মুহতারাম ইলম ও জিহাদ ভাইয়ের রচনা সমগ্র-২য় খন্ড

অগোছালো কিছু কথা

কিছু প্রশ্ন অনেকের মনেই আসে। সঠিক জওয়াব না পাওয়ায় মনে মনে সংশয় থেকে যায়। আবার কিছু প্রশ্ন আছে উত্তর পেলে মনটা শান্ত হতো। এ ধরনের অনেক বিষয় থাকে। এমন কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর নিয়েই আজকের লিখাটি। সবগুলো এক শিরোনামে আনা সম্ভব না। তাই অগোছালোই রাখলাম।

এক. অনেকে বলেন, ইসলাম একটা পিঁপড়াকেও কষ্ট দেয় না।

উত্তর: পিঁপড়া না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু ইসলাম তো সাপ মারতে বলে। সাপ মারলে সওয়াব পাওয়া যায়। আর কাফের মুরতাদরা সাপের চেয়েও ভয়ংকর এবং নিকৃষ্ট। আল্লাহর সৃষ্টিতে এরা সবচে' নিকৃষ্ট। এজন্য এদের মারলে সওয়াব পাওয়া যাবে। তবে আল্লাহর দেয়া সীমারেখা মেনে চলতে হবে অবশ্যই।

অধিকন্তু পিঁপড়া কামড় দিলে আপনিও ছাড়বেন না, যেমন মশা ছাড়েন না। আপনার বিবি সাহেবা যখন আপনার মাথা থেকে উকুন মারেন তখন কিন্তু কিছু বলেন না।

দুই. হুজুর! তলবে ইলম, দরস-তাদরিস, খানকা এগুলো ভাল

কাজ। সবাই তো ভাল কাজই করছে। তাহলে শুধু জিহাদ না করার কারণে সমালোচনা করেন কেন?

উত্তর: যেসব ছাত্র, যেসব মুরীদ ঠিকমতো নামায পড়ে না তাদের বকাঝকা করেন কেন? ফরয জিহাদ ছাড়লেও এমনই।

তিন. আপনারা বড় বড় হুজুরের বিরুদ্ধে কথা বলেন। এটা কি বেয়াদবি না? উনারা কি কম বুঝেন?

উত্তর: আমরা বড় হুজুরদের সম্মান বজায় রেখেই কথা বলি। বরং উনাদের গবেষণাগুলো থেকে আমরা মুজাহিদরাই প্রকৃতপক্ষে বেশি উপকৃত হই। তবে যেসব বিষয়ে উনারা জেনে না জেনে শরীয়াহ পরিপন্থী কথা বলেন, সেগুলোতে চুপ থাকতে পারি না। এখানে চুপ থাকা শয়তানি।

আর উনারা কম বুঝেন কি'না- এ ব্যাপারে কথা হলো, যেসব বিষয় উনারা কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক গবেষণা করেন সেগুলোতে উনারা অনেক ভাল বুঝেন। আমরা সেসব বিষয় উনাদের থেকেই গ্রহণ করি। কিন্তু শরীয়ত এক ব্যাপক জগত। এখানে সবাই একসাথে সব বুঝবে এমন না। নীতি হল, الاجتهاد يقبل التجزي – তথা কিছু বিষয়ে কারো ভাল বুঝ থাকতে পারে আর কিছু বিষয়ে একেবারেই ইলম না থাকতে পারে। বড় মুজতাহিদের বেলায়ও একই কথা যে, কোনো কোনো

মাসআলা না জানা থাকতে পারে। একারণে আইম্মায়ে কেরাম অনেক প্রশ্নের উত্তরেই বলতেন, লা আদরি- আমি জানি না। তখন অবশ্য শাগরিদ ও মুস্তাফতি প্রশ্ন করতো, আপনি এত বড় হুজুর, আপনি জানেন না? তখন তারা অকপটে স্বীকার করতেন, জী! এ বিষয়ে আমার জানা শুনা নেই। অন্যকে জিজ্ঞেস কর।

আমাদের সমস্যাটা হলো, আমরা একজনকে সব বিষয়ে আলেম মনে করে সব বিষয় উনার কাছে জিজ্ঞেস করি। আর বড়দের সমস্যা হলো, উনারা বড়ত্ব ঠিক রাখতে সব বিষয়ে কিছু একটা উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেন। লা আদরি বলতে লজ্জা পান। এ সমস্যাই আমাদের সর্বনাশ করছে।

চার. হুজুর, জিহাদের আয়াত কি তাবলিগে লাগানো যাবে না?

উত্তর: তাহলে আপনি স্বীকার করছেন, জিহাদ এক জিনিস আর তাবলিগ আরেক জিনিস। তাবলিগ জিহাদ নয়।
আরো স্বীকার করছেন, শরীয়তে জিহাদের ফজিলতের ব্যাপারে অনেক আয়াত হাদিস এসেছে। তাবলিগের ব্যাপারে এমন কিছু নেই। তাই জিহাদেরগুলো ধার করে তাবলিগে লাগাতে চাচ্ছেন।

যদি এ দুই কথা স্বীকার করেন তাহলে বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে যাবে। তারপর দেখা যাবে জিহাদের আয়াত তাবলিগে লাগানো যাবে কি’না। সহজ প্রশ্ন হল, রোযার ফজিলত তাবলিগে লাগানো যাবে

কি’না? সবাই বলবে, যাবে না। জিহাদেরগুলোতেও একই কথা। তাবলিগ সহীহ পথে হয়ে থাকলে দ্বীনের কাজের সওয়াব পাবে, জিহাদের সওয়াব পাবে না; যেমন রোযা না রেখে তাবলিগ করলে রোযার সওয়াব পাবে না।

পাঁচ. শুনেছি মুজাহিদদের হামলায় অনেক সময় সাধারণ মুসলমান মারা যায়।

উত্তর: সাধারণ মুসলমান কেনো, অনেক সময় মুজাহিদের হামলায় অন্য মুজাহিদও মারা যায়। অনেক সময় মুজাহিদ নিজেও মারা যান। এভাবে অনিচ্ছায় মারা গেলে গুনাহ হবে না। সর্বোচ্চ সতর্কতার পরও যদি কোনো মুসলমান মারা যায় এর দায়ভার মুজাহিদদের উপর আসবে না, কোনো গুনাহও হবে না।

এক যুদ্ধে এক সাহাবি এত জোরো তরবারি মারেন যে, তরবারি ঘুরে নিজের পায়ে এসে লাগে। সাহাবি মারা যান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ সাহাবি সাধারণ মুজাহিদদের চেয়ে বেশি মর্যাদা পাবে।

সাহাবায়ে কেরাম অনেক সময় অকস্মাৎ হামলা করতেন, যার ফলে কাফেরদের নারী-শিশুরাও মারা যেতো যাদেরকে হত্যা করা নিষেধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সমস্যা নেই। ইচ্ছা করে মেরো না।

মুসলমানদের ব্যাপারেও একই কথা। আর সাধারণ মুসলমানদের উচিৎ হলো, কাফের মুরতাদের থেকে দূরে থাকা। যাতে মুজাহিদদের হাতে আল্লাহ তাআলা কাফের মুরতাদদের যে আযাব দেন, তারাও যেন এ আযাবে পড়ে না যান।

ছয়. মুজাহিদরা অনেক জায়গায় হদ কায়েম করেন না, অন্য শাস্তি দেন। এটা কি হুকুম বি গাইরি মা আনযালাল্লাহ না?

আচ্ছা ভাই প্রশ্ন করি, আমাদের সমাজে তো অনেক যিনা হচ্ছে, চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে। কাউকে কি আপনি শাস্তি দিয়েছেন? উত্তরে বলবেন, আমাদের তো শক্তি নেই।

আপনি যদি মা'জুর হন, মুজাহিদদেরও মা'জুর মনে করেন। আপনি কোনো কিছু না করেও যদি মাফ পেয়ে যাবেন আশা করছেন তাহলে মুজাহিদরা যতটুকু পারছেন শাস্তি দিচ্ছেন, তাহলে তারা কেনো মাফ পাবেন না? হদ কায়েমের জন্য যতটুকু শক্তি দরকার ততটুকু হাসিল হলে অবশ্যই হদ কায়েম করবেন। যাদের হাসিল হয়েছে তারা করছেনও। যেমন সোমালিয়া। তখন ভিন্ন শাস্তি দিলে হুকুম বি গাইরি মা আনযাল্লাহ হবে। তখন দেখতে হবে সেটা কোন পর্যায়ের: ফিসক না কুফর?

সাত. জিহাদিরা উগ্র।

উত্তর: ভাই, কিছু জযবা না থাকলে দ্বীনের কাজ করা যায় না। আবু বকর রাদি. তো একেবারে নরম মানুষ ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أرحم أمتي بأمتي ابو بكر তথা উম্মতের মধ্যে উম্মতের প্রতি সবচে' রহম দিল মানুষ হলেন আবু বকর। সেই আবু বকর কি সিংহের গর্জন দিয়েছিলেন মনে আছে? 'আল্লাহর কসম! ছাগলের একটা রশি দিতে অস্বীকার করলেও আমি এদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো'। বাব্বা! কি হুংকার।

জিহাদিরা সেই আবু বকরের উত্তরসুরি তো তাই একটু জযবাতি। তবে অতি জযবা অবশ্যই নিন্দনীয়। কেউ কেউ জযবার সীমা লংঘন করেন। এটা অস্বীকার করা যায় না। এটা শুধু মুজাহিদদের দোষ না, সবাই এমন করেন। বদনাম শুধু মুজাহিদদের হয় আরকি।

আট. মুজাহিদরা ভাসা ভাসা বুঝে।

উত্তর: মুজাহিদরা সরীহ কুরআন সুন্নাহ আর সালাফে সালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কথা বলেন তো তাই একটু ভাসা ভাসা মনে হয়। সালাফও এমন ছিলেন। প্যাঁচ পছন্দ করতেন না। কথায় আছে, العلم نقطة كثرها الجهلاء ইলম ছিল একটা বিন্দু। জাহেলরা আজগুবি বহস করে করে পাহাড় বানিয়ে ফেলেছে।

নয়. জিহাদ করতে গেলে সমাজের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট হয়ে বিশৃংখলা দেখা দেবে।

কুফরি সমাজের শৃংখলা নষ্ট করা আল্লাহ তাআলার সুন্নত। আদ সামূদ যেসব জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন এরা তো অনেক সুখেই ছিল। আল্লাহ তাআলা এদের শান্তি হারাম করে দিলেন। এদের ধ্বংস করে তার মুমিন বান্দাদের হাতে যমিনের ক্ষমতা দিলেন। আমাদেরও করণীয় তাই। কুফরি সমাজ ধ্বংস করে শরীয়াহর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তবে মুমিনের জান-মাল সুরক্ষিত। যতটুকু পারা যায় চেষ্টা করতে হবে যেন মুমিনের জান মালের ক্ষতি না হয়। যতটুকু না পারা যায় ততটুকুর জন্য মুজাহিদরা দায়ি না। বরং যারা জিহাদ না করে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে আরামে চলে আসছিলেন তাদের বরবাদির জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। আল্লাহর পথে এত দিন জান মাল বিসর্জন যখন দেননি, অনিচ্ছায় হলেও এর সাজা পেতে হবে। মুজাহিদদের করার কিছু নাই।

দশ. মুজাহিদদের কারণে বড়দের প্রতি আস্থা নষ্ট হচ্ছে।

বড়দের প্রতি আস্থা নষ্ট করাই তো নবী রাসূলদের সুন্নত। লোকজন বড়দের পূজা করে আসছিল। নবী রাসূলগণ এসে তা হারাম ঘোষণা দিলেন। দ্বন্দ্ব লেগে গেল। সন্তান ঈমান আনলো বাপ কাফের রইল। পিতা-সন্তানে আস্থা নষ্ট হল। এভাবে ভাইয়ে ভাইয়ে, বন্ধুতে বন্ধুতে

একেবারে সব জায়গায় আস্থা নষ্ট হয়ে গেল। বড়দের কথা আর মানছে না ছোটরা। রাসূলদের দাওয়াতের কারণে আস্থা উঠে গেছে বড়দের প্রতি।

এটিই নবী রাসূলদের সুন্নত। তবে বড়রা যদি কুরআন সুন্নাহ এবং সালাফের তরিকামতো কথা বলেন তাহলেই আর আস্থা নষ্ট হবে না। ব্যতিক্রম হলেই আস্থা নষ্ট। এর জন্য উনারা নিজেরাই দায়ী।

আজ এ দশটাই। অন্য মজলিসে ইনশাআল্লাহ....।

অগোছালো কিছু কথা -০২

এগার. হুজুর, অনেকে বলেন, ইসলামে ধর্ম নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। ইসলাম সব ধর্মের স্বাধীনতা দেয়।

উত্তর: আমার ধর্ম বলে,

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

'মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর। তাদের পাকড়াও কর,

অবরোধ কর এবং তাদের (অপহরণ ও গুপ্ত হত্যার) জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে (ওঁৎপেতে) বসে থাক।’- তাওবা: ৫

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

‘তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর; আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন, তাদের অপদস্থ করবেন, তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্তর জুড়িয়ে দেবেন।’ –তাওবা: ১৪

এখন যদি আমি কাফেরদের মারতে না পারি, ধরতে না পারি; গুম, গুপ্ত হত্যা, কিডনেপ ও অপহরণ করে অন্তর জুড়াতে না পারি তাহলে তো আমার ধর্মের স্বাধীনতা থাকছে না। ইসলাম তো আমার ধর্মের স্বাধীনতা দিয়েছে।

বার. তাকফির করা না’কি খারেজিদের কাজ?

উত্তর: তাকফির করলেই যদি খারেজি হয়ে যায় তাহলে তো আবু বকর রাদি. সবচেয়ে বড় খারেজি। উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম তাকফিরের দরজা খোলেছেন। তাকফির করে কিতাল করেছেন। হত্যা করেছেন, বন্দী করেছেন। সম্পদ গনিমত বানিয়েছেন। তাদের বিবি বাচ্চাদের গোলাম বাদি বানিয়েছেন।

দলীলের আলোকে যে কাফের তাকে তাকফির করাই সিদ্দিকি মানহাজ, আহলুস সুন্নাহর মানহাজ।

তের. কোনো কোনো আলেমকে বলতে শুনেছি, তালেবান ঠিক আছে। আলকায়েদা উগ্রপন্থী।

উত্তর: আলকায়েদার হাতে মার খেয়ে যেদিন কুফরি বিশ্ব আলকায়েদাকে মুজাহিদ স্বীকৃতি দেবে কিংবা যেদিন আলকায়েদার হাতে হিন্দুস্তানে খেলাফতের পতাকা উড়বে সেদিন আলকায়েদাও মু'তাদিল হয়ে যাবে। সেদিন আলকায়েদা দেওবন্দের সন্তানে পরিণত হবে, যেমন আজ তালেবানরা দেওবন্দের সন্তানে পরিণত হচ্ছেন।

চৌদ্দ. তালেবান না'কি আলকায়েদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে?

উত্তর: অনেকে এমন অলিক স্বপ্ন দেখছিলেন। এমন কামনাই করছিলেন। সেটাই উনাদের মুখ দিয়ে বের হচ্ছে। নতুবা এমন কোনো সংবাদ পাইনি। যারা বলছে তারাও পায়নি। তবে মনকে তো মানাতে পারছে না তাই একটা কথা বলছে আর কি। তালেবান আগের মতোই আলকায়েদার বাইয়াত ধরে রেখেছে। আলকায়েদাও আগের মতোই তালেবানের হাতে বাইয়াত হয়ে আছে। কা-লবুনইয়ানিল মারসুস। মাঝখানে কিছু লোক দিবাস্বপ্ন স্বপ্ন দেখে তৃপ্তি নেয়ার চেষ্টা করছে।

পনের. এক মুফতি সাহেব বলেছেন, বাংলাদেশ দারুল হরব হলে তো মুশকিল। দারুল হরব থেকে হিজরত করা তো ফরয।

উত্তর: নামাযে এক লোকের বাতাস বের হয়ে গেল। মুফতি সাহেব ফতোয়া দিচ্ছেন বাতাস বের হয়নি। বের হলে তো নামায নষ্ট হয়ে যাবে, আবার পড়তে হবে। এটা ঝামেলা। এর চেয়ে বরং বের হয়নিটাই সোজা।
এ ফতোয়াও এমনই।

অধিকন্তু দারুল হরব থেকে হিজরত করতে হবে এটা মুফতি সাহেব কোথায় পেলেন? দারুল হরব উদ্ধার করা ফরয। হিজরত করতে হবে যখন হিজরতের মতো কোনো দারুল ইসলাম থাকবে। অন্যথায় যেখানে থাকলে অধিকতর ভালভাবে দ্বীনের কাজ করা যায় সেখানেই থাকবে। বর্তমানে হিজরত করে যাওয়ার মতো রাষ্ট্র পাওয়া যাচ্ছে না। আর পাওয়া গেলেও সম্ভব হচ্ছে না সকলের জন্য। এর চেয়ে বরং নিজের দেশে থেকে জিহাদ করাই ভাল। জিহাদ ফরয হয়ে যাবে ভয়ে দারুল হরবই হয়নি ফতোয়া দেয়ার সুযোগ নেই।

তাছাড়া যদি ধরি দারুল হরব হয়নি তাহলেও জিহাদ মাফ নেই। কাফেররা যখন দারুল ইসলামে দখলদারিত্ব কায়েম করে তখন এ দখলদার শত্রু হটানো ফরয। এ ব্যাপারে উম্মাহর কোনো ইমামের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই। আসলি কাফের আর মুরতাদ কাফেরের

মাঝেও কোনো ব্যবধান নেই। জিহাদ সকলের বিরুদ্ধেই ফরয। তবে বেশকম এতটুকু যে, মুরতাদদেরকে ছাড়া যাবে না। হয় মুসলমান হবে নইলে হত্যা করে দেয়া হবে।

অতএব, দারুল হরব হলেও জিহাদ মাফ নেই না হলেও মাফ নেই।

ষোল. এত কাফের কাফের কর কেন তোমরা? সবাইকে তোমরা কাফের বানিয়ে ফেলবে না'কি?

উত্তর: লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। কাফের বানাতে যাব কেন? যারা কাফের হয়ে গেছে আমরা তো কেবল তাদের ব্যাপারে সতর্ক করে যাচ্ছি। যেন সাধারণ মুসলিমরা এদের থেকে এবং এদের কুফর থেকে বেঁচে থাকে। এদের সাথে যেন বিবাহশাদি না হয়। এদের জবাইকৃত পশু যেন না খায়। এদেরকে যেন সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো পদে না বসায়। কোনো পদে বসে থাকলে যেন অপসারণ করে। সর্বোপরি কুফর থেকে ফিরে না আসলে যেন এদের উপর মুরতাদের শাস্তি প্রয়োগ করে। এগুলো যেগুলো কুরআন সুন্নাহর বিধান আমরা সেগুলো শুধু বাস্তবায়ন করতে চাই। আমরা কাফের বানাতে যাব কেন?

সতের. আলকায়েদা তালেবান আমেরিকার

তৈরি।

উত্তর: তাহলে আমরাও বলতে পারি, আপনারা আমেরিকার তৈরি। আপনারা আমেরিকার দালাল।

যদি বলেন, না, আমরা এমন নই; তাহলে আমরাও বলবো, আমরাও আমেরিকার তৈরি নই। বিশ্বাস না হলে আমেরিকার দিকে তাকান, আলকায়েদা তালেবানের মুগুড় খেয়ে শিয়াল মশাইয়ের কি হাল!

আঠার. জিহাদিরা নেট থেকে ইলম নেয়।

উত্তর: নেট থেকে সবাই নেয়, দোষ শুধু মুজাহিদদের। করোনার সময় বাংলাদেশের মুফতি সাহেবরা যে ফতোয়াগুলো দিয়েছেন সেগুলো তাকি উসমানী সাহেবদের এবং দেওবন্দের ফতোয়ার হুবহু অনুবাদ বলা চলে। সেগুলো তারা কোত্থেকে নিয়েছেন? কে গিয়েছিল পাকিস্তানে আর কে গিয়েছিল দেওবন্দে ফতোয়া আনতে?

হয়তো বলবেন, আমরা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের থেকে নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট থেকে নিই।

আমাদেরও একই কথা। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট থেকেই নিই। আজেবাজে সাইট ব্রাউজ করা, আজেবাজে কারো লেখা পড়া জিহাদি মানহাজে নিষিদ্ধ। তাহলে আমাদের দোষ হল কোথায়?

অধিকন্তু মুজাহিদ আলেমরা যারা ফতোয়া দেন, তারা নেট পড়ে আলেম হননি, নেট পড়ে ফতোয়াও দেন না। উস্তাদের দরবারে হাঁটু গেড়ে সবক পড়েই তারা আলেম হয়েছেন। কিতাব পড়েই ফতোয়া দিচ্ছেন। নেট একটা সহায়ক মাধ্যম, যেমন আপনাদের জন্যও সেটি সহায়ক মাধ্যম।

উনিশ. তানজিমের মাসুলদের আনুগত্য কি ফরয?

উত্তর: জি ভাই, ফরয। আপনিই বলুন, যদি আপনি এ শর্তে তানজিমে ঢুকতে চাইতেন যে, মাসুলদের আপনি আনুগত্য করবেন না, নিজের মতো চলবেন: তাহলে কি আপনাকে তানজিম কোনো দিন নিতো? আপনাকে নেয়াই হয়েছে এ শর্তে যে, তানজিমের নিয়ম কানুন মেনে চলবেন। নয়তো আপনাকে নিয়ে ভেজাল কে বাড়াতো? আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার পূরণের আদেশ দিয়েছেন। গাদ্দারি হারাম করেছেন।

তবে আনুগত্যের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যেসব বিষয়ে যতটুকু কর্তৃত্ব এর বাহিরে চাপ দিতে পারবেন না মাসুল ভাই।
তানজিমের স্বার্থ বিরোধী কিংবা আমনিয়ার খেলাফ কোনো কাজ করার অধিকার কোনো সাথীর নেই। দ্বিতীয়ত যে মাসুলকে যতটুকু কর্তৃত্ব তানজিমের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে ততটুকুতে তার আনুগত্য করতে হবে। এর বিপরীত করলে নাফরমানির গুনাহ হবে। আর তানজিমও

পড়বে হুমকির মুখে। কোনো ভাইয়ের জন্য এমন কাজ করা কখনই জায়েয হবে না।

তবে তানজিম সকল সাথীর জন্য মাশওয়ারা ও রায় দেয়ার দরজা খোলা রেখেছে। বরং সাথীদের যোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে তানজিম অনেক সময় সাথীরা না চাইলেও তাদের থেকে রায় তলব করে। সেখানে আমাদের কোনো খটকা থাকলে বা কোনো ভাল খেয়াল আসলে পেশ করতে পারি। তানজিমের উদ্দেশ্য, সাথীরা যেন বুঝে শুনে কাজ করে। জি হুজুর জি হুজুর তানজিমের মানহাজের খেলাফ। নিজের নজর ও ফিকির বাড়াতে চেষ্টা করুন। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার যোগ্যতা গড়ে তুলুন। আমাদের কোনো ভাই গ্রেফতার হলে বা শহীদ হলে যেন আমাদের কাজ স্থবির না হয়ে পড়ে। এটাই তানজিম চায়। তাই আদব ইহতিরামের সাথে আপনার রায় দিন। আপনার রায় গ্রহণ না হলে কষ্ট নেবেন না। বিদ্রোহ করবেন না। আনুগত্য করুন। পাশাপাশি নিজের যোগ্যতা বাড়াতে চেষ্টা করুন। অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষে নয়, আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে। হাদিসে এসেছে,

المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف

দুর্বল মুমিনের তুলনায় সবল মুমিন অধিক ভাল।

এ সবলতা ঈমানী, আমলী, ইলমী, শারীরিক ও ফিকরি: সব দিককে শামিল করে।

বিশ. আমাকে শুধু কিতাব পড়তে বলে, লিখতে বলে। আমি বলেছি আমাকে আসকারিতে নিন। নিলো না।

উত্তর: মুহতারাম ভাই, আমাদের কাজের গণ্ডি অনেক বিশাল। একজন সব শাখায় কাজ করতে পারে না। যাকে যে কাজে তানজিম যোগ্য মনে করে তাকে সে কাজেই লাগায়। আপনার মাঝে হয়তো তারা ইলমী যোগ্যতা দেখেছেন। তাই এ কাজ আপনাকে দিয়েছেন। সবরের সাথে করে যান। মা'রেকার সওয়াবও পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আজকের মজলিসে এ দশটিই। সামনের মজলিসে ইনশাআল্লাহ ....।

অগোছালো কিছু কথা-৩

একুশ. জিহাদের ফলে খাওয়ারেজ তৈয়ার হয়।

উত্তর: আপনি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী এড়িয়ে যেতে চান? উম্মতে মুসলিমার মাঝে খাওয়ারেজ নামক ভাইরাসের উৎপত্তি হবে বলে অসংখ্য হাদিসে এসেছে। এটি এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত খাওয়ারেজ তো পয়দা হয়েছিল হযরত উসমান রাদি. এর যামানায়। এসব লোক খলিফায়ে রাশেদ উসমান যুন নুরাইন রাদি.কে শহীদ করে। আলী রাদি.র সাথে তাদের কিতালের ইতিহাস সকলের জানা। অবশেষে এরা আলী রাদি.কেও শহীদ করে। তাহলে কি আপনি খেলাফতে রাশেদার উপর আপত্তি করবেন যে, খেলাফতের কারণে খাওয়ারেজ পয়দা হয় তাই খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা যাবে না?

আসলে খাওয়ারেজ অন্য সকল অপরাধীগোষ্ঠীর মতোই একটা গোষ্ঠী। অন্য অপরাধীগোষ্ঠীর মতো এদের উৎপত্তিও স্বাভাবিক। এটি খেলাফতেরও কুফল নয় জিহাদেরও কুফল নয়। বরং এসব নাফরমান নির্বোধ অহংকারীকে আল্লাহ তাআলা আহলুস সুন্নাহর খালেস মুজাহিদদের কাতার থেকে বহিষ্কৃত করে জিহাদকে পাক পবিত্র করতে চান।

বাইশ. জিহাদ যদি করতে চাও তাহলে গোপনে কেন? প্রকাশ্যে আস।

উত্তর: এ ধরনের প্রশ্ন শিখদের পক্ষ থেকে সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহ.কে করা হয়েছিল। সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহ. যখন শিখদের উপর রাতের অন্ধকারে গুপ্ত হামলা চালিয়ে যেতে থাকলেন যেগুলো শিখরা প্রতিহত করতে পারছিল না তখন তারা সিয়াসি চাল চেলে এ

হামলা বন্ধ করতে চেষ্টা করল। তারা বলল, আপনি যদি সুপুরুষ হন তাহলে রাতের অন্ধকারে গোপনে কেন হামলা করেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, জিহাদ আমার কাজ। যতভাবে তোমাদের দমন করা যায় আমি তা করে যাব। তোমাদের কথায় আমি ধোঁকায় পড়বো না।

আফসোস! এ ধরনের প্রশ্ন কাফেরদের তরফ থেকে করা হতো। আজ জাতির রাহবার বলে যারা পরিচিত তারা করছে।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, الحرب خدعة – যুদ্ধ কৌশলের নাম। প্রকাশ্য-গোপন যত রকমের কৌশল আছে সবই এতে শামিল।

আবু বাসির রাদি. গোপনে গোপনেই জিহাদ দাঁড় করিয়ে মক্কাবাসীর কোমড় ভেঙে দিয়েছিলেন।

কা'ব বিন আশরাফ, ইবনে আবিল হুকাইক, খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালি সবাইকে গোপনেই হত্যা করা হয়েছিল।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো যুদ্ধে গমনকালে সাহাবায়ে কেরামকে বলতেনও না যে কোন শত্রু তার উদ্দেশ্য। যেদিকে টার্গেট সরাসরি সেদিকে না গিয়ে অন্য দিকে রওয়ানা করতেন। সাহাবায়ে কেরামের সাথেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটুকু গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন।

মোটকথা, কাফেরদের কোমড় ভেঙে দেয়া হল কথা। এখন প্রকাশ্যে

আসবো না গোপনে আসবো সেটা কৌশলের ব্যাপার। যে মারহালায় যেটা মুনাসিব সেটাই করবো। এটাই যুদ্ধনীতি। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

তেইশ. জীবনটা কতয়ি মাহফুজ। সেটা দিতে হলে কতয়ি জায়গা লাগবে।

উত্তর: জিহাদ থেকে ফিরানোর জন্য কথাটা বলা হয়। কথাটার মর্ম: যেকোনো কিছুতে জীবন দিয়ে দেয়া জায়েয নয়। জীবন দিতে হলে এমন ক্ষেত্র লাগবে যেখানে জীবন দেয়া কুরআন সুন্নাহর কতয়ি দলীল অনুযায়ী বৈধ।

কথাটা সুন্দর, মতলব খারাপ। এ কথার প্রবক্তারা মূলত একথা বলতে চান যে, জিহাদিরা যত্রতত্র জীবন দিয়ে হারাম করে যাচ্ছে। কিন্তু সরাসরি এভাবে বললে আবার কোন্ বিপদ এসে পড়ে বিধায় একটু ইস্ত্রি করে বলেছে। ইলমী পরিভাষা ব্যবহার করেছে। যেন মনে করা হয় যে, তিনি কুরআন সুন্নাহর দলীলমাফিক কথাটা বলেছেন। নিজেকে বাঁচিয়ে চলার এটা একটা পলিসি।

জিহাদিরা কোথায় জীবন দিচ্ছে তা তো পরিষ্কার। আল্লাহর প্রেরিত

শত সহস্র নবী রাসূল এবং তাদের অনুসারিরা যেসব তাগুতের বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে গেছেন, বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবায়ে কেরাম যে পথে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন আমরা সে পথেই জীবন দিচ্ছি। যত্রতত্র দিচ্ছি না। এখানে আপত্তির তো কিছুই ছিল না। কিন্তু যাদের নজরিয়া ও ফিকির কুরআন সুন্নাহ থেকে ভিন্ন মোড় ধরেছে তাদের কাছে জিহাদ মানেই নাজায়েয একটা কিছু।

চব্বিশ. জিহাদ করে লাভ নেই। শেষে মুজাহিদরা নিজেরাই মারামারিতে লেগে যায়। রাশিয়ার পতনের পর আফগান মুজাহিদরা নিজেরা মারামারি করেছে।

উত্তর: মারামারি বনি আদমের তবিয়ত। আদম আলাইহিস সালামকে দেখে ফেরেশতারা আঁচ করতে পেরেছিল যে, এরা দুনিয়াতে গিয়ে মারামারি করবে। এজন্যই বলেছিল, ‘আপনি কি এমন কাউকে প্রতিনিধি করে পাঠাবেন যারা সেখানে গিয়ে ফিতনা ফাসাদ করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে’? যেহেতু মারামারি বনি আদমের তবিয়ত তাই একে নির্মূল করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর শুরু থেকে এখন পর্যন্ত

মারামারি চলে আসছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত চলবে।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলার অমোঘ ফায়াসালা, এ উম্মত নিজেরা মারামারি করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন যেন উম্মত নিজেরা মারামারি না করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, হে নবি, আপনার উম্মত মারামারি করবে এটাই আমার ফায়াসালা। আমি আপনার এ আবেদন মঞ্জুর করছি না।

যখন বনি আদমের তবিয়ত মারামারি এবং আল্লাহ তাআলার অমোঘ ফায়সালা যে এ উম্মত মারামারি করবে তখন মারামারি বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে আমার দায়িত্ব হল, হকের পক্ষে মারামারি করা। মারামারির ভয়ে হকের পক্ষ ত্যাগ করার অর্থ রিয়া এসে যাওয়ার ভয়ে নামায ছেড়ে দেয়া।

তৃতীয়ত মুজাহিদদের নিজেদের মারামারি আজ নতুন কিছু নয়। এ মারামারি স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম করেছেন। আর তারাই আমাদের আদর্শ। উসমান রাদি.র শাহাদাতকে কেন্দ্র করে হযরত আলী রাদি. এবং মুআবিয়া রাদি.র মাঝে মারামারি হয়েছে। যার পরিণতিতে উভয় পক্ষের মিলে খাইরুল কুরুনের আশি হাজার মুসলমান শহীদ হয়েছেন। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর এ মারামারি চলেছিল।

জুমহুর উলামায়ে কেরামের মত হল আলী রাদি. হকের উপর ছিলেন

আর মুআবিয়া রাদি. ভুলের উপর ছিলেন। যদিও ভুলের উপর ছিলেন তথাপি তিনি দুনিয়ার লোভে যুদ্ধ করেননি। যা হক মনে করেছেন তা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়েছেন। এজন্য ভুলের উপর থাকার পরও তার সমালোচনা নাজায়েয। যারা তার সমালোচনা করবে তারা আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত।

আলী রাদি. যিনি হকের উপর ছিলেন, তার যে বাহিনি এতদিন মুআবিয়া রাদি.র বিরুদ্ধে *যুদ্ধ করেছে তাদের থেকে বার হাজার খাওয়ারেজ তার বিরুদ্ধে চলে যায়। অবশেষে তিনি তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করেন। এমনভাবে নির্মূল করে ছাড়েন যে, এদের দশটা লোকও মুক্তি পায়নি।

তাহলে আমরা এখানে খেলাফতে রাশেদায় মুজাহিদদের দুই শ্রেণীর মারামারি পেলাম,
এক. আলী-মুআবিয়া; যাদের কারও সমালোচনা জায়েয নেই।
দুই. আলী-খাওয়ারেজ। এখানে খাওয়ারেজরা পথভ্রষ্ট গোমরাহ। এদের সমালোচনা জরুরী এবং এদের বিরুদ্ধে কিতাল জরুরী।

যারা মারামারির কারণে জিহাদ বন্ধ করার পক্ষপাতি তাদের বলবো, আপনারা একটু খবর নিয়ে দেখুন যে মুজাহিদদের মারামারিগুলো কোন শ্রেণীর। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কোনো এক শ্রেণীর হয়ে থাকলে আপনি এ অজুহাতে জিহাদ বন্ধ করার কথা বলতে পারবেন না।

আর বাস্তবেই যদি এমন হয় যে, কেবল ক্ষমতার লোভে মুজাহিদরা মারামারি করেছেন তাহলেও এ অজুহাতে আপনি জিহাদ বন্ধ করে দেয়ার কথা বলতে পারবেন না। কারণ, এ ধরনের মারামারিও আজ নতুন নয়। খায়রুল কুরুন থেকেই তা চলে আসছে। কিন্তু কেউই এ কারণে জিহাদ বন্ধ করতে বলেননি। ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়া আব্বাসী এবং পরবর্তী মামলুক ও উসমানীসহ আরো যত সুলতান যত মারামারি নিজেরা করেছেন সেগুলোর অনেকগুলোই, বরং বলতে গেলে অধিকাংশই ক্ষমতার জন্য। কিন্তু কোনো আলেম ফতোয়া দেননি যে, এরা ক্ষমতার জন্য মারামারি করে বলে এদের সাথে মিলে জিহাদ করা যাবে না বা এরা যে জিহাদ করে তা বন্ধ করে দিতে হবে। ইসলামের ইতিহাসে আপনারাই সর্বপ্রথম এ বিদআত আবিষ্কার করলেন।

বরং আহলুস সুন্নাহর মুত্তাফাক আলাইহি আকিদা হলো, সুলতান জালেম হলেও, ক্ষমতালোভী হলেও যতদিন তিনি ইসলামের পক্ষে জিহাদ করে যাবেন সকলে তার সাথে মিলে জিহাদ করে যাবে। এটা আহলুস সুন্নাহর সর্বসম্মত আকিদা। তার জুলুমে তাকে সহায়তা করা যাবে না, কিন্তু তিনি যখন জিহাদ করেন তখন পিছিয়ে থাকা যাবে না। যারা পিছিয়ে থাকবে তারা হয়তো মুনাফিক নয়তো বিদআতি বা স্বল্পজ্ঞানী। আকিদার প্রত্যেকটি কিতাবে এ মাসআলা পরিষ্কার লিখা আছে।

অতএব, *মুজাহিদরা যদি নিজেরা মারামারি করে তাহলে দেখতে হবে কোন দল হক আর কোন দল বাতিল। বাতিলের বিপক্ষে হকের পক্ষ নিতে হবে। আর যদি উভয় দলই বাতিল হয় তাহলে এ মারামারিতে কোনো দলের পক্ষ নেয়া যাবে না। তবে তারা যখন কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন তখন সকলে এক হয়ে জিহাদ করতে হবে। এখানে যারা পিছিয়ে থাকবে তারা বিদআতি। এটিই আহলুস সুন্নাহর আকিদা। এটিই কুরআন সুন্নাহর নির্দেশ। খেলাফতে রাশেদার পর ইসলামের অধিকাংশ জিহাদ এভাবেই হয়েছে। কাজেই মারামারির অজুহাতে যারা জিহাদ বন্ধ করে দিতে চায় তাদের মতলব খারাপ নয়তো স্বল্পজ্ঞানী।

আর আফগান মুজাহিদদের মারামারির কথা যেটা বলেছেন সেটাও আপনার বদ মতলব বা অন্তত আপনার স্বল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। রাশিয়া চলে যাওয়ার পর তালেবানরা ঐসব মুনাফিক ও মুরতাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল যারা এতদিন নিজেদের নিফাক গোপন রেখেছিল। যারা ইসলাম ছেড়ে রাশিয়া ও আমেরিকার সাথে আঁতাত করে কুফরি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। তালেবানরা এদের সাথে লড়াই করেছিল। এটা মূলত ঈমান কুফরের লড়াই ছিল। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আবু বকর রাদি. মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। এ কারণে তৎকালীন হক্কানী উলামায়ে কেরাম তালেবানদের পক্ষ নিয়েছিলেন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ...)

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা’যির)- ০১

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين
أما بعد...

আল্লাহ তাআলা অপরাধের বিপরীতে শাস্তির বিধান দিয়েছেন। যেন মানুষ শাস্তির ভয়ে অপরাধ থেকে বিরত থাকে। কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় কেউ অপরাধে লিপ্ত হলে তার উপর যথার্থ শাস্তি কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন। যাতে অপরাধী দ্বিতীয়বার অপরাধে লিপ্ত হতে সাহস না পায়। জনগণ যেন তার শাস্তি দেখে শিক্ষা নেয়। এভাবে সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূল হবে। সমাজের স্বাভাবিক ভারসাম্যতা বজায় থাকবে। সমাজে শান্তি ও সুশৃংখলতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

তবে এই শাস্তি সবক্ষেত্রে এক রকম নয়। অপরাধের ধরণ ও পরিমাণ, অপরাধীর অবস্থা, যার হক নষ্ট করা হয়েছে বা যার অনিষ্ট সাধন করা হয়েছে তার অবস্থা- ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্নতায় শাস্তির ধরণ-প্রকৃতি ও পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে।

এক. অপরাধের ভিন্নতায় শাস্তির ভিন্নতা

যেমন:

- যিনার শাস্তি: বিবাহিত হলে রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা আর অবিবাহিত হলে একশো দোররা।

- কোন পূত-পবিত্র স্বাধীন মুসলমানকে যিনার অপবাদ দিলে আশি দোররা।

- মদপানে আশি দোররা।

- চুরি করলে হাত কাটা।

- রাহাজানি করলে অবস্থাভেদে হত্যা, শূলিতে চড়ানো, কিংবা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেয়া, কিংবা জেলে ভরা বা নির্বাসন দেয়া।

- হত্যার বদলে হত্যা বা দিয়াত (রক্ত-মূল্য)।

- মুরতাদ হয়ে গেলে হত্যা।

দুই. অপরাধীর অবস্থাভেদে শাস্তির ভিন্নতা

যেসব অপরাধের শাস্তি শরীয়তে সুনির্ধারিত নয় (যেমন- পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, কাউকে গালি দেয়া), সেসব অপরাধের শাস্তি ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- কোন দ্বীনদার ব্যক্তি যদি জীবনের প্রথম কাউকে গালি দেয়, তাহলে তাকে

মাফ করে দেয়া যেতে পারে। যেমনটা হাদিসে এসেছে- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود “বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হদ ব্যতীত অন্যান্য ভুল-বিচ্যুতি মাফ করে দাও।” কিংবা তাকে যদি কাযি সাহেব লোক মারফত জানান যে, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে: আপনি অমুককে গালি দিয়েছেন- তাহলে এতটুকুই তার এ অপরাধের শাস্তির জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি গালি-গালাজ এবং মারামারিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, লোকজন তার যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে যায়- তাহলে এমন ব্যক্তিকে মাফ করা হবে না। তাকে শুধু মৌখিক জানানোও যথেষ্ট নয়। বরং তাকে গ্রেফতার করে কাযির দরবারে হাজির করতে হবে। প্রয়োজনে প্রহার করতে হবে। জেলে আটকে রাখতে হবে, যত দিন না তাওবা করে সংশোধন হয়। তদ্রূপ কোন দ্বীনদার ব্যক্তি যদি কোন নিরপরাধ মুসলমানকে মারতে মারতে রক্তাক্ত করে ফেলে, তাহলে জীবনের প্রথমবার করলেও তার এ অপরাধ ক্ষামাযোগ্য নয়। তাকে শুধু জানানোও যথেষ্ট নয়। বরং তাকে প্রয়োজন পরিমাণ বেত্রাঘাত করাই এখন তার যোগ্য শাস্তি। কেননা, তার এ অপরাধ আর ভুল-বিচ্যুতির পর্যায়ে থাকেনি (হাদিসে যা ক্ষমা করে দেয়ার কথা এসেছে) বরং তা মাত্রা অতিক্রম করে সীমালংঘন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

তিন. যার হক নষ্ট করা হয়েছে বা যার অনিষ্ট সাধন করা হয়েছে, তার অবস্থাভেদে শাস্তির ভিন্নতা

কোন সাধারণ লোক যদি অন্য কোন সাধারণ লোককে গালি দেয়, তাহলে তার শাস্তি হবে এক রকম। পক্ষান্তরে এমন ব্যক্তি কোন বিশিষ্ট আলেমকে গালি দিলে তার শাস্তি হবে আরও শক্ত। তদ্রূপ কোন নষ্টা মেয়ের সাথে ইভটিজিং করার শাস্তির তুলনায় কোন সম্ভ্রান্ত, দ্বীনদার ও পর্দানশীল নারীর সাথে এ ধরণের কর্মের শাস্তি আরও গুরুতর হবে। এভাবে অপরাধ ও অপরাধী এক হওয়া সত্ত্বেও যার হক নষ্ট করা হয়েছে বা যার অনিষ্ট সাধন করা হয়েছে, তার অবস্থাভেদে শাস্তি ভিন্ন হয়।

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০২

হদ (الحد)-তা'যির (التعزير)

শরীয়তে শাস্তি ও দণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত:

১. কিছু শাস্তি শরীয়ত কতৃক সুনির্ধারিত, যাতে কোন ধরণের কম-বেশ করা যাবে না। এগুলোকে হদ বলে। আর কিছু

শাস্তির সুনির্ধারিত কোন পরিমাণ নেই। অপরাধের ধরণ ও পরিমাণ, অপরাধীর অবস্থা, যার হক নষ্ট করা হয়েছে বা যার অনিষ্ট সাধন করা হয়েছে তার অবস্থা- ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্নতায় সেগুলো বিভিন্ন রকম ও পরিমাণের হয়ে থাকে। শরয়ী ইমাম, সুলতান বা কাযি যেখানে শরীয়ত সম্মত যে ধরণের ও যে পরিমাণের শাস্তি দেয়া মুনাসিব মনে করেন, ইজতিহাদের ভিত্তিতে সে রকম শাস্তি প্রয়োগ করবেন। যেখানে যে শাস্তি প্রয়োগ করলে অপরাধ দমন হবে বলে মনে হয়, সেখানে সে শাস্তিই প্রয়োগ করবেন। অবশ্য তা শরীয়ত কতৃক সুনির্ধারিত শাস্তি তথা হদের কম হতে হবে। এ ধরণের শাস্তিকে তা'যির বলে। নিচে আভিধানিক ও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে হদ ও তা'যির নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

হদ (الحد)

আভিধানিকভাবে الحد অর্থ- المنع তথা বাধা দেয়া। এসব শাস্তিকে হদ বলা হয়, কারণ- এগুলো লোকজনকে অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে। লোকজন যখন জানবে যে- যিনা, কযফ (তথা কোন পূত-পবিত্র স্বাধীন মুসলমানকে

যিনার অপবাদ দেয়া), চুরি ইত্যাদির ব্যাপারে শরীয়তে নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে, তখন সচরাচর তারা এসব অপরাধে লিপ্ত হতে সাহস করবে না। কেউ এসব অপরাধের কোন একটাতে লিপ্ত হলে যখন তার উপর এর শাস্তি কায়েম করা হবে তখন সে আর পুনর্বার তাতে লিপ্ত হতে সাহস করবে না। তদ্রূপ জনসাধারণ যখন অপরাধীর উপর এসব শাস্তি কায়েম হচ্ছে দেখবে, তখন তারাও এগুলোতে লিপ্ত হওয়ার সাহস করবে না। মোটকথা- এসব শাস্তি লোকজনকে এসব অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণে এগুলোকে হদ বলা হয়।

আল্লামা কাসানী রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

الحد في اللغة : عبارة عن المنع ... وفي الشرع : عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى - عز شأنه . اهـ

"অভিধানে হদ অর্থ- বাধা দেয়া। ... আর শরীয়তের পরিভাষায় হদ হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার হক হিসেবে ফরযকৃত সুনির্ধারিত শাস্তি।" **[বাদায়িউস সানায়ে': ৫/৪৮৬]**

ইবনে নুজাইম রহ. (৯৭০হি.) বলেন,

الحد في اللغة المنع ... وسميت العقوبات الخالصة حدودا لأنها موانع من ارتكاب أسبابها معاودة. اهـ

"অভিধানে হদ অর্থ- বাধা দেয়া। ... খালেস শাস্তিসমূহকে হদ বলা হয় কারণ, যেসব কারণে এসব শাস্তি বর্তায়, এগুলো পুনর্বার সেগুলোতে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে।" **[আলবাহরুর রায়েক: ৫/৩]**

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

تحقيق العبارة ما قال بعض المشايخ: إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده. أي: العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل، وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه. اهـ

"তাহকিকি কথা হচ্ছে যা কোন কোন মাশায়িখ বলেছেন যে, 'লিপ্ত হওয়ার পূর্বে এগুলো (লিপ্ত হওয়া থেকে) বাধা দান করে আর লিপ্ত হওয়ার পর (পুনর্বার লিপ্ত হওয়া থেকে) বারণ রাখে।' অর্থাৎ শরীয়তে এসব শাস্তির বিধান রয়েছে বলে জানা থাকাটা সেগুলোতে লিপ্ত হতে বাধা দেয়, আর লিপ্ত হওয়ার

পর এগুলো প্রয়োগ করাটা সেগুলোতে পুনর্বার লিপ্ত হওয়া থেকে বারণ রাখে।” **[ফাতহুল কাদির: ৫/১৯৬]**

হদের সংজ্ঞায় মৌলিকভাবে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে:

১. عقوبة তথা শাস্তি।

২. مقدرة তথা সুনির্ধারিত।

৩. حقا لله تعالى তথা আল্লাহ তাআলার হক।

অতএব, হদের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি জিনিস থাকবে-

প্রথমত তা শাস্তি হবে। কাজেই নামায, রোযা- ইত্যাদির কাফফারা সুনির্ধারিত হলেও সেগুলো হদ নয়। কেননা সেগুলো খালেস শাস্তি নয়। সেগুলোতে ইবাদত ও শাস্তি উভয় দিকই রয়েছে।

দ্বিতীয়ত শরীয়ত কতৃক সুনির্ধারিত হবে। এ শর্তের দ্বারা তা’যিরসমূহ হদের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে যাবে। কেননা, সেগুলো শাস্তি হলেও শরীয়ত কতৃক সেগুলোর ধরণ ও পরিমাণ সুনির্ধারিত নয়। বরং অবস্থাভেদে তা বিভিন্ন রকম হয়।

তৃতীয়ত তা আল্লাহ তাআলার হক হবে। আল্লাহ তাআলার হক হওয়ার অর্থবান্দাদের কেউ সেগুলো মাফ করতে পারবে না। অর্থাৎ উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পর কেউ সেগুলো মাফ করতে পারবে না। ইমামুল *মুসলিমীনেরও সে অধিকার, নেইঅন্য কারও সে অধিকার নেই। যেমন- চার সাক্ষী দিয়ে কাযির দরবারে যিনা প্রমাণ হওয়ার পর যিনাকারকে মাফ করার কোন সুযোগ নেই। বিবাহিত হলে রজম করতে হবে আর অবিবাহিত হলে একশো দোররা লাগাতে হবে।

(আল্লাহর হক ও বান্দার হক নিয়ে সামনে ইনশাআল্লাহ আলোচনা আসবে।)

এ শর্তের দ্বারা হদের সংজ্ঞা থেকে কেসাস তথা হত্যার বদলে হত্যা বেরিয়ে যাবে। কেননা হত্যার বদলে হত্যা যদিও সুনির্ধারিত, কিন্তু সেটা বান্দার হক। নিহত ব্যক্তির অভিবাবকগণ ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে হত্যা না করে বা দিয়াত না নিয়ে মাফও করে দিতে পারেন। কিন্তু হদ তার ব্যতিক্রম। প্রমাণ হওয়ার পর তা মাফ করার কোন সুযোগ

নেই।

কাসানী রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

وفي الشرع : عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى - عز شأنه - بخلاف التعزير فإنه ليس بمقدر ، قد يكون بالضرب وقد يكون بالحبس وقد يكون بغيرهما ، وبخلاف القصاص فإنه وإن كان عقوبة مقدرة لكنه يجب حقا للعبد ، حتى يجري فيه العفو والصلح. اهـ

"শরীয়তের পরিভাষায় হদ হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার হক হিসেবে ফরযকৃত সুনির্ধারিত শাস্তি। কিন্তু তা'যির এমন নয়। কেননা, সেটা সুনির্ধারিত না। কখনো প্রহারের দ্বারা হয়, কখনো বন্দী করে রাখার দ্বারা হয় আবার কখনো অন্য কিছু দিয়ে হয়। তদ্রূপ কেসাসও এর ব্যতিক্রম। কেননা, সেটা সুনির্ধারিত শাস্তি হলেও তা বান্দার হক হিসেবে ফরয হয়। ফলে তাতে মাফ করে দেয়া কিংবা (বিনিময় নিয়ে) চুক্তি করা চলে।" **[বাদায়িউস সানায়ে': ৫/৪৮৬]**

মুহাম্মাদ থানবী হানাফী রহ. (১১৫৮হি.) বলেন,

وعند الفقهاء: عقوبة مقدرة تجب حقّا لله تعالى. فلا يسمّى القصاص حدّا لأنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير. والمراد بالعقوبة هاهنا ما يكون بالضرب أو القتل أو القطع فخرج عنه الكفّارات، فإنّ فيها معنى العبادة والعقوبة. اهـ

"ফুকাহায়ে কেরামে পরিভাষায় হদ হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার হক হিসেবে ফরযকৃত সুনির্ধারিত শাস্তি। কাজেই কেসাসকে হদ বলা হয় না। কেননা, সেটা বান্দার হক। তা'যিরকেও না। কারণ, সেটা সুনির্ধারিত নয়। এখানে শাস্তির দ্বারা উদ্দেশ্য- যা প্রহার, হত্যা বা কর্তনের মাধ্যমে হবে। কাজেই কাফফারাসমূহ এ থেকে বেরিয়ে যাবে। কেননা, সেগুলোতে ইবাদত-শাস্তি উভয় দিকই রয়েছে।" **[কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনুনি ওয়াল উলূম: ১/৬২৩]**

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির)- ০৪

২. কযফ তথা যিনার অপবাদ আরোপ

কোন পূত-পবিত্র স্বাধীন মুসলমান নারী বা পুরুষের উপর যিনার অপবাদ আরোপ করলে অপবাদ আরোপকারীকে আশি বেত্রাঘাত করা হবে। অপবাদ আরোপকারীকে চার জন আদেল

সাক্ষী দিয়ে যিনা প্রমাণ করতে বলা হবে। যদি প্রমাণ না করতে পারে তাহলে সে অপবাদ আরোপকারী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে আশি বেত্রাঘাত করা হবে। আর হানাফি মাযহাব মতে ভবিষ্যতে সারা জীবনের জন্য তার সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা বাতিল হয়ে যাবে। তাই আর কখনোও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

"যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসতে পারে না: তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসেক। তবে যারা এরপরে তাওবা করে এবং নিজদের সংশোধন করে, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" নূর: ৪-৫

মুনাফিকরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা

আনহার উপর যিনার অপবাদ আরোপ করেছিল। তিন জন সরল-সহজ মুসলমানও তাদের ফাঁদে পড়ে তাদের সাথে তাল মিলিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে সূরা নূরের শুরুর দিকে দশটি আয়াত নাযিল করে উম্মুল মু'মিনীনের পবিত্রতা ঘোষণা করেন। সেখানে অপবাদ আরোপকারীদেরকে মিথ্যাবাদি সাব্যস্ত করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ}

"তারা এ বিষয়ে কেন চার জন সাক্ষী উপস্থিত করল না? যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহ তাআলার নিকট তারা নিজেরাই মিথ্যাবাদি।" নূর: ১৩

আয়াত নাযিল হওয়ার পর যেসব মুসলমান অপবাদে শরীক ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হদ্দে কযফস্বরূফ আশি করে বেত্রাঘাত লাগান। [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্: কিতাবুল হুদুদ, বাব: হদ্দুল কযফ।]

হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী যিনায় লিপ্ত হয়। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ উত্থাপন করেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك.

"চার সাক্ষী উপস্থিত কর, অন্যথায় তোমার পিঠে হদ বর্তাবে।" [নাসায়ী, বাব: কাইফাল লিআন। আরও দেখুন- তিরমিযি: তাফসীরে সূরা নূর; আবু দাউদ, বাব: ফিল-লিআন।]

কযফ কিভাবে প্রমাণ হবে?

সাক্ষী বা অপবাদ আরোপকারীর নিজ স্বীকারোক্তির দ্বারা প্রমাণ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে যিনার মতো চার পুরুষ বা চার বার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। দুই জন আদেল পুরুষের সাক্ষ্য কিংবা অপবাদ আরোপকারীর এক বার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। অর্থাৎ দুই জন আদেল পুরুষ যদি কারো ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক পূত-পবিত্র মুসলমানকে যিনাকারী বলেছে কিংবা ব্যক্তি যদি নিজেই কাযির কাছে স্বীকার করে যে, সে অমুক পূত-পবিত্র মুসলমানকে যিনাকারী বলেছে তাহলেই সে অপবাদ

আরোপকারী সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এখন যদি সে চার জন সাক্ষী দিয়ে যিনা প্রমাণ না করতে পারে, তাহলে হদ্দে কযফরূপে তাকে আশিটি বেত লাগানো হবে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রেও মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

৩-৪. মদ পান ও মাদক সেবন

এ উভয়টির শাস্তি আশি বেত্রাঘাত। তবে মদের ক্ষেত্রে কম পান করুক কি বেশি পান করুক, নেশা আসুক বা না আসুক- সর্বাবস্থায় হদ লাগানো হবে। আর মদ ব্যতীত অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদি এ পরিমাণ সেবন করে যে, যার কারণে নেশা এসে গেছে- তাহলে হদ লাগানো হবে, অন্যথায় নয়। তবে হদ না লাগানোর অর্থ এই নয় যে, তা সেবন করা জায়েয। সেবন সর্বাবস্থায়ই নাজায়েয। তবে হদ কায়েমের জন্য নেশা আসা শর্ত। কিন্তু মদের ক্ষেত্রে নেশা আসা শর্ত নয়। মদ পান করাই হদ কায়েমের জন্য যথেষ্ট, নেশা আসুক বা না আসুক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ পানকারীকে চল্লিশ বেত লাগাতেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এর উপরই

আমল করেছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় যখন লোকজনের মাঝে মদ পানের পরিমাণ বেড়ে গেল, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন- কি করা যায়? সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে আশি বেত্রাঘাত শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত হয়।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পক্ষে এই যুক্তি দেন যে, হদের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল- আশি বেত্রাঘাত। কেননা, যিনার শাস্তি একশো দোররা আর হদ্দে কযফের শাস্তি আশি দোররা। এর নিচে কোন হদ নেই। তিনি বলেন, এ সর্বনিম্ন হদকেই মদ পানের শাস্তি নির্ধারণ করা হোক।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কোন ব্যক্তি মদ পান করলে মাতাল হয়ে যায়। মাতাল হলে বেহুদা কথা-বার্তা ও গালি-গালাজ শুরু করে। গালি-গালাজের এক পর্যায়ে কাউকে যিনার অপবাদও আরোপ করতে পারে। আর এর শাস্তি আশি দোররা। অতএব, মদ পান যেহেতু কযফ তথা অপবাদ পর্যন্ত গড়াতে পারে, তাই এর শাস্তি কযফের শাস্তির অনুরূপ হতে পারে। এ পরামর্শদ্বয় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পছন্দ হল।

অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও তাতে সম্মতি দিলেন। এভাবে সাহাবায়ে কেরামের সম্মতির ভিত্তিতে মদ্য পানের শাস্তি নির্ধারিত হয় আশি বেত্রাঘাত। [সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, বাব: হদ্দুল খমর, বাব: আয-যারবু বিলজারিদি ওয়াননিআল; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: হদ্দুল খমর; মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, বাব: আলহদ্দু ফিলখমর।]

মদ্যপান কিভাবে প্রমাণ হবে?

হদ্দে কযফের মতোই দুই জন আদেল পুরুষের সাক্ষ্য কিংবা মদ্যপানকারী নিজের স্বীকারোক্তির দ্বারা প্রমাণ হবে। তবে স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে শর্ত হলো- তা স্বাভাবিক হুঁশ থাকা অবস্থায় হতে হবে। মাতাল অবস্থায় যদি স্বীকার করে যে, সে মদপান করেছে তাহলে তা ধর্তব্য নয়।

এ দুই ত্বরীকা ভিন্ন মদ্যপান প্রমাণিত হওয়ার আর কোন ত্বরীকা নেই। কাজেই কারো ঘরে বা দোকানে বা কারো সাথে যদি মদ পাওয়া যায়, তাহলে তার উপর মদ্যপানের হদ কায়েম করা যাবে না। তবে তার কাছে মদ পাওয়া যাওয়ার কারণে মুনাসিব মতো অন্য শাস্তি দেয়া হবে।

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা’যির)- ০৬: তা’যিরের প্রকারভেদ ও পরিমাণ

তা’যির(التعزير)

আভিধানিকভাবেতা’যিরের**(التعزير)**কয়েকটাঅর্থআসে।তবেফিকহশাস্ত্রেরপারিভাষিকঅর্থেরসাথেসবচেয়েসামঞ্জস্যপূর্ণঅর্থহলো- التأديبতথাশিষ্টাচারশিক্ষাদানওমন্দকাজেরশাস্তিপ্রদানএবং المنع তথা নিবৃত্ত রাখা;চাইতাপ্রহারেরমাধ্যমেহোকবাঅন্যকোনভাবেহোক।তদ্রূপপ্রহারবাশাস্তিরপরিমাণকমওহতেপারে, বেশিওহতেপারে।এরনির্ধারিতকোনসীমানেই।

আরফিকহশাস্ত্রেরপরিভাষায়তা’যিরবলে, শরীয়তেযেসবঅপরাধেরশাস্তিসুনির্ধারিতনয়, সেসবঅপরাধেরবিপরীতেপ্রদত্তশাস্তি। ইমামুল মুসলিমীন, সুলতান বা কাযি- অপরাধ, অপরাধী ও অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনায় শরীয়ত সম্মত যে শাস্তি নির্ধারণ করেন, সেটাই তা’যির। তবে শরীয়তের বিধান হলো, তা’যিরের পরিমাণ হদের চেয়ে কম হতে হবে। যেমন, অবিবাহিত ব্যক্তি যিনা

করলে তার উপর হদ্দে যিনারূপে একশোত বেত্রাঘাত বর্তাবে। এখন যদি কোন অবিবাহিত ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে চুম্বন, জড়িয়ে ধরা ইত্যাদি কুকর্ম করে কিন্তু সঙ্গম করতে পারেনি- তাহলে তার শাস্তি কি হবে তা শরীয়তে নির্ধারিত নেই। এক্ষেত্রে কাযি সাহেব মুনাসিব মতো শাস্তি দেবেন। তবে তার পরিমাণ হদ্দে যিনা তথা একশো বেত্রাঘাতের চেয়ে কম হতে হবে। তবে একশোর কমে সর্বোচ্চ কত দিতে পারবেন, তাতে আইম্মায়ে কেরামের মতভেদ আছে। তা'যিরের পরিমাণের আলোচনায় তা আসবে ইনশাআল্লাহ্। এবার ফুকাহায়ে কেরামের কয়েকটি বক্তব্য লক্ষ করুন:

ইবনে কুদামা মাকদিসি রহ. (৬২০হি.) বলেন,

التعزير : هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ... يسمى تعزيرا لأنه منع من الجناية. والأصل في التعزير المنع. اهـ

"তা'যিরহচ্ছেসেসবঅপরাধেরবিপরীতেপ্রদত্তশরয়ীশাস্তি, যেগুলোতেহদআসেনা। ... তা'যিরকেতা'যিরবলাহয়কারণ, তাঅপরাধথেকেনিবৃত্তরাখে।তা'যিরেরমূলঅর্থ- নিবৃত্তরাখা।" [আলমুগনী: ১০/৩৪২]

'আদ-দুররুলমুখতারে' বলাহয়েছে,

(هو) لغة التأديب مطلقا... وشرعا (تأديب دون الحد). اهـ

“তা’যিরেরআভিধানিকঅর্থ-

শিষ্টাচারশিক্ষাদানএবংমন্দকাজেরবিপরীতেশাস্তিপ্রদান,

চাইতাযেভাবেইহোক, যেপরিমাণইহোক। ...

আরশরীয়তেরপরিভাষায়তা’যিরবলে,

হদেরচেয়েকমপরিমাণেরশাস্তিকে।”

আল্লামাইবনেআবেদীনশামীরহ. (১২৫২হি.)

এরব্যাখ্যায়আভিধানিকঅর্থকেআরোপরিষ্কারকরেতুলেছেন।তিনিব

লেন,

(قوله هو لغة التأديب مطلقا) أي بضرب وغيره دون الحد أو أكثر

...“منه. اهـ

অর্থাৎতাপ্রহারেরমাধ্যমেহোকবাঅন্যকিছুরমাধ্যমেহোক।হদেরচে

য়েকমহোকবাবেশিহোক।” [রদ্দুলমুহতার: ৪/৫৯]

ফাতাওয়ায়েহিন্দিয়া-তেএসেছে,

هو تأديب دون الحد ويجب في جناية ليست موجبة للحد. اهـ

“তা’যিরবলেহদেরচেয়েকমপরিমাণেরশাস্তিকে।যেসবঅপরাধেহদ

ফরযহয়না, সেসবঅপরাধেতা’যিরআবশ্যকহয়।” [

আলফাতাওয়ালহিন্দিয়া: ২/১৬৭]

ইসলামে তা'যিরের পরিধি অনেক বিস্তৃত

শরীয়তে হদের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট কয়েকটি। হানাফি মাযহাব মতে হদ ছয়টি। দ্বিতীয়ত হদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য অনেক শর্ত নির্ধারিত আছে, যেগুলো পেরিয়ে হদ কমই প্রমাণিত হয়। কোন শর্ত না পাওয়া যাওয়ার কারণে যখন হদ কায়েম করা যায় না, তখন তা'যির করতে হয়। অপর দিকে হদের বাহিরে অপরাধের সংখ্যা ও ধরণ অনেক। আবার একেক অপরাধীর অবস্থাও একেক রকম। এসবের হিসেবে তা'যিরের ধরণ, প্রকৃতি ও পরিমাণও বিভিন্ন রকম হয়। তাই শরীয়তে তা'যিরের পরিধি অনেক বিস্তৃত। একটি ইসলামী রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এবং সব ধরণের অপরাধ দমন করে শান্তি-শংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ তা'যির কায়েম করার ভূমিকা তুলনাহীন।

তা'যিরের প্রকারভেদ ও পরিমাণ

তা'যিরের সংজ্ঞায় আমরা দেখেছি, তা'যির হচ্ছে এমন শাস্তি যা শরীয়তে হদের মতো সুনির্ধারিত নয়; বরং অপরাধ, অপরাধী, পারিপার্শ্বিকতা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনায় এর

ধরণ ও পরিমাণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যাকে যে পরিমাণ শাস্তি দিলে সে অপরাধ থেকে বিরত হবে, সেটাই তার তা'যির। তবে এ শাস্তির পরিমাণ হদের চেয়ে কম হতে হবে, যেমনটা সংজ্ঞায় বলা হয়েছে। তবে কারো যদি অপরাধ অনেক হয়ে থাকে, আর সবগুলোর সম্মিলিত শাস্তি হদের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে তাতে অসুবিধা নেই। কারণ, এখানে প্রত্যেকটা শাস্তি মূলত হদের চেয়ে কম। কিন্তু অপরাধ বেশি হওয়ায় সামষ্টিকভাবে সেগুলো হদের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে।

তা'যিরের শাস্তি সুনির্ধারিত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, কাযি বা সুলতান যাকে যেমন ইচ্ছা মন মতো শাস্তি দিয়ে দেবেন। এটা কখনোই উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো- কাযি সাহেব প্রত্যেক ব্যক্তির বেলায় সার্বিক দিক বিবেচনা করে দেখবেন, তাকে কি পরিমাণ শাস্তি দিলে সে বিরত হবে। যে প্রকার শাস্তি দিলে বিরত হবে বলে মনে করেন, সে প্রকার ব্যতীত অন্য প্রকারের শাস্তি দেয়া জায়েয হবে না। তদ্রূপ, যে পরিমাণে বিরত হবে বলে মনে করেন, সে পরিমাণের চেয়ে বেশি দেয়াও জায়েয হবে না। যে চোখ রাঙানীর দ্বারাই বিরত হয়ে যাবে মনে হয়, তাকে প্রহার করা যাবে না। যে প্রহারের দ্বারাই বিরত হয়ে যাবে, তাকে জেলে দেয়া যাবে না। আবার

যে দশ বেত্রাঘাতেই বিরত হয়ে যাবে, তাকে বিশটা লাগানো জায়েয হবে না। অতএব, তা’যিরের বিষয়টা কাযি সাহেবের ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল, খাহেশাতের উপর নয়।

ইবনে দাকিকুল ঈদ রহ. (৭০২হি.) বলেন,

وليس التخيير فيه ، ولا في شيء مما يفوض إلى الولاة : تخيير تشه ، بل لا بد عليهم من الاجتهاد . اهـ

“তা’যিরে কিংবা কর্তৃত্বশীলদের নিকট সোপর্দ এমন কোন বিষয়েই কোন একটা বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়ার অর্থ নিজ খাহেশাত মতো বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া নয়। বরং তাদের উপর আবশ্যক- ইজতিহাদ করা।” [ইহকামুল আহকাম: ৩/১৪৪, কিতাবুল হুদুদ]

তা’যিরের শাস্তি কোন এক প্রকারে সীমাবদ্ধ নয়

উপরের আলোচনা থেকে আশাকরি স্পষ্ট যে, তা’যির কোন এক প্রকারে সীমাবদ্ধ নয়। এমন নয় যে, সকল অপরাধের শাস্তি শুধু প্রহারের দ্বারা কিংবা জেলের দ্বারাই দিতে হবে। বরং অবস্থাভেদে শাস্তির প্রকার বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেখানে যে

প্রকার উপযুক্ত, সে প্রকারই প্রয়োগ করবে।

কুরআন হাদিসে বিভিন্ন প্রকারের তা’যিরের কথা এসেছে। ফুকাহায়ে কেরাম তা’যিরে বিভিন্ন প্রকার শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

(চলবে ইনশাআল্লাহ্)

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা’যির)- ০৭: এক. বয়কট ও বর্জন

কুরআন হাদিসে বিভিন্ন প্রকারের তা’যিরের কথা এসেছে। ফুকাহায়ে কেরাম তা’যিরে বিভিন্ন প্রকার শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. বর্জন ও বয়কট।

২. নির্বাসন।

৩. বন্দী করে রাখা।

৪. প্রহার।

৫. হত্যা ... ইত্যাদি।

এক. বর্জন ও বয়কট

কেউ কোন হারাম কাজে লিপ্ত হলে কিংবা কোন ফরয-ওয়াজিব ছেড়ে দিলে, মুনাসিব মনে হলে তাকে বর্জন ও বয়কটের মাধ্যমে তার শাস্তি হতে পারে। কুরআনে কারীমে স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর ব্যাপারে এই শাস্তির কথা এসেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

{ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}

"যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদেরকে (প্রথমে) বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় শয়ন ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদের প্রহার করতে পার। অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না। নিশ্চিত জেনো- আল্লাহ সবার উপরে, সবার বড়।" [নিসা: ৩৪]

বুঝিয়ে কাজ না হলে আল্লাহ তাআলা অবাধ্য স্ত্রীর বিছানা স্বামী থেকে আলাদা করে দিতে বলেছেন। এতেও কাজ না হলে প্রহারের বৈধতা দিয়েছেন। এটা তার অবাধ্যতার শাস্তি।

এ আয়াতে কারীমাটি তা'যিরের অধ্যায়ে একটি মৌলিক দলীলরূপে বিবেচ্য। এখান থেকে কয়েকটি বিধান জানা যায়:

- হুকুকুল্লাহ বা হুকুকুল ইবাদ- এর যে কোনটার সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধ, যেগুলোর কারণে সমাজে বিশৃংখলা বা সমাজের লোকজনের কষ্ট হতে পারে, সেগুলোর বিপরীতে তা'যির করা যাবে। কেননা, স্ত্রীর অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাআলা স্বামীকে তা'যিরের অধিকার দিয়েছেন; অথচ স্ত্রীর অবাধ্যতার কষ্ট শুধু স্বামী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, তাহলে যেসকল অপরাধের কারণে সমাজ নষ্ট হবে, জনগণের কষ্ট হবে; সেগুলোর কারণে তো এর আগেই শাস্তি জায়েয হবে, যাতে অপরাধী দমন হয় এবং সমাজে বিশৃংখলা না হয়, লোকজন কষ্ট থেকে রেহাই

পায়।

- তা’যিরের ক্ষেত্রে ক্রমানুবর্তিতা গ্রহণ করতে হবে। অল্পতে কাজ হলে বেশি দেয়া যাবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা প্রথমেই বিছানা পৃথক করার কিংবা প্রহার করার বৈধতা দেননি। প্রথমে বুঝাতে বলেছেন। কাজ না হলে তখন বিছানা পৃথক করতে বলেছেন। তাতেও কাজ না হলে তৃতীয় পর্যায়ে প্রহারের বৈধতা দিয়েছেন। এই ক্রমানুবর্তিতার বিধান সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

وهو مشروع بالكتاب، قال الله تعالى {فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} [النساء: 34] أمر بضرب الزوجات تأديبا وتهذيبا. اهـ

“তা’যিরের বৈধতা কুরআনে কারীম দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, [তাদেরকে (প্রথমে) বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় শয়ন ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদের প্রহার করতে পার। অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে,

তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না।] শিষ্টাচার ও সংশোধনের জন্য আল্লাহ তাআলা স্ত্রীদের প্রহার করার আদেশ দিয়েছেন।" [ফাতহুল কাদির: ৫/৩৪৫]

ইবনুল উখুওয়্যাহ্ রহ. (হি.৭২৯) বলেন,

ولأن الله - تعالى - أباح الضرب للزوج عند نشوز الزوجة وقسنا عليه سائر المعاصي على حسب ما يراه الإمام أو نائبه. اهـ

"তাছাড়া স্ত্রীর অবাধ্যতায় আল্লাহ তাআলা স্বামীকে প্রহারের বৈধতা দিয়েছেন। অন্য সকল অপরাধকে আমরা এর উপর কিয়াস করতে পারি। ইমাম বা তার নায়েব যেমনটা মুনাসিব মনে করেন, শাস্তি দেবেন।" [মাআলিমুল ক্বুরবাহ্: ১/২৫০]

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন,

إذا خاف نشوزها وعظها فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع فإن قبلت وإلا ضربها. اهـ

"যখন স্ত্রীর থেকে অবাধ্যতার আশঙ্কা করবে- তাকে বুঝাবে। যদি গ্রহণ করে তো ভালই, অন্যথায় তাকে বিছানায় পরিত্যাগ

করবে। যদি গ্রহণ করে তো ভালই, অন্যথায় প্রহার করবে।" [আহকামুল কুরআন: ২/২৩৮]

হাদিস শরীফেও বয়কটের নজীর রয়েছে। গযওয়ায়ে তাবুকে তিনজন সাহাবী শরীক হননি। তারা হলেন- কা'ব ইবনে মালেক রাদি., হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদি. ও মুরারাহ্ ইবনে রবী' রাদি.। সাহাবায়ে কেরামসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম তাদেরকে পঞ্চাশ দিন বয়কট করে রেখেছিলেন। পঞ্চাশ দিন পর আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের তাওবা কবুল করে তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল করেন:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا } رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ {تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"এবং সেই তিন জনের প্রতিও (আল্লাহ সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন) যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখা হয়েছিল। অবশেষে যখন

এ পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল, তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠল এবং তারা উপলব্ধি করল- আল্লাহর পাকড়াও থেকে স্বয়ং তার আশ্রয় ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাবে না: তখন আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হলেন, যাতে তারা তারই দিকে মনোনিবেশ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [তাওবা: ১১৮]

ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. (হি.৬৫৬) বলেন,

(قوله : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا - أيها الثلاثة -) هو دليل على وجوب هجران من ظهرت معصيته ، فلا يسلم عليه إلا أن يقلع وتظهر توبته . اهـ

“কা’ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম লোকজনকে আমাদের তিন জনের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দেন’ এটি প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত হবে, তাকে বর্জন করা ফরয। কাজেই তাকে সালাম দেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে তা থেকে বিরত হয় এবং তার মাঝে তাওবা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়।” [আলমুফহিম:

২২/১৩৫]

তাদের ঘটনা বিস্তারিত বুখারী ও মুসলিম শরীফে দেখা যেতে পারে।

তদ্রূপ বেদআতীদেরকেও বর্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা তাদের বিদআত পরিত্যাগ করে এবং লোকজন তাদের গোমরাহি থেকে সতর্ক ও নিরাপদ থাকতে পারে।

বি.দ্র.

এই প্রকারের বর্জন ও বয়কট ঐ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মুসলিমকে তিন দিনের অধিক বর্জন করতে নিষেধ করেছেন। যেমন- হযরত আবু আইয়ূব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

[لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام]

“কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় তিন দিনের অধিক তার (দ্বীনি মুসলিম) ভাইকে পরিত্যাগ করে চলবে যে, দু’জন দেখা হয়ে গেলে সেও মুখ ফিরিয়ে নেবে, সেও মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের দু’জনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হলো- যে আগে সালাম দেবে।” [সহীহ বুখারী ৬২৩৭, সহীহ মুসলিম ৬৬৯৭]

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা’যির)- ০৮: দুই নির্বাসন

দুই. নির্বাসন

কোন অপরাধীর বেলায় যদি মনে হয়, তাকে অন্যত্র নির্বাসন দিলে একাকিত্বের যাতনায় কিংবা নির্বাসিত এলাকার নেক পরিবেশে থেকে সে সংশোধন হয়ে যাবে, তাহলে তাকে অন্যত্র নির্বাসন দেয়া যেতে পারে। এতে এক দিকে সে নিজে সংশোধন হবে, অন্য দিকে লোকজন তার অনিষ্ট থেকে রেহাই পাবে।

এই নির্বাসনের কথা কুরআন ও হাদিসে এসেছে। আল্লাহ তাআলা রাহজানদের শাস্তির ব্যাপারে বলেন,

{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

“যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যমিনে ফাসাদ-বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে- তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে ওদের নির্বাসিত করা হবে। এটা দুনিয়াতে ওদের লাঞ্ছনা, আর আখেরাতে ওদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।” [মায়েদা: ৩৩]

অনেকের মতে এখানে أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ দ্বারা নির্বাসন উদ্দেশ্য।

হাদিসে অবিবাহিত যিনাকারীর শাস্তিতে এক বৎসরের নির্বাসনের কথা এসেছে। মুসলিম শরীফে হযরত উবাদা ইবনে

সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

(البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)

“অবিবাহিত অবিবাহিতার সাথে যিনা করলে তার শাস্তি: একশো বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের নির্বাসন।” [সহীহ মুসলিম: ১৬৯০]

বুখারী শরীফে এসেছে,

عن زيد بن خالد الجهني قال: (سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام)

“হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিবাহিত যিনাকারীকে একশো বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের নির্বাসন দেয়ার আদেশ দিতে শুনেছি।” [সহীহ বুখারী: ৬৪৪৩]

অন্য হাদিসে এসেছে- এক লোক এক বাড়িতে কর্মচারি ছিল।

সে বাড়ির মালিকের স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলে। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর হদ কায়েম করেন। কর্মচারি লোকটি অবিবাহিত ছিল তাই তাকে একশো বেত্রাঘাত করেন এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেন। আর মালিকের স্ত্রী বিবাহিত হওয়ায় তাকে রজম করে হত্যা করেন। [সহীহ বুখারী, কিতাবুশ শুরূত, বাবুশ শুরূতিল্লাতি লা তাহিল্লু ফিলহুদুদ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: মানি'তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা।]

সাহাবায়ে কেরাম থেকেও নির্বাসনের ঘটনা বর্ণিত আছে। তবে আমাদের আইম্মায়ে কেরামের মতে এগুলো হদ হিসেবে নয়, তা'যির হিসেবে। অতএব, যার ক্ষেত্রে উপযোগী মনে হয়, তাকেই শুধু নির্বাসন দেয়া হবে; যাকে নির্বাসন দিলে তার নিজের বা অন্যদের ফিতনার আশঙ্কা আছে, তাকে নির্বাসন দেয়া যাবে না। হযরত উমর রাদিল্লাহু আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এমনই বর্ণিত আছে।

হিদায়া গ্রন্থকার (৫৯৩হি.) বলেন,

إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى" " وذلك تعزير وسياسة لأنه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي فيه إلى الإمام وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. اهـ

“তবে যদি ইমামুল মুসলিমীন নির্বাসন দেয়াতে মাসলাহাত রয়েছে মনে করেন, তাহলে যত দিন মুনাসিব মনে করেন নির্বাসন দিতে পারেন। এটি হবে তা’যির ও সিয়াসতরূপে। কেননা, কোন কোন অবস্থায় এটি উপকারী হয়। কাজেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ভার ইমামের উপর ন্যাস্ত। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের কারো কারো থেকে বর্ণিত নির্বাসন দেয়ার ঘটনাকে এর উপরই প্রয়োগ করা হবে।” [আলহিদায়া: ২/১৮৪]

আল্লামা শামী রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

قوله ويكون بالنفي عن البلد) ومنه ما مر من نفي الزاني البكر (ونفي عمر - رضي الله عنه - نصر بن حجاج لافتتان النساء

بجماله وفي النهر عن شرح البخاري للعيني أن من آذى الناس ينفى عن البلد. اهـ

“দুররে মুখতার গ্রন্থকারের বক্তব্য [নিজ জনপদ থেকে নির্বাসন দেয়ার মাধ্যমেও তা’যির হতে পারে।]- অবিবাহিত যিনাকারীকে নির্বাসন দেয়ার কথা যা আগে গেছে, সেটা এর মধ্যেই পড়ে। নসর ইবনে হাজ্জাজের সৌন্দযের কারণে মহিলারা যখন ফিতনার শিকার হচ্ছিল, তখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নির্বান দিয়েছিলেন। এটাও এর মধ্যেই পড়ে। আননাহরুল ফায়েক্বে আইনী প্রণীত বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি লোকজনকে কষ্ট দেবে, তাকে নিজ জনপদ থেকে অন্যত্র নির্বাসন দিয়ে দেয়া হবে।” [রদ্দুল মুহতার: ৪/৬৪]

আল্লামা কাসানী রহ. (৫৮৭হি.) বলেন,

وفعل الصحابة محمول على أنهم رأوا ذلك مصلحة على طريق التعزير ، ألا يرى أنه روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه نفى رجلا فلحق بالروم فقال : لا أنفي بعدها أبدا .

وعن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال : كفى بالنفي فتنة؛ فدل

أن فعلهم كان على طريق التعزير ، ونحن به نقول : إن للإمام أن

ينفي إن رأى المصلحة في التغريب ، ويكون النفي تعزيرا لا حدا.
اهـ

“সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত নির্বাসন দেয়ার ঘটনা এর উপর প্রয়োগ হবে যে, তা’যিররূপে তারা তা উপকারী মনে করেছেন। আপনি কি দেখেন না- হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে নির্বাসন দিলে সে রোমানদের সাথে গিয়ে মিলে যায়। তখন তিনি বলেন, ‘এরপর আর কখনও আমি নির্বাসন দেব না।’

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ‘ফিতনার জন্য নির্বাসনই যথেষ্ট।’ অতএব, বুঝা গেল- তারা তা করেছেন তা’যিররূপে। আমরাও এ অভিমত পোষণ করি যে, যদি মাসলাহাত মনে করেন, তাহলে ইমামুল মুসলিমীন নির্বাসন দিতে পারেন। এ নির্বাসন হবে তা’যির, হদ না।” [বাদায়িউস সানায়ি’: ১৫/৫২]

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির); ০৯- তিন-চার. বন্দী ও প্রহার

তিন. বন্দী করে রাখা

এখানে জেলে বন্দী বা নিজ গৃহে নজরবন্দী উভয়টাই উদ্দেশ্য। কুরআন সুন্নাহয় এ উভয়টাই এসেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً}

"তোমাদের নারীদের মধ্য হতে যারা অশ্লীল কাজ করবে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্য হতে চার জন সাক্ষী রাখবে। তারা সাক্ষ্য দিলে সেসকল নারীকে গৃহে বন্দী করে রাখবে, যাবৎ না মৃত্যু তাদের তুলে নিয়ে যায় কিংবা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা দেন।" [নিসা: ১৫]

ইসলামের শুরু যামানায় যিনার নির্ধারিত কোন শাস্তি ছিল না। সে সময়ে ব্যবস্থা ছিল- যিনায় লিপ্ত নারীদের গৃহে বন্দী করে রাখা। পরবর্তীতে এ বিধান রহিত হয়ে গেছে। অবিবাহিতদের জন্য একশো বেত্রাঘাত আর বিবাহিতদের

জন্য রজম করে হত্যা নির্ধারিত হয়েছে।

এ আয়াত যদিও মানসূখ হয়ে গেছে, তবে এ থেকে এতটুকু বুঝে আসে যে, যেসকল অপরাধের জন্য শরীয়তে নির্ধারিত কোন শাস্তি নেই, সেসবের ক্ষেত্রে বন্দী করে রাখা একটা শাস্তি হতে পারে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] قد يستدل بذلك على أن المذنب إذا لم يعرف فيه حكم الشرع فإنه يمسك فيحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي فينفذ فيه. اهـ

"আল্লাহ তাআলার বাণী: [সেসকল নারীকে গৃহে বন্দী করে রাখবে, যাবৎ না মৃত্যু তাদের তুলে নিয়ে যায় কিংবা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা দেন।] এ থেকে এ বিষয়ে দলীল দেয়া যায় যে, অপরাধীর ব্যাপারে যদি শরীয়তের বিধান জানা না যায়, তাহলে তার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে আটক করে বন্দী করে রাখা হবে। বিধান জানা গেলে তখন বাস্তবায়ন করা হবে।" [আলফাতাওয়াল কুবরা: ৫/৫২৭]

এক হাদিসে এসেছে,

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه)

“হযরত বাহয ইবনে হাকিম তার পিতৃসূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন- অভিযোগের ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বন্দী করেছিলেন। এরপর (নির্দোষ প্রমাণিত হলে) তাকে ছেড়ে দেন।” [তিরমিযি: ১৪১৭, আবু দাউদ: ৩৬৩০]

সাহাবায়ে কেরাম থেকে বন্দী করে রাখার অজস্র ঘটনা বর্ণিত আছে।

চার. প্রহার

প্রহার তা’যিরের অত্যধিক প্রসিদ্ধ পন্থা। বরং তা’যির বলতে যেন সাধারণত প্রহারকেই বুঝিয়ে থাকে। কুরআন সুন্নাহয় প্রহারের দ্বারা তা’যিরের কথা এসেছে। খুলাফায়ে রাশিদিনসহ পরবর্তী সকল যুগে প্রহারের মাধ্যমে তা’যিরের ধারা চলে আসছে।

কুরআনে কারীম থেকে সূরা নিসার পূর্বোল্লিখিত ৩৪ নং আয়াত এর দলীল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}

"যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদেরকে (প্রথমে) বুঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় শয়ন ছেড়ে দাও এবং (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদের প্রহার করতে পার। অতঃপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজো না। নিশ্চিত জেনো- আল্লাহ সবার উপরে, সবার বড়।" [নিসা: ৩৪]

এক হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

(مُرُوا أولادَكم بالصلاة وهم أَبناءُ سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشْر ، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع)

"তোমাদের সন্তানরা যখন সাত বৎসরে উপনীত হয়, তখন তাদেরকে নামাজের আদেশ কর। আর দশ বৎসরে উপনীত হলে তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের

বিছানা আলাদা করে দাও।” [আবু দাউদ: ৪৯৫]

এখানে নাবালেগকে নামায তরক করার কারণে প্রহারের আদেশ দেয়া হয়েছে, অথচ নাবালেগের উপর শরীয়তের বিধি বিধান বর্তায় না; তাছাড়া নামায না পড়ার দ্বারা শুধু ব্যক্তির নিজেরই ক্ষতি হয়, অন্যের ক্ষতি হয় না। তাহলে বালেগ ব্যক্তিদের এবং ঐ সকল অপরাধ, যেগুলোর দ্বারা অন্যের ক্ষতি হয় বা হক নষ্ট হয়- সেগুলোতে এর আগেই প্রহার বৈধ হবে।

অন্য হাদিসে এসেছে,
(لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله)
“আল্লাহ তাআলার কোন হদ ভিন্ন অন্য কোথাও দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে না।” [সহীহ বুখারী: ৬৪৫৬]

এখানে হদ দ্বারা গুনাহ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ গুনাহ নয় এমন বিষয়ে দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে না। অর্থাৎ আদব-কায়দা ও সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বৈধ রীতি-নীতির বিপরীত করলে, যদি তা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে গুনাহের পর্যায়ে না পড়ে, তাহলে বেত্রাঘাত করা যাবে, তবে দশের অধিক নয়।

আর কোন গুনাহে লিপ্ত হলে তখন মুনাসিব মতো দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে।

এক হাদিসে এসেছে, নিজ স্ত্রীর বাঁদিকে বৈধ মনে করে সহবাস করলে একশো বেত্রাঘাত লাগানো হবে। [সহীহ বুখারী: ২২৯০, মুসনাদে আহমাদ: ১৪৫১]

কুরআনে কারীমের মুতাশাবিহ আয়াত নিয়ে ফিতনা সৃষ্টির অপরাধে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকের সাবিগ ইবনে ইসলকে পেটাতে পেটাতে রক্তাক্ত করেছেন। [সুনানে দারেমী: ১৪৪] অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তাকে দুইশত বেত্রাঘাত করেছেন। [মুসনাদে বাযযার: ২৯৯]

মোটকথা: প্রহারের দ্বারা তা'যির বৈধ। তবে এর সর্বোচ্চ পরিমাণ কত হবে তা নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে দ্বিমত রয়েছে। সামনে এর আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির); ১০; পাঁচ. হত্যা

তা'যিরের পঞ্চম প্রকার: হত্যা

পাঁচ: হত্যা

হত্যার মাধ্যমেও তা'যির হতে পারে। সাধারণত একে القتل سياسةً তথা সিয়াসতরূপে হত্যা বলা হয়। কুরআন সুন্নাহয় তা'যিররূপে হত্যার নির্দেশনা এসেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}

"কাউকে হত্যা বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ব্যতীতই কেউ কাউকে হত্যা করলে, সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করল।" - মায়েদা: ৩২

এ আয়ত থেকে বুঝা যায়, কেউ কাউকে হত্যা করলে হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা যাবে। তদ্রূপ কেউ পৃথিবীতে ফাসাদ ও বিশৃংখলা করে বেড়ালে তাকেও হত্যা করা যাবে।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন,

فكان في مضمون الآية إباحة قتل المفسد في الأرض. اهـ

"আয়াত বুঝাচ্ছে- যমিনে বিশৃংখলাকারীকে হত্যা করা বৈধ।"

- আহকামুল কুরআন: ২/৫০৫

ফাসাদ দুনিয়াবিও হতে পারে, দ্বীনিও হতে পারে।

দুনিয়াবি ফাসাদ, যেমন: চুরি, ডাকাতি, রাহজানি, সন্ত্রাসী, খুন, ধর্ষণ, যাদু-টোনা ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের শান্তি-শৃংখলা নষ্ট করা, জনজীবন অতিষ্ট করে তোলা।

দ্বীনি ফাসাদ, যেমন: ইলহাদ, যান্দাকাহ্, নাস্তিকতা, বিদআত ইত্যাদি ছড়ানো।

এ উভয় ধরণের ফাসাদকারীকেই হত্যা করা যাবে, যদি হত্যা ব্যতীত তার অনিষ্ট দমন সম্ভব না হয়।

এক হাদিসে সমকামীকে হত্যার কথা এসেছে:

(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)

“কাউকে লূত আলাইহিস সালামের কাওমের মতো কাজ (অর্থাৎ সমকামিতা) করতে দেখলে যে করেছে এবং যার সাথে করেছে, তাদের উভয়কে হত্যা করে দাও।” - আবু দাউদ: ৪৪৬৪ , তিরিমিযি: ১৪৫৬

অর্থাৎ বিবাহিত হলেও হত্যা কর, অবিবাহিত হলেও হত্যা কর।

অন্য হাদিসে পশুর সাথে সঙ্গমকারীকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে:

(من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه)

“কাউকে কোন পশুর সাথে সঙ্গম করতে দেখলে হত্যা করে দেবে।” - আবু দাউদ: ৪৪৬৬, তিরিমিযি: ১৪৫৫

অন্য হাদিসে মাহরাম মহিলার সাথে যিনাকারীকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে:

(ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)

“যে ব্যক্তি তার মাহরামের সাথে যিনা করে, তাকে হত্যা করে দাও।” - তিরিমিযি: ১৪৬২

অর্থাৎ বিবাহিত হলেও, না হলেও।

আমাদের আইম্মায়ে কেরামের মতে এসকল হত্যার কোনটাই হদ নয়, বরং তা’যির। কাজেই সর্বাস্থায় এদের হত্যা করা জরুরী নয়। যারা এসব কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে দমন করতে হত্যার প্রয়োজন পড়বে, তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর যাদেরকে হত্যা ছাড়াই দমন করা সম্ভব, তাদেরকে হত্যা করা হবে না।

‘আদদুররুল মুখতার’ গ্রন্থকার (১০৮৮হি.) বলেন,

(ويكون) التعزير (بالقتل). اهـ

“তা’যির হত্যার দ্বারাও হতে পারে।” - আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের সাথে ছাপা): ৪/৬২

আল্লামা শামী রহ. (১২৫২হি.) এর ব্যাখ্যায় বলেন,

رأيت في [الصارم المسلول] للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة، وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها. اهـ ... ومن ذلك ما سيذكره المصنف من أن للإمام قتل السارق سياسة أي إن تكرر منه. وسيأتي أيضا قبيل كتاب الجهاد أن من تكرر الخنق منه في المصر قتل به سياسة لسعيه بالفساد، وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل، وسيأتي أيضا في باب الردة أن الساحر أو الزنديق الداعي إذا أخذ قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، ولو أخذ بعدها قبلت، وأن الخناق لا توبة له وتقدم كيفية تعزير اللوطي بالقتل. اهـ كلام ابن عابدين رحمه الله

"হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. এর 'আসসারিমুল মাসলূল' গ্রন্থে দেখেছি: [হানাফিদের একটি মূলনীতি হলো- তাদের মতে যেসব অপরাধের শাস্তি হত্যা নয়; যেমন: ভারি বস্তু দ্বারা হত্যা করা, যোনিদ্বার ব্যতীত অন্য পথে সঙ্গম করা; যদি

ব্যক্তি থেকে তা একাধিকবার প্রকাশ পায়, তাহলে ইমামুল মুসলিমীন তাকে হত্যা করতে পারবেন। তদ্রূপ মাসলাহাত মনে করলে তিনি নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত শাস্তিও দিতে পারবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ সকল অপরাধের বেলায় বর্ণিত হত্যাকে তারা এর উপর প্রয়োগ করেন যে, এতে তিনি মাসলাহাত রয়েছে মনে করেছেন। একে তারা 'সিয়াসতরূপে হত্যা' নাম দিয়ে থাকেন। এর সারকথা: যেসব অপরাধের অনুরূপ অপরাধে হত্যার বিধান রয়েছে, সেগুলো যখন বারংবার সংঘটিত হওয়ার দ্বারা গুরুতর অবস্থা ধারণ করবে, তখন সেগুলোতে তিনি তা'যিররূপে হত্যা করতে পারবেন।] হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য শেষ হল। ...

(শামী রহ. বলেন,) গ্রন্থকার সামনে যা উল্লেখ করবেন, সেটাও এই শ্রেণীভুক্তই। তা হল- ইমামুল মুসলিমীন সিয়াসতরূপে চোরকে হত্যা করতে পারবেন। অর্থাৎ যখন তার থেকে বারংবার চুরি প্রকাশ পাবে। কিতাবুল জিহাদের একটু আগে আলোচনা আসবে যে, যে ব্যক্তি থেকে শহরের অভ্যন্তরে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার ঘটনা বারংবার ঘটবে, তাকে

সিয়াসতরূপে হত্যা করে দেয়া হবে। কেননা, সে যমিনে ফাসাদ করে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তি, যার অবস্থা এমন হবে- তাকে হত্যা করে দিয়ে তার অনিষ্ট দমন করা হবে। বাবুর রিদ্দাহয় আলোচনা আসবে- যাদুকর কিংবা এমন যিন্দিক, যে নিজ কুফরি অভিমতের দিকে লোকজনকে দাওয়াত দেয়: যদি তাওবা করার আগেই ধৃত হয় এরপর তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা কবুল হবে না বরং হত্যা করে দেয়া হবে। আর তাওবা করার পর ধৃত হলে তাওবা কবুল হবে। সামনে এও আসবে যে, শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যাকারীর কোন তাওবার সুযোগ নেই। আর সমকামিকে তা'যিররূপে কিভাবে হত্যা করা হবে তার আলোচনা আগে গেছে।" - রদ্দুল মুহতার: ৪/৬২-৬৩

সহজ কথা: যাকে হত্যা ছাড়া দমন সম্ভব না, তাকে হত্যা করে দমন করা হবে। এই হত্যা হদ হিসেবে নয়, তা'যির হিসেবে।

ইসলামে দণ্ডবিধি (হদ-তা'যির); ১১- বিভিন্ন প্রকার তা'যির

কুরআন সুন্নাহয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত কয়েকটি তা'যির উপরে উল্লেখ করা হল, নতুবা তা'যিরের ধরণ অসংখ্য। যাকে যেভাবে শাস্তি দিলে দমন হবে, সেটাই তার তা'যির। তবে কাউকে যদি প্রহারের মাধ্যমে তা'যির করার প্রয়োজন হয়, তাহলে সর্বোচ্চ কয়টি বেত্রাঘাত করা যাবে এ নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ আছে।

এখন তা'যির সংক্রান্ত আইম্মায়ে কেরামের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করছি। তাতে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

وليس لأقل التعزير حد بل هو بكل ما فيه إيلام الانسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والاغلاظ له وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة كما هجر النبى وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا وقد يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبى وأصحابه يعزرون بذلك وقد يعزر بترك استخدامه فى جند المسلمين كالجندى المقاتل إذا فر من الزحف فان الفرار من الزحف من الكبائر وقطع أجره نوع تعزير له وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له وكذلك قد يعزر

بالحبس وقد يعزر بالضرب وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا كما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أمر بمثل ذلك فى شاهد الزور. اهـ

“তা’যিরের সর্বনিম্ন পরিমাণের কোন নির্ধারিত সীমা নেই। বরং প্রত্যেক এমন কথা ও কাজ কিংবা প্রত্যেক এমন কথা বা কাজ পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা ব্যক্তির কষ্ট হবে, সেটা দিয়েই তা’যির হতে পারে। কোন সময় ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে, ধমকি দিয়ে ও কঠোরতা করে তা’যির করা যায়। আবার কোন সময় তাওবা না করা পর্যন্ত বয়কট করে ও সালাম দেয়া বন্ধ রাখার মাধ্যমে করা যায়। এমনটা করা যায় যখন এটাই মাসলাহাত বলে মনে হয়। যেমন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম ঐ তিন সাহাবিকে বয়কট করেছিলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মুলতবী ছিল।

কখনো নিজ পদ থেকে অপসারিত করে দেয়ার দ্বারাও তা’যির হতে পারে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম এভাবে তা’যির করতেন। আবার কখনো মুসলিম বাহিনিতে না নেয়ার মাধ্যমেও তা’যির হতে পারে; যেমন- যোদ্ধা সৈনিক যদি

যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে। কেননা, ময়দান ছেড়ে পালানো কবীরা গুনাহ। আর তার প্রতিদান বন্ধ করে দেয়াও তার জন্য এক প্রকার তা'যির। তদ্রূপ আমীর যদি জঘন্য কিছু করে ফেলে, তাহলে তাকে তার নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করে দেয়া তার তা'যির। তেমনি কখনো কখনো বন্ধী করার মাধ্যমে তা'যির করা যেতে পারে, কখনো প্রহারের মাধ্যমে করা যেতে পারে, আবার কখনোও চেহারায় চুন-কালি মেখে কালো করে বাহনের উপর উল্টো করে বসিয়ে ঘুরানোর মাধ্যমেও হতে পারে, যেমনটা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার সাথে এমনটা করার আদেশ দিয়েছেন।" - মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৪৪

এখানে তা'যিরের আরোও কয়েকটি পদ্ধতি পাওয়া গেল:

ছয়. শরীয়তসম্মত এমন কথা বলা, যার দ্বারা অপরাধীর কষ্ট হতে পারে।

সাত. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কাজ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

আট. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কথা পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

নয়. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কাজ পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

দশ. উপদেশ দেয়া।

এগার. ধমক দেয়া।

বার. কঠোরতা করা।

তের. সালাম না দেয়া।

চৌদ্দ. পদ থেকে অপসারিত করে দেয়া।

পনের. সেনাবাহিনিতে না নেয়া।

ষোল. আমীরকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া।

সতের. চেহারায় চুন-কালি মেখে কালো করে বাহনের উপর উল্টো করে বসিয়ে ঘুরানো।

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.) বলেন,

وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم وكبرها وصغرها وبحسب حال المذنب في نفسه والتعزير منه ما يكون بالتوبيخ وبالزجر وبالكلام ومنه ما يكون بالحبس ومنه ما يكون بالنفي ومنه ما يكون بالضرب. اهـ

“তা’যিরের পরিমাণ, ধরণ ও সিফাত অপরাধের অবস্থাভেদে, অপরাধ ছোট ও বড় হওয়া ভেদে এবং অপরাধীর নিজের অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তা’যির হতে পারে ধমক দেয়া, তিরস্কার করা ও কথার মাধ্যমে। হতে পারে বন্দী করা ও এলাকা থেকে নির্বাসন দেয়ার মাধ্যমে। হতে পারে প্রহারের মাধ্যমে।” - আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ: ১/৩৮৪

এখানে আরেকটি পাওয়া গেল:

আটার. তিরস্কার করা।

‘আদদুররুল মুখতার’ গ্রন্থকার (১০৮৮হি.) বলেন,

(و) التعزير (ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأي القاضي) وعليه مشايخنا زيلعي لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس فيه مختلفة بحر. اهـ

“তা’যিরের কোন নির্ধারিত পরিমাণ নেই, বরং তা কাযির বিবেচনার উপর ন্যস্ত। ... কেননা, এর উদ্দেশ্য- (অপরাধ থেকে) বিরত রাখা। আর লোকজনের অবস্থা এক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।” - আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের

সাথে ছাপা): ৪/৬৪

তিনি আরো বলেন,

(ويكون به و) بالحبس و (بالصفع) على العنق (وفرك الأذن، وبالكلام العنيف، وبنظر القاضي له بوجه عبوس، وشتم غير القذف). اهـ

“তা’যির হতে পারে প্রহারের দ্বারা, বন্দী করার দ্বারা, গর্দানে চপেটাঘাতের দ্বারা, কানমলা ও রূঢ় কথার দ্বারা, কাযি সাহেব তার প্রতি ভ্রুকুচিত চেহারায় তাকানোর দ্বারা, অপবাদ নয় এমন গালি দেয়ার দ্বারা।” - আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের সাথে ছাপা): ৪/৬১

অবশ্য সারাখসী রহ. মুসলমানকে গর্দানে চপেটাঘাতের মাধ্যমে তা’যির করতে নিষেধ করেছেন। যিম্মিকে করলে করা যেতে পারে।

এখান থেকে আরোও পাওয়া গেল:

উনিশ. কানমালা।

বিশ. কাযি সাহেব ভ্রুকুচিত চেহারায় তাকানো।

একুশ. অপবাদ নয় এমন গালি দেয়া।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা তা'যিরের একুশটি পদ্ধতি পেলাম:

এক. বর্জন ও বয়কট।

দুই. নির্বাসন

তিন. বন্দী।

চার. প্রহার।

পাঁচ. হত্যা।

ছয়. শরীয়তসম্মত এমন কথা বলা, যার দ্বারা অপরাধীর কষ্ট হতে পারে।

সাত. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কাজ করা, যার দ্বারা

তার কষ্ট হতে পারে।

আট. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কথা পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

নয়. তার সাথে শরীয়তসম্মত এমন কাজ পরিত্যাগ করা, যার দ্বারা তার কষ্ট হতে পারে।

দশ. উপদেশ দেয়া।

এগার. ধমক দেয়া।

বার. কঠোরতা করা।

তের. সালাম না দেয়া।

চৌদ্দ. পদ থেকে অপসারিত করে দেয়া।

পনের. সেনাবাহিনিতে না নেয়া।

ষোল. আমীরকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া।

সতের. চেহারায় চুন-কালি মেখে কালো করে বাহনের উপর উল্টো করে বসিয়ে ঘুরানো।

উনিশ. কানমলা।

বিশ. কাযি সাহেব ভ্রুকুচিত চেহারায় তাকানো।

একুশ. অপবাদ নয় এমন গালি দেয়া (ওহে আহমক!)।

এগুলো তা'যিরের কয়েকটি পদ্ধতি মাত্র। নতুবা এর কোন নির্ধারিত পরিমাণ ও পদ্ধতি নেই, যেমনটা অনেকবার বলা হয়েছে। যেখানে শরীয়তসম্মত যে পদ্ধতি কার্যকর মনে হবে সেটাই প্রয়োগ করা হবে। তবে কারো ক্ষেত্রে প্রহারের দ্বারা তা'যির উপকারী মনে হলে তখন সর্বোচ্চ কয়টি বেত্রাঘাত করা যাবে- সেটার একটা সীমারেখা আছে। সামনে এর বিবরণ আসছে ইনশাআল্লাহ।

তা'যিরের সর্বোচ্চ পরিমাণ

আমরা দেখেছি, তা'যিরের ভিত্তি কাযির ইজতিহাদের উপর, খাহেশাতের উপর নয়। তিনি ইজতিহাদের ভিত্তিতে যাকে যে ধরণের ও যে পরিমাণ তা'যির করা প্রয়োজন মনে করেন ততটুকুই করবেন। এর চেয়ে কমও না, এর চেয়ে বেশিও না। কমও জায়েয হবে না, বেশিও জায়েয হবে না। কারণ, বেশি লাগালে সীমালঙ্ঘন হবে আবার কম লাগালে অপরাধী দমন হবে না। সীমালঙ্ঘনও জায়েয নয়, অপরাধীকে দমন না করে ছেড়ে দেয়াও জায়েয নয়। অতএব, কমও জায়েয নয়, বেশিও জায়েয নয়। এ হিসেবে তা'যিরের সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ কোন পরিমাণ নেই। অর্থাৎ এমন কোন পরিমাণ নেই যে, অপরাধী বিরত হয়ে গেলেও এর চেয়ে কম করা যাবে না; আবার এমন কোন পরিমাণও নেই যে, অপরাধী ঐ পরিমাণ শাস্তির পর বিরত হবে না বলে মনে হলেও তাকে এর অধিক শাস্তি দেয়া যাবে না।

হানাফি মাযহাবের অনেক কিতাবে আছে, তা’যিরের সর্বনিম্ন পরিমাণ তিন বেত। তবে আমাদের আইম্মায়ে কেরাম স্পষ্ট বলেছেন, এই বক্তব্য সহীহ নয়। যে ধমকে বিরত হয়ে যাবে, তাকে বেত্রাঘাত করা যাবে না। আবার যাকে এক বেত্রাঘাতে বিরত রাখা যাবে মনে হয়, এর বেশি দরকার হবে না- তাকে এর বেশি লাগানো যাবে না। অতএব, তিন বেত্রাঘাতের বক্তব্য সহীহ নয়।

তবে যাকে দশ বেতের কমে বিরত রাখা যাবে না, তার তা’যিরের সর্বনিম্ন পরিমাণ- দশ বেত্রাঘাত। যাকে বিশটা দরকার, তার জন্য বিশটাই সর্বনিম্ন। যার ত্রিশটা দরকার, তার ত্রিশটা। এর চেয়ে কম লাগানো জায়েয হবে না।
তদ্রূপ, যাকে দুই দিন বন্দী করে রাখলেই বিরত হয়ে যাবে, তাকে এর বেশি সময় বন্দী রাখা জায়েয হবে না। আবার যাকে এক বৎসরের কমে দমন সম্ভব নয়, তার সর্বনিম্ন তা’যির এক বৎসর। তাকে এক বৎসরের আগে ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে না। অতএব, যাকে যে পরিমাণ বন্দী রাখা দরকার, কাযি সাহেব তাকে সে পরিমাণই বন্দী রাখবেন। অন্যান্য সকল তা’যিরের ক্ষেত্রেও একই কথা।

তবে বিশেষভাবে বেত্রাঘাতের দ্বারা তা'যিরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কতটি বেত লাগানো যাবে এ নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম মালেক রহ. এর মতে এর কোন সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত নেই। যাকে বিরত রাখতে যত পরিমাণ বেত লাগানো দরকার তাকে সে পরিমাণই লাগানো যাবে। একশো দরকার হলে একশো, দু'শো দরকার হলে দু'শো, চারশো দরকার হলে চারশো।

তবে অন্যান্য আইম্মায়ে কেরামের মতে বেত্রাঘাতের একটা সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত আছে। আবু হানিফা রহ. এর মতে এর পরিমাণ ঊনচল্লিশ (৩৯)। অতএব, তা'যিররূপে কাউকে ঊনচল্লিশ বেতের অধিক লাগানো যাবে না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যদি কেউ ঊনচল্লিশ বেতে বিরত না হয়, তাহলে তার ব্যাপারে কি করা হবে? ঊনচল্লিশ লাগানোর

পর কি ছেড়ে দেয়া হবে?

উত্তর:

না ছেড়ে দেয়া হবে না। বরং তাকে বিরত রাখতে বেত্রাঘাতের পরিবর্তে অন্য কোন শাস্তি বেছে নেয়া হবে। যেমন- বেত্রাঘাতের পর জেলে ভরে রাখা হবে কিংবা নির্বাসন দিয়ে দেয়া হবে কিংবা লোকজনকে তাকে বয়কট করার আদেশ দেয়া হবে, যাতে সংকীর্ণতার শিকার হয়ে সে সংশোধন হয়ে যায়। অতএব, বেত্রাঘাতের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৩৯ হওয়ার অর্থ এই নয়- এর অতিরিক্ত কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। বরং এর অর্থ: বেত্রাঘাত ৩৯- এর অধিক লাগানো যাবে না, তবে ৩৯- এ বিরত না হলে আর বেত্রাঘাত না করে বরং অন্য কোন শাস্তি বেছে নেয়া হবে।

দ্বিতীয়ত: কারো অপরাধ যদি অনেক হয়, আর প্রত্যেকটা অপরাধের কারণে তা'যিরের প্রয়োজন পড়ে, যার ফলে সবগুলো বেত্রাঘাতের পরিমাণ সমষ্টিগতভাবে ৩৯- এর অধিক হয়ে যায়: তাহলে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। বর্ণিত আছে, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তার আংটির

নকশা নকল করে বাইতুল মাল থেকে সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার কারণে মা'ন ইবনে যায়েদাকে তিনি দু'শো বেত্রাঘাত করেছেন, সাথে বন্দীও করেছেন এবং নির্বাসনও দিয়েছেন। কারণ, তার এই অপরাধ অনেকগুলো অপরাধের রূপ নিয়েছে। যেমন:

- আংটির নকশা নকল করা।
- অন্যায়ভাবে বাইতুল মালের সম্পদ হাতিয়ে নেয়া।
- অপরাধীদের জন্য এই অপরাধের রাস্তা খোলে দেয়া।

কেননা, তার দেখাদেখি অন্যরাও বাইতুল মালের সম্পদ হাতিয়ে নিতে দায়িত্বশীলদের আংটির নকশা নকল করার পথ ধরতে পারে ইত্যাদি।

যেহেতু তার অপরাধ অনেকগুলো অপরাধের রূপ নিয়েছে এ কারণে সবগুলোর তা'যিররূপে দু'শো লাগানো হয়েছে।

[বিস্তারিত ফাতহুল কাদীর ও রদ্দুল মুহতার, বাবুত তা'যির দেখুন।]

অতএব, ৩৯- এর অধিক লাগানো যাবে না ঐ সময়, যখন অপরাধ একটা হবে। যেমন- কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন অবিবাহিত মহিলার সাথে সঙ্গম ব্যতীত অন্যান্য কুকর্ম করলো

(যেমন- জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া ইত্যাদি)। তার শাস্তি কি তা শরীয়তে নির্ধারিত নেই। এখানে তা'যির করতে হবে। তবে এই তা'যিরের পরিমাণ হানাফি মাযহাব মতে ৩৯ বেতের অধিক হতে পারবে না। তবে যদি এর দ্বারা সে পরবর্তীতে এসব কুকর্ম থেকে বিরত হবে না বলে মনে হয়, তাহলে তাকে জেলে দেয়া যেতে পারে কিংবা মুনাসিব মতো অন্য কোন শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তির অপরাধ যদি অনেকগুলো হয়, যেমন:

- কাউকে গালি দিয়েছে,
- কারো নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে,
- কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছে,
- কোন মহিলার সাথে সঙ্গম ব্যতীত অন্যান্য কুকর্ম করেছে,
- অন্যায়ভাবে কারো টাকা হাতিয়ে নিয়েছে,
- জুয়া খেলেছে ইত্যাদি;

এমতাবস্থায় তাকে সবগুলোর বিপরীতে যদি বেত্রাঘাত করা হয়, তাহলে তার সংখ্যা ৩৯- এর চেয়ে অনেক বেশি হবে। এতে কোন সমস্যা নেই। কেননা, এখানে এক অপরাধের

বিপরীতে বেত্রাঘাত হচ্ছে না, অনেকগুলো অপরাধের বিপরীতে হচ্ছে। তবে বেত্রাঘাতের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে- যেন তার মৃত্যু না ঘটে যায় কিংবা কোন অঙ্গ নষ্ট না হয়ে যায়।

সারকথা এই দাঁড়ালো:

ϖ তা’যির কাযির ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল। তিনি খাহেশাতের বশবর্তী না হয়ে ইজতিহাদের ভিত্তিতে যাকে যেমন মুনাসিব মনে করেন তা’যির করবেন।

ϖ তা’যিরের সর্বনিম্ন কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। যাকে দমন করতে যে পরিমাণ শাস্তি দরকার, সেটাই তার জন্য সর্বনিম্ন তা’যির। এর চেয়ে কম শাস্তি জায়েয হবে না। তদ্রূপ, যে পরিমাণ শাস্তির মাধ্যমে অপরাধী দমন হয়ে যাবে, এর বেশি লাগবে না মনে হয়- সেটা তার জন্য সর্বোচ্চ তা’যির। এর অধিক শাস্তি দেয়া যাবে না।

ϖ হানাফি মাযহাব মতে তা’যিরে বেত্রাঘাতের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৩৯। এর বেশি বৈধ নয়। তবে অপরাধ যদি অনেক হয় এবং প্রত্যেকটার জন্য তা’যিরের দরকার পড়ে, তাহলে সবগুলোর

সমষ্টি ৩৯- এর অধিক হতে কোন সমস্যা নেই। তদ্রূপ, যেক্ষেত্রে ৩৯- এর অধিক বৈধ নয়, সেক্ষেত্রেও যদি অপরাধী বিরত হবে না বলে মনে হয়, তাহলে বেত্রাঘাতের সাথে অন্য শাস্তি যোগ করা হবে।

ওয়ালা-বারা এবং শরীফ হাতেম আলআউনীর বিভ্রান্তি

ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা কুরআন বা দ্বীনে ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাসী হওয়াই যথেষ্ট নয়। তদ্রূপ বিশ্বাসের পাশাপাশি মহব্বত রাখাও যথেষ্ট নয়। বিশ্বাস ও মহব্বতের পাশাপাশি দ্বীনে ইসলামকে তা'জিম করা, তা'জিম পরিপন্থী কোন কিছু না করা এবং দ্বীনে ইসলামের আনুগত্য অবধারিতরূপে গ্রহণ করে নেওয়া আবশ্যক।

একইভাবে ঈমান আনার পর শুধু বিশ্বাস রাখা বা মহব্বত রাখাই ঈমানের উপর বহাল থাকার জন্য যথেষ্ট নয়। বিশ্বাস ও

মহব্বত রেখেও যদি কোন কুফরি করে বা তা'জিম পরিপন্থী কোন কাজ করে, তাহলে মুরতাদ হয়ে যাবে। তার বিশ্বাস ও মহব্বত তাকে কুফর থেকে বাঁচাতে পারবে না। এর দলীল-

ক.

আহলে কিতাবরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতায় বিশ্বাস করতো। কিন্তু এরপরও তারা কাফের। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে চেনে, যেমন চেনে তাদের ছেলে-সন্তানদেরকে। আর নিশ্চয় তাদের মধ্য থেকে একটি দল সত্যকে গোপন করে, অথচ তারা জানে।"- বাক্বারা ১৪৬

অন্য আয়াতে বলেন,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে চেনে যেরূপ চেনে তাদের ছেলে-সন্তানদেরকে। যারা নিজদের ক্ষতি করেছে

তারা ঈমান আনবে না।”- আনআম ২০

খ.

ফিরআউন এবং তার কওমের ব্যাপারে বলেন,

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

“আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তর তা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখ, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।”- নামল ১৪

অন্তরে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখার পরও তারা কাফের ছিল।

গ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বাস করতেন এবং মহব্বতও করতেন। কিন্তু রাসূলের দ্বীনের আনুগত্য গ্রহণ না করায় কাফের ছিলেন।

ঘ.

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বাস করতো এবং মহব্বতও করতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছতে পারলে তার কদম মোবারকের ধূলি ধোয়ে দেবে বলে তামান্নাও রাখতো। কিন্তু রাসূলের দ্বীনের আনুগত্য গ্রহণ না করায় কাফের ছিলো।

কাশ্মিরি রহ. (১৩৫২ হি.) বলেন,

وهذا القرآن يشهدُ بمعرفة الكفار، قال تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءهُمْ} [البقرة: 146] وهذا أبو طالب يُقِرُ بنبوتِهِ ونباهته صلى الله عليه وسلّم ويُعْلِنُ بها في أبياته، حتى دارت وسارت، فيقول:

ودعوتَني وزعمتَ أَنَّكَ صادِق ... وصدقت فيه وكنت ثَمّ أمِينًا*

وعرفتُ دينَك لا محالةَ أنه ... من خيرِ أديانِ البَرِيَّةِ دِينا*

لولا الملامةُ أو حَذَارِ مَسَبَّةٍ ... لوجدتَّني سمحًا بذاك مُبِينًا*

وهذا هرقل عظيم الروم يقول: لو أني أعلم أني أَخْلُصُ إليه لتجَشَّمْتُ لقاءه، ولو كنت عنده لغَسَلْتُ عن قدميه، وفي «فتح الباري»: عن مرسل ابن إسحق عن بعض أهل العلم: أن هرقل قال: ويحك، والله إني لأَعْلَمُ أنه نبيٌ مرسل، ولكني أخاف الرومَ على نفسي، ولولا ذلك لاتَّبعتُهُ. فهل تريدُ من التصديق أمرًا وراء ذلك؟ فلما وُجِد منهم التصديقُ والتسليمُ والإقرارُ بهذه المثابة، وَجَبَ على التعريفِ المذكورِ أن يُحْكم عليهم بالإسلام، مع اتفاقهم

على كونهم كافرين.

فأقول: إنّ الجزءَ الذي يمتاز به الإيمان والكفر، هو التزام الطاعة (1) مع الردع والتبري عن دين سواه، فإذا التزم الطاعة فقد خرجَ عن ضلالة الكفر ودخل في هَدْي الإسلام. وحينئذٍ تبين لك وجه كفر هؤلاء الكفرة مع تصديقهم ومعرفتهم، وذلك لأن أبا طالب وإن أعلن بحقية دينه، إلا أنه لم يلتزم طاعته، ولم يدخل في دينه، ولذا قال: لولا الملامة أو حذار مسبة .... إلخ، فآثر النار على العار. وهكذا هِرَقل، وإن تمنى لقاءه وَبجَّلَه وعظمه بظهر الغيب، لكنه خشي الرومَ أشدَّ خشية، فلم يلتزم طاعته. وكذلك حال الكفار الذين أخبر الله سبحانه عن معرفتهم، فإنهم مع معرفتهم الحقَ، صفحوا عن كلمة الحق، ولم يَدِينُوا بدين الإسلام. اهـ فيض الباري شرح صحيح البخاري: 1/125كتاب الإيمان ،.

“এই কুরআনই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কাফেরদের মা’রেফত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘তারা তাকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) তেমনই চেনে, যেমন চেনে তাদের ছেলে সন্তানদেরকে।’ এই যে আবু তালেব! সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যাত ও মহত্বের স্বীকৃতি দিতো। তার কবিতার পংক্তিতে সে তা সুস্পষ্ট ঘোষণা করছে। সে বলছে,

*তুমি আমাকে আহ্বান করেছ এবং বলেছো যে, তুমি সত্যবাদি ... এতে তুমি সত্যই বলেছো এবং এ ব্যাপারে তুমি বিশ্বস্ত।
*আমি তোমার ধর্মকে চিনতে পেরেছি যে, ... নিঃসন্দেহে তা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।
*যদি তিরস্কারের ভয় কিংবা গালি-গালাজের আশঙ্কা না থাকতো ... তাহলে আমাকে স্পষ্টরূপেই তা গ্রহণকারী বলে দেখতে পেতে।

এই যে রোমের অধিপতি হিরাক্লিয়াস! সে বলছে, 'আমি যদি জানতাম, আমি তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কাছে পৌঁছতে পারবো, তাহলে আমি অবশ্যই কষ্ট বরদাশত করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম, তাহলে তাঁর কদমের ধুলোবালি ধুয়ে দিতাম।'
ফাতহুল বারিতে ইবনে ইসহাক সূত্রে মুরসাল সনদে কোনো কোনো আহলে ইলম থেকে বর্ণিত আছে, হিরাক্লিয়াস বলেছিল, 'আফসোস তোমার জন্য! আল্লাহর কসম! আমি জানি, নিঃসন্দেহে তিনি প্রেরিত নবী। কিন্তু আমি নিজের ব্যাপারে রোমানদের আশঙ্কা করছি। যদি এমনটা না হতো, তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করতাম।'
এর চেয়েও অধিক তাসদিক আপনি চান? এমন পর্যায়ের

তাসদিক, তাসলিম ও স্বীকারোক্তি যখন তাদের থেকে পাওয়া গেছে, তখন উল্লেখিত সংজ্ঞানুযায়ী তাদেরকে মুসলমান বলে হুকুম দেয়া আবশ্যক! অথচ তারা কাফের হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত।

অতএব, আমি বলি, ঈমান ও কুফর পরস্পর থেকে আলাদা হবে যে মৌলিক জিনিসের মাধ্যমে, তা হলো, (নিজের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) আনুগত্য অবধারিত করে নেয়া, সাথে সাথে অন্য সকল ধর্ম থেকে মুক্ত হওয়া ও সম্পর্কচ্ছেদ করা। যখন আনুগত্য অবধারিত করে নেবে, তখন কুফরের গোমরাহি হতে বের হয়ে ইসলামের হেদায়াতে প্রবেশ করবে। আশা করি এখন আপনার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তাসদিক ও মা'রেফত থাকা সত্ত্বেও এসব কাফেরের কুফরির কারণ কি ছিল। কারণ, আবু তালেব যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম হক্ব বলে ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু সে তাঁর আনুগত্য নিজের জন্য অবধারিত করে নেয়নি। তাঁর ধর্মে প্রবেশ করেনি। এ কারণেই সে বলেছে, 'যদি তিরস্কারের ভয় কিংবা গালি-গালাজের আশঙ্কা না থাকতো ... ।' লজ্জা (বরণের) অপেক্ষায় সে জাহান্নামকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। হিরাক্লিয়াসও তা-ই করেছে। সে যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করেছে, অনুপস্থিতিতে তাঁকে সম্মান করেছে, তা'জিম করেছে, কিন্তু সে রোমানদেরকে অতিমাত্রায় ভয় পেয়েছে, ফলে তাঁর আনুগত্য নিজের জন্য অবধারিত করে নেয়নি। ঐসব কাফেরদের অবস্থাও এমনই, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানিয়েছেন: তাদের মা'রেফাত ছিল, কিন্তু হক্ক চেনার পরও তারা হকের কালিমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ইসলাম ধর্মকে নিজের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেনি।"- ফায়জুল বারি, কিতাবুল ঈমান ১/১২৫

ঈমান না আনার পক্ষে কাফেরদের কতগুলো খোঁড়া যুক্তি উল্লেখ করার পর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسل بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم فلذلك لم يتبعوهم وهؤلاء كلهم كفار بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكانوا يعلمون صدقه ولكن كانوا يعلمون أن في متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به؛ بل لهوى النفس. اهـ

“এসব বিষয় এবং এর সমশ্রেণীর অন্যান্য বিষয় এমন কোন দলীল নয় যা রাসূলগণের সত্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। বরং প্রমাণ করে যে, এগুলো তাদের মনোচাহিদা, প্রবৃত্তি ও আদত-অভ্যাসের পরিপন্থী সাব্যস্ত হয়েছে। এ কারণেই তারা রাসূলগণের আনুসরণ করেনি। এদের সকলেই কাফের। বরং আবু তালেব ও আরো অনেকে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বতও করতো। তার কালিমা বলুন্দ হোক তাও চাইতো। তার প্রতি তাদের কোন প্রতিহিংসা ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতাও তাদের জানা ছিল। কিন্তু তারা জানতো যে, রাসূলের অনুসরণ করতে গেলে তাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম ছাড়তে হবে। কুরাইশরা তাদের গাল-মন্দ করবে। (পূর্ব পুরুষদের) ঐসব আদত-অভ্যাস পরিত্যাগ করা এবং এই গাল-মন্দ বরদাশত করার হিম্মত তাদের হয়নি। অতএব, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার সত্যতা না জানার কারণে ঈমান ছাড়েনি, বরং প্রবৃত্তির তাড়নায় ছেড়েছে।”- মাজমুউল ফাতাওয়া ৭/১৯২-১৯৩

বুঝা গেল, কাফেরদের অনেকে সব কিছু জানা বুঝার পরও শুধু দুনিয়ার লোভে ঈমান আনেনি। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“তা (অর্থাৎ তাদের কুফর) এ কারণে যে, তারা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং (এ কারণে যে,) আল্লাহ তাআলা কাফের সম্প্রদায়কে (জোরপূর্বক) হেদায়াত দেন না।”- নাহল ১০৭

বুঝা গেল: বিশ্বাস, মহব্বত, স্বীকারোক্তি সব থাকার পরও যদি কেউ দুনিয়ার লোভে পড়ে ঈমান ত্যাগ করে, তাহলে সেও কাফেরই গণ্য হবে। তার বিশ্বাস, তার মহব্বত, তার স্বীকারোক্তি- এসব কোনই কাজে আসবে না।

একইভাবে ঈমান আনার পর যদি কেউ কোন কুফরি কাজ করে তাহলে তার বিশ্বাস, মহব্বত, স্বীকারোক্তি কোনই কাজে আসবে না। আহলে সুন্নাহর সকলের ঐক্যমতে সে মুরতাদ।

যেমন, কেউ যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা সত্বেও তাকে নিয়ে কটাক্ষ করে, তাহলে সর্বসম্মতিতে সে মুরতাদ। শুধু দুনিয়ার লোভেও যদি করে তবুও মুরতাদ। অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্বেষ রাখা আবশ্যক নয়। তাকে মিথ্যা ভাবাও আবশ্যক নয়। সব ঠিকঠাক থাকার পরও যদি কোন দুনিয়াবি লোভে, অর্থ-কড়ি বা পদের বা চাকরির লোভে কটাক্ষ করে তবুও মুরতাদ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত ও তার রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে?! কোন অজুহাত দেখিও না। ঈমান আনার পর তোমরা যে কাফের হয়ে গেছো।”- তাওবা ৬৫-৬৬

***

উপরোক্ত আলোচনা বুঝার পর আশাকরি সহজে বুঝে আসবে যে, কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস করার পরও, নিজেকে ইসলামের অনুসারি দাবি করার পরও শুধু দুনিয়ার লোভে বা চাকরি ঠিক রাখার খাতিরে ইসলাম ও মুসলমানদের বিপক্ষে কাফেরদের সহায়তা করে, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

"তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"- মায়েদা ৫১

এ ব্যাপারে আহলে ইলমদের কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করছি:

এক. ইবনে হাযম রহ. (৪৫৬ হি.)

من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه متى قدر عليه، ومن إباحة ماله، وانفساخ نكاحه، وغير ذلك. اهـ

“যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দারুল কুফর ও দারুল হরবে চলে যাবে এবং গিয়ে (দারুল হরবের) নিকটবর্তী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সে তার এ কাজের দ্বারা মুরতাদ হয়ে যাবে। মুরতাদের সকল বিধি বিধান তার উপর বর্তাবে। যেমন- ধরতে সক্ষম হলে তাকে হত্যা করা ফরয, তার মাল হালাল, তার বিবাহ বাতিল ইত্যাদি।”- আলমুহাল্লাহ ১১/২৫০

আরো বলেন,

وكذلك: من سكن بأرض الهند، والسند، والصين، والترك، والسودان والروم، من المسلمين، فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر، أو لقلة مال، أو لضعف جسم، أو لامتناع طريق، فهو معذور. فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة، أو كتابة: فهو كافر. اهـ

“তদ্রূপ যে মুসলমান হিন্দুস্তান, সিন্দু, চীন, তুর্কিদের ভূমি, সুদান বা রোমে বসবাস করে; যদি সে পরিবার বড়, সম্পদের স্বল্পতা, শারীরিক দুর্বলতা বা রাস্তা অনিরাপদ হওয়ার কারণে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে, তাহলে সে মা’জূর। পক্ষান্তরে যদি সেখানে থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে,

খেদমত বা লিখনীর (মতো সামান্য কিছুর) দ্বারাও কাফেরদের সহায়তা করে, তাহলে সে কাফের।”- আলমুহাল্লা ১১/২৫০

উল্লেখ্য, এসব ভূমি তখন কাফেরদের ভূমি ছিল।

আরো বলেন,

ولو أن كافرا مجاهدا غلب على دار من دور الإسلام، وأقر المسلمين بها على حالهم، إلا أنه هو المالك لها، المنفرد بنفسه في ضبطها، وهو معلن بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه، وأقام معه - وإن ادعى أنه مسلم. اهـ

“যদি কোন সুস্পষ্ট কাফের মুসলমানদের কোন ভূমি দখল করে নেয় কিন্তু মুসলমানদেরকে আপন হালতে সেখানে বহাল রাখে; তবে উক্ত ভূমির মালিক সে-ই এবং সে-ই তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক, পাশাপাশি সে প্রকাশ্যে ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম অনুসরণের দাবিদার হয়, তাহলে সেখানে থেকে গিয়ে যে-ই তাকে সহায়তা করবে এবং তার সাথে অবস্থান করবে, সে-ই কাফের হয়ে যাবে; যদিও সে নিজেকে মুসলমান দাবি করে।”- আলমুহাল্লা ১১/২৫১

উল্লেখ্য, দারুল হরবে চলে যাওয়া বা থেকে যাওয়াই মূল উদ্দেশ্য নয়, মূলকথা হলো, যে ব্যক্তিই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহায়তা করবে, সেই মুরতাদ হয়ে যাবে।

প্রথম বক্তব্যে فهو بهذا الفعل مرتد -'সে তার এ কাজের দ্বারা মুরতাদ হয়ে যাবে'- কথাটা থেকে সুস্পষ্ট যে, কাফেরদের সহায়তা করা কাজটাই কুফর। আকীদা যা-ই হোক, এ কাজের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে। তদ্রূপ, শেষ বক্তব্যে وإن ادعى أنه مسلم-' যদিও সে নিজেকে মুসলমান দাবি করে' থেকেও বিষয়টা স্পষ্ট। সহায়তা কি হালাল মনে করে করলো, না'কি হারাম মনে করে করলো; কাফেরদের মহব্বতে করলো বা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে করলো: এসব কিছু দেখার দরকার নেই। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়তা করলেই মুরতাদ হয়ে যাবে।

দুই. হামদ ইবনে আতিক আননজদি রহ. (১৩০১ হি.)

مظاهرة المشركين ، ودلالتهم على عورات المسلمين ، أو الذب عنهم بلسان ، أو رضي بما هم عليه ، كل هذه مكفرات ، فمن صدرت منه – من غير الإكراه المذكور – فهو مرتد ، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين. اهـ

“কাফেরদের সহায়তা করা, মুসলমানদের গোপন খবরাখবর তাদের অবগত করা, যবান দিয়ে তাদের পক্ষ নেয়া, তাদের মত ও পথের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা: এ সবগুলোই কুফর। পূর্বোক্ত ইকরাহ-জবরদস্তী ব্যতীত যার থেকে এসব প্রকাশ পাবে, সে মুরতাদ; যদিও সে পাশাপাশি কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে এবং মুসলমানদের মহব্বত করে থাকে।”- আদদিফা আন আহলিস সুন্নাহ ৩০

লক্ষ করুন, **‘যদিও সে পাশাপাশি কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে এবং মুসলমানদের মহব্বত করে থাকে।’**

তিন. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.)

যেসব মুসলমান তাতারদের পক্ষাবলম্বন করেছিল, তাদের

তাকফির করে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام. وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين - مع كونهم يصومون. ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين - فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين. اهـ

“সেনাবাহিনির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বা অন্যান্য মুসলমানের মধ্য থেকে যারাই তাতারদের দলে যোগ দেবে, তাদের বিধান তাতারদেরই অনুরূপ হবে। চেঙ্গিস খান ইসলামী শরীয়তের বিধানাবলী থেকে যে পরিমাণ রিদ্দাহয় লিপ্ত, তাদের মাঝেও ঐ একই পরিমাণ ইরতিদাদ বিদ্যমান। সালাফগণ যেখানে যাকাত আদায়ে অসম্মতিজ্ঞাপনকারীদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেছেন; অথচ তারা নামাযও পড়তো, রোযাও রাখতো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেনি; তখন ঐ ব্যক্তির কি বিধান হবে, যে আল্লাহ ও রাসূলের দুশমনদের সাথে মিলে মুসলমানদের হত্যা করে?!”- মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৫৩০

অর্থাৎ সে আরো আগেই মুরতাদ হয়ে যাবে। এখানে তিনি এ শর্ত করেননি যে, যারা কাফেরদের মহব্বতে তাতারদের সাথে যোগ দেবে তারাই কেবল কাফের হবে, বাকিরা হবে না। ঢালাওভাবে সকলের উপর হুকুম লাগিয়েছেন।

চার. আহমাদ শাকের রহ. (১৩৭৭ হি.)

আগ্রাসী ইংরেজ ও ফরাসীদের সহায়তার বিধান আলোচনাকল্পে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও কাযি আহমাদ শাকের রহ. (১৩৭৭ হি.) বলেন,

أما التعاون مع الإنجليز، بأي نوع من أنواع التعاون، قل أو كثر، فهو الردة الجامحة، والكفر الصُّراح ... سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء. كلهم في الكفر والردة سواء. اهـ

"ইংরেজদেরকে যেকোন প্রকারে সাহায্য করা- কম হোক বেশি হোক- তা সুনিশ্চিত রিদ্দাহ ও সুস্পষ্ট কুফর। ...সাহায্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক হোক, রাষ্ট্রীয় হোক বা নেতৃস্থানীয় লোকদের থেকে হোক- রিদ্দাহ ও কুফরে সকলেই বরাবর।"- কালিমাতুল হক ৭৬

আরো বলেন,

ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم
بأي نوع من أنواع التعاون، وإن التعاون معهم حكمه حكم التعاون
مع الإنجليز: الردة والخروج من الإسلام جملة، أياَ كان لون
المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه. اهـ

“কোন ভূখণ্ডেই কোন মুসলিমের জন্য ফরাসীদের কোন রকম সহায়তা করা জায়েয হবে না। তাদেরকে সহায়তা করার বিধান ইংরেজদের সহায়তা করার অনুরূপ। অর্থাৎ, রিদ্দাহ ও সম্পূর্ণরূপে দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাওয়া; সহায়তাকারী যে বর্ণেরই হোক, যে শ্রেণীরই হোক আর যে জাতীরই হোক।”- কালিমাতুল হক ৭৭

এ শর্ত করেননি যে, ইংরেজদের বা ফরাসিদের মহব্বতে সহায়তা করলে কাফের হবে, অন্যথায় নয়।
উপরোক্ত আলোচনার পর আশাকরি শরীফ হাতেম আলআউনীর বিভ্রান্তি বুঝতে পারবেন। তিনি এ বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন যে, কাফেরদের ও কাফেরদের দ্বীনের মহব্বত নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়তা করলে কাফের হবে,

অন্যথায় হবে না। দুনিয়ার লোভে, চাকরির লোভে কেউ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়তা করলে কাফের হবে না। অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি মহব্বত থাকলে এবং কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ থাকলে সহায়তা যতই করুক, যতই মুসলমান হত্যা করুক, আল্লাহর দ্বীনের যতই ক্ষতি করুক- কাফের হবে না। এটি সুস্পষ্ট জাহমিয়াদের মতবাদ।

প্রথমত কথা হল, যে কাফেরদের সাথে মিলে ইসলামকে মিটিয়ে দিতে যুদ্ধে লিপ্ত, তার অন্তরে ইসলামের সত্যতার বিশ্বাস যদিও থাকতে পারে, কিন্তু ঐ পরিমাণ তা'জিম নেই, যেই পরিমাণ তা'জিম থাকলে তাকে মুসলমান ধরা যায়। বেশির চেয়ে বেশি আবু তালেবের মতো মহব্বত আছে, যা ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত পূর্ণ তা'জিমও যদি থাকে, তথাপি সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হলে এ তা'জিম তাকে কুফর থেকে বাঁচাতে পারবে না; যেমন পারে না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটাক্ষকারীকে বাঁচাতে। কাজেই আউনীর এ শর্তটি কুরআন

সুন্নাহ পরিপন্থী জাহমি মতবাদের বক্তব্য। আমার মনে হয় এসব জাহমি, মুরজি ও দরবারিদের কিতাবাদি আগে অধ্যয়ন করাও মারকাযের বড়দের বিভ্রান্তির একটা বড় কারণ। আল্লাহ আমাদেরকে আলেমদের বিচ্যুতি এবং মুনাফিক ও দরবারি আলেমদের থেকে হিফাজত করুন। আমীন।

ওয়ালা-বারা এবং শরীফ হাতেম আলআউনীর বিভ্রান্তি-০২

গত পর্বে কয়েকজনের বক্তব্য তুলে ধরেছিলাম। আজ শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. (১২০৬ হি.) এর বক্তব্য তুলে ধরছি।

পাঁচ.

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. (১২০৬ হি.)

তিনি ঈমান ভঙ্গের প্রসিদ্ধ দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে কাফেরদের দ্বীনকে সঠিক মনে করা,

কাফেরদের দ্বীনকে পছন্দ করা বা ইসলাম ধর্মকে অপছন্দ করা- এগুলোকে ঈমান ভঙ্গের স্বতন্ত্র কারণ বলেছেন, আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহায়তা করাকে স্বতন্ত্র কারণ ধরেছেন। তিনি বলেন,

الثالث: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر إجماعا

الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه، فهو كافر

.

الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ}

...

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين). اهـ الدرر السنية 10\91-92

“**তৃতীয়:** যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের বলে না, কিংবা তারা কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে, কিংবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে- সকলের ঐক্যমতে সে কাফের হয়ে যাবে।

চতুর্থ: যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, ভিন্ন কারো জীবনাদর্শ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শের চেয়ে অধিকতর পরিপূর্ণ, কিংবা ভিন্ন কারো বিধান তাঁর বিধানের চেয়ে অধিক ভাল- যেমন ঐসব লোক, যারা তাগুতের বিধানকে তাঁর বিধানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়: সে ব্যক্তি কাফের।

পঞ্চম: যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত কোন বিধানকে অপছন্দ করে, সেটি অনুযায়ী আমল করলেও সে সকলের ঐক্যমতে কাফের হয়ে যাবে। এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী, ‘তা এ কারণে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা অপছন্দ করেছে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের সকল আমল বরবাদ করে দিয়েছেন।” –মুহাম্মাদ ৯ ...

অষ্টম: মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য-সহযোগিতা

করা। এর দলীল- আল্লাহ তাআলার বাণী, ‘তোমাদের মধ্যে যে তাদেরক সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমদের পথ প্রদর্শন করেন না।’- মায়েদা ৫১”- আদদুরারুস সানিয়্যাহ ১০/৯১-৯২

দেখুন, তৃতীয়-চতুর্থ ও পঞ্চম কারণে তিনি কাফেরদের দ্বীনকে সঠিক মনে করা, কিংবা ইসলামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা কিংবা ইসলামকে অপছন্দ করাকে স্বতন্ত্র কারণ ধরেছেন। এরপর অষ্টম কারণ বলেছেন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহায়তা করা। এটি একটি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন কারণ। এর জন্য কাফেরদের দ্বীনকে সঠিক মনে করা বা পছন্দ করা শর্ত নয়। এটিকে তিনি আগেই কুফর বলে এসেছেন। বুঝা গেল, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহায়তা করা আমলটিই স্বয়ং কুফর। এর জন্য কাফেরদের দ্বীনকে মহব্বত করা বা ইসলামকে অপছন্দ করা শর্ত নয়। হ্যাঁ, কেউ যদি সহায়তার পাশাপাশি মহব্বতও করে, তাহলে সে দু’টি কুফর করলো: সহায়তা ও মহব্বত। আর যে মহব্বত করেনি কিন্তু সহায়তা করেছে, সে একটি কুফর করল। আর তা হল, সহায়তা। আর স্পষ্ট যে, কাফের হওয়ার জন্য একটি কুফরই যথেষ্ট। অতএব,

যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহায়তা করবে, সে কাফের। কাফেরদের দ্বীনকে পছন্দ করলেও কাফের, না করলেও কাফের। ইসলামকে অপছন্দ করলেও কাফের, না করলেও কাফের। শায়খ হামদ ইবনে আতিক আননজদি রহ. (১৩০১ হি.) এর বক্তব্য উল্লেখ করে এসেছি যে, তিনি বলেছেন,

فهو مرتد ، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين. اهـ

"সে মুরতাদ; যদিও সে পাশাপাশি কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে এবং মুসলমানদের মহব্বত করে থাকে।"- আদদিফা আন আহলিস সুন্নাহ ৩০

অতএব, ওয়ালা বারার মাসআলায় কাফেরদের দ্বীনকে মহব্বত করা বা সঠিক মনে করার শর্ত সম্পূর্ণ বাতিল ও জাহমি ও মুরজিদের ত্বরিকা।

করোনা মহামারি: ০১. সংক্রামক ব্যাধি

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর একদিকে যেমন এটি এক মহা আতংকে পরিণত হয়েছে – বিশেষত কাফেরদের জন্য- অন্য দিকে তা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনা, লেখালেখি ও মন্তব্য হচ্ছে। জনমনে অসংখ্য প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে। সংক্রমণ, লক ডাউন, কোয়ারেনটিন, কারফিউ, মসজিদ-মাদ্রাসা ও জুমআ-জামাত বন্ধ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় সামনে এসেছে। সৌদি আরবসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে মসজিদ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আরো ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর কিছুটা মিললেও সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশনা স্পষ্ট হচ্ছে না। ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে।

অনেকে আলহামদুলিল্লাহ লেখালেখি ও বয়ান-ভিডিওর মাধ্যমে মুসলিমদের হতাশা থেকে ফিরানোর পথে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছেন। সে সিলসিলাতে আমিও ইনশাআল্লাহ কিছু বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

সংক্রামক ব্যাধি

প্রথমে যে বিষয়টি সামনে এসেছে তা হলো, সংক্রমণ। ইসলাম

সংক্রামক ব্যাধির অস্তিত্ব স্বীকার করে কি'না? অন্য কথায় বলতে গেলে, একজন আক্রান্ত রোগীর শরীর থেকে অন্যের শরীরে রোগ প্রবেশ করা এবং তার সংস্পর্শে অন্যরাও আক্রান্ত হওয়া ইসলাম সমর্থন করে কি'না?

সাধারণত সকলেই যে বিষয়টি জানে তা হলো, কিছু রোগ আছে ছোঁয়াচে। কিছু পয়জন আছে সংক্রামক। একজনের সংস্পর্শ থেকে অন্য জনের হতে পারে। এ বিয়ষটি মোটামুটি সব মহলেই জানাশুনা। বিশেষত বিশ্বময় করোনার আক্রমণ থেকে বিষয়টা আরো পরিষ্কার। বিশেষত ডাক্তাররাও বলছেন এবং এর বিপরীতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। তখন তো আর বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

এর বিপরীতে যখন সহীহ হাদিস সামনে চলে এসেছে যে, ﻻ عدوى- 'সংক্রমণ বলে কিছু নেই' তখন বিপত্তি ঘটে গেছে। না আমরা হাদিস অস্বীকার করতে পারছি আর না বাস্তব দেখাকে। বাস্তবে তো দেখছি যে একজন থেকে অন্য জনের হচ্ছে। এটা কিভাবে অস্বীকার করতে পারি? অন্য দিকে সহীহ হাদিস বলছে সংক্রমণ বলে কিছু নেই। হাদিসও বাদ দিতে পারছি না বাস্তবও অস্বীকার করতে পারছি না। তাহলে এর ব্যাখ্যা কি?

কোনো কোনো ভাই আলহামদুলিল্লাহ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আমি ইনশাআল্লাহ আরেকটু পরিষ্কার করতে চেষ্টা করবো।

প্রথমে একটি সাদামাটা কথা বলে নিই। আরবিতে একটা কথা আছে الصحبة مؤثرة- 'সান্নিধ্য প্রভাব ফেলে থাকে'। আর স্বাভাবিক সকলেই জানে ভালোর সাথে চললে ভালো হয়, মন্দের সাথে চললে মন্দ। ইয়াহুদির ঘরে স্বাভাবিক ইয়াহুদিই জন্মায়, মুসলিমের ঘরে মুসলিম। ব্যতিক্রম হয় কম। **এর সত্যায়নে হাদিসও পরিষ্কার-**

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

"প্রতিটি সন্তানই ফিতরাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে। তারপর তার পিতা মাতা তাকে ইয়াহুদি বানায়, নাসারা বানায় বা মাজূসী বানায়।" –সহীহ বুখারি ১২৯২

সান্নিধ্যের জোর প্রভাব রয়েছে বলেই ইসলাম অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে সৎ সঙ্গ গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل –سنن ابي داود، قال الشيخ الأرنؤوط: إسناده حسن. اهـ

"ব্যক্তি তার বন্ধুর মত-পথকে গ্রহণ করে থাকে। তাই তোমাদের যেকেউ যেন দেখে নেয় যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" –সুনানে আবু দাউদ ৪৮৩৩

এ তো গেল মানসিক ও চারিত্রিক প্রভাবের কথা। সরাসরি রোগ সংক্রমণের ঈঙ্গিতও অনেক হাদিসে পাওয়া যায়। যেমন,

এক.

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

"অসুস্থ উটের মালিক যেন তার রোগাক্রান্ত উটগুলোকে নিয়ে গিয়ে (অন্য মালিকের) সুস্থ উটের সাথে মিশ্রিত না করে।" –সহীহ বুখারি ৫৪৩৭

এ নিষেধ কেন? বিভিন্ন মত আছে। একটা মত এও যে, রোগাক্রান্ত উটগুলোর সংস্পর্শে সুস্থগুলোতে জীবাণু ছড়িয়ে সেগুলোও রোগাক্রান্ত হতে পারে।

দুই.

فر من المجذوم كما تفر من الأسد

“সিংহ থেকে যেমন পলায়ন কর কুষ্ঠ রোগী থেকেও তেমনি পলায়ন করবে।” –সহীহ বুখারি ৫৩৮০

কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকতে বলা হলো কেন? একটা কারণ এও হতে পারে যে, এ রোগটি কংক্রামক। রোগীর সংস্পর্শে সুস্থ ব্যক্তিও আক্রান্ত হতে পারে।

তিন.

كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبى -صلى الله عليه وسلم- « إنا قد بايعناك فارجع »

“সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের মাঝে একজন কুষ্ঠ রোগী ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে লোক পাঠালেন, আমরা আপনাকে বাইয়াত করে নিয়েছি। আপনি ফিরে যান।” –সহীহ মুসলিম ৫৯৫৮

এখানেও এ ব্যাখ্যা আছে যে, তার থেকে অন্যদের সংক্রমণের আশঙ্কা ছিল বিধায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরে যেতে বলেছেন।

চার.

একটি জয়িফ হাদিসে এসেছে,

لا تديموا النظر إلى المجذومين

“কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না।” –সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫৪৩

এখানেও একই কথা যে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার দ্বারা সংক্রমণের আশঙ্কা আছে।

পাঁচ.

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

“কোনো ভূমিতে তাউন দেখা দিয়েছে শুনলে তাতে প্রবেশ করবে না। আর তোমরা কোনো ভূমিতে থাকাবস্থায় যদি সেখানে দেখা দেয় তাহলে সেখান থেকে বের হবে না।” –সহীহ বুখারি ৫৭২৮

এখানেও একই কথা যে, প্রবেশ করলে নিজে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর বের হয়ে গেলে সে যে জীবাণু বহন করে নিয়ে যাবে তার দ্বারা অন্যরা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ছয়.

অন্য একটি জয়িফ হাদিসে এসেছে,

فإن من القرف التلف

“القرف ধ্বংস ডেকে আনে।”- সুনানে আবু দাউদ ৩৯২৩

ইবনুল আসির রহ. (৬০৬হি.) القرف এর ব্যাখ্যায় বলেন,

ملابسة الداء ومداناة المرض. اهـ

"রোগ বালাই ও অসুখ বিসুখের সংস্পর্শে আসা।" –আননিহায়া ফি গারিবিল হাদিস ৪/৪৬

বুঝা গেল, রোগের সংস্পর্শে সংক্রমণ ঘটতে পারে।

তাহলে এখানে আমরা কয়েকটি বিয়ষ পেলাম,

- আক্রান্ত উট সুস্থ উটের সাথে মেশাতে নিষেধ করেছেন।
- কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।
- কুষ্ঠ রোগীকে মৌখিক বাইয়াত নিয়ে ফিরে যেতে বলেছেন।
- কুষ্ঠ রোগীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে নিষেধ করেছেন।
- তাউন মহামারির এলাকায় যেতে বা সেখান থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন।
- রোগ বালাইয়ের সংস্পর্শ ধ্বংস ডেকে আনতে পারে বলে সাবধান করেছেন।

উপরোক্ত সবগুলো হাদিস থেকে সংক্রমণ বুঝে আসে।

এর বিপরীতে কয়েকটি হাদিস রয়েছে যেগুলো

থেকে সংক্রমণ বলতে কিছু নেই বুঝে আসে। যেমন,

এক.

لا عدوى

“সংক্রমণ বলে কিছু নেই।” –সহীহ বুখারি ৫৪৩৮

দুই.

إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (لا عدوى) . فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب ؟ قال النبي صلى الله عليه و سلم (فمن أعدى الأول)

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সংক্রমণ বলতে কিছু নেই। তখন এক আ’রাবি-গ্রাম্য ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো, বলুন তো দেখি, বালু ময়দানে উটের পাল চড়তে থাকে, যেন সেগুলো হরিণের মতো (সুস্থ, সবল ও সতেজ)। তখন একটি পাঁচড়ায় আক্রান্ত উট আসে। ফলে বাকি উটগুলো আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে প্রথমটিকে কে আক্রান্ত করলো?” –সহীহ বুখারি ৫৪৩৯

তিন.

عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد مجذوم "فوضعها معه في القصعة، وقال: "كل، ثقة بالله وتوكلا عليه

“হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তির হাত ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা

খাবার ডিশে রাখলেন এবং বললেন, আল্লাহর উপর আস্থা রেখে এবং তার উপর ভরসা করে খাও।” –সুনানে আবু দাউদ ৩৯২৫

বাহ্যত বুঝা যায়, রাসূল সে ব্যক্তিকে নিয়ে খানা খেয়েছেন।

***

সামঞ্জস্য বিধান

বাহ্যত এসব হাদিসে তাআরুজ ও বিরোধ মনে হলেও আসলে বিরোধ নেই। যেসব হাদিসে সংক্রমণ বলতে কিছু নেই বলা হয়েছে সেগুলো দ্বারা জাহিলি যামানার একটি শিরকি আকিদা দূর করা উদ্দেশ্য।

আমরা জানি, জাহিলি যামানায় মানুষ গাইরুল্লাহর ইবাদাত করতো। চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, গাছপালা ইত্যাদির পূজা করতো। এগুলোকে শক্তির অধিকারী মনে করতো। বৃষ্টি হলে তারা বলতো, অমুক তারকা বৃষ্টি দিয়েছে। অর্থাৎ তারকাকে তারা বৃষ্টি দানের শক্তিমত্তার অধিকারী মনে করতো। এ কারণে বৃষ্টির জন্য তারকার পূজা করতো। এভাবে একেক বস্তুকে একেকটার জন্য পূজা করতো। যেমনটা বর্তমানে হিন্দুরা করে থাকে। একেক বিষয়ে তাদের একেক দেবতা।

এভাবে তাদের মা'বুদের সংখ্যা অসংখ্য।

সংক্রমণের ব্যাপারেও জাহিলি যামানাতে এমন ধারণা ছিল যে, রোগের একটা শক্তি রয়েছে। সে যে কারো শরীরে প্রবেশ করে তাকে আক্রান্ত করতে পারে। অন্যান্য দেবতাদের যেমন একটা শক্তি রয়েছে সম্ভবত রোগকেও তারা এমন একটা শক্তির অধিকারী বস্তু মনে করতো। আল্লাহ তাআলা চান বা না চান সে অন্যকে আক্রান্ত করতে পারে।

ইসলাম এ শিরকি আকিদাকেই খণ্ডন করেছে যে, তোমরা যে ধরনের সংক্রমণে বিশ্বাসী এমন কোন সংক্রমণ নেই। কোনো রোগের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া সে অন্যকে আক্রান্ত করবে। আমরা বাহ্যত যদিও দেখি যে, একজনের সংস্পর্শে আরেকজন আক্রান্ত হলো, কিন্তু আসলে এটা রোগের নিজস্ব ক্ষমতা নয়, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হয়েছে বলেই আক্রান্ত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা না চাইলে আক্রান্ত হতো না।

যেমন ধরুন, আগুন-পানি। আগুনের ধর্ম হলো, সে জ্বালিয়ে দেয়। কোনো বস্তু যখন আগুনের সংস্পর্শে আসে

তখন স্বাভাবিক এটাই যে, আগুন তাকে জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু এই জ্বালিয়ে দেওয়াটাও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া হতে পারে না। আল্লাহ আগুনকে জ্বালানোর অনুমতি দেন বলেই জ্বালাতে পারে, নতুবা পারতো না। এ কারণেই তো আগুন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে জ্বালাতে পারেনি। কারণ, অনুমতি ছিল না। পক্ষান্তরে অগ্নিপূজারিরা আগুনকে শক্তির অধিকারী মনে করে। তার পূজা করে তাকে সন্তুষ্ট করে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে চায়। ইসলাম এ ধারণাকেই খণ্ডন করেছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আগুনের জ্বালাবার ক্ষমতা নেই বা আগুনের সংস্পর্শে গেলেও জ্বলবে না। জ্বলে যাবে এটাই স্বাভাবিক। তবে আল্লাহর অনুমতিক্রমে।

পানির ক্ষেত্রেও একই কথা। এজন্যই মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলকে নিয়ে নিরাপদে পার হয়ে গেলেন আর ফিরাউন দলবলসহ ডুবে মরলো।

সংক্রমণ নেই হাদিসগুলোর এটাই উদ্দেশ্য।

আরেকটা দৃষ্টান্ত হাদিসে এসেছে। সূর্য পূজারিরা

সূর্যকে শক্তির অধিকারী মনে করে। তাই উদয় ও অস্তের সময় তার পূজা করে। হাদিসে এসেছে,

عن أبى ذر أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال يوما « أتدرون أين تذهب هذه الشمس ». قالوا الله ورسوله أعلم. قال « إن هذه تجرى حتى تنتهى إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعى ارجعى من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها

"আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি জানো এই সূর্য কোথায় যায়'? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ সূর্য চলতে থাকে। চলতে চলতে অবশেষে আরশের নিচে তার আপন অবস্থানে গিয়ে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে (এবং আগামী দিনের উদয়ের ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করে)। এভাবে সাজদায়ই পড়ে থাকে যতক্ষণ না তাকে বলা হয়, 'উঠ! যেদিক থেকে এসেছো সেদিকেই ফিরে যাও'। তখন সে ফিরে যায় এবং তার উদয়স্থল থেকে (স্বাভাবিক) উদয় হয়।" –সহীহ মুসলিম ৪১৯

কিয়ামতের আগে পশ্চিম দিক থেকে উদয় হতে আদেশ দেবেন। তখন পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে।

এখানে দেখার বিষয় হলো, সূর্য তো আমরা স্বাভাবিক দেখি যে, প্রতিদিন উদয় হয় আবার অস্ত যায়। কখনও মনে হয় না

যে, সে প্রতিদিনের উদয়ের জন্য আল্লাহর দরবারে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে অনুমতি চায়। অনুমতি হলে তখন উদিত হয়। উদয়-অস্ত একটি চিরন্তন রীতি। কোনো দিন তাতে কোনো ধরনের ব্যতিক্রম ঘটে না।

সূর্য পূজারিরা তো মনে করে সূর্যের নিজস্ব শক্তি আছে। সে শক্তিবলেই সে উদিত হয়। সারা জাহানকে আলোকিত করে। এজন্য তারা তার পূজা করে। ইসলাম এ ধারণাকেই খণ্ডন করেছে যে, এ নিত্য দিনের উদয় অস্তও আল্লাহর অনুমতিতেই হতে হয়।

রোগের বিষয়টাও এমনই। জাহিলি যামানার মানুষ রোগের ব্যাপারে যে শিরকি আকিদা পোষণ করতো ইসলাম সেটিই খণ্ডন করেছে। অন্যথায় রোগ সংক্রমিত হয় এটি তো বাস্তব দেখাশুনা বিষয়। ইসলাম এটি অস্বীকার করেনি। কিছু রোগ আল্লাহ তাআলা এমনভাবেই সৃষ্টি করেছেন যে, তার সংস্পর্শে আসলে স্বাভাবিক আক্রান্ত হবে। কিন্তু সেটি রোগের ক্ষমতায় নয়। সে সংক্রমণও হবে আল্লাহর অনুমতিতে।

সূর্যকে যেমন উদয়ের জন্য অনুমতি নিতে হয়, রোগকেও সংক্রমণের জন্য অনুমতি নিতে হয়। আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছা হলেই কেবল কোনো রোগ অন্যের মাঝে সংক্রমিত হবে। না

হলে হবে না। এ কারণেই তো দেখি অনেকে মেশার পরও আক্রান্ত হয় না। আবার অনেকে বাহ্যত কোনো কারণ ছাড়াই আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

যেহেতু কিছু কিছু রোগের বেলায় আক্রান্ত হওয়াটা স্বাভাবিক তাই ইসলাম এ ধরনের রোগীর সাথে মিশতে বা আক্রান্ত এলাকায় যেতে না করেছে। কারণ, ইচ্ছা করে নিজের উপর বিপদ টেনে আনা ঠিক নয়। তদ্রূপ আক্রান্ত ব্যক্তিকেও সুস্থ ব্যক্তি বা সুস্থদের এলাকায় যেতে নিষেধ করেছে যাতে তার দ্বারা অন্যরা সংক্রমিত না হয়। বরং সবর করে থাকতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

এর দৃষ্টান্ত হলো এ হাদিস,

لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا–

صحيح البخاري، رقم: 2861، ط. دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت

“শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত থাকার দোয়া কর। তবে মুখোমুখী যখন হয়েই পড়বে, ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করবে।”- সহীহ বুখারি ২৮৬১

তদ্রূপ নিজ হাতে রোগ ডেকে আনা ঠিক নয়। কারণ, এসে পড়লে তখন সবর করতে পারবে কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে

এসেই যদি পড়ে তখন সবর করে থাকা। আল্লাহ তাআলার ফায়াসালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। তার দ্বারা যেন অন্য কেউ সংক্রমিত না হয় সে দিকটিও লক্ষ রাখা।

মোটকথা, সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। রোগের সংক্রমণও আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। আগুনের ধর্ম যেমন জ্বালানো, পানির ধর্ম যেমন ডুবানো- কিছু কিছু রোগের ধর্মও তেমনি সংক্রমণ। আগুন পানি থেকে যেমন দূরে থাকার নির্দেশ; সেসব রোগ, রোগী ও এলাকা থেকেও দূরে থাকার নির্দেশ। অতএব, উভয় ধরনের হাদিসে কোনো বিরোধ নেই।

ইমাম বায়হাকি রহ. (৪৫৮হি.) বলেন,

ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا عدوى»، وإنما أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل، وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يورد ممرض على مصح»، وقال في الطاعون: «من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه»، وغير

معرفة السنن –ذلك مما في معناه، وكل ذلك بتقدير الله عز وجل - والآثار 10\189، ط. جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي باكستان)، دار قتيبة (دمشق -بيروت)، دار الوعي (حلب - (المنصورة - القاهرة)دمشق)، دار الوفاء

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেছেন, 'সংক্রমণ বলে কিছু নেই।' তবে এর দ্বারা জাহিলি যামানার মানুষেরা যে আকিদা পোষণ করতে যে, সংক্রমণটা গাইরুল্লাহর শক্তিতে হয় সেটি খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। নতুবা আল্লাহ তাআলা তার আপন ইচ্ছায় কখনও কখনও এ ধরনের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সুস্থ ব্যক্তির সংমিশ্রণটাকে তার মধ্যেও রোগ সৃষ্টি হওয়ার সবব ও কারণ বানিয়ে দেন। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'অসুস্থ উটের মালিক যেন তার রোগাক্রান্ত উটগুলোকে নিয়ে গিয়ে (অন্য মালিকের) সুস্থ উটের সাথে মিশ্রিত না করে।'

তাউন মহামারির ব্যাপারে বলেছেন, 'কোনো অঞ্চলে দেখা দিয়েছে শুনলে সে যেন সেখানে না যায়।'

এছাড়াও এ জাতীয় অন্যান্য হাদিসের একই উদ্দেশ্য। সবগুলো আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর নির্ধারিত তাকদির অনুযায়ীই হয়ে থাকে।" –মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার- বায়হাকি রহ.

১০/১৮৯, ফাতহুল বারি- ইবনে হাজার রহ. ১০/১৬১

ইবনে দাকিকুল ঈদ রহ. (৭০২হি.) বলেন,

الذي يترجح عندي في الجمع بينهما أن في الإقدام عليه تعريض النفس للبلاء ولعلها لا تصبر عليه وربما كان فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر أو التوكل فمنع ذلك حذرا من اغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند الاختبار وأما الفرار فقد يكون داخلا في التوغل في الأسباب بصورة من يحاول النجاة بما قدر عليه فأمرنا الشارع بترك التكلف في الحالتين ومن هذه المادة قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا فأمر بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء وخوف اغترار النفس إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله تعالى-نقلا عن فتح الباري لابن حجر 190\10

"উভয় ধরনের হাদিসের সমন্বয়ে আমার কাছে রাজেহ মনে হয় যে, আক্রান্ত ভূমিতে যাওয়ার অর্থ নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করা। পরে এমনও হতে পারে যে, সে সবর করতে পারবে না। অধিকন্তু এখানে এক ধরনের সবর ও তাওয়াক্কুলের মাকামের দাবিও যেন হচ্ছে। তাই এ থেকে বারণ করা হচ্ছে। যেন নফসকে ধোঁকায় না পড়ে এবং এমন দাবিও যেন না করে, পরীক্ষার সময় যে দাবি টিকবে না।

আর আক্রান্ত ভূমি থেকে ভেগে যাওয়ার (নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে

কথা হলো) এটি অনেকটা আসবাব গ্রহণ করার মাধ্যমে তাকদির থেকে পলায়ন করার চেষ্টার নামান্তর। শরীয়ত উভয় অবস্থাতেই মাত্রাতিরিক্ত চেষ্টা-তদবির ছেড়া দেয়ার আদেশ দিয়েছে।

ঠিক এ ধরনের আরেকটি বিষয় হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

‘শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করো না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত থাকার দোয়া কর। তবে মুখোমুখী যখন হয়েই পড়বে, ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করবে’।

মুখোমুখী হওয়ার কামনা ছেড়ে দিতে আদেশ করা হয়েছে। কেননা, এখানে নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করা হচ্ছে অথচ নফসের ধোঁকার আশঙ্কা আছে। কেননা, সম্মুখীন হয়ে গেলে নফস গাদ্দারি করবে না তা নিশ্চিত নয়। তবে এরপর সম্মুখীন হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলার ফায়সালা নত শিরে মেনে নিয়ে সবর করে থাকার আদেশ দিয়েছেন।” –ফাতহুল বারি- ইবনে হাজার রহ. ১০/১৯০

***

করোনা মহামারি ০১. সংক্রামক ব্যাধি- ০২

গত পর্বে আমরা রোগের সংক্রমণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমরা দেখেছি যে, সংক্রমণ ইসলামী আকীদার পরিপন্থী নয়। আর ইসলাম যে সংক্রমণ অস্বীকার করেছে সেটা হলো জাহিলি আকিদার সংক্রমণ, যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই রোগ বিস্তারের শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। ইসলাম এটি অস্বীকার করেছে। ইসলামের আকীদা হলো, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই হতে পারে না। রোগের সংক্রমণও আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে।

সংক্রমণ নিয়ে ইনশাআল্লাহ এ পর্বে আরেকটু আলোচনা করবো। এ প্রসঙ্গে আমরা আজ দু'টি হাদিস নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

হাদিস ০১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل

“সাপ মেরে ফেলবে। বিশেষত পিঠে শুভ্র দুই রেখাবিশিষ্ট সাপ এবং লেজকাটা সাপ মেরে ফেলবে। কেননা, এ দু’টি দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভপাত করে দেয়।” –সহীহ বুখারি ৩১২৩

এ দু’টি সাপ এমনই বিষাক্ত যে, এদের দিকে তাকালে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং অনেক সময় গর্ভবতী মহিলার গর্ভস্থ বাচ্চা তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

দেখার বিষয় যে, সাপে কামড় দেয়নি। দূরে থেকে শুধু তাকিয়েছে। এতেই এমন প্রভাব পড়েছে যে, চোখ অন্ধ হয়ে গেছে এবং গর্ভপাত হয়ে গেছে।

হাদিস ০২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

العين حق

“চোখ লাগা বাস্তব ও সত্য।” –সহীহ বুখারি ৫৪০৮

কিছু মানুষ এমন আছে যে, এরা যদি কোনো সুন্দর ব্যক্তি বা জিনিসের দিকে তাকায় তাহলে নজর লেগে যায়। নজর লাগা ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এমনকি কোনো কোনো সময় মারাও যায়।

দেখার বিষয়, ব্যক্তি কিন্তু তাকে কিছু করেনি। তাকিয়েছে শুধু। ব্যস, এতটুকুই।

সাপ এবং চোখের যে তা’ছির যা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং বাস্তবতাও এর সাক্ষী- এটি দুইভাবের কোনো একভাবে হতে পারে,

১. হয়তো সাপ বা ব্যক্তির চোখ থেকে কোনো বিষ বেড়িয়ে গিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর পড়েছে;
২. কিংবা কোনো কিছুই বেড়োয়নি, তাকানোর দ্বারাই আল্লাহ তাআলা তার মাঝে রোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২হি.) বলেন,

التأثير بإرادة الله تعالى وخلقه ليس مقصورا على الاتصال الجسماني بل يكون تارة به وتارة بالمقابلة وأخرى بمجرد الرؤية
–فتح الباري 201\10

“তা’ছির হয়ে থাকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়। তা শুধু শারীরিক সংস্পর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কখনও এভাবেও হতে পারে আবার কখনও মুখোমুখী হওয়া এবং কখনও শুধু তাকানোর দ্বারাও হতে পারে।” –ফাতহুল বারি ১০/২০১

বুঝা গেল, একজন দ্বারা আরেকজনে আক্রান্ত হওয়ার জন্য শারীরিক সংস্পর্শও অনেক সময় দরকার পড়ে না। অনেক সময় শুধু সামনা সামনি হওয়া এবং অনেক সময় শুধু তাকানোর দ্বারাই হয়ে যেতে পারে। ইবনে হাজার রহ. বিষয়টি আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। বিস্তারিত সেখানে দেখা যেতে পারে।

আমাদের গত পর্বে এ হাদিসটি গিয়েছে,

لا تديموا النظر إلى المجذومين

"কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না।" –সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫৪৩

তাদের দিকে এক নজরে তাকিয়ে থাকাও আক্রান্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। তবে সকল রোগই যে তাকানোর দ্বারা বা সংস্পর্শের দ্বারা সংক্রমিত হয় তা না। কিছু কিছু রোগে এমন হতে পারে।

যাহোক, সব মিলিয়ে বুঝা গেল, একজনের সংস্পর্শে, চলাফেরায় ও উঠা-বসায় আরেকজন আক্রান্ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটি ইসলামী আকিদার পরিপন্থী নয়, যখন আমার বিশ্বাস থাকবে যে, এ আক্রান্ত হওয়াও আল্লাহর

ইচ্ছায়। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে হবে না। যাদের বেলায় হচ্ছে না তাদের বেলায় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা নেই। ওয়াল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।

***

করোনা মহামারি ০২. প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা- ০১

গত দুই পর্বে আমরা আলহামদুলিল্লাহ সংক্রমণ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, কিছু কিছু রোগ এমন আছে যেগুলো আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় সাধারণত একজন থেকে অন্য জনের মাঝে ছড়িয়ে থাকে।

যখন ছড়িয়ে থাকে তখন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা শরীয়ত বিরোধী হবে না। সাধ্যমতো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও যদি ছড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআলার ফায়সালা মেনে নিয়ে সবর করে থাকা। বেসবর না হওয়া। হা হুতাশ না করা।

এতে আল্লাহ তাআলার কাছে অশেষ সওয়াব পাওয়া যাবে। কোনো মুমিনকে আল্লাহ তাআলা বিপদাপদ দেন তার দারাজাত বুলন্দ করার জন্য। মুমিন যখন বিপদে সবর করে তখন তার গুনাহ মাফ হয় এবং দারাজাত বুলন্দ হয়।

আমরা যদি হাদিসগুলো লক্ষ করি দেখবো যে, শরীয়ত চতুর্দিক থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থার নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে-

আক্রান্ত উটের পালকে সুস্থ উটের পালের সাথে মিশাতে না করেছেন।

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

"অসুস্থ উটের মালিক যেন তার রোগাক্রান্ত উটগুলোকে নিয়ে গিয়ে (অন্য মালিকের) সুস্থ উটের সাথে মিশ্রিত না করে।" – সহীহ বুখারি ৫৪৩৭

সংক্রমণ রোগে উটেরই যখন এ বিধান তখন মানুষের বেলায় এমনটা হওয়া তো আরো স্বাভাবিক। অতএব, সংক্রমণ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থদের সাথে মিশতে যাবে না। এ কারণেই উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু জুযাম তথা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে জনসমাগমে মিশতে নিষেধ করেছিলেন। (ফাতহুল বারি ১০/২০৫, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬৪)

সুস্থ ব্যক্তিকে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেও মানা করেছেন।

فر من المجذوم كما تفر من الأسد

"সিংহ থেকে যেমন পলায়ন কর কুষ্ঠ রোগী থেকেও তেমনি পলায়ন করবে।" –সহীহ বুখারি ৫৩৮০

لا تديموا النظر إلى المجذومين

"কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না।" –সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫৪৩

এ ধরনের নির্দেশ শুধু কুষ্ঠ রোগের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, সকল সংক্রমণ রোগের বেলায়ই এ ধরনের বিধান প্রযোজ্য।

আক্রান্ত এলাকায় যেতে নিষেধ করেছেন এবং আক্রান্ত এলাকা থেকে বের হতেও নিষেধ করেছেন।

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

“কোনো ভূমিতে তাউন দেখা দিয়েছে শুনলে তাতে প্রবেশ করবে না। আর তোমরা কোনো ভূমিতে থাকাবস্থায় যদি সেখানে দেখা দেয় তাহলে সেখান থেকে বের হবে না।” – সহীহ বুখারি ৫৭২৮

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে সংক্রমণ রোগের বেলায় আমরা চতুর্দিক থেকেই প্রতিরোধ ব্যবস্থার নির্দেশনা পেলাম-
এক. আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির সাথে মিশবে না।
দুই. সুস্থ ব্যক্তিও আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মিশবে না।
তিন. আক্রান্ত এলাকায় কেউ যাবে না।
চার. আক্রান্ত এলাকার কোন লোকও বাহিরে বের হবে না।

এভাবে এলাকা থেকে এলাকায় বা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে রোগ সংক্রমিত হওয়ার সকল পথ ইসলাম বন্ধ করে দিয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যত সিস্টেমই বের করুক- ইসলামের এ নির্দেশনার বাহিরে যেতে পারবে না। এর চেয়ে সুন্দর কোনো ব্যবস্থাও ইনশাআল্লাহ গ্রহণ করতে পারবে না।

এলাকা থেকে এলাকায় যেন না ছড়ায় এজন্য **লক ডাউন** করা

হয়েছে- এর ধারণা সর্বপ্রথম ইসলামই দিয়েছে।

ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে যেন না ছড়ায় এজন্য **কোয়ারেনটাইনে**র ব্যবস্থা করা হয়েছে- এ ধারণাও ইসলামের নির্দেশনার বাহিরে না।

এছাড়া হাত ধোয়া, পরিষ্কার থাকা, হাঁচির সময় সতর্ক থাকা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও নিয়মকানুন ইসলামের নিত্যদিনের শিক্ষা।

আজ পত্রিকার পাতা খুললেই আপনি চীনের প্রশংসা দেখতে পাবেন। কিভাবে তারা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগের সংক্রমণ কমিয়ে এনেছে- এ নিয়ে চীনাদের প্রশংসার শেষ নেই। কিন্তু নিমুকহারাম এসব সাংবাদিক কলামিস্টদের যবানে ইসলামের প্রশংসা একবারও বের হয় না। কিন্তু আমরা যারা মুসলমান আমরা যেন আমাদের ধর্ম নিয়ে হীনমন্যতার শিকার না হই।

বি.দ্র.

ব্যবস্থা যতই গ্রহণ করা হোক রোগ দেয়া নেয়ার মালিক আল্লাহ। তিনি যতক্ষণ না চাইবেন রোগ যাবে না। এজন্য ব্যবস্থা যতই গ্রহণ করা হচ্ছে আক্রান্ত হওয়া বন্ধ হচ্ছে না। মৃত্যুও বন্ধ হচ্ছে না। আল্লাহ তাআলার যতটুকু ইচ্ছা ততটুকুতে না পৌঁছা পর্যন্ত কেউ থামাতে পারবে না। অতএব, সকলের উচিৎ তাওবা করে আল্লাহ তাআলা দিকে রুজু হওয়া। দোয়া করা। আর সাধ্যমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আক্রান্ত হয়ে গেলে সওয়াবের নিয়তে সবর করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের হিফাজত করুন। সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

(চলমান)

করোনা মহামারি ০২. প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা- ০২

গত দুই পর্বে আমরা আলহামদুলিল্লাহ সংক্রমণ নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, কিছু কিছু রোগ এমন আছে যেগুলো আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় সাধারণত একজন থেকে অন্য জনের মাঝে ছড়িয়ে থাকে।

যখন ছড়িয়ে থাকে তখন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা শরীয়ত বিরোধী হবে না। সাধ্যমতো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও যদি ছড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআলার ফায়সালা মেনে নিয়ে সবর করে থাকা। বেসবর না হওয়া। হা হুতাশ না করা। এতে আল্লাহ তাআলার কাছে অশেষ সওয়াব পাওয়া যাবে। কোনো মুমিনকে আল্লাহ তাআলা বিপদাপদ দেন তার দারাজাত বুলন্দ করার জন্য। মুমিন যখন বিপদে সবর করে তখন তার গুনাহ মাফ হয় এবং দারাজাত বুলন্দ হয়।

আমরা যদি হাদিসগুলো লক্ষ করি দেখবো যে, শরীয়ত চতুর্দিক থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থার নেয়ার নির্দেশ দিয়েছে-

আক্রান্ত উটের পালকে সুস্থ উটের পালের সাথে মিশাতে না করেছেন।

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

"অসুস্থ উটের মালিক যেন তার রোগাক্রান্ত উটগুলোকে নিয়ে গিয়ে (অন্য মালিকের) সুস্থ উটের সাথে মিশ্রিত না করে।" – সহীহ বুখারি ৫৪৩৭

সংক্রমণ রোগে উটেরই যখন এ বিধান তখন মানুষের বেলায় এমনটা হওয়া তো আরো স্বাভাবিক। অতএব, সংক্রমণ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থদের সাথে মিশতে যাবে না। এ কারণেই উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু জুযাম তথা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে জনসমাগমে মিশতে নিষেধ করেছিলেন। (ফাতহুল বারি ১০/২০৫, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬৪)

সুস্থ ব্যক্তিকে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, এমনকি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেও মানা করেছেন।

فر من المجذوم كما تفر من الأسد

"সিংহ থেকে যেমন পলায়ন কর কুষ্ঠ রোগী থেকেও তেমনি পলায়ন করবে।" –সহীহ বুখারি ৫৩৮০

لا تديموا النظر إلى المجذومين

“কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে না।” –সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫৪৩

এ ধরনের নির্দেশ শুধু কুষ্ঠ রোগের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, সকল সংক্রমণ রোগের বেলায়ই এ ধরনের বিধান প্রযোজ্য।

আক্রান্ত এলাকায় যেতে নিষেধ করেছেন এবং আক্রান্ত এলাকা থেকে বের হতেও নিষেধ করেছেন।

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

“কোনো ভূমিতে তাউন দেখা দিয়েছে শুনলে তাতে প্রবেশ করবে না। আর তোমরা কোনো ভূমিতে থাকাবস্থায় যদি সেখানে দেখা দেয় তাহলে সেখান থেকে বের হবে না।” – সহীহ বুখারি ৫৭২৮

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে সংক্রমণ রোগের বেলায় আমরা চতুর্দিক থেকেই প্রতিরোধ ব্যবস্থার নির্দেশনা পেলাম-

এক. আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির সাথে মিশবে না।

দুই. সুস্থ ব্যক্তিও আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মিশবে না।

তিন. আক্রান্ত এলাকায় কেউ যাবে না।
চার. আক্রান্ত এলাকার কোন লোকও বাহিরে বের হবে না।

এভাবে এলাকা থেকে এলাকায় বা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে রোগ সংক্রমিত হওয়ার সকল পথ ইসলাম বন্ধ করে দিয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান যত সিস্টেমই বের করুক- ইসলামের এ নির্দেশনার বাহিরে যেতে পারবে না। এর চেয়ে সুন্দর কোনো ব্যবস্থাও ইনশাআল্লাহ গ্রহণ করতে পারবে না।

এলাকা থেকে এলাকায় যেন না ছড়ায় এজন্য **লক ডাউন** করা হয়েছে- এর ধারণা সর্বপ্রথম ইসলামই দিয়েছে।

ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে যেন না ছড়ায় এজন্য **কোয়ারেনটাইনে**র ব্যবস্থা করা হয়েছে- এ ধারণাও ইসলামের নির্দেশনার বাহিরে না।

এছাড়া হাত ধোয়া, পরিষ্কার থাকা, হাঁচির সময় সতর্ক থাকা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও নিয়মকানুন ইসলামের নিত্যদিনের শিক্ষা।

আজ পত্রিকার পাতা খুললেই আপনি চীনের প্রশংসা দেখতে পাবেন। কিভাবে তারা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগের সংক্রমণ কমিয়ে এনেছে- এ নিয়ে চীনাদের প্রশংসার শেষ নেই। কিন্তু নিমুকহারাম এসব সাংবাদিক কলামিস্টদের যবানে ইসলামের প্রশংসা একবারও বের হয় না। কিন্তু আমরা যারা মুসলমান আমরা যেন আমাদের ধর্ম নিয়ে হীনমন্যতার শিকার না হই।

বি.দ্র.
ব্যবস্থা যতই গ্রহণ করা হোক রোগ দেয়া নেয়ার মালিক আল্লাহ। তিনি যতক্ষণ না চাইবেন রোগ যাবে না। এজন্য ব্যবস্থা যতই গ্রহণ করা হচ্ছে আক্রান্ত হওয়া বন্ধ হচ্ছে না। মৃত্যুও বন্ধ হচ্ছে না। আল্লাহ তাআলার যতটুকু ইচ্ছা ততটুকুতে না পৌঁছা পর্যন্ত কেউ থামাতে পারবে না। অতএব, সকলের উচিৎ তাওবা করে আল্লাহ তাআলা দিকে রুজু হওয়া। দোয়া করা। আর সাধ্যমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আক্রান্ত হয়ে গেলে সওয়াবের নিয়তে সবর করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের

হিফাজত করুন। সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ফায়সালা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

(চলমান)

সংশয় নিরসন- ০২, খ. গুপ্ত হত্যা- কুরআনে কারীম

গত পর্বে আমরা ইসলামে গোপনীয়তা এবং সামরিক কাজে গোপনীয়তার আবশ্যকতা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। এ পর্বে ইনশাআল্লাহ আমরা গুপ্ত হত্যার শরয়ী দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা করবো।

গুপ্ত হত্যার বিষয়টি মুসলমানদের নিকট সুবিদিত ছিল। আজকাল মুহিউস সুন্নাহ নামধারী কিছু যিন্দিকমার্কা আলেম এতে সন্দেহের বীজ বপনের পায়তারা চালিয়েছে। বুঝে না বুঝে অনেক মুসলমান ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছে যে- ইসলাম যা করে তো প্রকাশ্যে করে; কাউকে হত্যা করতে হলে প্রকাশ্যে করবে, গোপনে কেন? অথচ গুপ্ত হত্যা কুরআনে কারীমের

নির্দেশ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও সাহাবায়ে কেরামের ত্বরীক। বরং দুনিয়ার স্বাভাবিক যুদ্ধনীতিই এমন যে, বড় বড় ও নেতৃত্বস্থানীয়; যাদের সচরাচর যুদ্ধের ময়দানে পাওয়া যায় না বা হত্যা করা সম্ভব হয় না, তাদেরকে গোপনে হত্যা করা হয়। যেসব দরবারি আলেম মুজাহিদদের গুপ্ত হত্যার উপর আপত্তি করে, তারা কিন্তু কাফের, মুরতাদ ও তাগুতরা যখন গুপ্ত হত্যা বা গ্রেফতার করে, তখন আপত্তি করে না। মনে হয় যেন, তাদের জীবনের টার্গেটই হচ্ছে দ্বীনের মুজাহিদগণের উপর আক্রমণ, তাদের বিভ্রান্ত প্রমাণ করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় উম্মাহকে জিহাদ থেকে ফিরানো।

যাহোক, কুরআন-সুন্নাহয় গুপ্ত হত্যা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত। আমরা ইনশাআল্লাহ কুরআন সুন্নাহ থেকে দলীল পেশ করবো।

কুরআনে কারীমের দলীল দুইভাবে:

ক. আম দলীল;

খ. খাস দলীল।

সুন্নাহ থেকে আমরা চারটি ঘটনা পেশ করবো:

ক. ইয়াহুদি কা'ব বিন আশরাফের গুপ্ত হত্যা;

খ. ইয়াহুদি আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হুকাইকের গুপ্ত হত্যা;

গ. মুশরিক খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালির গুপ্ত হত্যা;

ঘ. আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু কতৃক মক্কার মুশরিকদের গুপ্ত হত্যা।

***

কুরআনে কারীমে গুপ্ত হত্যা

কুরআনে কারীমে গুপ্ত হত্যার দুই ধরণের নির্দেশনা বিদ্যমান: ক. আম; খ. খাস।

আম দলীল

আম দলীল দ্বারা ঐসব আয়াত উদ্দেশ্য, যেগুলোতে কাফেরদের হত্যার নিঃশর্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ - البقرة 191

"**তোমরা যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে।** যেসব স্থান হতে তারা তোমাদের বহিষ্কার করে দিয়েছে, তোমারাও তাদের সেসব স্থান হতে বের করে দাও। (জেনে রেখো) ফিতনা (দাঙ্গা হাঙ্গামা ও) হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। (লড়াই করার ব্যাপারে আরেকটি কথা মনে রাখবে) মসজিদে হারামের আশেপাশে তোমরা কখনও তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। অবশ্য তারা নিজেরাই যদি সেখানে তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তাহলে (প্রতিরোধের জন্য) তোমরাও লড়াই কর। এটাই হচ্ছে কাফেরদের যথাযথ শাস্তি।"- বাকারা ১৯১

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন-

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন **তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর** এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে (ওঁৎপেতে) বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়- তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'- তাওবা: ৫

এ ধরণের যত আয়াতে কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল ও হত্যার নিঃশর্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সবগুলো গুপ্ত হত্যার দলীল। কেননা, আল্লাহ তাআলা নিঃশর্তভাবে হত্যার অনুমতি দিয়েছেন। প্রকাশ্যে করা যাবে, গোপনে যাবে না- এমন কোন শর্ত করা হয়নি। অতএব, গোপনে-প্রকাশ্যে যেভাবেই সম্ভব হত্যা করা যাবে।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন,

فإنه أمر بقتل المشركين إذا ظفرنا بهم وهي عامة في قتال سائر المشركين من قاتلنا منهم ومن لم يقاتلنا. اهـ أحكام القرآن 1\321

"এ আয়াতে আদেশ দেয়া হচ্ছে, যখনই বাগে পাওয়া যায়- কাফেরদের হত্যা করে দিতে। আমাদের বিরুদ্ধে কিতাল করুক বা না করুক- সকল কাফেরের বেলায়ই আয়াতের কিতালের নির্দেশ প্রযোজ্য।"- আহকামুল কুরআন ১/৩২১

খাস দলীল

উল্লিখিত দ্বিতীয় আয়াতের দ্বিতীয় অংশ গুপ্ত হত্যার খাস দলীল। সেখানে আদেশ দেয়া হয়েছে, **وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ- 'তাদের জন্য প্রতিটি ঘাটিতে (ওঁৎপেতে) বসে থাক'।** আল্লাহ তাআলা কাফেরদের হত্যা ও বন্দী করার জন্য ওঁৎপেতে বসে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যখনই বাগে পাওয়া যাবে, পাকড়াও করে বন্দী বা হত্যা করা হবে। এর নামই গুপ্ত হত্যা।

কাযি ইবনে আরাবী রহ. (৫৪৩ হি.) বলেন,

واقعدوا لهم كل مرصد- قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة أ.هـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী ‘তাদের জন্য প্রতিটি ঘাটিতে (ওঁৎপেতে) বসে থাক’; আমাদের আইম্মায়ে কেরাম বলেন, এ আয়াত দলীল যে, (যেসব কাফেরের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে) তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার আগেই গুপ্ত হত্যা করা বৈধ।”- আহকামুল কুরআন: ৪/২০৮

***

সংশয় নিরসন- ০২, খ. গুপ্ত হত্যা- হাদিস ১. কা’ব বিন আশরাফের ঘটনা

কা’ব বিন আশরাফ মদীনায় ইয়াহুদিদের সর্দার ছিল। সে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। বদর যুদ্ধের পর চুক্তি ভঙ্গ করে। মক্কায় গমন করে মুশরিকদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উস্কে দেয়। সে বড় কবি ছিল। কবিতা দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

নিয়ে কটুক্তি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গোপনে হত্যা করে দেয়ার জন্য হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে পাঁচজন সাহাবিকে পাঠান। তারা হলেন,

১. মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (কা'ব বিন আশরাফের ভাগিনা)।
২. আবু নায়িলা (কা'ব বিন আশরাফের দুধ ভাই)।
৩. আব্বাদ ইবনে বিশর।
৪. আবু আবস ইবনে জাবর।
৫. আলহারিস ইবনে মুআজ- রাদিয়াল্লাহু আনহুম। **[দেখুন: ফাতহুল বারি ৭/৪১১, কিতাবুল মাগাজি, বাব: কতলু কা'ব ইবনিল আশরাফ]**

ইমাম বুখারি রহ. (২৫৬ হি.) কিতাবুল মাগাজিতে কা'ব ইবনে আশরাফের গুপ্ত হত্যার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله»، فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله،

أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم»، قال: فأذن لي أن أقول شيئا، قال: «قل»، فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألَنا صدقة، وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلفك، قال: وأيضا والله لتملنه، قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين ... فقال: نعم، أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم، قالوا: :ارهنوني، قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهنك أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو يعني :وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة - قال سفيان السلاح - فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة، وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة، أسمع صوتا كأنه يقطر :وأخي أبو نائلة، وقال غير عمرو، قالت منه الدم، قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، قال: ويُدخل محمد بن مسلمة معه رجلين ... فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه، فدونكم فاضربوه، وقال مرة: ثم أشمكم، فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيت كاليوم ريحا، أي أطيب ... فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم، فشمه ثم أشم أصحابه، ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم، فلما

استمكن منه، قال: دونكم، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه (صحيح البخاري: 4037)

“জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে আছ যে কা’ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করতে পারো? সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দিয়েছে’। সাহাবি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি চান, আমি তাকে হত্যা করি? বললেন, হাঁ; চাই। ইবনে মাসলামা আরজ করলেন, তাহলে আমাকে আপনার সমালোচনামূলক কিছু বলার অনুমতি দিন। বললেন, ঠিক আছে অনুমতি দেওয়া হলো।...

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা কা’বের কাছে গেলেন। বললেন, এই মুহাম্মাদ লোকটা আমাদের কাছে দান দক্ষিণা চায়, সে আমাদেরকে বড় কষ্টে ফেলে দিল! তোমার কাছে এসেছি কিছু ঋণের জন্য। (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার এসব কথায় সুযোগ পেয়ে) কা’ব বলে উঠল, মাত্র তো শুরু! আল্লাহর কসম! তার প্রতি তোমরা অতিষ্ঠ হয়ে যাবে!

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বলেলেন, তা ঠিক! তবে যেহেতু তাকে মেনেই ফেলেছি, তাই এখনই মনে হয় তার সঙ্গ ত্যাগ করা ঠিক হবে না। শেষটা কোনদিকে গড়ায়, একটু দেখা দরকার। যা হোক, তো তুমি আমাকে কিছু খাবার ধার দাও। এই ধরো দু'-এক 'ওয়াসাক' হলেই চলবে।...

ঠিক আছে, তাহলে কিছু একটা বন্ধক রাখ আমার কাছে ।

কী চাও তুমি?

তোমাদের নারীদের বন্ধক রাখ।

কী যে বলো, এটা কী করে সম্ভব! তুমি হলে আরবের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ! (তোমাকে ছেড়ে আমাদের মহিলারা আর যেতে চাইবে না।)

আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের ছেলেদের বন্ধক রাখ।

না, সেটাই বা কীভাবে করি! ভবিষ্যতে লোকে আমাদের ছেলেদের গালি দিয়ে বলবে, তোমাকে তো এক দুই ওয়াসাক খাবারের জন্য বন্ধক রাখা হয়েছিল! এটা আমাদের জন্য খুব লজ্জার বিষয়। তার চেয়ে বরং আমরা তোমার কাছে কিছু অস্ত্র বন্ধক রাখি। (অস্ত্রের কথা বলেছেন, যাতে হত্যার সময় অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে কোন আপত্তি না হয়।)

ঠিক আছে, তা-ই কর।

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু অস্ত্র নিয়ে আসার

ওয়াদা করে চলে গেলেন।...

ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু অঙ্গিকারমতো কা'বের কাছে এলেন। রাতের বেলা। তার সাথে আসলেন কা'বের দুধ ভাই আবু নায়িলা। (এ ছাড়াও আরো তিনজন সহ মোট পাঁচজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বাকিউল গারকাদ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে রাতে নামায ও দোয়ায় লিপ্ত থাকেন।)

ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বাসায় এসে কা'বকে ডাক দিলেন এবং দূর্গে আসতে আহ্বান করলেন। ডাক শুনে কা'ব নেমে এল। (কা'ব তখন মাত্র বিয়ে করেছে)। স্ত্রী আপত্তি করল, এই অসময়ে কোথায় যাচ্ছ তুমি?
কা'ব বলল, এই তো, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নায়িলা এসেছে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, স্ত্রী বলল, আমার তো মনে হচ্ছে আমি রক্তঝরা আওয়াজ শুনছি। কা'ব বলল, আরে সে তো আমারই ভাই মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা এবং আমার দুধভাই আবু

নায়িলা! সম্ভ্রান্ত পুরুষ রাতের বর্শা লড়াইয়ে ডাক পড়লেও সাড়া দিতে ভয় করে না।

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা তার সঙ্গে আরো দু'জন লোক নিয়ে এসেছেন। তদের বলে রাখলেন, কা'ব আসলে আমি তার চুলে ধরে সুগন্ধি গ্রহণ করব। যখন দেখবে, মাথাটা শক্ত করে ধরেছি, এক আঘাতে মাথাটা গর্দান থেকে আলাদা করে ফেলবে। কা'ব একটি চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে আসল। তার শরীর থেকে খুশবু ছড়াচ্ছে। মুহাম্মাদ বললেন, এত চমৎকার সুগন্ধ তো আর কখনো পাইনি! আমি কি তোমার এই সুঘ্রাণ নিতে পারি? কা'ব বলল, হাঁ, 'অবশ্যই পারো'। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা কা'বের চুল ধরে গন্ধ শোঁকলেন। তারপর সঙ্গীদেরও শোঁকালেন। কিছুক্ষণ পর মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা আবার গন্ধ শোঁকার অনুমতি চাইলেন। কা'ব আবারও অনুমতি দিল। এবার তিনি সুযোগ মতো কা'বের মাথাটা ঝাপটে ধরে সঙ্গীদের ইশারা করলেন- দাও কোপ। এভাবে তারা তাকে হত্যা করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (অভিযান সফল হবার) সুসংবাদ দিলেন।" **-সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৪০৩৭, বাব: কতলু কা'ব ইবনিল আশরাফ**

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম তার মাথা কেটে নিয়ে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিক্ষেপ করেন।

বর্ণনায় এসেছে, আঘাত খেয়ে কা'ব বিন আশরাফ চিৎকার দিয়ে উঠে। চিৎকার শুনে ইয়াহুদিরা জমায়েত হয়ে যায় এবং সাহাবায়ে কেরামের পশ্চাদ্ধাবন করে। তবে ভিন্ন পথে রওয়ানা হওয়ায় তারা সাহাবায়ে কেরামকে পায়নি।

পরের দিন সকাল বেলা ইয়াহুদিরা ভীত-সন্ত্রস্ত্র অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নালিশ করে যে, আমাদের সর্দার গতরাত গুপ্ত হত্যার শিকার হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কা'বের অপরাধগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এতে ইয়াহুদিরা ভয় পেয়ে যায়। আর কিছু বলার সাহস পায়নি। [দেখুন: ফাতহুল বারি, কিতাবুল মাগাজি, বাব: কতলু কা'ব ইবনিল আশরাফ]

***

এ ঘটনা গুপ্ত হত্যার সুস্পষ্ট দলীল। ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুল জিহাদে এ ঘটনা নিম্নোক্ত শিরোনামে এনেছেন,

باب الفتك بأهل الحرب

‘হরবি কাফেরদের সুযোগ বুঝে হত্যা করে দেয়া(র বৈধতা) সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ’।

মুহাদ্দিসিনে কেরাম এ শিরোনামের ব্যাখ্যায় বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যেমন, হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

قوله باب الفتك بأهل الحرب أي جواز قتل الحربي سرا. اهـ

“হরবিকে গোপনে হত্যা করে দেয়ার বৈধতা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।” -ফাতহুল বারি ৬/২০৫

কাস্তাল্লানি রহ. (৯২৩ হি.) বলেন,

(باب) جواز (الفتك) بفتح الفاء وسكون الفوقية آخره كاف (بأهل الحرب) أي قتلهم على غفلة. اهـ

“অন্যমনস্কতার সুযোগে হরবিকে হত্যা করে দেয়ার বৈধতা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।”- ইরশাদুস সারি ৫/১৫৫

ইবনে বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.) বলেন,

قاله بعض شيوخنا قال : إن قتل ابن الأشرف هو من باب أن من آذى الله ورسوله قد حل دمه ، ولا أمان له يعتصم به فقتله جائز على كل حال ؛ لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) إنما قتله بوحى من الله وأذن فى قتله فصار ذلك أصلا فى جواز قتل من كان لله ولرسوله حربًا. اهـ بطال 5\190

“আমাদের কতক মাশায়িখ বলেন, কা’ব বিন আশরাফকে হত্যা এ দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেবে, তার রক্ত হালাল হয়ে যাবে এবং কোন আমান তার রক্তের সুরক্ষা দিতে পারবে না। বিধায় সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করা বৈধ। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী ও অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে হত্যা করেছেন। ফলে এটি একটি সার্বজনীন মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধীদের হত্যা করে দেয়া বৈধ।”- শরহু ইবনি বাত্তাল লি

সহীহিল বুখারি ৫/১৯০

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) কিতাবুল মাগাজিতে এ হাদিসের ব্যাখ্যা শেষে বলেন,

وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته. اهـ

“এ হাদিস দলীল যে, কোন মুশরিকের কাছে যখন সাধারণ দাওয়াত পৌঁছে যায়, তখন (দ্বিতীয়বার) দাওয়াত দেয়া ছাড়াই তাকে হত্যা করে দেয়া বৈধ।” –ফাতহুল বারি ৭/৪১২

***

সংশয় নিরসন- ০২, খ. গুপ্ত হত্যা- হাদিস ২. আবু রাফের ঘটনা

ইয়াহুদি আবু রাফে আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হুকাইক। তাকে সাল্লাম ইবনে আবিল হুকাইক-ও বলা হয়। সে হিজাযের বড় ব্যবসায়ী ছিল। অঢেল ধন-সম্পদের মালিক ছিল। খায়বারের পাশেই হিজাযের একটি দূর্গে সে থাকতো। সে ছিল রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোরতর দুশমন। গাতফানসহ আরবের অন্যান্য মুশরিক গোত্রকে সে আর্থিক সহায়তার মধ্য দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উস্কে দিত। আনসারি সাহাবিগণ দুর্ধর্ষ এক অভিযানের মাধ্যমে তাকে হত্যা করেন।

মদীনার আনসারি সাহাবিগণ প্রধান দু'টি গোত্রে বিভক্ত ছিলেন: আউস ও খাযরাজ। তাদের মাঝে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা চলতো। এক গোত্র কোন কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিলে অন্য গোত্রের আর প্রশান্তি হতো না- যতক্ষণ না তারাও অনুরূপ কোন কৃতিত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন। কা'ব বিন আশরাফকে হত্যার মর্যাদা লাভ করেছিলেন আউস গোত্রের সাহাবাগণ। খাযরাজ গোত্রের সাহাবায়ে কেরাম দেখলেন, আউসের সাহাবাগণ এক অভূতপূর্ব কৃতিত্ব লাভ করেছেন যা তাদের নেই। এতে তারা মনস্থির করলেন, কা'ব বিন আশরাফের মতো আরও কোন নবীর দুশমনকে হত্যা করে তারাও এই মর্যাদা লাভ করবেন। পরস্পরে পরামর্শ করলেন- কা'ব বিন আশরাফের মতো আর কে আছে এমন নবীর দুশমন? শেষে দেখলেন, আছে একজন। সে হল ইয়াহুদি আবু রাফে। মনস্থির

করলেন, একেই হত্যা করা যায়।

নিজেরা পরামর্শের পর খাযরাজের সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবু রাফেকে হত্যার অনুমতি চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন এবং সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ছয়জনের একটি ছোট্ট সারিয়্যা পাঠালেন আবু রাফেকে হত্যার জন্য। তারা হলেন,

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (সারিয়্যার আমীর)।
২. আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা।
৩. মাসউদ ইবনে সিনান।
৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস।
৫. আবু কাতাদা।
৬. খুযায়ি ইবনে আসউয়াদ- রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

তাদের মধ্যে সারিয়্যার আমীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক

রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াহুদিদের ঢঙে কথা বলতে পারতেন। তিনি সন্ধা বেলা কৌশলে দূর্গের ভিতরে প্রবেশ করেন এবং রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে আবু রাফেকে হত্যা করেন।

ইমাম বুখারি রহ. কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুল মাগাজিতে বিভিন্ন সনদে সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত উভয়ভাবে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিতাবুল জিহাদের এক বর্ণনায় এনেছেন,

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربط دواب لهم قال وأغلقوا باب الحصن ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت فيمن خرج أريهم أنني أطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها

“হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আবু রাফেকে হত্যার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারিদের কয়েকজনের একটি দল প্রেরণ করলেন। তাদের একজন (তথা আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু) দূর্গে প্রবেশ করল। তিনি বলেন, দূর্গে

প্রবেশ করে আমি তাদের একটি পশুর আস্তাবলে লুকিয়ে গেলাম। তারা দূর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। এরপর তারা দেখলো যে, তাদের একটি গাধা খুঁজে পাচ্ছে না। গাধা খুঁজতে তারা বাহিরে বেরিয়ে এল। তাদের সাথে আমিও বেরিয়ে এলাম। আমি তাদেরকে দেখাচ্ছি, যেন আমিও তাদের সাথে গাধা তালাশ করছি। খোঁজাখুঁজি করে তারা গাধা পেল এবং দূর্গে চলে এল। আমিও চলে এলাম। রাতে দূর্গের দরজা বন্ধ করে দিল এবং চাবিগুলো দেয়ালের একটি ছিদ্রের ফাঁকে রাখলো, যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।”- **সহীহ বুখারি: ২৮৫৯**

কিতাবুল মাগাজির বর্ণনায় এনেছেন,

عن البراء بن عازب قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه و سلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم فقال عبد الله لأصحابه أجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل

فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باب أغلقت علي من الداخل قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت فقلت يا أبا رافع قال من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى أنتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد أنتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته ؟ فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل أبا رافع فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فحدثته فقال (ابسط رجلك) . فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط

“হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদি আবু রাফের (হত্যার) উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আনসারি কয়েকজন সাহাবিকে পাঠালেন। আবু রাফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

কষ্ট দিত এবং (মুশরিকদেরকে) তার বিরুদ্ধে সহায়তা করত। সে (খায়বারের কাছাকাছি) হিজায ভূমিতে তার একটি দূর্গে বাস করত। সাহাবায়ে কেরাম যখন তার দূর্গের কাছাকাছি পৌঁছলেন, ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে এবং লোকজন তাদের পশুগুলোকে চারণভূমি থেকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গীদের বললেন, তোমারা এখানেই বসে থাক। আমি যাই। দারোয়ানের সাথে কোন কৌশল করে ঢুকতে পারি কি'না দেখি।

তিনি দরজার কাছে পৌঁছলেন। পৌঁছে কাপড় মুড়ি দিয়ে এমনভাবে বসে গেলেন, যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করছেন। এতক্ষণে লোকজন দূর্গে ঢুকে গেছে। দারোয়ান আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ করে বলল, ওহে আল্লাহর বান্দা! ঢুকতে চাইলে ঢুক। আমি দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি।

আমি ঢুকে গেলাম। ঢুকে (আস্তাবলে) লুকিয়ে গেলাম। সবার ঢুকা শেষ হলে দারোয়ান দরজা বন্ধ করে দিল। চাবিগুলো একটি পেরেকে লটকিয়ে রাখল। তিনি বলেন, আমি চাবিগুলো

নিয়ে নিলাম। দরজা খুললাম। আবু রাফের অভ্যাস ছিল, রাতে তার কাছে খোশ-গল্পের আসর বসত। সে দূর্গের উপরের তলায় থাকত। তার গল্পের সঙ্গীরা যখন চলে গেল, আমি সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায় উঠলাম। আমি যে দরজাই খুলতাম, ভিতর থেকে লাগিয়ে দিতাম; এই ভেবে যে, যদি লোকজন আমার ব্যাপারে টের পেয়ে যায়, তাহলে হত্যা করে শেষ করা পর্যন্ত যেন তারা আমার কাছে পৌঁছতে না পারে। আমি তার কক্ষে পৌঁছলাম।

(অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি গিয়ে আবু রাফেকে ডাক দেন। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তিনি জওয়াব দেন, আমি আবু রাফের জন্য একটু হাদিয়া নিয়ে এসেছি। এতে স্ত্রী দরজা খোলে দেয়।) সে অন্ধকার কক্ষে তার পরিবারের লোকদের মাঝখানে শুয়ে ছিল। বুঝতে পারছিলাম না যে, ঠিক কোথায় সে। ডাক দিলাম, আবু রাফে! সে জওয়াব দিল, এই লোক কে? আমি আওয়াজটা লক্ষ করে তরবারি চালালাম। আমার তখন দিশেহারার মতো অবস্থা। কিন্তু না! কোন কাজ হল না। উল্টো সে চিৎকার দিয়ে উঠল।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অল্প কিছুক্ষণ পর আবার গেলাম। (গলার স্বর পরিবর্তন করে যেন আমি তাকে সাহায্য করতে এসেছি এই ভান করে) বললাম, ‘আবু রাফে! আওয়াজ কিসের’? সে উত্তর দিল, ‘তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক! এই মাত্র কক্ষে এক ব্যক্তি আমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছে’। তিনি বলেন, এবার আরেকটা কোপ দিলাম। এতে সে মারাত্মক জখম হল। কিন্তু হত্যা করতে পারলাম না। এরপর আমি তরবারির ধারালো দিকটা তার পেটের উপর ধরে সজোরে চাপ দিলাম। একেবারে পিটে গিয়ে ঠেকল। বুঝতে পারলাম, হত্যা করতে পেরেছি।

তারপর একেক করে দরজাগুলো খুলতে লাগলাম। আসতে আসতে একটা সিঁড়িতে এসে পা রাখলাম। (আমি চোখে একটু কম দেখতাম।) রাত ছিল চাঁদনী। মনে করেছি (সব সিঁড়ি শেষ) নিচে এসে গেছি। (কিন্তু তখনও একটি সিঁড়ি বাকি ছিল)। আমি পড়ে গেলাম। পড়ে গিয়ে পায়ের গোছার হাড় ভেঙে গেল। পাগড়ি খোলে পা বেঁধে নিলাম।

সেখান থেকে এসে দরজার নিকট বসে রইলাম। বললাম, হত্যা করতে পেরেছি কি'না জানা পর্যন্ত আজ রাতে আর বের হচ্ছি না। যখন (ভোর হল এবং) মোরগ ডাকতে লাগল, তখন ঘোষক প্রাচীরের উপর উঠে ঘোষণা দিল, 'আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে, হিজাযের ব্যবসায়ী আবু রাফে মারা গেছে'।

ঘোষণা শুনে (নিশ্চিত হয়ে) আমার সঙ্গীদের নিকট এলাম। বললাম, তাড়াতাড়ি পালাও। আল্লাহ তাআলা আবু রাফেকে হত্যা করেছেন। (এরপর আমরা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতাম আর রাতের বেলা পথ চলতাম। এভাবে খায়বার থেকে মদীনায় উপস্থিত হলাম।) তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনার বিবরণ শুনালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বললেন, তোমার পা এদিকে বাড়াও দেখি। পা বাড়িয়ে দিলাম। তিনি পায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। এমনভাবে ভাল হয়ে গেলাম, যেন কখনও কোন ব্যথাই পাইনি।"- **সহীহ বুখারি: ৩৮১৩, কিতাবুল মাগাজি।**

***

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) এ ঘটনা থেকে উৎসারিত বিধানাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر وقتل من أعان على رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده أو ماله أو لسانه وجواز التجسيس على أهل الحرب وتطلب غرتهم. اهـ

“এ হাদিস থেকে বুঝা গেল, যেসব মুশরিক দাওয়াত পৌঁছার পরও কুফরে অটল থাকবে, তাদের গুপ্ত হত্যা করা জায়েয। বুঝা গেল, যে ব্যক্তি হাত, মাল বা যবান- কোনভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সহায়তা করবে, তাকে হত্যা করা হবে। বুঝা গেল, হরবিদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি এবং সুযোগ সন্ধান জায়েয।”- **ফাতহুল বারি: ৭/৩৪৫, কিতাবুল মাগাজি**

অন্যত্র বলেন,

وفيه جواز التجسيس على المشركين وطلب غرتهم وجواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم وكان أبو رافع يعادي رسول الله صلى الله عليه و سلم ويؤلب عليه الناس ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة أن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك. اهـ

“এ হাদিস দলীল যে, মুশরিকদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি এবং সুযোগ সন্ধান জায়েয। তাদের মধ্যে যারা অত্যধিক কষ্টপ্রদায়ি, তাদের গুপ্ত হত্যা জায়েয। আবু রাফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুশমনি পোষণ করতো এবং লোকজনকে তার বিরুদ্ধে উস্তে দিত। এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, মুশরিকের কাছে একবার দাওয়াত পৌঁছে গেলে, দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেয়া ছাড়াই তাকে হত্যা করা জায়েয।”- **ফাতহুল বারি: ৬/১৫৬, কিতাবুল জিহাদ**

***

সংশয় নিরসন- ০২, খ. গুপ্ত হত্যা- হাদিস ৩. খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালির ঘটনা

গুপ্ত হত্যা: হাদিস-৩: খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালির ঘটনা

মুশরিক খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠান তাকে হত্যা করার জন্য। তিনি কৌশলে একে হত্যা করেন এবং কর্তিত মস্তক এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করেন। চতুর্থ হিজরির শুরুতে মুহাররাম মাসের ৫ তারিখ রোজ সোমবার তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা করেন। হত্যা করে ১৮ দিন পর শনিবার মদীনায় উপস্থিত হন।

ইমাম আহমাদ রহ., আবু দাউদ রহ. ও বাইহাকি রহ.সহ আরো অনেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে আহমাদ রহ. এর বর্ণনাটি তুলনামূলক বিস্তারিত। এ বর্ণনায় এসেছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أنه قد بلغني أن :دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة فاته
فأقتله قال قلت يا رسول الله أنعته لي حتى أعرفه قال إذا رأيته
وجدت له اقشعريرة قال فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه
وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلا وحين كان وقت العصر فلما
رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من
الاقشعريرة فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة
تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع
والسجود فلما انتهيت إليه قال من الرجل قلت رجل من العرب
سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا قال أجل أنا في ذلك
قال فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى
قتلته ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه فلما قدمت على
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال أفلح الوجه قال قلت
قتلته يا رسول الله قال صدقت قال ثم قام معي رسول الله صلى
الله عليه وسلم فدخل في بيته فأعطاني عصا فقال أمسك هذه عندك
يا عبد الله بن أنيس قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه
العصا قال قلت أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني
أن أمسكها قالوا أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فتسأله عن ذلك قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلت يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا قال آية بيني وبينك يوم
القيامة أن أقل الناس المتخصرون يومئذ يوم القيامة فقرنها عبد الله
بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصبت معه في كفنه ثم
دفنا جميعا. (المسند للإمام أحمد بن حنبل، 16090)

تعليق شعيب الأرنؤوط : ابن عبد الله بن أنيس - وهو عبد الله]
بن عبد الله بن أنيس كما جاء مبينا من رواية محمد بن سلمة
الحراني عن محمد بن اسحق عند البيهقي - ترجم له البخاري في
التاريخ 5 / 125 وابن أبي حاتم 5 / 90 وابن حبان في الثقات
5 / 37 ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا وباقي رجال الإسناد
ثقات غير محمد بن اسحق روى له البخاري تعليقا ومسلم متابعة
وقد صرح بالتحديث
وأخرجه أبو يعلى 905 وابن خزيمة 982 و 983 وابن حبان
7160 وأخرجه أبو داود 1249 مختصرا وحسن الحافظ في الفتح
[إسناد أبي داود

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, খালেদ ইবনে সুফিয়ান ইবনে নুবাইহ্ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করছে। সে (মক্কা থেকে নয় মাইল দূরে) উরানা উপত্যকায় আছে। তুমি গিয়ে তাকে হত্যা করে আস। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমি তো তাকে চিনি না) তাকে চেনার আলামত বলে দিন, যাতে আমি তাকে চিনতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (তাকে চেনার আলামত হল,) যখন তুমি তাকে

দেখবে, তখন তার ভয়ে তোমার মাঝে খানিকটা কম্পন অনুভব হবে।

(এ আলামত বাতলানো মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু’জিযা। আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাধারণত কাউকে দেখে ভয় পেতেন না। এজন্য ঠিক এর বিপরীতে ভয় পাওয়াকে আলামত বানানো হয়েছে।)

তিনি বলেন, আমি তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অবশেষে তার নিকট উপস্থিত হলাম। সে উরানা উপত্যকায় ছিল। তার সাথে তার স্ত্রীরা ছিল। তাদের নিয়ে অবতরণের জন্য সে একটি ভাল জায়গা তালাশ করছিল। তখন আসরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি যখন তাকে দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবরণ অনুযায়ী আমার মাঝে কিছুটা ভীতিজনিত কম্পন অনুভব করলাম। (এতে বুঝতে পারলাম যে, সে-ই আল্লাহর রাসূলের দুশমন খালেদ ইবনে সুফিয়ান।)

(তিনি বলেন,) আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার ভয় হচ্ছিল যে, তার কাছে পৌঁছতে আমার কিছুটা সময় লাগবে, যার ফলে আমার নামায ছুটে যাবে। তাই আমি হাঁটতে হাঁটতে মাথার ইশারায় রুকু-সাজদা করে নামায আদায় করে নিলাম। আমি তার কাছে পৌঁছলে সে জিজ্ঞেস করল, মিয়া! তুমি কে? আমি উত্তর দিলাম, '(আমি) আরবের লোক, যে আপনার ব্যাপারে শুনতে পেয়েছে যে, আপনি এই (মুহাম্মাদ) লোকটির বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছেন; তাই সে আপনাকে সাহায্য করতে এসেছে'। সে জওয়াব দিল, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি এরই প্রস্তুতি নিচ্ছি। তিনি বলেন, আমি তার সাথে খানিক্ষণ চললাম। (তার সাথে কথা-বার্তা বলতে বলতে ভাব জমালাম, আর তাকে হত্যার সুযোগ খুঁজছিলাম।) অবশেষে যখন সুযোগ পেয়ে গেলাম, তরবারি চালালাম। (তরবারির আঘাতে) তাকে হত্যা করলাম। এরপর (তার কর্তিত মস্তকটি নিয়ে) সেখান থেকে পালালাম। তার স্ত্রীদেরকে তার উপর পড়ে ক্রন্দনরত রেখে আসলাম।

(এরপর তিনি পাহাড়েরর একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেন।

হত্যাকারীকে খোঁজে বের করার জন্য লোক পাঠানো হল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তারা তাকে খোঁজে পায়নি। এরপর তিনি রাতের বেলা পথ চলতেন আর দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন। এভাবে মদীনায় উপস্থিত হন।)

(তিনি বলেন,) যখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম এবং তিনি আমাকে দেখতে পেলেন, (খুশিতে) বলে উঠলেন, (তোমার) চেহারা কামিয়াব হোক! তিনি বলেন, আমি সংবাদ দিলাম, তাকে হত্যা করেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সত্য বলেছ। (বলা হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই অহীর মাধ্যমে হত্যার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলেন।)

(তিনি বলেন,) এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিয়ে উঠলেন। তার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমাকে একটি লাঠি উপহার দিলেন এবং সেটি আমার কাছে রাখতে আদেশ দিলেন। আমি লাঠিটি নিয়ে লোকজনের কাছে

আসলাম। তারা আমার কাছে আবেদন করলো, ‘তুমি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ লাঠির হেতু জিজ্ঞেস করতে পারবে না’? তিনি বলেন, (তাদের আবেদনে) আমি আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন আমাকে এ লাঠি দিয়েছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি কেয়ামতের দিন তোমার ও আমার মাঝের সম্পর্কের পরিচয়বাহক হবে। (তখন আমি তোমার জন্য শাফাআত করে জান্নাতে তোমার মর্তবা বৃদ্ধি করতে পারবো। আর তুমি জান্নাতে এ লাঠিতে ভর দিয়ে যেভাবে চাও রাজত্ব করবে। আর শোন,) কেয়ামতের সেদিনে লাঠিতে ভর দেয়ার মর্যাদা কম লোকই লাভ করবে।

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু লাঠিটি তার তরবারির সাথে মিলিয়ে নিলেন। সেটি এরপর থেকে তার কাছেই ছিল। (অসীয়ত করে গেলেন, মারা গেলে যেন লাঠিটি তার কাফনে দিয়ে দেয়া হয়।) তিনি যখন মারা গেলেন, (অসীয়ত মতো) লাঠিটি তার কাফনে দিয়ে দেয়া হল এবং লাঠিসহ দাফন করা হল।”- **মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৬০৯০**

***

এ হাদিস থেকে অতিরিক্ত একটি মাসআলা জানা গেল যে, গুপ্ত হত্যার জন্য একাকী অভিযান চালানোও জায়েয। আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একাই পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি একাই হত্যা করে ফিরে এসেছেন।

সংশয় নিরসন- ০২, খ. গুপ্ত হত্যা, হাদিস-৪: আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা

গুপ্ত হত্যা: হাদিস-৪: আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা

একাকী জিহাদ ও গুপ্ত হত্যার ইমাম আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা ঘটেছে ৬ষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর। হুদায়বিয়ার সন্ধির একটা শর্ত ছিল, মক্কার কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে এলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে, তবে মদীনার কেউ মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে গেলে তাকে মদীনায় পাঠনো হবে না। বাহ্যত এ সন্ধি মুসলমানদের জন্য অপমানকর মনে হলেও আল্লাহ

তাআলা একেই ঘোষণা দিয়েছেন, ‘ফাতহুম মুবিন- সুস্পষ্ট বিজয়’। আর বাস্তবেও এমনই ছিল।

আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা ইমাম বুখারী রহ. এভাবে বর্ণনা করেছেন,

ثم رجع النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين رآه (لقد رأى هذا ذعرا) . فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم قال النبي صلى الله عليه و سلم (ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد) . فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه و سلم تناشده بالله والرحم لما

أرسل فمن آتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إليهم فأنزل الله تعالى { وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم - حتى بلغ - الحمية حمية الجاهلية }

“এরপর (সন্ধি শেষে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে এলেন। তখন আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু- যিনি কুরাইশ গোত্রের লোক- (পালিয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে এলেন। তিনি মুসলমান ছিলেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁর তালাশে দু‘জন লোক পাঠাল। তারা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে) বলল, আপনি আমাদের সাথে যে চুক্তি করেছেন (তা পূর্ণ করুন এবং আবু বাসীরকে ফেরত দিন)। তিনি তাকে ঐ দুই ব্যাক্তির হাওয়ালা করে দিলেন। তাঁরা তাকে নিয়ে (মক্কায়) রওয়ানা হল। যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে অবতরণ করল। সেখানে তাদের সাথে যে খেজুর ছিল তা খেতে লাগল।

আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের একজনকে বললেন,

আল্লাহর কসম! হে অমুক, তোমার তরবারিটি খুবই চমৎকার দেখছি। সে লোকটি তরবারিটি বের করে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! এটি একটি উৎকৃষ্ট তরবারি। আমি একাধিক বার তা পরীক্ষা করেছি। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তলোয়ারটি আমি দেখতে চাই। আমাকে দেখাও। লোকটি আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তলোয়ারটি দিল। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটি দ্বারা তাকে এমন আঘাত করলেন যে, সে মরে গেল। তার অপর সঙ্গী পালিয়ে মদিনায় এসে পৌঁছল এবং দৌঁড়তে দৌঁড়তে মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন, লোকটি ভীতিজনক কিছু দেখে এসেছে।

লোকটি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে উপস্থিত হল বলল, আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, (আপনার রক্ষা না করলে) আমিও নিহত হতে যাচ্ছি। তখন আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনার চুক্তি পূর্ণ করেছেন। আপনি (চুক্তিমতো) আমাকে তাদের কাছে ফেরত

দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ আমাকে তাদের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সর্বনাশ! এ তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলনকারী। যদি তাকে সহায়তা করার কেউ থাকতো!

(মুশরিক লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা থেকে বুঝেছিল যে, যদি তার আরো কতক সাথী থাকতো তাহলে আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যা করে পালাতে পারতো না। তবে প্রচ্ছন্নভাবে মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন যে, তুমি কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগুন জ্বালাও। এ কাজের জন্য তোমার সাথে আরো কিছু সাথী থাকলে ভাল হবে। এজন্য মক্কার নির্যাতিত মুসলমানগণ যেন পালিয়ে তোমার সাথে মিলিত হয়। চুক্তি থাকার কারণে সরাসরি আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একথা বলতে পারছিলেন না। তাই ঈঙ্গিতে বলেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারিতে এমনই বলেছেন।)

আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এ কথা শুনলেন, বুঝতে

পারলেন, (এখানে থাকলে) তিনি তাকে আবার কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় চলে গেলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এ দিকে আবু জানদাল ইবনু সুহাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু কাফেরদের কবল থেকে পালিয়ে এসে আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর থেকে কুরাইশ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ করেছে এমন যে-ই পালাতে পারতো, সে-ই আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে এসে মিলিত হতো। এভাবে (চল্লিশ বা সত্তরজনের মতো) তাদের একটি দল হয়ে গেল। আল্লাহর কসম! তারা যখনই শুনতেন যে, কুরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া যাচ্ছে, তখনই তারা তাদের পথ অবরোধ করতেন। তাদের হত্যা করতেন। তাদের মাল-সম্পদ কেড়ে নিতেন। (অবস্থা বেগতিক দেখে) কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে লোক পাঠাল। আল্লাহ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আবেদন করল, ‘আপনি আবু বাসীরের কাছে এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পাঠান। এখন থেকে (মক্কা থেকে) কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে এলে সে

নিরাপদ থাকবে (কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে না)’।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের কাছে (এ মর্মে) নির্দেশ পাঠালেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন: وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ থেকে الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ পর্যন্ত।”- **সহীহ বুখারী ২৫৮১**

ঘটনার পরের অংশের বিবরণে হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري فكتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في يده فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا قال وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهدا فاستشهد في خلافة عمر. اهـ

“মূসা ইবনে উকবা রহ. যুহরি রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু

আনহুর কাছে পত্র পাঠালেন। তার কাছে যখন চিঠি পৌঁছল, তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি হাতে অবস্থায়ই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানেই তাকে দাফন করেন এবং তার কবরের কাছে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি বলেন, (এরপর) আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সঙ্গীরা মদীনায় চলে আসেন। তখন থেকে তিনি সেখানেই ছিলেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তিনি শামে জিহাদে যান এবং সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন।”- **ফাতহুল বারি ৫/৩৫১**

এ হাদিস একাকী জিহাদ ও গুপ্ত হত্যার সুস্পষ্ট ও আমলী দলীল। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাফের লোকটিকে হত্যা করলেন। অপরটিকে ধাওয়া করে মদিনা পর্যন্ত নিয়ে এলেন। সমূদ্র উপকূলে গিয়ে যখন আশ্রয় নিলেন, আস্তে আস্তে একটা তায়েফা হয়ে গেল, মুশরিকদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলো টার্গেট করে আক্রমণ করলেন, হত্যা করলেন, লুণ্টন করলেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসবের কোনটির উপরই

কোন আপত্তি করলেন না। বরং প্রচ্ছন্নভাবে উৎসাহ দিলেন। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হামলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌন সমর্থন ও উৎসাহ সুস্পষ্ট দলীল যে, ইমাম না থাকাবস্থায় একাকী বা ছোট্ট তায়েফা মিলে জিহাদ করতে এবং হরবি কাফেরদের গুপ্ত হত্যা করতে কোন সমস্যা নেই। চুক্তি নেই এমন যেকোন কাফেরকে বাগে পেয়ে হত্যা করা যাবে। এককভাবেও করা যাবে, তায়েফাগতভাবেও করা যাবে। প্রকাশ্যেও করা যাবে, গোপনেও করা যাবে। হত্যাও করা যাবে, লুণ্টনও করা যাবে। কোনটাতেই কোন সমস্যা নেই।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي صلى الله عليه و سلم وبين قريش لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله ودافع عن دينه بذلك ولم ينكر النبي قوله ذلك وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا دية. اهـ

“আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা প্রমাণ যে,

সীমালঙ্গনকারী মুশরিককে গুপ্ত হত্যা করা যাবে এবং আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু যা করেছেন, তা গাদ্দারি নয়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরাইশদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তিতে তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কেননা, তিনি তখন মক্কায় বন্দী ছিলেন। তবে যখন তার আশঙ্কা হল যে, মুশরিকটি তাকে (মক্কার) মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তখন তাকে হত্যা করে নিজের প্রতিরক্ষা করেছে। এর মাধ্যমে তিনি আপন দ্বীন রক্ষা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কথায় কোন আপত্তি করেননি।

এ থেকে এও বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো (হত্যা ও লুণ্টন) করবে, তার উপর কিসাস বা দিয়াত কোন কিছু বর্তাবে না।”- **ফাতহুল বারি ৫/৩৫১**

আমরাও একই কথা বলি: আমাদের মুসলিম ভাইদের যদি তাগুতি শাসন বিলুপ্ত করার সামর্থ্য নাও থাকে, তথাপি তারা যেখানেই পাবেন তাগুত, তাগুত বাহিনির সৈন্য ও কাফের-মুরতাদদের হত্যা করবেন। এতে তাদের উপর না কোন কিসাস বর্তাবে, আর না কোন দিয়াত। বরং আল্লাহ তাআলার

পক্ষ থেকে পাবেন অশেষ প্রতিদান। আর নিহত হলে পাবেন শাহাদাতের মর্যাদা।

***

গুপ্ত হত্যা (শেষ পর্ব): বিবিধ ফাওয়ায়েদ

বিবিধ ফাওয়ায়েদ

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে গুপ্ত হত্যার দালিলিক আলোচনা দেখলাম। আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু যদিও গুপ্ত হত্যার বৈধতা, তবে গুপ্ত হত্যার এ দলীলগুলো থেকে আরো অনেক বিষয় উৎসারিত হয়। আমরা সেসব উৎসারিত ফাওয়ায়েদের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করবো।

ফায়েদা-১: জিহাদের মাসলাহাত ও জরুরতে ক্ষেত্রবিশেষে তাওরিয়া করা (কথা ঘুরিয়ে বলা) এমনকি মিথ্যা ও কুফরি কথা বলাও জায়েয। যেমনটা কা'ব বিন আশরাফ ও খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালিকে হত্যা করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম করেছেন। অবশ্য নিরেট মিথ্যা বলা বৈধ কি'না তা নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ আছে। তবে সবচেয়ে

ভাল হল নিরেট মিথ্যা না বলে তাওরিয়া করা। অবশ্য যদি তাওরিয়া সম্ভব না হয়, তাহলে মিথ্যা না বলে উপায় নেই।

ফায়েদা-২: স্বল্পসংখ্যক মুসলমান বিপুল সংখ্যক কাফেরের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়া বৈধ। আমরা দেখেছি, গুপ্ত হত্যা করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম কাফের নেতাদের প্রাণকেন্দ্রে ঢুকে গেছেন, যেখানে বিপুল সংখ্যক কাফের বিদ্যমান ছিল। এমনকি কাফেররা সাহাবায়ে কেরামের পশ্চাদ্ধাবনও করেছে- যদিও আল্লাহর রহমতে তাদের ধরতে পারেনি।

ফায়েদা-৩: একাকি সারিয়্যা ও অভিযান বৈধ। যেমনটা খালেদ ইবনে সুফিয়ানের হত্যার ঘটনায় এবং আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনায় দেখেছি।

ফায়েদা-৪: মাসলাহাত মনে হলে কাফের নেতাদের হত্যা করে মাথা কেটে নিয়ে আসা জায়েয। যেমন সাহাবায়ে কেরাম কা’ব বিন আশরাফ ও হুজালির মাথা নিয়ে এসেছেন।

ফায়েদা-৫: যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কটুক্তি করবে বা তার শানের অবমাননা করবে, তাদের কোন আমান নেই। তাকে আমান দিয়েও হত্যা করা যাবে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম কা'ব বিন আশরাফকে আমান দিয়েও হত্যা করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে দ্বিমত আছে।

ফায়েদা-৬: যেসব কাফেরের কাছে একবার ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে কিন্তু সে কুফর পরিত্যাগ করেনি, তাদেরকে দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেয়া ছাড়াই হত্যা করা যাবে।

ফায়েদা-৭: কাফেরদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য পালানো ও আত্মগোপন করা জায়েয। যেমন সাহাবায়ে কেরাম কা'ব বিন আশরাফ, আবু রাফে ও হুজালিকে হত্যা করে পালিয়েছেন এবং আত্মগোপন করেছেন।

ফায়েদা-৮: ঘুমন্ত কাফেরকে হত্যা করা জায়েয- যদি জানা যায় যে, সে কুফরে অটল আছে। যেমন আবু রাফের উপর ঘুমন্ত অবস্থায় হামলা করা হয়েছে।

ফায়েদা-৯: ইমাম না থাকাবস্থায় জিহাদ জায়েয; যেমনটা আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনায় দেখেছি যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আয়ত্বাধীন না থাকা সত্ত্বেও জিহাদ করেছেন।

ফায়েদা-১০: যদি মুসলমানদের সার্বজনীন এক ইমাম না থাকে এবং তারা বিভিন্ন শাসকের অধীনে থাকেন, তাহলে কাফেরদের সাথে এক শাসকের কৃত চুক্তি অন্য শাসক ও তার অধীনস্তদের উপর বর্তাবে না। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃত চুক্তি আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর বর্তায়নি। ফলে তিনি মক্কার মুশরিকদের হত্যা ও লুণ্টন করেছেন।

ফায়েদা-১১: দুর্বলতা ও ভীরুতা মুমিনের শান নয়, বরং বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা কাম্য। উল্লিখিত চারটি ঘটনাতেই আমরা সাহাবায়ে কেরামের অকল্পনীয় বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় পেয়েছি।

ফায়েদা-১২: যুদ্ধের মূল উপাদান হল কৌশল। জনবল ও অস্ত্রবলের *সাথে সাথে কৌশলের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেকটি ঘটনাতেই দেখেছি যে, কৌশলের কারণে সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে সফলতা পেয়েছেন, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে সম্ভবপর মনে হচ্ছিল না।

ফায়েদা-১৩: কাফেরদের অস্ত্র দিয়ে কাফেরদের হত্যা করা বৈধ। যেমন আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুশরিকটির নিজের অস্ত্র দিয়েই তাকে হত্যা করেছেন।

এছাড়াও আরো অনেক ফাওয়ায়েদ আছে। আপাত দৃষ্টিতে এ

ক'টিই মনে পড়ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের জন্য ফিদা হওয়ার তাওফিক দান করুন। কৌশল, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০১

ঢালকানগরের পীর আব্দুল মতীন বিন হোসাইন সাহেবের একটি বয়ান বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ৩১শে মে ২০১৯ ইং, ২৬ নং তারাবি বাদ বয়ান। বয়ানটি শুরু হয়েছিল একটি হাদিস দিয়ে, যাতে যিকিরকারীকে জিহাদকারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এরপর সেখান থেকে হযরতওয়ালা শুরু করেছেন মুজাহিদদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কটাক্ষ আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য।

হযরতওয়ালার ভাষায় মুজাহিদ হচ্ছে:

এমন কতক জযবাতি লোক, যারা তাদের পাগলামী ও জযবাকে, তাদের বুঝ-বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে- শরীয়তের ফায়সালার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না; যারা কুরআন-সুন্নাহ ও উলামায়ে দ্বীনের ফায়সালার অনসরণের স্থলে নিজেদের খাহেশের অনুসরণকে অগ্রাধিকার দেয়; যারা হত্যা ও খুন করে উল্লাসবাজি করে; দ্বীন যিন্দা করার নামে এদিক সেদিক বোম

মেরে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে; যাদের দ্বারা উম্মাহর ফায়দার স্থলে ক্ষতি হচ্ছে বেশি এবং যাদের সীমালঙ্গনের কারণে সারা বিশ্বে মুসলমানগণ অনিরাপত্তায় ভুগছে।

মোটামুটি হযরতওয়ালার যবানে এ হচ্ছে মুজাহিদদের পরিচিতি। হযরতওয়ালার ভাষায়: কিছু আয়াতের অপব্যাখ্যা করে এ ধরণের জিহাদনামী ফাসাদের প্রচার ঘটছে। আরো বলেন, এ পথে তারা যে কুরবানি পেশ করছে তা বন্ধ করে যদি তারা লোকদের দাওয়াত দিত, তাহলে এর চেয়ে লাখো-কোটি গুণ বেশি ফায়দা হতো।

এ প্রসঙ্গে তিনি বড় চার ইমামের প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। প্রথমে ইমাম মালেকের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেন,

> ***“তিনি মোট কয়টা জিহাদ করছেন? ... করছিলেন কোনো জিহাদ? হ্যাঁ !? (ধমক ও আপত্তির সুরে।)”***

এরপর ইমাম আহমাদ রহ. ও খালকে কুরআনের ফিতনা প্রসঙ্গ এনে বলেন,

“ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. সেই নিজের সহী মসলক প্রচার করতে থাকছেন। কিন্তু ঐ যারা কুরআন মাখলূক বলছিল, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কি করছিলেন!? তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরছিলেন?!”

এরপর ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. এর প্রসঙ্গে বলেন যে তিনি,

“বড় কঠিন জুলুমের শিকার হইছেন। ... রক্তাক্ত হইছেন। কিন্তু কোথায় কোন্ জিহাদ করছেন যে, ভক্তরা আস! অস্ত্র ধর! তলোয়ার লও?! জিহাদ করছিলেন?!”

এভাবে তিনি চার ইমামের প্রসঙ্গ এনে শেষে বলেন,

“এরা জিহাদ কয়টার মধ্যে যোগ দিছে? ব..ল.. ভাই। তারা সবেই জিহাদ না করার কারণে সব জাহান্নামী হবে? বা গুনাহে কবীরাতে লিপ্ত?”

শেষমেশ বক্তব্য, এমন কিছু জযবাতি লোকের সীমালঙ্গনের কারণে সারা *দুনিয়াতে মুসলমান আজ অনিরাপদ হয়ে

পড়েছে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গভরে এভাবে তিনি যতটুকু পেরেছেন মুজাহিদদের অপমান করার চেষ্টা করেছেন।

এ হল জিহাদ ও মুজাহিদিনের ব্যাপারে হযরতওয়ালার আকিদা ও বক্তব্য।

অভিব্যক্তি:

আব্দুল মতীন সাহেবের পীর হাকিম আক্তার সাহেব রহ.। হাকিম আক্তার সাহেব রহ. জিহাদ ও মুজাহিদদের কতটুকু ভালবাসতেন এবং তালেবানদের তিনি কি পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তা অনেকের আশাকরি জানা আছে। শুনেছি জিহাদের কথা বলার কারণে আব্দুল মতীন সাহেব নিজ পীরের প্রতি একবার অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যদি এমনটাই হয়ে থাকে তাহলে তিনি জিহাদবিদ্বেষী হবেন স্বাভাবিক। মুজাহিদদের নিয়ে কটাক্ষ করবেন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন (যেমনটা অন্য দশজন জিহাদবিদ্বেষী করে থাকে) এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখজনক হল, তারা তাদের এ ধরণের বদ আকীদাকে শরীয়তের আবরণে চালিয়ে থাকে। বাতিল কখনই নিজেকে সরাসরি হকের বিরুদ্ধে দাড় করায় না। বরং বাতিলকে হকের আবরণে পেশ করে। আর এভাবেই এদের

দ্বারা জনগণ বিভ্রান্ত হয়। **শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) কত বাস্তব কথাই না বলেছেন,**

ولا يشتبه على الناس الباطل المحض؛ بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق. اهـ

“নিরেট বাতিলের দ্বারা লোকজন সংশয়ে পড়ে না। (সংশয়ে পড়ার জন্য) বরং কিছুটা হকের সংমিশ্রণ আবশ্যক।”-মাজমুউল ফাতাওয়া ৮/৩৭

হযরতওয়ালারা যদি সত্য করে বলতেন যে, আমরা জিহাদ অপছন্দ করি বা জিহাদে জান-মালের আশঙ্কা তাই আমরা তা করতে রাজি না, খানকার আরামের জিন্দেগি আমরা ছাড়তে পারবো না, তাহলে কেউই তাদের কথা সমর্থন করতো না। কেউ তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হতো না। কিন্তু দুঃখজনক হল, তারা নিজেদের দুর্বলতা গোপন রেখে নিজেদের বাতিল অবস্থানটির পক্ষে চতুরতার সাথে এমন কিছু যুক্তি-প্রমাণ তুলে ধরে, যেগুলোর অসাড়তা সাধারণ জনগণ বুঝতে পারে না। আর এভাবেই তারা বিভ্রান্ত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টিরই আশঙ্কা করে গেছেন। **তিনি ইরশাদ করেন,**

إنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين (سنن ابي داود: 4254، جامع الترمذي 2229، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ)

“গোমরাহকারী ইমাম-নেতাদের তরফ থেকে আমার উম্মতের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হচ্ছে।”- আবু দাউদ ৪২৫৪, তিরমিযি ২২২৯

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. (১০১৪ হি.) বলেন,

الأئمة: جمع إمام وهو مقتدى القوم ورئيسهم، ومن يدعوهم إلى قول أو فعل أو اعتقاد. اهـ

“... ইমাম-নেতা হচ্ছে কওমের অনুসৃত ব্যক্তি এবং তাদের প্রধান। তাছাড়াও এমন ব্যক্তি, যে কওমকে কোন কথা, কাজ বা আকীদার দিকে দাওয়াত দেয়।”- মিরকাত ১৫/৩৫৫

ইমামের এ ব্যাপক অর্থে আমাদের অনেক হযরতওয়ালাও পড়বেন, যাদের দ্বারা উম্মত বিভ্রান্ত হবেন বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা করে গেছেন। আজ আমরা এরই বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াইলাল্লাহিল মুশতাকা!

যিকির প্রসঙ্গ:

যিকিরের ব্যাপারে আগেও কথা হয়েছে। তাই এ নিয়ে কথা বাড়াবো না। তবে জিহাদের ফজিলতের ব্যাপারে **সহীহ মুসলিম শরীফের একটি হাদিস উল্লেখ করছি-**

عن أبي هريرة قال قيل للنبي صلى الله عليه و سلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز و جل ؟ قال (لا تستطيعوه) قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول (لا تستطيعونه) وقال في الثالثة (مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام وصلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى)

"হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করা হল, এমন কি আমল আছে যা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমান হতে পারে? তিনি উত্তর দিলেন, তোমরা তা করতে সক্ষম নও। এভাবে দুই/তিন বার তারা একই প্রশ্নটি করলো আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবারেই জওয়াব দিলেন, তোমরা তা করতে সক্ষম নও। শেষে তৃতীয়বারে বললেন, রোযাদারের দৃষ্টান্ত হল এমন এক (ইবাদতগুজার) ব্যক্তির মতো যে (দিনভর) অনবরত রোযা রেখে চলেছে এবং আল্লাহ তাআলার (কুরআনের) আয়াতগুলোর (তিলাওয়াতের) মাধ্যমে খুশু-খুজুর সাথে (রাতভর) অনবরত নামায পড়ে চলেছে। আল্লাহর পথের মুজাহিদ (জিহাদ থেকে) ফিরে আসা পর্যন্ত সে রোযা ও

নামাযে একটুও বিরতি দিচ্ছে না।”- সহীহ মুসলিম ১৮৭৮

খানকাহবাসীরা জয়ীফ-মুনকার হাদিসগুলো বাদ দিয়ে যদি এসব সহীহ হাদিসের দিকে তাকাতেন তাহলে সহজেই মুজাহিদের ফজিলত বুঝতে পারতেন। এ হাদিসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাদের পক্ষে অন্য কোন আমলের মাধ্যমে জিহাদের সমান সওয়াব লাভ করা সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কেরামের বার বার প্রশ্নের জওয়াবের তিনি এমন একটি আমলের কথা বলেছেন, যা কেউ করতে সক্ষম নয়। আর তা হল, লাগাতার রোযা এবং এক মূহুর্তও বিরতি ব্যতীত লাগাতার খুশু-খুজুর সাথে নামায। উদ্দেশ্য, এ আমল তোমরা করতেও পারবে না, মুজাহিদের জিহাদের সমান সওয়াবও লাভ করতে পারবে না।

ইমাম নববি রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন,

وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال وقد جعل المجاهد مثل من لايفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات ومعلوم أن هذا لايتأتى لأحد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لاتستطيعونه. اهـ

“এ হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, জিহাদের ফজিলত মহা

ফজিলত। কেননা, নামায, রোযা ও আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহের আনুগত্য সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। আর এখানে মুজাহিদকে গণ্য করা হয়েছে এমন ব্যক্তির মতো যে এগুলো থেকে এক পলকও বিরত হয় না। আর সকলেরই জানা কথা যে, এটা কারও দ্বারাই সম্ভব নয়। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা তা করতে সক্ষম নও’।”- আলমিনহাজ ১৩/২৫

যখন লাগাতার নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারাও মুজাহিদের সমান সওয়াব পাওয়া যাচ্ছে না- অথচ এগুলো সকল যিকির এবং সকল আমলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ আমল- তাহলে এমন কোন যিকিরকারী আছে যে তার যিকিরের দ্বারা মুজাহিদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে!?

বুঝা গেল, সকল নফল নামাযীর নামায, সকল নফল রোযাদারের রোযা এবং সকল যিকিরকারীর যিকিরের চেয়েও মুজাহিদের জিহাদের মর্যাদা অনেক অনেক বেশি। কিন্তু এ ধরণের ফজিলত যেহেতু সহীহ হাদিসে এসেছে, তাই এগুলো

হযরতওয়ালাদের নজরে পড়ে না!!

যাহোক, এখন কথা হল, কোনো কোনো হাদিসে যে জিহাদের চেয়ে যিকির শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে-হাদিস সহীহই হোক আর জয়ীফই হোক- তার কি জওয়াব?

উত্তর:

এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র পোস্টে আলোচনা হয়েছে। তাই কথা বাড়াবো না। সংক্ষেপ উত্তর হল যা হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) দিয়েছেন: যে জিহাদে আল্লাহ তাআলার ইয়াদ, যিকির, আজমত ও ইস্তিহজার নেই তার চেয়ে আজমত, মহব্বত ও ইস্তিহজারওয়ালা যিকির শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে যে জিহাদ আল্লাহর ইয়াদ, যিকির ও আজমতের সাথে হয় তা সকল প্রকার যিকিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর স্পষ্ট যে, জিহাদ সাধারণত আল্লাহ তাআলার ইয়াদ সহই হয়ে থাকে। যে মুজাহিদের উপর বিমান থেকে মিসাইল ছোঁড়া হচ্ছে, যার সম্মুখে শত্রুর শতটি ট্যাংক ধেয়ে আসছে, যার ডান-বাম সকল দিক দিয়ে শো শো শব্দে বুলেটগুরো ছুটে যাচ্ছে, যার সামনে তারই দশটি

ভাইয়ের লাশ পড়ে আছে- তার আল্লাহর ইয়াদের সাথে খানকাহর যিকিরের কি-ই বা তুলনা হতে পারে? শত বৎসর খানকাহয় পড়ে থাকলেও মুজাহিদের এমন একটা মূহুর্তের যিকিরের সমান হবে কি'না সন্দেহ! আর জান-মাল বিলিয়ে দেয়ার কথা না হয় বাদই দিলাম।

হ্যাঁ, কিছু মুজাহিদ এমন থাকাও অসম্ভব নয় যে, জিহাদের এমন ভয়াবহ ময়দানেও তাদের আল্লাহর ইয়াদ হয় না। দুনিয়ার মহব্বতই তাদের উপর চড়াও হয়ে আছে। তাদের কথা ভিন্ন। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

সামনের পর্বে ইনশাআল্লাহ আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ প্রসঙ্গ আসবে। হযরতওয়ালা এ প্রসঙ্গে কেমন অজ্ঞতার প্রমাণ দিয়েছেন বা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ।

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০২

আইম্মায়ে আরবাআর যামানায় জিহাদ প্রসঙ্গ:

হযরতওয়ালা মুজাহিদদের বিরুদ্ধে দলীল দিয়েছেন আইম্মায়ে আরবাআ (আবু হানিফা, মালেক, শাফিয়ী ও আহমাদ ইবনে হাম্বল) রাহিমাহুমুল্লাহর সীরাত দিয়ে। হযরতওয়ালার দাবি, তারা বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করেছেন, তথাপি তাদের কেউ জিহাদ করেননি। তাহলে জযবাতিরা জিহাদ কোথায় পেল? তার অবস্থানকে মজবুত করতে তিনি এ প্রশ্নও রেখেছেন, "তারা সবেই জিহাদ না করার কারণে সব জাহান্নামী হবে? বা গুনাহে কবীরাতে লিপ্ত?"

প্রথমে বলে নিই, বর্তমান মুসলমানগণ মৌলিকভাবে দু ধরণের কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ করছেন:

এক. দখলদার প্রকাশ্য কাফের। যেমন- ইয়াহুদ, নাসারা, রাফেযী, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি।

দুই. মুসলিমনামধারী গণতান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক তাগুত-মুরতাদ শাসক শ্রেণী।

হযরতওয়ালার বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে, উভয় প্রকার মুজাহিদদেরই তিনি জযবাতি-খাহেশপূজারি আখ্যা দিয়েছেন। শুধু বিশেষ কোন মুজাহিদ দল তার উদ্দেশ্য না। এক কথায়- চলমান বিশ্বের সকল মুজাহিদকেই তিনি আক্রমণের নিশানা বানিয়েছেন। আমার ভুল হয়ে থাকলে হযরতওয়ালারা ইচ্ছে করলে সংশোধন করে দিতে পারবেন।

***

আইম্মায়ে আরবাআ জিহাদ করেছেন কি করেননি সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে কয়েকটি মৌলিক কথা বলা জরুরী মনে হচ্ছে:

এক.

হযরতওয়ালা দলীল হিসেবে আইম্মায়ে আরবাআকে বেছে

নিলেন কেন? কুরআন, সুন্নাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সীরাতে কি এর কোন দলীল বা নজীর বিদ্যমান নেই যে, সব কিছু বাদ দিয়ে আইম্মায়ে আরবাআকে ধরতে হচ্ছে? আইম্মায়ে আরবাআর কথা-কাজ তো শরীয়তের দলীল নয়। আইম্মায়ে আরবাআ স্বয়ং নিজেরাই যে কুরআন, সুন্নাহ, সীরাতে রাসূল ও সীরাতে সাহাবাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, হযরতওয়ালা সেগুলোকে দলীলরূপে পেশ করতে নারাজ হলেন কেন? তিনি তো বলতে পারতেন:

“ওহে জযবাতির দল! তোমরা যে জিহাদ জিহাদ কর, কুরআনে কোথায় জিহাদের কথা আছে? হাদিসের কোথায় জিহাদের কথা আছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জীবনে কোনো জিহাদ করেছেন? কোনো সাহাবি কি জীবনে কোনো জিহাদ করেছেন? তাদের কেউ তো কোন একটা জিহাদও করেননি, তাহলে তোমরা জিহাদ কোথায় পেলে?”

এভাবে কুরআন সুন্নাহকে তিনি দলীলরূপে পেশ করতে পারতেন না কি? কিন্তু কেন করলেন না?

এর উত্তর মোটামুটি সকলের কাছেই পরিষ্কার যে- কুরআন, সুন্নাহ, সীরাতে রাসূল ও সীরাতে সাহাবা দেখতে গেলে দেখা যাবে: কুরআনের পাতায় পাতায় জিহাদের কথা, হাদিসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জিহাদের কথা, রাসূলের সমগ্র জিন্দেগিই জিহাদ, প্রত্যেকজন সাহাবিই মুজাহিদ। এদিকে হাত দিতে গেলেই মুশকিল।

অধিকন্তু তখন প্রশ্ন আসবে যে, রাসূল কি খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? কোনো সাহাবির কি কোনো খানকাহ বা কোনো মুরীদ ছিল? যদি না থাকে, তাহলে ওহে হযরতওয়ালারা, তোমরা খানকাহ কোথায় পেলে?

দুই.

প্রথম ইমাম আবু হানিফা রহ. এর জন্ম ৮০ হিজরিতে আর চতুর্থ ইমাম আহমাদ রহ. এর ইন্তেকাল ২৪১ হিজরিতে। এর মাঝখানে সময় হল ১৬১ বছর। বলতে গেলে সাহাবায়ে কেরামের পর বিশ্বজোড়া ইসলামের বিজয় এ সময়টাতেই হয়েছে। উমাইয়া ও আব্বাসী খলিফারা কাফের রাষ্ট্রগুলো

বিজয় করে ইসলামী ভূখণ্ডে পরিণত করেছেন। হযরতওয়ালার কাছে প্রশ্ন: এ বিজয়গুলো কিভাবে হয়েছে? বাহিনি পাঠানো হয়েছিল কি'না? অস্ত্র চালানো হয়েছিল কি'না? যুদ্ধ হয়েছিল কি'না? মানুষ হত্যা হয়েছিল কি'না?

যদি বলেন, এগুলোর কিছুই হয়নি, যিকিরের দ্বারা বিজয় হয়েছিল: তাহলে লোকজন আপনাকে পাগল বলবে। অতএব, না বলে উপায় নেই যে, এসব কিছুই হয়েছিল।

প্রশ্ন হল, সেগুলো জিহাদ ছিল কি'না? সেগুলোতে উলামায়ে কেরামের সম্মতি ও অংশগ্রহণ ছিল কি'না? সেগুলো উলামায়ে কেরামের নির্দেশনায় শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হতো কি'না? মুজাহিদিনে কেরামের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল উলামায়ে কেরাম বলতেন কি'না? তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ কাজি সাহেবগণ মীমাংসা করতেন কি'না? গনিমতের মাল এবং গোলাম-বাঁদি কাজি সাহেবগণের তত্ত্বাবধানে বণ্টন হতো কি'না? না বলে উপায় নেই যে, এ সব কিছুই হয়েছে।

হযরত ওয়ালার কাছে আরো প্রশ্ন: এসব জিহাদ আইম্মায়ে আরবাআর সামনেই সংঘটিত হয়েছিল কি’না? তাদের সম্মতি ছিল কি’না?

না বলে উপায় নেই যে, তাদের সম্মতিতেই হয়েছিল। বরং বলতে গেলে হানাফি, মালেকি, শাফিয়ি ও হাম্বলিরা এবং আইম্মায়ে আরবাআর শাগরেদ ও ভক্তবৃন্দরাই এসব জিহাদ করেছে, আর আইম্মায়ে আরবাআ মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় মাসায়েল বলে ও সংকলন করে মুজাহিদদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। এগুলো অস্বীকার করার কোন জু নেই। যদি তাই হয়, তাহলে জযবাতিরা জিহাদ কোথায় পেল- এ প্রশ্নের আর উত্তর দেয়ার দরকার নেই আশাকরি। আইম্মায়ে আরবাআসহ অন্য সকল উলামায়ে কেরামের সামনে এবং তাদের প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষ নির্দেশনা ও তত্বাবধানে যেসব জিহাদ হতো, জযবাতিরা সেগুলোই যিন্দা করছে- যখন হযরতওয়ালারা সেগুলো মিটিয়ে দিয়েছে।

তিন.

এ সময়কালে জিহাদ ফরযে আইন ছিল না'কি ফরযে কিফায়া ছিল?

উত্তর: ফরযে কিফায়া ছিল। কারণ, তখন কোন মুসলিম ভূমি কাফের মুরতাদদের দখলে ছিল না। সাময়িক সময়ে যদি কোথাও কাফেরদের থেকে আক্রমণ হতো, মুসলমানগণ দ্রুত তা প্রতিহত করে দিতেন। মুসলিম ভূমি কাফেরদের দখলে থেকে যাওয়ার মতো অবস্থা হতো না। বরং মুসলমানগণ নতুন নতুন বিজয়াভিযান পরিচালনা করে দিন দিন কাফেরদের ভূমি দখল করতে থাকতেন। মোটকথা তখন জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল, ফরযে আইন ছিল না। আর ফরযে কিফায়ার বিধান আমাদের জানা আছে যে, কতক মুসলমান জিহাদ করতে থাকলে বাকি মুসলমানদের উপর জিহাদে বের হওয়া আবশ্যক থাকে না। ইচ্ছে করলে বের হতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে অন্যান্য কাজ-খেদমতেও মশগুল থাকতে পারেন। এ সময়ে জিহাদ উত্তম না'কি ইলম নিয়ে মশগুল থাকা উত্তম তা একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা। কারও কারও মতে জিহাদ উত্তম, আবার কারও কারও মতে ইলমী মাশগালা উত্তম।

যেহেতু সে সময়ে জিহাদ ফরযে আইন ছিল না, তাই যার ইচ্ছা জিহাদ করতেন, যার ইচ্ছা ইলমসহ অন্যান্য খিদমত করতেন। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনটাতেই কোন বাধা নিষেধ নেই। পক্ষান্তরে বর্তমানে মুসলিম ভূমিগুলো কাফের-মুরতাদদের দখলদারিত্বের শিকার হওয়ায় জিহাদ ফরযে আইন। মা'জূর নয় এমন প্রত্যেক মুসলমানের উপর জিহাদে শরীক হওয়া নামায-রোযার মতোই ফরযে আইন। এ সময়ে কেউ জিহাদ থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু আইম্মায়ে আরবাআর যামানা তার ব্যতিক্রম ছিল। অতএব, সে যামানার কোন আলেম যদি জিহাদে শরীক নাও হতেন, তাহলেও তা এ বিষয়ের দলীল হতো না যে, আলেমদের জন্য বা অন্যান্য মুসলমানদের জন্য জিহাদ নাজায়েয। তখন জিহাদও ফরযে কিফায়া ছিল, ইলমও ফরযে কিফায়া ছিল। যার যেটা ইচ্ছা করতেন। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা ব্যতিক্রম। এ সময়ে জিহাদ একেবারে তরক করে দিয়ে অন্যান্য খিদমতে লিপ্ত থাকা নাজায়েয। আইম্মায়ে আরবাআর যামানা দিয়ে বর্তমান যামানার উপর আপত্তি করা হযরতওয়ালাদের ইলমী কমতি বরং জাহালত ও অজ্ঞতার প্রমাণ।

চার.

আইম্মায়ে আরবাআ যদি জিহাদ না করে থাকেন (অবশ্য তাদের ব্যাপারে এ কথা সঠিক নয়, আমরা পরে তা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ), তাহলে এর দ্বারা জিহাদ হারাম প্রমাণ হয় না। বেশির চেয়ে বেশি এ কথা বলা যায় যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ব্যক্তির জন্য জিহাদ না করে থাকার বৈধতা আছে। স্বয়ং আইম্মায়ে আরবাআর যামানাতেই আরো শত-হাজারো উলামা জিহাদ করে গেছেন। যদি আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ না করার দ্বারা জিহাদ হারাম প্রমাণিত হয়, তাহলে তখনকার সময়ে যেসকল উলামা ও মুসলমান জিহাদ করেছেন, তারা কি সব হারাম করেছেন? তখন যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছে সেগুলো কি সব হারাম হয়েছে? বরং প্রমাণিত আছে যে, আইম্মায়ে আরবাআর শাগরেদগণই সেসব জিহাদ করেছেন এবং আইম্মায়ে আরবাআ সেগুলো সমর্থন করে গেছেন। এরপরও হযরতওয়ালারা কিভাবে যে আইম্মায়ে আরবাআকে জিহাদের বিপক্ষে দাড় করাচ্ছেন এবং জিহাদ হারাম সাব্যস্থ করছেন বোধগম্য নয়।

পাঁচ.

আইম্মায়ে আরবাআসহ তখনকার সকল উলামা-মাশায়েখ মূলত জিহাদি ছিলেন। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বিভিন্নভাবে তারা জিহাদ করে গেছেন ও সমর্থন করে গেছেন। তাদের জিহাদি খিদমাতগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরির ছিল। যেমন:

ক. তখনকার বহু ইমাম সরাসরি জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। যেমন- আবু হানিফা রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদ ও ফিকহি বোর্ডের অন্যতম সদস্য, আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.)। [দেখুন: সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- যাহাবি: ৭/৩৬৫, ৩৭৬]; ইমাম মালেক, কাযি আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদ আসাদ ইবনুল ফুরাত রহ. (২১৩ হি.)। [দেখুন: সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- যাহাবি: ৮/৩৫০-৩৫১]।

খ. অনেকে রিবাত তথা সীমান্ত পাহারার জন্য দূর-দূরান্তের সীমান্তে চলে গেছেন এবং রিবাতরত অবস্থায়ই ইন্তেকাল

করেছেন। যেমন- ইমামু আহলিশ শাম ইমাম আওযায়ী রহ. (১৫৭ হি.)। [দেখুন: আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া- ইবনে কাসীর: ১০/১২৮]; হাফেয আবু ইসহাক আলজাওহারি রহ. (২৪৭ হি.) (ইমাম মুসলিমসহ সুনানে আরবাআর সকলেই যার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন)। [দেখুন: সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- যাহাবি: ৯/৫১০-৫১১]।

গ. জিহাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং জিহাদের প্রয়োজনীয় মাসআয়েল বয়ানের জন্য স্বতন্ত্র কিতাব লিখে দিয়েছেন। যেমন: কিতাবুল জিহাদ- ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.); আসসিয়ারুস সগীর ও আসসিয়ারুল কাবীর- ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.)।

ঘ. হাদিসের কিতাবাদিতে জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলো স্বতন্ত্রভাবে এবং স্বতন্ত্র ও *উপযুক্ত শিরোনামে বিভক্ত করে করে বর্ণনা করেছেন; যেন মুজাহিদদের হাদিসের প্রয়োজনও পূরণ হয়, হাদিস থেকে উদঘাটিত মাসআলারও অবগতি হয়। যেমন: কিতাবুল আসার- আবু হানিফা, মুআত্তা- মালেক, কুতুবে সিত্তাহ ও এ জাতীয় অন্যান্য হাদিসের কিতাব।

ঙ. ফুকাহায়ে কেরাম ফিকহের কিতাবাদিতে কিতাবুল জিহাদ, সিয়ার, মাগাজি, কিতালু আহলির রিদ্দাহ, কিতালু আহলিল বাগি ইত্যাদি শিরোনামে জিহাদের প্রয়োজনীয় সকল মাসআলা বলে দিয়েছেন, যেন মুজাহিদগণের মাসআলার প্রয়োজন হলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন।

চ. কাযি ও বিচারকগণ মুজাহিদদের মাঝে সংঘটিত সকল বিবাদ-বিসম্বাদের সুরাহা করে দিয়েছেন। গনিমত, গোলাম-বাঁদি ও বিজিত ভূমি মুসলিম উমারা, উলামা ও কাযিগণের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে বণ্টিত হয়েছে।

ছ. যারা জিহাদে সরাসরি অংশ নিতে পারেননি, তারা নিজেদের সম্পদ দিয়ে অন্য মুসলমানদের জিহাদে পাঠিয়ে জিহাদে অংশ নিয়েছেন।

জ. উলামায়ে কেরাম সাধারণ মুসলমানদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এজন্য প্রতি বছরই কাফের ভূমিতে মুসলিম সেনাবাহিনি হামলা করতেন আর নতুন নতুন এলাকা বিজয় করতেন। কোথাও কখনও হামলা হলে নিজেদের জান-মাল উৎস্বর্গ করে মুসলমানগণ তা প্রতিহত করতেন। এজন্য তখন

এমন হয়নি যে, কোন মুসলিম ভূখণ্ড কাফেররা দখল করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

ঝ. মুজাহিদগণ জিহাদে যাওয়ার পর থেকে নামাযান্তে মসজিদে মসজিদে তাদের জন্য দোয়া হতো। তাদের দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাআলা বিজয় দিতেন।

ঞ. জিহাদ থেকে ফেরার পর মুজাহিদদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ইস্তেকবাল করা হতো এবং আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা হতো।

এ ছিল আইম্মায়ে আরবাআর যামানার উলামা-মাশায়েখ ও তাদের জিহাদ প্রেমের অবস্থা। পক্ষান্তরে আমাদের বর্তমান হযরতওয়ালাদের অবস্থা হল:

- নামাযে পর্যন্ত তারা জিহাদের আয়াতগুলোর তিলাওয়াত শুনতে নারাজ। এতে না'কি তাদের খুশু-খুজু নষ্ট হয়। যদি কেউ তাদের সামনে সঠিক জিহাদের আলোচনা তোলেন, তাহলে তাদের অবস্থা হয়ে যায়:

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

“তারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির ন্যায়।”- মুহাম্মাদ ২০

- জিহাদের আয়াত ও হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং সে সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল তো পরের কথা কথা; তাফসির, হাদিস বা ফিকহের পৃষ্ঠাগুলো উল্টিয়ে দেখতেও তারা নারাজ। আর দু’চার পৃষ্ঠা উল্টালেও সঠিকভাবে বুঝতে চান না। উল্টো বুঝেন। আল্লাহ রক্ষা করুন, অবস্থা যেন আল্লাহ তাআলা যেমন বলেছেন:

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

“তারা ঘরে বসে থাকা লোকদের সাথে অবস্থান করাকেই পছন্দ করে নিয়েছে এবং তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারে না।”- তাওবা ৮৭

কিন্তু ফতোয়াবাজি করার সময় এমন ভাব দেখান, এসব ব্যাপারে যেন তিনিই বিশ্বের সবচেয়ে বিজ্ঞ লোকটি। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

“যখন তারা কথা বলবে, (বাকপটুতার কারণে) তুমি তাদের কথা শুনতেও চাইবে।”- মুনাফিকুন ৪

- গা বাঁচিয়ে যে শুধু খানকাহে পড়ে থাকেন তাই না, নিজেদের সাধু প্রমাণ করতে জিহাদ হারাম ফতোয়া দিতেও লজ্জা বোধ করেন না। যেমনটা নবি যুগের জিহাদবিদ্বেষীরা বলতো:

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ

“যদি (শরয়ী) যুদ্ধ বলে জানতাম, তাহলে অবশ্যই তোমাদের অনুরসণ করতাম।”- আলে ইমরান ১৬৭

- মুজাহিদদের আলোচনা আসলে অতি জযবাতি, দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞ, সন্ত্রাসী, ফাসাদি, অপরিণামদর্শী, খাহেশপূজারি ইত্যাদি গালিগালাজ মুখে ফেনা আসা পর্যন্ত করতে থাকেন। যেমনটা নবি যুগের জিহাদবিদ্বেষীরা মুজাহিদদের ব্যাপারে বলতো:

غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ

“এদের ধর্ম এদের বিভ্রান্ত করেছে।”- আনফাল ৪৯

لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا

“এরা যদি আমাদের কাছে থেকে যেতো তাহলে মারাও যেতো না, (অন্যদের হাতে) মারাও পড়তো না।”- আলে ইমরান ১৫৬

لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا

“এরা যদি আমাদের কথা শুনতো (এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ করতো) তাহলে (অন্যদের হাতে) মারা পড়তে হতো না।”- আলে ইমরান ১৬৮

- কোন মুরীদ বা ছাত্রের মাঝে জিহাদের আভাস দেখলে তার সনদ কেটে দেন এবং খানকাহ ও মাদ্রাসা থেকে বের করে দেন। যেমনটা নবি যুগের জিহাদবিদ্বেষীরা করতে চাইতো:

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

“আমরা মদীনায় ফিরে গেলে মর্যাদাবান লোকেরা হীনদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে।”- মুনাফিকুন ৮

এ হল হযরতওয়ালাদের মোটামুটি অবস্থা। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাজতে রাখুন। আমীন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি হযরতওয়ালার এ আপত্তির জওয়াব পেয়ে যাবেন, “তারা সবেই জিহাদ না করার কারণে সব জাহান্নামী হবে? বা গুনাহে কবীরাতে লিপ্ত?”

উত্তর পরিষ্কার যে, তারা জাহান্নামীও হবে না, কবীরা গুনাহেও লিপ্ত না। কারণ, তারা সকলেই মুজাহিদ বা অন্তত জিহাদপ্রেমী ছিলেন। হযরতওয়ালাদের মতো জিহাদবিদ্বেষী ছিলেন না। প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যার যেভাবে সম্ভব জিহাদের খেদমত করে গেছেন। অধিকন্তু যদি তারা কিছু নাও করতেন, তথাপি জাহান্নামী হতেন না বা কবীরা গুনাহ হতো না। কারণ,

এখনকার মতো জিহাদ তখন ফরযে আইন ছিল না। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৩ (আবু হানিফা রহ. এর জিহাদ)

আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ প্রসঙ্গ:

হযরতওয়ালা বহু জোর গলায় দাবি করেছেন যে, আইম্মায়ে আরবাআ কেউ জিহাদ করেননি। তরবারি ধরেননি। ধরতেও বলেননি। এর দ্বারা তিনি জিহাদ হারাম হওয়ার পক্ষে দলীল দিয়েছেন।

ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য ধারণা রাখেন এমন কারো কাছেই অস্পষ্ট নয় যে, হযরতওয়ালা এখানে কত মাত্রার অজ্ঞতার প্রমাণ দিয়েছেন। যদি ইতিহাসের কিতাবাদির দিকে একটু নজর দেন, তাহলে তিনি নিজেও লজ্জিত হবেন। আমরা

ইনশাআল্লাহ আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করবো।

এর আগে প্রথমেই বলে রাখি- যেমনটা আগেও বলেছি:

- আইম্মায়ে আরবাআর যামানায় জিহাদ ফরযে কিফায়া ছিল। তাই তখন কেউ জিহাগে না গেলে আপত্তির কিছু নেই। এর দ্বারা ফরযে আইনের সময়েও জিহাদে না যাওয়ার কিংবা জিহাদ হারাম সাব্যস্ত হয় না।

- দ্বিতীয়ত তখনকার সময়ে যত জিহাদ হয়েছে আইম্মায়ে আরবাআ সেগুলো সমর্থন করেছেন। হাদিস ও ফিকহ সংকলন করে জিহাদের মাসআলা মুজাহিদদের সামনে তুলে ধরেছেন। অধিকন্তু আইম্মায়ে আরবাআর শাগরেদ, অনুসারি ও ভক্তবৃন্দদের দ্বারাই তখনকার জিহাদগুলো হয়েছিল। এরপরও তাদেরকে জিহাদ বিরোধী দাঁড় করানো তাদের নামে অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

***

ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং জিহাদ:

আশ্চর্যের বিষয় যে, হযরতওয়ালা আবু হানিফা রহ. এর মুকাল্লিদ হয়েও নিজ ইমাম সম্পর্কে এতটা অজ্ঞ। অথচ সকলেরই জানা যে, জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণেই আবু হানিফা রহ. নির্যাতিত হয়েছেন এবং অবশেষে শহীদি মৃত্যু লাভ করেছেন। উমাইয়া-আব্বাসী উভয় আমলেই জালেম শাসকের বিরুদ্ধে আবু হানিফা রহ. বিদ্রোহ করেছিলেন। এ কারণে উভয় যামানাতেই তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

জুলুম-অত্যাচার এবং আহলে বাইতের প্রতি নির্যাতনের কারণে আবু হানিফা রহ. উমাইয়াদের প্রতি নারাজ হয়ে পড়েছিলেন। এ শাসন পরিবর্তন হয়ে ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার তিনি স্বপ্ন দেখতেন। এ সময়ে ১২১ হিজরিতে আহলে বাইতের হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতি যাইনুল আবিদিন হযরত যায়দ বিন আলি রহ. গোপনে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহের আহ্বান জানান। আস্তে আস্তে তার দল ভারি হতে থাকে। বিভিন্ন দিক থেকে উলামা-মাশায়েখ ও সাধারণ মুসলমান গোপনে তার হাতে বাইয়াত হতে থাকে।

ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪ হি.) বলেন,

استمر يبايع الناس في الباطن في الكوفة، على كتاب الله وسنة رسوله حتى استفحل أمره بها في الباطن. اهـ

“যায়দ বিন আলী রহ. গোপনে কূফায় কুরআন সুন্নাহর উপর লোকদের থেকে বাইয়াত নিতে থাকেন। এভাবে গোপনে গোপনে সেখানে তার দল ভারি হতে থাকে।”- আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৯/৩৫৮

আবু হানিফা রহ. গোপনে যায়দ বিন আলি রহ.কে সমর্থন করেন। তার পক্ষে যোগ দেয়ার জন্য লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। নিজে অসুস্থ থাকায় যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তবে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত যায়দ বিন আলি রহ. কামিয়াব হতে পারেননি। বিপদ মূহুর্তে কূফাবাসী তাকে পরিত্যাগ করে। বর্ণিত আছে, আবু হানিফা রহ. এমনটাই আশঙ্কা করেছিলেন। তথাপি তিনি

গোপনে তার পক্ষাবলম্বন করেন।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন,

وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلك قال الأوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف يعني قتال الظلمة فلم نحتمله، وكان من قوله: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول، فإن لم يؤتمر له فبالسيف، على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن. اهـ

“জালেম ও অত্যাচারি শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে আবু হানিফা রহ. এর অভিমত প্রসিদ্ধ। এ কারণেই আওযায়ী রহ. বলেন, ‘আবু হানিফাকে আমরা সকল বিষয়ে বরদাশত করেছি। কিন্তু যখন তিনি তরবারি তথা জালেমদের বিরুদ্ধে কিতালের পর্ব নিয়ে আসলেন, তখন আর বরদাশত করতে পারিনি’।

আবু হানিফা রহ. এর অভিমত ছিল, আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার (প্রথমে) যবান দ্বারা ফরয, তাতে কাজ না হলে তরবারি দ্বারা; যেমনটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। ...

যায়দ বিন আলী রহ. এর সাথে তার ঘটনা প্রসিদ্ধ। তিনি গোপনে তার কাছে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন এবং ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, তাকে নুসরত করা এবং তার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করা আবশ্যক। তদ্রূপ, আব্দুল্লাহ বিন হাসান তনয় মুহাম্মাদ ও ইব্রাহিমের সাথেও তার ঘটনা প্রসিদ্ধ।”- আহাকমুল কুরআন ১/৮৭

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ রহ. ও ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ রহ.-এর আলোচনা ইনশাআল্লাহ আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আলোচনায় আসবে।

১২১ হিজরির আলোচনায় ইবনুল ইমাদ রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,

وفيها قتل الإمام الشهيد زيد بن عليّ بن الحسين، رضي الله عنهم، بالكوفة، وكان قد بايعه خلق كثير، وحارب متولي العراق يومئذ لهشام بن عبد الملك، يوسف بن عمر الثقفي ... وكان ممن بايعه منصور بن المعتمر، ومحمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، وهلال

بن خبّاب بن الأرتّ، قاضي المدائن، وابن شبرمة، ومسعر بن كدام، وغيرهم، وأرسل إليه أبو حنيفة بثلاثين ألف درهم، وحثّ النّاس على نصره، وكان مريضا. اهـ

“এ বৎসরে শহীদ ইমাম যায়দ বিন আলী বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম *কূফায় শহীদ হন। অসংখ্য লোক তার হাতে বাইয়াত দিয়েছিল। তিনি তখনকার খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ইরাকের গভর্নর ইউসুফ বিন উমার আসসাকাফির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ... তার হাতে যারা বাইয়াত দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন: মানসূর ইবনুল মু’তামির, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলা, মাদায়িনের কাযি হিলাল ইবনু খাব্বাব ইবনুল আরাত্ত, ইবনু শুবরুমা, মিসআর বিন কিদাম এবং আরো অনেকে। **আবু হানিফা রহ. তার কাছে ত্রিশ হাজার দিরহাম (আর্থিক সাহায্য) পাঠান এবং তাকে নুসরত করার জন্য লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন (তাই যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি)**।”- শাযারাতুয যাহাব ২/২৩০

তবে আল্লাহ তাআলার ফায়াসালা ভিন্ন ছিল। যায়দ বিন আলী রহ. পরাজিত ও নিহত হন। তার পর আহলে বাইতের আরো

কয়েকজন উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তবে সবাই পরাজিত হন। আহলে বাইতের পক্ষাবলম্বন করায় আবু হানিফা রহ.কে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। জেলে বন্দী হন। অমানবিক প্রহারের শিকার হন। অবশেষে নির্যাতনের মুখে তিনি কূফা ছেড়ে মক্কায় চলে যান। সেখানকার মুহাদ্দিসিন ও ফুকাহাদের থেকে ইলম তলব ও গবেষণায় মগ্ন হন। অবশেষে যখন আব্বাসীদের হাতে উমাইয়াদের পতন হয় এবং পরিস্থিতি শান্ত হয়, তখন আবার কূফায় ফিরে আসেন।

আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

আব্বাসীদের হাতে উমাইয়াদের পতনের পর যখন পরিস্থিতি শান্ত হয়, তখন আবু হানিফা রহ. মক্কা থেকে আবার কূফায় ফিরে আসেন। আব্বাসীরা ক্ষমতা লাভের পূর্বে আহলে বাইতের পক্ষে ছিল। অধিকন্তু তারা ছিল রাসূল বংশের লোক। তিনি ধারণা করেছিলেন, আব্বাসীরা ইনসাফ করবে। আহলে বাইতের প্রতি সুবিচার করবে। জুলুম-অত্যাচারমুক্ত শাসন করবে। কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর আব্বাসীরা জুলুম শুরু করে। আহলে বাইতের লোকদের ধরে ধরে হত্যা করতে থাকে।

অমানবিক পন্থায় নির্যাতন করতে থাকে। সন্দেহজনকভাবে মুসলমানদের হত্যা করতে থাকে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করতে থাকে। আবু হানিফা রহ. এর ধারণা পাল্টে যায়। পরিস্থিতি আবার অশান্ত হয়ে পড়ে। আহলে বাইতের পক্ষ থেকে আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মেঘ দানা বাঁধতে থাকে।

একসময় আহলে বাইতের দুই ভাই **মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান রহ. (নফসে যাকিয়্যা**) এবং **ইব্রাহিম বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান রহ**. গোপনে আব্বাসী খলিফা আবু জা'ফর মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানান। মুহাম্মাদ রহ. মদীনায় এবং ইব্রাহিম রহ. বসরায় লোকদের থেকে বাইয়াত নেন। প্রথমে নফসে যাকিয়্যা রহ. মদীনায় বিদ্রোহ করেন। ইমাম মালেক রহ. তার হাতে বাইয়াত হওয়ার ফতোয়া দেন (যার আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ)। তবে তিনি কামিয়াব হতে পারেননি। ১৪৫ হিজরিতে তিনি পরাজিত ও শহীদ হন।

নফসে যাকিয়্যা রহ. শহীদ হওয়ার পর তার ভাই ইব্রাহিম রহ.

বসরায় মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাইয়াত নেন। গোপনে গোপনে তার দল যথেষ্ট ভারি হতে থাকে। সৈন্য সংখ্যা এক লাখে পৌঁছে যায়। আবু হানিফা রহ. কূফায় ছিলেন। তিনি ইব্রাহিম রহ.কে সমর্থন করেন। তার পক্ষে যোগ দেয়ার জন্য গোপনে লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। অবশ্য শেষে তিনিও কামিয়াব হতে পারেননি। পরাজিত ও শহীদ হন। খলিফা মানসূর বিভিন্নভাবে আন্দাজ করতে পারে যে, আবু হানিফা তার বিরোধী। ফলে তার উপর নির্যাতনের খড়্গ নেমে। অবশেষে নির্যাতনের মুখেই তিনি শহীদ হন।

ইবনুল ইমাদ রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,

وكان خرج مع إبراهيم كثير من القرّاء، والعلماء، منهم: هشيم، وأبو خالد الأحمر [3] وعيسى بن يونس، وعبّاد بن العوّام، ويزيد بن هارون، وأبو حنيفة، وكان يجاهر في أمره، ويحثّ النّاس على الخروج معه، كما كان مالك يحثّ النّاس على الخروج مع أخيه محمّد.

وقال أبو إسحاق الفزاريّ لأبي حنيفة: ما اتّقيت الله حيث حثثت أخي على الخروج مع إبراهيم فقتل، فقال: إنه كما لو قتل يوم بدر. اهـ

“ইব্রাহিম রহ. এর পক্ষ হয়ে অনেক মাশায়েখ ও আলেম-উলামা বিদ্রোহ করেছিলেন। যেমন: হুশাইম, আবু খালেদ আলআহমার, ঈসা বিন ইউনুস, আব্বাদ ইবুল আওয়াম, ইয়াজিদ বিন হারুন ও আবু হানিফা রহ.। আবু হানিফা রহ. প্রকাশ্যেই তার পক্ষ নিয়েছিলেন। তার সাথে মিলে বিদ্রোহ করার জন্য লোকদের উদ্বুদ্ধ করতেন, যেমন ইমাম মালেক রহ. তার ভাই মুহাম্মাদের সাথে মিলে বিদ্রোহের জন্য লোকদের উদ্বুদ্ধ করতেন।

আবু ইসহাক ফাযারি রহ. আপত্তি করে আবু হানিফা রহ.কে বলেছিলো, ‘আপনি তো আল্লাহকে ভয় করেননি। আপনি আমার ভাইকে ইব্রাহিমের পক্ষ হয়ে বিদ্রোহে করতে উৎসাহ দিয়েছেন ফলে সে নিহত হয়েছে।’ তিনি উত্তর দেন, ‘তোমার ভাইয়ের শাহাদাত বদরের দিনে শহীদ হওয়ার মতোই মর্যাদাপূর্ণ’।”- শাজারাতুয যাহাব ২/২০৩

খতীব বাগদাদি রহ. (৪৬৩ হি.) আবু ইসহাক ফাযারি রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

قتل أخي مع إبراهيم الفاطمي بالبصرة، فركبت لأنظر في تركته، فلقيت أبا حنيفة، فقال لي: من أين أقبلت؟ وأين أردت؟ فأخبرته أني أقبلت من المصيصة، وأردت أخا لي قتل مع إبراهيم، فقال لو أنك قتلت مع أخيك كان خيرا لك من المكان الذي جئت منه، قلت: فما منعك أنت من ذاك؟ قال: لولا ودائع كانت عندي وأشياء للناس، ما استأنيت في ذلك. اهـ

“ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার বংশধর ইব্রাহিমের সাথে বসরায় আমার ভাই নিহত হয়। আমি তার রেখে যাওয়া সম্পদ দেখার জন্য সওয়ার হয়ে রওয়ানা দিলাম। পথিমধ্যে আবু হানিফার সাথে দেখা হল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছে, আর কোথায় যাচ্ছে? আমি জানালাম যে, মিসসিসাহ্ থেকে এসেছি। আমার এক ভাই যে ইব্রাহিমের সাথে নিহত হয়েছে, তাকে দেখতে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি যেখান থেকে এসেছো, তার চেয়ে যদি তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে নিহত হতে তাহলে সেটাই তোমার জন্য অধিক ভাল ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘তাহলে এ থেকে আপনাকে কিসে বাঁধা দিল? তিনি উত্তর দিলেন, যদি আমার কাছে লোকজনের রাখা অনেকগুলো আমানত ও গচ্ছিত সম্পদ না থাকতো, তাহলে আমি এতে কোন শিথিলতা করতাম না।”- তারিখে বাগদাদ ১৫/৫১৬-৫১৭

অর্থাৎ আবু হানিফা রহ. এর কাছে অনেকের রাখা অনেক আমানতের মাল ছিল। তিনি ভয় করছিলেন যে, যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হয়ে যান, তাহলে এ আমানতের মালগুলো লোকজনের হাতে পৌঁছাতে পারবেন না। এ জন্য তিনি সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেননি।

ইমাম যাহাবি রহ. (৭৪৮ হি.) বলেন,

وقد روي أن المنصور سقاه السم فمات شهيداً رحمه الله؛ سمّه لقيامه مع إبراهيم. اهـ

"বর্ণিত আছে, ইব্রাহিম রহ. এর পক্ষালম্বনের কারণেই খলিফা মানসূর আবু হানিফা রহ.কে বিষ প্রয়োগে শহীদ করে।"- আলইবার ফি খাবারি মান গাবার ১/১৬৪

প্রিয় পাঠক! এই হলেন আবু হানিফা রহ.। জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যিনি শহীদ হয়েছেন। আর আমাদের

হযরতওয়ালার বলছেন, আবু হানিফা রহ. না'কি কোনো জিহাদ করেননি। কোনো তরবারি ধরেননি। ধরতেও বলেননি। এ যেন দিবালোকে সূর্য অস্বীকার করারই নামান্তর।

লক্ষ্যণীয়, উমাইয়া-আব্বাসী উভয় খেলাফতই কুরআন সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে ক্ষমতার দখল ও টিকানোর স্বার্থে তারা অনেকের উপর জুলুম করেছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ অনেক সময় অন্যায় ব্যবহার করেছে। কিন্তু শাসন সম্পূর্ণই ইসলামী ছিল। বরং সে যুগটাই তো ছিল ইসলামের স্বর্ণ যুগ। হাদিস ও ফিকহ সংকলনের কাজ তো সে যামানাতেই হয়েছে। সালাফে সালেহিন আইম্মায়ে কেরাম তো সে যুগেই জন্মগ্রহণ করেছেন। এতদসত্ত্বেও শুধু ফিসক-জুলুমের কারণে আবু হানিফা রহ.

তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তাহলে আজ যদি তিনি এ তাগুতি শাসন দেখতেন- যারা ইসলামকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করে কুফর গ্রহণ করেছে এবং ইসলামকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য তাদের সর্ব-সামর্থ্য ব্যয় করছে- যদি আবু হানিফা রহ. এ তাগুতি শাসন দেখতেন, তাহলে তিনি কি করতেন? উত্তরের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু উম্মাহর বীর সন্তানরা যখন সালাফে সালেহিনের পথ ধরে জীবন বাজি রেখে আল্লাহর শরীয়তের জন্য তাগুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন, তখন আমাদের হযরতওয়ালারা তাদের শানে খাহেশপূজারি, জযবাতি ইত্যাদি ঘৃণ্য বিশেষণ ব্যবহার করছেন। হে আল্লাহ! তোমার কাছেই

সকল অভিযোগ। তুমিই তোমার দ্বীনের হিফাজতকারী।

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৪ (মালেক রহ. এর জিহাদ)

ইমাম মালেক রহ. এর জিহাদ

আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, নফসে যাকিয়্যাহ মুহাম্মাদ রহ. মদীনায় এবং তার ভাই ইব্রাহিম রহ. বসরায় খলিফা মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ইব্রাহিম রহ.কে আবু হানিফা রহ. সমর্থন করেন, সহায়তা করেন এবং তার পক্ষে ফতোয়া দেন। আর মুহাম্মাদ রহ.কে ইমাম মালেক রহ. সমর্থন করেন এবং তার পক্ষে ফতোয়া দেন।

ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪হি.) বলেন,

وقد روى ابن جرير عن الإمام مالك: أنه أفتى الناس بمبايعته، فقيل له: فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين

وليس لمكره بيعة. فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك، ولزم مالك بيته. اهـ

"ইবনে জারির (ত্ববারি) রহ. ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি লোকদের মুহাম্মাদ রহ. এর হাতে বাইয়াত হতে ফতোয়া দেন। তখন তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, আমাদের গর্দানে তো মানসূরের বাইয়াত বিদ্যমান আছে (তা ভঙ্গ করে আমরা কিভাবে মুহাম্মাদকে বাইয়াত দেবো)? তিনি উত্তর দেন, তোমাদেরকে তো (বাইয়াত দিতে) জবরদস্তি বাধ্য করা হয়েছিল। আর যাকে জবরদস্তি বাধ্য করা হয় (শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে) তার বাইয়াত কার্যকর হয় না। মালেক রহ. এর ফতোয়ার কারণে তখন লোকজন তার হাতে বাইয়াত দেয়। আর মালেক রহ. আপন গৃহে বসে পড়েন (এবং বাহিরে যাওয়া বন্ধ করে দেন)।"- আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ১০/৮৭

কাজি ইয়াজ রহ. (৫৪৪হি.) দারাওয়ারদি রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

أفتى الناس عند قيام محمد بن عبد الله بن حسن العلوي المسمى بالمهدي بأن بيعة أبي جعفر لا تلزم لأنها على الإكراه. اهـ

“আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান- যিনি মাহদি উপাধী ধারণ করেছিলেন- তিনি যখন বিদ্রোহ করেন, তখন মালেক রহ. ফতোয়া দেন যে, আবু জা’ফর (মানসূর)- এর বাইয়াত মেনে চলা আবশ্যক নয়। কেননা, তা জবরদস্তি গ্রহণ করা হয়েছিল।”- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩৪

ইমাম মালেক রহ. এর উক্ত ফতোয়ার কথা কতক হিংসুক লোক মদীনায় মানসূরের পক্ষ থেকে নিয়োজিত তৎকালীন গভর্নর জা’ফর বিন সুলাইমানের কাছে পৌঁছায়। এতে জা’ফর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং মালেক রহ.কে অমানবিক নির্যাতন করে। ফলে মালেক রহ. আজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়েন। এ পঙ্গু অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেন। বলা হয়, নির্যাতনের পর মালেক রহ. আর কখনোও বাহিরে যেতেন না। মসজিদে জামাতে শরীক হতেন না। জুমআতেও যেতেন না। কারণ, বেত্রাঘাতের কারণে তার অবস্থা এমন হয়ে পড়েছিল যে, বেশিক্ষণ অজু ধরে রাখতে পারতেন না। বলা হয়, এজন্যই তিনি জুমআয় ও জামাতে শরীক হতেন না।

কাজি ইয়াজ রহ. মুনযির রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, বনী মাখযুমের এক ব্যক্তি মালেক রহ. এর ফতোয়ার ব্যাপারে জা’ফর বিন সুলাইমানের কাছে নালিশ করেছিল। এরপর জা’ফর তা মানসূরকে পত্র মারফত অবগত করে। মানসূর মালেক রহ.কে প্রহার করার আদেশ দেয়। **কাজি ইয়াজ রহ. বর্ণনা করেন,**

فكتب بذلك جعفر إلى الخليفة فكتب إليه: أن اجلده. فجلده ومد يده بين العقابين فلذلك كان لا يأتي المسجد لإنزال ريح تخرج من موضع الكتف. اهـ

“জা’ফর এ ব্যাপারে খলিফার কাছে পত্র লিখে। খলিফা উত্তর পাঠায়, ‘মালেককে প্রহার কর’। এতে জা’ফর তাকে বেত্রাঘাত করে। দু’টি পিলারের মাঝখানে তার হাত টানা দেয়া হয়। এ কারণেই তিনি মসজিদে যেতেন না। কারণ, কাঁধের দিক থেকে বায়ু বের হতো।”- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩৬

কাজি ইয়াজ রহ. ওয়াকিদি রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

فغضب جعفر ودعا به فاحتج عليه فما رفع إليه. ثم جره ومده فضربه بالسياط ومدت يده حتى انخلعت كتفه وفي رواية عنه ومدت يداه حتى انخلع كتفاه وكذلك اختلف على مصعب الزبيري. وقال الحنيني بقي مالك بعد الضرب مطابق اليدين لا يستطيع أن يدفعهما وارتكب منه أمر عظيم فو الله لمالك بعد ذلك الضرب في رفعة في الناس وعلو وإعظام حتى كأنما كانت تلك الأسواط حلياً حلي بها. اهـ

“নালিশ শুনে জা’ফর ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। মালেক রহ.কে ডেকে দরবারে হাজির করায়। উত্থাপিত নালিশের ভিত্তিতে তাকে অভিযুক্ত করে। এরপর তাকে নিয়ে টানা-হেঁচরা করে। সটান করে টানা দেয়। তারপর চাবুক দ্বারা বেত্রাঘাত করে। তার এক হাত এত সজোরে টানা হয় যে, কাঁধ আপন জায়গা থেকে সরে পড়ে। তার থেকে অন্য বর্ণনায় আছে, উভয় হাত ধরে সজোরে টানা হয় ফলে উভয় কাঁধ আপন স্থান থেকে সরে পড়ে। ... হুনাইনি রহ. বলেন, এরপর থেকে মালেক রহ. এর উভয় হাত পঙ্গু হয়ে পড়ে। হাত নাড়ানোর সামর্থ্য তার ছিল না। তার সাথে নিদারুন অমানবিক আচরণ করা হয়। আল্লাহর কসম! এ নির্যাতনের পর থেকে লোকজনের নিকট মালেকের সম্মান ও মর্যাদা বাড়তে থাকে। যেন ঐসব চাবুক কতগুলো অলংকার ছিল আর তিনি সেগুলো পরিধান করে সুসজ্জিত হয়েছেন।”- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩০-১৩১

মুতাররিফ রহ. বলেন,

فرأيت آثار السياط في ظهره قد شرحته تشريحاً ... خلعوا كتفيه حتى كان ما يستطيع أن يسوي رداءه.اهـ

“মালেক রহ. এর পৃষ্ঠে আমি চাবুকের চিহ্ন দেখেছি। আঘাতে পৃষ্ঠে গভীর ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। ... তারা তার কাঁধ আপন স্থান থেকে সরিয়ে ফেলেছিল। এমনকি তিনি তার চাদরও সোজা করতে পারতেন না।”- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩৩

কাজি ইয়াজ রহ. আরো বর্ণনা করেন,

لما ضرب مالك رحمه الله تعالى ونيل منه حمل مغشياً عليه فدخل الناس عليه فأفاق فقال: أشهدكم إني جعلت ضاربي في حل. اهـ

“মালেক রহ.কে যখন বেত্রাঘাত ও নির্যাতন করা হল, তখন বেহুঁশ অবস্থায় তাকে বহন করে আনা হল। এরপর লোকজন তার ঘরে প্রবেশ করল। তখন তিনি হুঁশে আসেন। হুঁশে এসে বলেন, আমি তোমাদের সাক্ষ্যি রাখছি যে, আমি আমার বেত্রাঘাতকারীকে মাফ করে দিয়েছি।”- তারতিবুল মাদারিক

২/১৩২

উল্লেখ্য, বেত্রাঘাতকারী মুসলামান ছিল তাই তাকে মাফ করে দিয়েছেন। আর আমাদের বর্তমান তাগুতগুলো মুরতাদ। এদেরকে মুসলমানদের ঘাড়ে চেপে থাকতে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য মুমিনদের উপর (চড়াও হয়ে তাদের মূলোৎপাটন করার) কোন রাস্তা রাখবেন না।"- নিসা: ১৪১

নির্যাতিত হওয়ার পর মালেক রহ. বলেছিলেন,

ولقد ضرب فيما ضربت فيه محمد بن المنكدر وربيعة وابن المسيب ولا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر. اهـ

"যে পথে আমি প্রহৃত হয়েছি, সে পথে মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, রবিআ ও ইবনুল মুসায়্যিব প্রহৃত হয়েছেন। এ পথে

যার উপর কোনো নির্যাতন আসে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।”- তারতিবুল মাদারিক ২/১৩২, ছাপা: আলমাগরিব

সুবহানাল্লাহ! লক্ষ করুন, **“এ পথে যার উপর কোনো নির্যাতন আসে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।”** দ্বীনের জন্য যার উপর নির্যাতন আসে না, জেল-জরিমানা, বন্দী বা রিমান্ডের শিকার হয় না: তিনি বলছেন, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। হতে পারেন তিনি অনেক বড় হযরতওয়ালা, কিন্তু মালেক রহ. এর দৃষ্টিতে তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। কোথায় মালেক আর কোথায় আমরা! আজ যদি কোন আলেম বা কোনো মুজাহিদ দ্বীনের কারণে, জিহাদের কারণে গ্রেফতার হন, রিমান্ডে যান বা ফাঁসি দেয়া হয়, তাহলে বলা হয়: সে অতি জযবাতি ছিল, ভাসা ভাসা বুঝের ছিল- গভীর বুঝ ছিল না, মাসলাহাত বুঝতো না, হেকমত জানতো না, বেশি বুঝে ফেলেছিল, বড়দের সাথে বেয়াদবির ফল ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের বিশেষণ। ইমাম মালেকের দৃষ্টিতে এদের মাঝোই কল্যাণ নিহিত। আর যারা বড় বড় হযরতওয়ালা বা বড় বড় মুদীর, আমীন, মুরুব্বী ও শাইখুল হাদিস হয়ে বসে আছেন কিন্তু দ্বীনের পথে একটা ফুলের টোকাও তাদের শরীরে পড়েনি: ইমাম মালেকের দৃষ্টিতে তাদের মাঝে কোন কল্যাণ

নেই। হে আল্লাহ আমাদের হেফাজত কর। তোমার দ্বীনের জন্য কবুল কর। আমীন।

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৫ (ইমাম শাফিয়ী রহ. এর জিহাদ)

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর জিহাদ

যুদ্ধবিদ্যা ইমাম শাফিয়ী রহ. এর অন্যতম শখের বিষয় ছিল। ছোট বেলা থেকেই এটি তার প্রিয় বিষয় ছিল। এজন্য তিনি একজন বিশিষ্ট তীরন্দাজ ও ঘোড়সওয়ার মুজাহিদে পরিণত হন। **তিনি বলেন,**

ولدت بعسقلان، فلما أتى عليّ سنتان حملتني أمي إلى مكة، وكانت نَهْمتي في شيئين: في الرّمي، وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشَرة عشرة. اهـ

“আমার জন্ম আসকালানে। দু’ বছর বয়সে আমার মা আমাকে নিয়ে মক্কায় চলে আসেন। আমার শখ ছিল দু’টি বিষয়: ১. তীরন্দাজি; ২. ইলম অন্বেষণ। তীরন্দাজিতে আমি এমনই

পারদর্শীতা অর্জন করেছি যে, দশটিতে দশটিই টার্গেটে গিয়ে বিঁধতো।”- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৭-১২৮

অন্য বর্ণনায় আছে যে তিনি বলেন,

تمنيت من الدنيا شيئين: العلم والرمي. فأما الرّمي فإني كنت أصيب من عشرة عشرة. اهـ

“দুনিয়াতে আমার আকাঙ্খার বস্তু ছিল দু’টি: ইলম ও তীরন্দাজি। তীরন্দাজিতে আমি এমনই পারদর্শীতা অর্জন করেছি যে, দশটিতে দশটিই টার্গেটে গিয়ে বিঁধতো।”- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৮

অন্য বর্ণনায় বলেন,

كنت ألزم الرمي حتى كان الطبيب يقول لي: أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر. اهـ

“আমি তীরন্দাজি নিয়ে পড়ে থাকতাম। এমনকি ডাক্তার আমাকে বলতো, ‘তুমি রোদ্রে যেভাবে পড়ে থাক, আমার ভয় হচ্ছে যে, তুমি যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে পড়বে।”- তারিখে বাগদাদ ২/৩৯২

ইমাম শাফিয়ী রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদ রবি বিন সুলাইমান রহ. বলেন,

كان الشافعي أفرس خلق الله وأشجعه، وكان يأخذ بأذنه وأذن الفرس، والفرس يعدو، فيثب على ظهره وهو يعدو. اهـ

"শাফিয়ী রহ. অতুলনীয় ঘোড় সওয়ার এবং নেহায়েত বীর বাহাদুর ছিলেন। (এমনকি) তিনি এক হাতে নিজের কান আরেক হাতে ঘোড়ার কান ধরে ঘোড়া দৌড়াতে পারতেন। ঘোড়া প্রবল বেগে দৌড়তে থাকতো। ঘোড়া দৌড়তো আর তিনি ঘোড়ার পিঠে লাফাতে থাকতেন।"- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৯

তার আরেক শাগরেদ ইমাম মুযানী রহ. বলেন,

كان الشافعي يسميني القطامي الرامي، ووضع «كتاب السبق والرمي» بسببي، وأملاه عليّ. اهـ

"শাফিয়ী রহ. আমাকে তীরন্দাজ কাতামি নামে ডাকতেন। আমার জন্যই তিনি كتاب السبق والرمي (ঘোড় দৌড়

প্রতিযোগিতা ও তীরন্দাজির বিধি বিধান) কিতাবটি লেখেন এবং ইমলা করিয়ে আমাকে তা লিখিয়ে দেন।”- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১২৯

ইমলা বলা হয়: উস্তাদ বসে মুখস্থ বলবেন আর শাগরেদরা লিখবে। আগের যুগে এভাবেই পাঠ দেয়া হতো।

লক্ষণীয়, তীরন্দাজি শাফিয়ী রহ. এর কাছে এতই প্রিয় ছিল যে, তার প্রিয় শাগরেদ মুযানী রহ.কে তীরন্দাজ বলে ডাকতেন। সম্ভবত তিনি দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। পাশাপাশি শাগরেদের জন্য তিনি তীরন্দাজি ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার বিধিবিধান সম্বলিত একটা কিতাবই রচনা করেছেন এবং ইমলা করিয়ে শাগরেদকে তা লিখিয়েও দিয়েছেন।

শাফিয়ী রহ. এর মূল ব্যস্ততা যদিও ইলম নিয়ে ছিল, তথাপি তিনি আল্লাহর রাস্তায় রিবাত তথা ইসলামী সীমান্ত প্রহরার

দায়িত্ব পালন করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

তার বিশিষ্ট শাগরেদ রবি বিন সুলাইমান রহ. বলেন,

خرجت مع محمد بن إدريس الشافعي من الفسطاط إلى الإسكندرية مرابطا، وكان يصلي الصلوات الخمس في المسجد الجامع، ثم يسير إلى المَحْرَس فيستقبل البحر بوجهه جالساً يقرأ القرآن في الليل والنهار حتى أُحصيت عليه ستين ختمة في شهر رمضان. اهـ

“মুহাম্মাদ বিন ইদরিস শাফিয়ী রহ. এর সাথে একবার ফুসতাত থেকে ইস্কানদারিয়ায় রিবাত তথা সীমান্ত প্রহরায় বের হলাম। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায তিনি জামে মসজিদে পড়তেন। এরপর পাহারার স্থানে চলে যেতেন। সমূদ্রের দিকে মুখ করে বসে পড়তেন। বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। দিন-রাত সর্বক্ষণ তিলাওয়াত করতে থাকতেন। এমনকি আমি রমজান মাসে হিসেব করে দেখিছি যে, তিনি ষাট খতম করেছেন।”- মানাকিবুশ শাফিয়ী লিলবাইহাকি ২/১৫৮

সীমান্ত অঞ্চল, যেদিক দিয়ে কাফেরদের আক্রমণের আশঙ্খা থাকে, সেখানে গিয়ে পাহারাদারি করাকে রিবাত বলে।

হাদিসে এসেছে,

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها

“একদিন রিবাতের দায়িত্ব পালন করা দুনিয়া এবং তার মাঝে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।”- সহীহ বুখারি ২৮৯২

অন্য হাদিসে এসেছে,

« رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان»

“এক দিন ও এক রাত রিবাতের দায়িত্ব পালন করা এক মাসের নামায ও রোযা থেকেও উত্তম। যদি রিবাতরত অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে যেসকল নেক আমল করতো, সেগুলো তার নামে জারি থাকবে (তথা সেগুলোর সওয়াব পেতে থাকবে)। তার রিযিক জারি হয়ে যাবে এবং কবরে আযাবের ফিরিশতার হাত থেকে নিরাপদ থাকবে।”- সহীহ মুসলিম ১৯১৩

রিবাতের এত ফজিলতের কারণেই বড় বড় উলামায়ে কেরাম সীমান্ত অঞ্চলে চলে যেতেন রিবাতের জন্য। অনেকে সপরিবারে গিয়ে বসবাস করতেন। উদ্দেশ্য থাকতো সীমান্ত পাহারা। বর্ণনা থেকে বুঝা গেল, ইমাম শাফিয়ী রহ. সুযোগ মতো রিবাতে চলে যেতেন। পাহারা দিতেন আর ইবাদাত বন্দেগী করতেন। কারণ, ঘরে বসে যিকির আযকার, তিলাওয়াত ও ইবাদাত বন্দেগী করলে যে সওয়াব পাওয়া যাবে, ময়দানে গিয়ে করলে তার শত-হাজারো গুণ বেশি পাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের হযরতওয়ালারা বুঝেছেন উল্টো।

জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে হযরতওয়ালাদের বিভ্রান্তি-০৬ (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. (২৪১ হি.) এর জিহাদ)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. (২৪১ হি.) এর জিহাদ

ইমাম যাহাবি রহ. (৭৪৮ হি.) আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর জিহাদের স্বতন্ত্র শিরোনাম কায়েম করেছেন। **তিনি বলেন,**

من جهاده

قال عبد الله بن محمود بن الفرج: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: خرج أبي إلى طرسوس، ورابط بها، وغزا ... وعن أحمد، أنه قال لرجل: عليك بالثغر، عليك بقزوين، وكانت ثغرا. اهـ

"**ইমাম আহমাদ রহ. এর জিহাদ:**
আব্দুল্লাহ ইবনু মাহমূদ ইবনুল ফারাজ বলেন, আমি আহমাদ রহ. এর পুত্র আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে তিনি বলেন, 'আমার পিতা (সীমান্ত এলাকা) ত্বরাসূসে গিয়েছেন। সেখানে রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যুদ্ধ করেছেন'। ... আহমাদ রহ. থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে বলেছেন, 'তুমি সীমান্তে চলে যাও। কাযবিনে চলে যাও'। কাযবিন তখন সীমান্ত এলাকা ছিল।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/৩৩১

যাহাবি রহ. আরো বর্ণনা করেন,

قال عبد الله بن أحمد: خرج أبي إلى طرسوس ماشيا. اهـ

“আহমাদ রহ. এর পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, আমার পিতা ত্বরাসূস গিয়ে পায়ে হেঁটে।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১১/২২১

আরো বর্ণনা করেন,

وعن أحمد، قال: ... كنا خرجنا إلى طرسوس على أرجلنا. اهـ

“আহমাদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা ত্বরাসূস গিয়েছিলাম পায়ে হেঁটে।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১১/৩০৮

যাহাবি রহ. এর বর্ণনা থেকে বুঝা গেল,

ক. আহমাদ রহ. পায়ে হেঁটে সীমান্তে গিয়েছেন।

খ. সীমান্তে রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন তথা সীমান্ত পাহারা দিয়েছেন।

গ. যুদ্ধও করেছেন।

ঘ. অন্যদেরকে সীমান্ত পাহারায় উদ্ধুদ্ধ করেছেন।

সীমান্তবাসী মুজাহিদিনে কেরাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। অনেক সময় তারা আহমাদ রহ. এর তরফ থেকে গোলা ছোঁড়তেন। আল্লাহ তাআলা তাতে বরকত দান করতেন। **যেমন এক বর্ণনায় এসেছে,**

قدم رجل من طرسوس، فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل، رفعوا أصواتهم بالدعاء، ادعوا لأبي عبد الله، وكنا نمد المنجنيق، ونرمي عن أبي عبد الله. ولقد رمي عنه بحجر، والعلج على الحصن متترس بدرقة، فذهب برأسه وبالدرقة. اهـ

"এক লোক ত্বরাসূস থেকে আসল। বলল, আমরা রোমে যুদ্ধে ছিলাম। যখন নিঝুম রাত হল দোয়ায় সকলে জোরো জোরো বলতে লাগল, সকলে আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ বিন হাম্বল)- এর জন্য দোয়া কর। আমরা অনেক সময় ক্ষেপণাস্ত্র ফিট করে আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ বিন হাম্বল) এর তরফ থেকে ছোঁড়তাম। একবার তার তরফ থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হল। শত্রু সৈন্যটি দূর্গের উপর ছিল। একটি

ঢাল দিয়ে আত্মরক্ষা করছিল। পাথরটি সৈন্যটির ঢালসহ মাথা গুঁড়িয়ে দিল।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা **১১/২১০**

অনেক সময় সীমান্তবাসী মুজাহিদিনে কেরাম বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করে আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর কাছে চিঠি পাঠাতেন। তিনিও প্রতিউত্তর লিখে চিঠি পাঠাতেন। যেমন, একবার তারা এক বিদআতি লোকের ব্যাপারে জানতে চেয়ে চিঠি পাঠান। **আহমাদ রহ. বলেন,**

كتب إلي أهل الثغر يسألوني عن أمره، فكتبت إليهم، فأخبرتهم بمذهبه وما أحدث، وأمرتهم أن لا يجالسوه. اهـ

"সীমান্তবাসীরা আমার কাছে এ লোকের ব্যাপারে জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল। আমি তার মাযহাব-মতাদর্শ ও তার আবিষ্কৃত বিদআত সম্পর্কে তাদের অবগত করিয়ে প্রতিউত্তর পাঠাই এবং তাদের আদেশ দিই, যেন তারা তার সাথে উঠাবসা না করে।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা **১১/২১১**

আহমাদ বিন হাম্বল রহ. জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করতেন এবং জিহাদের কথা স্বরণ হলে কাঁদতেন। **ইবনে কুদামা রহ. (৬২০ হি.) বলেন,**

قال أبو عبد الله: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد روى هذه المسألة عن أحمد جماعة من أصحابه، قال الأثرم: قال أحمد: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله، وذكر له أمر العدو؟ فجعل يبكي، ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. وقال عنه غيره: ليس يعدل لقاء العدو شيء. اهـ

"আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ বিন হাম্বল রহ.) বলেন, 'ফরযের পর আমার জানা মতে জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই'।

আহমাদ রহ. এর অনেক শাগরেদ তার থেকে এ মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন। আসরাম রহ. বলেন, আহমাদ রহ. বলেছেন, 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর চেয়ে উত্তম কোন নেক আমল আছে বলে আমার জানা নেই'।

ফজল বিন যিয়াদ রহ. বলেন, 'একবার শত্রুর (তথা কাফেরদের) আলোচনা উঠল। আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ রহ.)

কাঁদতে লাগলেন এবং আমি শুনেছি যে, তিনি বলতে লাগলেন, ‘জিহাদের চেয়ে উত্তম কোন আমল নেই’। অন্য কেউ

কেউ তার থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘শত্রুর মোকাবেলার চেয়ে উত্তম কিছু নেই’।”- আলমুগনি ৯/১৯৯

আহমাদ রহ. এর কাছে জিহাদ এতই প্রিয় ছিল যে, খলিফা মু’তাসিম বিল্লাহ- যিনি খালকে কুরআনকে সমর্থন না করায় আহমাদ রহ.কে নিদারুণ ও নির্মম নির্যাতন করেছেন- তিনি যখন বাতেনী কাফের বাবাক আলখুররামি ও তার বাহিনিকে পরাজিত করতে সক্ষম হন, তখন আহমাদ রহ. খুশি হয়ে তাকে মাফ করে দেন। **ইমাম যাহাবি রহ. আহমাদ বিন সিনান রহ. থেকে বর্ণনা করেন,**

بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل يوم فتح عاصمة بابك، وظفر به، أو في فتح عمورية، فقال: هو في حل من ضربي. اهـ

“আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, মু’তাসিম বিল্লাহ যেদিন বাবাকের রাজধানী বিজয় করেন এবং বাবাককে পাকড়াও করতে সক্ষম হন কিংবা যখন তিনি আমুরিয়া বিজয় করেন, তখন আহমাদ রহ. তাকে মাফ করে দেন এবং বলেন, ‘আমি তাকে আমার প্রহারের অপরাধ মাফ করে দিলাম।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১১/২৫৭-২৫৮

মু’তাসিম বিল্লাহ আহমাদ রহ.কে কতটুকু নির্মম নির্যাতন করেছিল তা সকলের জানা। আড়াই বছর পর্যন্ত জেলে ভরে রেখেছেন। তাকে এমনও শিকল পরানো হতো যে, শিকলের ভারেই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। খালি গায়ে দু’ হাত দুই দিকে টানা দিয়ে বেঁধে মু’তাসিম বিল্লাহর সামনে হাজির করা হল ইমাম আহমাদ রহ.কে। মু’তাসিম বিল্লাহ বললেন, আহমাদ! আমার কথায় সাড়া দাও, কুরআন মাখলূক মেনে নাও, আমি নিজ হাতে তোমার শিকল খুলে তোমাকে মুক্ত করে দেবো। আহমাদ রহ. জওয়াব দিলেন, আমীরুল মু’মিনীন! আপনার মতের পক্ষে কোনো একটা আয়াত বা একটা হাদিস যদি পারেন দেখান। মু’তাসিম বিল্লাহ ভড়কে

গেল। কিন্তু দরবারি মোল্লারা বুঝাল, আমীরুল মু’মিনীন! এ লোকটা কাফের হয়ে গেছে। একে হত্যা করুন। মু’তাসিম জল্লাদকে আদেশ দিল, একে চাবুক মারো। চাবুক শুরু হল। একেকটা আঘাত এমন ছিল যেন, মৃত্যু প্রতিক্ষা করছে। মু’তাসিম বিল্লাহ আবারও প্রস্তাব দিলেন, আহমাদ! আমার কথায় সাড়া দাও, কুরআন মাখলূক মেনে নাও, আমি নিজ হাতে তোমার শিকল খুলে তোমাকে মুক্ত করে দেবো। আহমাদ রহ. আগের মতোই জওয়াব দিলেন, আমীরুল মু’মিনীন! আপনার মতের পক্ষে কোনো একটা আয়াত বা একটা হাদিস যদি পারেন দেখান। মু’তাসিম আবারও জল্লাদকে আদেশ দিল। আবারও চাবুক শুরু হল। আহমাদ রহ. জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ চাবুক বন্ধ রইল। কিছুক্ষণ পর যখন জ্ঞান ফিরল, আবার শুরু হল চাবুক। আবারও তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। আবার হুঁশে আসলেন। আবার শুরু হল। এভাবেই আহমাদ রহ.কে নির্যাতন করতো মু’তাসিম বিল্লাহ। কিন্তু যিন্দিক বাবাক আলখুররামি- যাকে বিশ বছর যাবৎ পরাজিত করা যাচ্ছিল না- তার বিরুদ্ধে যখন তিনি জয় লাভ করলেন, আহমাদ রহ. তাকে ক্ষমা করে দিলেন। জিহাদকে তিনি এমনই ভালবাসতেন।

ইমাম আহমাদ রহ. যদিও জালেম খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, কিন্তু আহলে সুন্নাহর বিশিষ্ট ইমাম আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. যখন মু'তাসিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শহীদ হন, তখন তিনি তার প্রশংসা করেন।

২৩১ হিজরির আলোচনায় ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

فلما كان شهر شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة لأحمد بن نصر الخزاعي في السر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخروج على السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآن، ولما هو عليه وأمراؤه وحاشيته من المعاصي والفواحش وغيرها. اهـ

"এ বছরের শা'বান মাসে গোপনে আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. এর হাতে বাইয়াত সংঘটিত হয়। আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সুলতানের বিদআত, খালকে কুরআনের দিকে দাওয়াত এবং তার উমারা ও ঘনিষ্টজনদের পাপাচারসহ আরো বিভিন্ন কারণে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য এ বাইয়াত সংঘটিত হয়।"- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/৩৩৬

কিন্তু তিনি কামিয়াব হতে পারেননি। সুলতানের হাতে বন্দী হন এবং শহীদ হন। **একদিন আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর সামনে তার আলোচনা উঠলে তিনি তার প্রতি আপ্লুত হয়ে বলেন,**

رحمه الله ما كان أسخاه بنفسه لله، لقد جاد بنفسه له. اهـ

“আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন। আল্লাহর জন্য আপন প্রাণ বিলিয়ে দিতে তিনি কতই না অগ্রগামী ছিলেন। তার জন্য তিনি আপন প্রাণ উৎস্বর্গ করে গেছেন।”- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/৩৩৬

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ইনশাআল্লাহ যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. একজন প্রকৃত মুজাহিদ ছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। দ্বীনের পথে স্বশরীরে জিহাদ করেছেন। অন্যদের উৎসাহিত করেছেন। জিহাদকে ভালবেসেছেন। জিহাদে খুশি হয়েছেন। জিহাদকে সকল আমলের চেয়ে উত্তম মনে করেছেন।

***

শেষকথা

আইম্মায়ে আরবাআরা ব্যাপারে এ হল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আশাকরি এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই পরিষ্কার যে, তাদের সকলেই মুজাহিদ ছিলেন। জিহাদের পথে জীবন দিয়েছেন। নির্যাতিত হয়েছেন। শহীদ হয়েছেন। আমাদের জিহাদে তারাই আমাদের অনুসরণীয়। মুজাহিদিনে কেরাম যা করছেন তাদেরই অনুসরণে করছেন। তাদের দিয়ে যাওয়া ফতোয়ার ভিত্তিতেই করছেন। কিন্তু হায়! এমনসব লোকই আমাদের নেতৃত্বের আসনে বসে গেছেন, যারা নিজেদেরকে আইম্মায়ে আরবাআর অনুসারি বলে দাবি তো করেন, কিন্তু তাদের সীরতের ব্যাপারে কোন ধারণাই তারা রাখেন না। তাদের রেখে যাওয়া আদর্শের ব্যাপারেও তারা বেখবর। যে পথে তারা জীবন দিয়ে গেছেন, সে পথকেই তারা অস্বীকার করছেন। কোনো দিন তারা সে পথে চলেননি বলেও দাবি করছেন। বরং সে পথকে অস্বীকার করতে তাদেরকেই দলীল হিসেবে দাঁড় করাচ্ছেন। কত বড় অজ্ঞতা! কত বড়

জাহালত! নয়তো কত বড় ইফতিরা! কত বড় বুহতান! কত সাংঘাতিক অপবাদ।

***

ফাওয়ায়েদ

আইম্মায়ে আরবাআর সীরত থেকে আমাদের বেশ কিছু সমকালীন মাসআলার সমাধান পাওয়া যাবে। আমরা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

- আবু হানিফা রহ. ও মালেক রহ.সহ তৎপূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঐ সকল উলামায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে দ্বীন, যারা নিজ নিজ যামানার জালেম শাকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গেছেন, তাদের সকলের মতেই জালেম শাসক- কাফের না হলেও- তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয। অতএব, জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে যে ইজমার কথা বলা হয় তা সঠিক নয়। বেশির চেয়ে বেশি এ কথা বলা যায় যে, পরবর্তী উলামায়ে কেরাম বিদ্রোহ না করার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন।

- যিন্দিক মুরতাদদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জরুরী। এতে কোনো দ্বিমত নেই। এজন্যই যিন্দিক বাবাক আলখুররামির বিরুদ্ধে জিহাদ ও বিজয়ে আহমাদ রহ. যারপরনাই খুশি হয়েছেন।

- জিহাদ ফরয বা সহীহ হওয়ার জন্য ইসলাহে নফস আবশ্যক নয়। আমরা দেখেছি, আবু হানিফা, মালেক ও আহমাদ রহ.কে যারা নির্যাতন করেছে, তারাই কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে। আইম্মায়ে কেরাম সেগুলো সমর্থন করেছেন বরং উৎসাহিত করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব শাসক ফাসেক ও জালেম ছিল। এতদসত্ত্বেও আইম্মায়ে কেরাম তাদের সাথে মিলে কাফের-মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং তাদের জিহাদগুলোকে সমর্থন করেছেন। বুঝা গেল, ইসলাহে নফস জিহাদের জন্য শর্ত নয়- যেমন নামায রোযার জন্য শর্ত নয়।

- জিহাদের জন্য গোপনে বাইয়াত হওয়া এবং বাইয়াত গোপন রাখা জায়েয। যেমন, নফসে যাকিয়্যা রহ. ও তার ভাই ইব্রাহিম রহ. এর বাইয়াত গোপনে হয়েছিল। আবু হানিফা রহ. ও মালেক রহ. গোপনে গোপনেই ফতোয়া দিয়েছিলেন। তদ্রূপ, আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. এর

বাইয়াতও গোপনেই হয়েছিল।

- জিহাদের পক্ষে গোপনে গোপনে ফতোয়া দেয়া জায়েয। যেমন ইমাম মালেক রহ. ও আবু হানিফা রহ. দিয়েছিলেন।

- জিহাদের জন্য গোপনে গোপনে আর্থিক সহায়তা দেয়া জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. যায়দ বিন আলী রহ.কে গোপনে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন।

- জিহাদের পক্ষে থেকে নির্যাতিত হওয়া জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. ও মালেক রহ. নির্যাতিত হয়েছেন।

- জিহাদের অপরাধে জেলে যাওয়া জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. জেলে গিয়েছেন।

- জিহাদের জন্য শহীদ হওয়া জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. ও আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. শহীদ হয়েছেন।

- জিহাদের জন্য ট্রেনিং নেয়া জায়েয। যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. ট্রেনিং নিয়েছেন।

- আল্লাহর রাস্তায় রিবাত তথা পাহারাদারি করা জায়েয। যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. ও আহমাদ রহ. রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন।

- আল্লাহর রাস্তায় স্বশরীরে যুদ্ধ করা জায়েয, যেমন আহমাদ রহ. যুদ্ধ করেছেন।

- অন্যকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা জায়েয। যেমন, আব হানিফা রহ. মানসূরের বিরুদ্ধে ইব্রাহিম রহ. এর পক্ষে লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আহমাদ রহ. এক ব্যক্তিকে সীমান্তে গিয়ে পাহারাদারি করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

- জিহাদের কথা স্বরণ হলে কাঁদা জায়েয। যেমন, আহমাদ রহ. কেঁদেছেন।

- শহীদের প্রশংসা করা জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. আবু ইসহাক ফাযারির ভাইয়ের প্রশংসা করেছেন। আহমাদ রহ. আহমাদ বিন নাসর আলখুজায়ি রহ. এর প্রশংসা করেছেন।

- মুজাহিদদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং তাদের

প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল ও জিজ্ঞাসার জওয়াব দেয়া জায়েয। যেমন, আহমাদ রহ. সীমান্তবাসীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চিঠি লিখেছেন। মালেক রহ.কে মানসূরের বাইয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা মানা আবশ্যক নয় বলে জওয়াব দিয়েছেন।

- মুজাহিদদের বিজয়ে খুশি হওয়া জায়েয (যদিও মুজাহিদরা বা তাদের আমীর ফাসেক হয়)। যেমন, বাবাকের বিরুদ্ধে মু'তাসিমের বিজয়ে আহমাদ রহ. খুশি হয়েছেন, অথচ মু'তাসিম ফাসেক ছিল। তার বাহিনির বহু মুজাহিদিই ফাসেক ছিল।

- জিহাদের জন্য পায়ে হেঁটে চলাও জায়েয। যেমন, আহমাদ রহ. পায়ে হেঁটে ত্বরাতূস গিয়েছেন।

- বড় আলেম বরং সবচেয়ে বড় আলেমদের জন্যও জিহাদ জায়েয। যেমন, আইম্মায়ে আরবাআর সকলেই যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন।

- শাগরেদকেও জিহাদের ময়দানে নিয়ে যাওয়া জায়েয।

যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. তার শাগরেদ রবি বিন সুলাইমানকে নিয়ে ইস্কান্দারিয়ায় রিবাতে গিয়েছেন।

- শাগরেদের জন্যও উস্তাদের সাথে জিহাদে যাওয়া জায়েয। যেমন, রবি বিন সুলাইমান আপন উস্তাদ শাফিয়ি রহ. এর সাথে রিবাতে গিয়েছেন।

- ছোট বেলা থেকেই জিহাদের ট্রেনিং নেয়া জায়েয। যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. ছোট বেলা থেকেই জিহাদের ট্রেনিং নিতেন।

- যুবক বয়সে জিহাদ করা জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. যখন বনী উমাইয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফতোয়া দিয়েছেন, তখন তার বয়স ৪১ বছর।

- বৃদ্ধ বয়সেও জিহাদ করা জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. যখন আব্বাসীদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন, তখন তার বয়স ৬৭ বছর।

- জিহাদের জন্য যুবক বয়সেও নির্যাতিত হওয়া জায়েয, বৃদ্ধ বয়সেও জায়েয। যেমন, আবু হানিফা রহ. যখন উমাইয়াদের

হাতে নির্যাতিত হয়েছেন, তখন তিনি যুবক আর যখন আব্বাসীদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন, তখন তিনি বৃদ্ধ।

- উলূমে হাদিসে মাহের হলেও জিহাদে যাওয়া জায়েয। যেমন, আইম্মায়ে আরবাআ সকলেই (বিশেষত ইমাম আহমাদ রহ.) উলূমে হাদিসে মাহের ছিলেন।

- ফিকহে মাহের হলেও জিহাদে যাওয়া জায়েয। যেমন, আইম্মায়ে আরআবা সকলেই ফিকহে মাহের ছিলেন (বিশেষত আবু হানিফা রহ.)।

- হাদিসের উস্তাদদের জন্যও জিহাদে যাওয়া জায়েয। মেযন, মালেক রহ. ও আহমাদ রহ. উভয়ই নিয়মতান্ত্রিক হাদিসের দরস দিতেন।

- জাস্টিস তথা বিচারকদের জন্যও জিহাদে যাওয়া জায়েয। যেমন, ইমাম শাফিয়ি রহ. এক সময় জাস্টিস ছিলেন।

***

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন- (অবতরণিকা)

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد

জিহাদ দমানোর জন্য যেসকল ষড়যন্ত্র হয়েছে, তার মধ্যে বড় একটি ষড়যন্ত্র: ইলমকে জিহাদের বিপরীতে দাঁড় করানো। যার ফলে আমাদের সমাজের উলামা-তুলাবাদের মাঝে ব্যাপকভাবে এই ভ্রান্ত্র ধারণা গেড়ে বসেছে যে, ইলম আর জিহাদ একত্র হতে পারে না। যারা ইলম নিয়ে থাকবে, তারা জিহাদ করবে না। জিহাদ করে ইলম শিখা যায় না। পাশাপাশি এ ধারণাও আছে যে, ইলম হল সর্বশ্রেষ্ঠ। যারা ইলম নিয়ে ব্যস্ত তারা সর্বশ্রেষ্ঠ কাজে লিপ্ত। ইলম ছেড়ে জিহাদে যাওয়ার অর্থ আফজাল ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছেড়ে নিম্নমানের কাজে লিপ্ত হওয়া।

এই ভ্রান্ত আকীদার পক্ষে কুরআন সুন্নাহর কোনো দলীল তো অবশ্যই তারা দিতে সক্ষম নয়, তবে যে কাজটি তারা করেছে, তা হলো- জেনে না জেনে- আইম্মায়ে কেরামের সীরাতকে

বিকৃত ও অপব্যাখ্যা করেছে। আপনি যদি জিহাদবিরোধী কোনো আলেমের সাথে কথা বলেন, তাহলে তিনি অকপটেই বলে দেবেন যে, আপনি কি বেশি বুঝেন? আবু হানিফা, শাফিয়ি, মালেক, আহমাদ, বুখারি, মুসলিম- এরা কি আপনার চেয়ে কম বুঝে? এরা তো কেউ ইলম ছেড়ে জিহাদে যায়নি?

মোটকথা তাদের বিশ্বাস, আমাদের পূর্বসূরি সালাফে সালেহীন আইম্মায়ে কেরাম জিহাদ করেননি। শুধু তাই নয়, বরং তাদেরকে জিহাদ বিরোধী বলে চালিয়ে দিতেও অনেকের দ্বিধা হয় না। গত রমযানে ঢালকানগরের পীর আব্দুল মতীন সাহেবের একটি বিভ্রান্তিকর বক্তব্য হয়তো অনেকে শুনেছেনও।

সালাফে সালেহীনকে জিহাদের বিপরীতে দাঁড় করানোর পেছনে বড় কয়েকটি কারণ হল:

ক. অজ্ঞতা।

আপনি দেখবেন যে, যারা সালাফে সালেহীনকে জিহাদের বিপরীতে দাঁড় করায়, তারা আসলে সালাফের জীবন চরিত সম্পর্কে অজ্ঞ। যেমন, ঢালাকানগরের পীর সাহেবের বক্তব্যে হয়তো আপনারা লক্ষ করেছেন যে, অজ্ঞতার কারণে তিনি আইম্মায়ে আরবাআ সকলকেই জিহাদের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন এবং তাদেরকে জিহাদ নাজায়েয হওয়ার পক্ষে দলীল বানিয়েছেন। যদি তারা মন্তব্য করার আগে একটু কষ্ট করে সালাফের জীবনী পড়ে দেখতো, তাহলে হয়তো এমন আজগুবি কথা মুখে আসতো না।

খ. একপেশে ভাবনা।

সালাফকে জিহাদ বিরোধী ধারণা করার এটাও একটা বড় কারণ। আমাদের বর্তমান উলামা-তুলাবারা ইলমকেই সবচেয়ে বড় করে দেখে। সালাফের কারো জীবনী যদি তারা পড়েও, তাহলেও সালাফের ইলমী দিকটিই শুধু তাদের নজরে পড়ে। তাদের সিয়াসী ও জিহাদি জীবন, আমর বিল মা'রূফ-নাহি আনিল মুনকার, হকের পথে জীবন দেয়া: এগুলো তাদের নজরে তেমন পড়ে না। এগুলো ভাসা ভাসা নজরে দেখে চলে যায়। তারা শুধু দেখে যে, তিনি হাদিসের কি কি খিদমাত করেছেন, ফিকহে তার কি অবদান ইত্যাদি। এই একপেশে

ভাবনা প্রবল হওয়ার কারণে অন্য দিকগুলো তাদের নজর কাড়ে না।

গ. উলামাদের জীবনীতে ইলমী দিকের প্রাবল্য।

উলামায়ে কেরামের জীবনের মৌলিক দিকটি হচ্ছে ইলম। কেউ যখন তাদের জীবনী অধ্যয়ন করতে যাবে, তাদের ইলমী দিকটিই স্বাভাবিক বেশি নজরে আসবে। অন্যান্য দিকগুলো তাদের মৌলিক ব্যস্ততা না হওযায় সেগুলোর আলোচনা আসে প্রসঙ্গত। এ কারণে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে যারা সালাফের জীবনী অধ্যয়ন করে তাদের কাছে ইলমী দিকটিই প্রবল হয়ে আসে। অন্যান্য দিকগুলো প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

ঘ. পাঠকদের জিহাদ বিমুখীতা।

জিহাদ বিরোধীরা যদি সালাফের জীবনী পড়েও, তাহলেও নিজেদের অন্তরে সুপ্ত জিহাদ বিমুখীতার কারণে সালাফের জিহাদি জীবনটা তাদের দৃষ্টি কাড়ে না। নজরে পড়ে গেলে বা কেউ দেখিয়ে দিলে নিজেদের জিহাদ বিমুখীতার কারণে সালাফকেও তারা নিজেদের মতো জিহাদবিমুখী ধারণা করে এবং সালাফের জিহাদি দিকগুলোকে তাবিল, তাহরিফ ও অপব্যাখ্যা করে নিজেদের অনুকূল বানিয়ে নেয়।

এ সমস্ত কারণসহ আরো বিভিন্ন কারণে সালাফে সালিহীনের জিহাদি দিকগুলো প্রচ্ছন্ন থেকে যায় এবং অপব্যাখ্যার শিকার হয়। জিহাদবিরোধীরা গর্বভরে বলে বেড়ায়, আমাদের সালাফ জিহাদ করেননি, তাহলে আমাদের না করাতে কি দোষ? শুধু তাই নয়, বরং সালাফকে জিহাদ বিরোধী দাঁড় করিয়ে জিহাদ নাজায়েয-হারাম ফতোয়া দিয়ে বেড়ায়।

ঢালকানগরের পীর সাহেবের অজ্ঞতাপ্রসূত বিভ্রান্তিমূলক বয়ানের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার তাওফিকে কিছু দিন আগে আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছি। আইম্মায়ে আরবাআর জিহাদি জীবনের মতো আরো কতক আইম্মার জিহাদি জীবনটাও যদি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা যায়, তাহলে একটা বড় খিদমাত হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটা বিভ্রান্তির কিছুটা হলেও অপনোদন হয়। বিশেষত আমাদের নিজেদের ভাইদের উপকার হবে এবং দাওয়াতের

কাজে সহায়ক হবে। এ ধারণা থেকেই এ ব্যাপারে কলম ধরা। আল্লাহ চাহেন তো আমাদের আইম্মায়ে কেরাম যে ইলমের পাশাপাশি জিহাদের ময়দানেও বিচরণ করেছেন তার কিঞ্চিত তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আমরা তো তাদের থেকেই জিহাদ শিখেছি। তাদেরকে জিহাদবিরোধী দাঁড় করানো অজ্ঞতা, অপবাদ ও স্বার্থপরতা ছাড়া কিছুই নয়। সকল ভাইয়ের কাছে দোয়ার দরখাস্ত। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন- (অবতরণিকা - ২)

ইলম নিয়ে ব্যস্ততার অজুহাত

জিহাদবিমুখ উলামা-তুলাবাদের একটি মুখরোচক অজুহাত হল, **'আমরা ইলম নিয়ে ব্যস্ত আছি। জিহাদ করতে গেলে ইলম ছুটে যাবে। সমাজের মানুষের ইলম ও মাসায়েলের সমাধান তাহলে দেবে কে- যদি আমরা জিহাদে চলে যাই'**?

বাহ্যত যুক্তিটি অনেক সুন্দর। যে কেউ কথাটি শুনবে আপাত দৃষ্টিতে সমর্থন না করে পারবে না। তবে আমি এখানে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই: **ইলম কি শুধু অজু-গোসল, হায়েয-নেফাস, নামায-রোযা, নিকাহ-তালাকের মাঝেই সীমাবদ্ধ? না'কি গোটা শরীয়তের সকল দিক, সকল বিধি-বিধানই ইলম? ঈমান-কুফর, তাকফিরুত তাওয়াগিত, সিয়াসত-খিলাফত-ইমারাত, জিহাদ-কিতাল-সিয়ার এগুলো কি ইলমের গণ্ডিতে পড়ে?**

যদি বলেন, পড়ে; তাহলে আপনারা কি এগুলো নিয়ে ব্যস্ত? স্বাভাবিক প্রায় সকলেরই উত্তর আসবে, না। একান্ত যারা কিছুটা অধ্যয়ন করেনও তারাও বলতে গেলে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে। নিকাহ-তালাকের মাসআলা যেভাবে বুঝতে পারছেন এবং ফতোয়া দিতে পারছেন, এসব মাসআলায় তার দশ ভাগের এক ভাগ বরং বলতে গেলে একশ ভাগের এক ভাগও দক্ষতা নেই। তাহলে এখন যদি পর্যালোচনা করা হয় দেখা যাবে আপনারা ইলমের খুব কম অংশ নিয়েই লিপ্ত আছেন, আর বাকি সকল ইলমই আপনাদের ব্যস্ততার

বাহিরে। তাহলে বলা যায় ইলমের অজুহাতের দাবিতেও আপনারা সত্যবাদি নন।

যদি সত্য সত্যই আপনারা ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তাহলে তো আপনারাই আমাদের রাহবার হতেন। আপনারা যা বলতেন আমরা নির্দ্বিধায় মেনে নিতাম। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে উম্মাহর সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় ইলমটুকুর ধারে কাছেও আপনারা নেই বরং বিনা ইলমে উল্টো উল্টে ফতোয়া দিয়ে দিয়ে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে আপনাদের কথা মেনে চলতে পারি? বরং আপনাদের অজুহাত কবূল করার মতো কোন সুযোগও তো দেখছি না। বরং সত্য কথা বলতে গেলে: আপনারা ইলমের কেবল ততটুকু নিয়েই ব্যস্ত যতটুকুতে আপনাদের রুজি রোজগারের বন্দোবস্ত হবে, যতটুকুতে রাষ্ট্রের বিরোধীতার কিছু নেই এবং যতটুকুতে তাগুত শাসক শ্রেণী আপনাদের প্রতি নারাজ হবে না। তাহলে বলা যায়, ‘ইলম নিয়ে ব্যস্ত আছি’- উজরটা একেবারেরই অবাস্তব।

আমরা তো ইলমের দাবিই জানাচ্ছি

ইলমী ব্যস্ততার অজুহাত অবাস্তব হওয়ার একটা বড় দলীল হচ্ছে, আপনাদের জিহাদ বিমুখতা। কারণ, মুজাহিদরা যখন আপনাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দিচ্ছেন, তখন তো আপনাদেরকে এ কথা বলছেন না যে, আপনারা এখনই অস্ত্র হাতে রাস্তায় বেরিয়ে শহীদ হয়ে যান। আপনাদেরকে কাছে দাবি হচ্ছে, আপনারা প্রথমে সত্য জানুন। সত্য জেনে উম্মাহর সামনে সত্য তুলে ধরুন। উম্মাহকে দ্বীন ও জিহাদ বুঝান। তাহলে বলা যায়, যে ইলম নিয়ে আপনারা ব্যস্ত বলে দাবি করছেন, মুজাহিদগণ আপনাদের কাছে সে ইলমই দাবি করছেন এবং আপনাদের সামনে ইলমের বিশাল এক ময়দান খুলে দিচ্ছেন। কিন্তু আপনারা যদি সারা না দেন, তাহলে কিভাবে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, আপনারা ইলম নিয়ে আছেন? বরং তখন তো সন্দেহ জাগে যে, আপনারা ইলমের নামে ইলম ও জিহাদ উভয়টা থেকেই বিমুখ হয়ে আছেন।

বি.দ্র.

আমার এ কথা শুধু ঐসব উলামা-তুলাবার ব্যাপারে যারা আসলেই নিজেদের দাবিতে মিথ্যাবাদি। সকলের ব্যাপারে নয়।

জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সময় ইলমী ব্যস্ততায় জিহাদ ছাড়ার সুযোগ নেই

সর্বোপরি জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সূরতে ইলম নিয়ে পড়ে থেকে জিহাদ ছাড়ার কোন অবকাশ নেই। ইলমী ব্যস্ততা যদিও সর্বশ্রেষ্ঠ একটি আমল, কিন্তু যখন উম্মাহর উপর কাফের-মুরতাদরা সওয়ার হয়ে পড়ে, তখন আলেম-গাইরে আলেম সকলেরই প্রথম দায়িত্ব শত্রু প্রতিহত করা। এমন সময় ইলম নিয়ে পড়ে থাকা হারাম। স্বাভাবিক অবস্থায় ইলম-জিহাদ উভয়টাই ফরযে কিফায়া। মুজাহিদগণ যদি জিহাদের ফরয আঞ্জাম দিতে থাকেন, তাহলে জিহাদের প্রয়োজনে যে সংখ্যক আলেম জিহাদে অংশগ্রহণ জরুরী, তারা বাদে বাকি আলেমদের উপর জিহাদে যাওয়া জরুরী নয়। তাদের জন্য তখন ইলম-জিহাদ উভয়টিই বরাবর। ইচ্ছা করলে জিহাদও করতে পারেন, ইচ্ছা করলে ইলমেও লিপ্ত থাকতে পারেন। অবশ্য এ সময় কোনটা উত্তম তা

নিয়ে মতভেদ আছে।

জিহাদবিরোধীরা যেসকল আইম্মাদের দোহাই দিয়ে জিহাদ হারাম-নাজায়েয ফতোয়া দেয়, সেসকল আইম্মার যামানায় জিহাদের মূলত এ অবস্থাটিই ছিল। তাদের জন্য ইলম-জিহাদ উভয়টিই বরাবর ছিল। তখন কেউ কেউ ইলমের পাশাপাশি জিহাদ ও রিবাতের দায়িত্বও পালন করেছেন, আর কেউ কেউ ইলম নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন। তবে মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় হাদিস ও মাসায়েল বর্ণনা ও সংকলন করে দিয়েছেন। এভাবে ময়দানে না গিয়েও তারা জিহাদের খিদমাত করেছেন। আর উলামায়ে কেরামের অনেকের জন্য তখন জিহাদের ময়দানে যাওয়া জায়েযও ছিল না। কারণ: শীয়া, খাওয়ারিজ, মু'তাজিলি, বাতিনি ইত্যাদি বাতিল ফিরকাগুলো তো তখনই মাথাছাড়া দিয়ে গজিয়েছিল। এদেরকে দমন করা উলামাদের উপর ফরযে আইন ছিল। সকলেই যদি জিহাদে চলে যেতো তাহলে এদের দমন কে করতো? এমতাবস্থায় জিহাদে যাওয়ার অর্থ ছিল ফরযে কিফায়া আদায় করতে গিয়ে ফরযে আইন তরক করা যা হারাম। তাই, উলামায়ে কেরামের বিশাল একটা অংশ

সার্বক্ষণিক ইলমে লিপ্ত থাকা আবশ্যক ছিল। তাদের জন্য জিহাদে যাওয়া নাজায়েয ছিল।

কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা এর বিপরীত। এখন জিহাদ ফরযে আইন। আর জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, তখন অন্য সব বাদ দিয়ে আগে শত্রু প্রতিহত করা ফরয। কারণ, এখন যদি শত্রু প্রতিহত করা না যায়, তাহলে দ্বীন-দুনিয়া সবই বরবাদ হয়ে যাবে। শত্রু প্রতিহত হয়ে গেলে তখন দ্বীনের সকল শাখার সকল খিদমাত করা যাবে। এজন্য উম্মাহর আইম্মায়ে কেরামের ইজমা: জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেলে তখন আলেমদেরকেও জিহাদে চলে যেতে হবে।

তবে বর্তমান বিশ্বের সকল এলাকার অবস্থা এক রকম নয়। যেখানে সরাসরি যুদ্ধ চলছে, সেখানে আলেমদেরকেও জিহাদে বের হতে হবে। আর আমাদের দেশের মতো যেসব এলাকায় দাওয়াত ও ই'দাদি কাজ চলছে, সেখানে ময়দানে যাওয়া আবশ্যক নয়। দাওয়াত ও ই'দাদের জন্য আলেমদের

যে ধরণের ভূমিকা প্রয়োজন, সে ধরণের ভূমিকা রাখাই তাদের কাজ। বিশেষত ইলমী কাজটাই তাদের মূল কাজ। হ্যাঁ, কখনও যদি সরাসরি ময়দানে নেমে পড়ার দরকার পড়ে- এদেশে হোক বা অন্য দেশে- তাহলে তখনকার কথা ভিন্ন।

মোটকথা, সালাফে সালিহীন আইম্মায়ে কেরামের যামানায় আলেমদের জন্য জিহাদ ফরযে আইন ছিল না। করাতে কোন সমস্যা ছিল না। বরং অনেকের জন্য ইলমে লিপ্ত থাকাই ফরযে আইন ছিল, জিহাদে যাওয়া নাজায়েয ছিল। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা ভিন্ন। এখন ইলমের নাম করে জিহাদের ইলমী-আমলী সকল ধরণের সহায়তা থেকে দূরে থাকার কোন সুযোগ নেই।

যাহোক, ভূমিকা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সামনের পর্ব থেকে ইনশাআল্লাহ মুজাহিদ ও মুরাবিত উলামাদের আলোচনা শুরু করবো। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

***

এক.

হাসান বসরী রহ. (১১০হি.)

বিশিষ্ট তাবিয়ী। অনেক সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাফসীর, হাদিস ও ফিকহে যামানার শ্রেষ্ঠ ইমাম। খলিফায়ে রাশেদ উমার ইবনু আব্দুল আজিজ রহ. এর খেলাফতকালে তিনি বসরার কাযি ছিলেন।

হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের দুই বছর বাকি থাকতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের সময় তার বয়স ছিল চৌদ্দ।

তার পিতা-মাতা উভয়ই যুদ্ধবন্দী দাস ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরই ঔরসে এ মহামানবের জন্ম দেন। তার মা

উম্মুল মু’মিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে কাজ করতেন। অনেক সময় তিনি কাজের ব্যস্ততায় শিশু হাসান রহ.কে দুধ পান করাতে পারতেন না। তিনি যখন কাঁদতে থাকতেন, অনেক সময় উম্মুল মু’মিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে দুধ পান করাতেন। বলা হয়, সে দুধের বরকতেই এ ইলম ও হিকমতের দৌলত তিনি লাভ করেন। তাছাড়া তার মা তাকে সাহাবায়ে কেরামের কাছে নিয়ে যেতেন এবং দোয়া চাইতেন। তারা জন্য দোয়া করতেন। হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তার জন্য দোয়া করেন,

اللهم فقهه في الدين، وحببه إلى الناس. اهـ

“হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের সমঝ দান কর এবং মানুষের কাছে তাকে প্রিয় বানিয়ে দাও।”- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ৯/২৯৫

তার যামানায় তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। এমনকি এও বলা হয় যে, তিনি নবীগণের সাদৃশ্য রাখতেন।

তিনি অত্যন্ত সুদর্শন, শক্তিশালী ও বীরবাহাদুর সুপুরুষ ছিলেন। বীরত্বের জন্য সুখ্যাত ছিলেন। শুরু শুরুতে তিনি জিহাদ নিয়েই পড়ে থাকতেন। এমনকি খুরাসানের আমীর আর-রবি ইবনু যিয়াদের কাতেবে পরিণত হন। তার হাতের কব্জি এক বিঘত প্রশস্ত ছিল- যা খুবই বিরল। উমাইয়া শাসনামলে তিনি খুরাসানে জিহাদ করতেন। তিনি এমনই প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন যে, আমীরুল মুজাহিদিন আলমুহাল্লাব ইবনু আবি সুফরা যখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতেন, তখন হাসান বসরী রহ.কে সামনের কাতারে রাখতেন।

ইমাম যাহাবি রহ. (৭৪৮হি.) 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' গ্রন্থে হিশাম ইবনু হাসসান রহ. থেকে বর্ণনা করেন (৪/৫৭৮),

كان الحسن أشجع أهل زمانه. اهـ

"হাসান রহ. যামানার সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন।"

আছমায়ী রহ. এর সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন (৪/৫৭২),

ما رأيت زندا أعرض من زند الحسن البصري، كان عرضه شبرا. قلت: كان رجلا تام الشكل، مليح الصورة، بهيا، وكان من الشجعان الموصوفين. اهـ

"হাসান বসরীর কব্জির চেয়ে প্রশস্ত কোন কব্জি দেখিনি। তার কব্জি এক বিঘত প্রশস্ত ছিল। আমি বলি- অর্থাৎ যাহাবি রহ. বলেন- শারীরিকভাবে তিনি পূর্ণ গড়নবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। সুদর্শন ও চক্ষুশীতলকারী ছিলেন। প্রসিদ্ধ বীরদের একজন ছিলেন।"

আরো বলেন (৪/৫৭২),

لم يطلب الحديث في صباه، وكان كثير الجهاد، وصار كاتبا لأمير خراسان الربيع بن زياد

وقال سليمان التيمي: كان الحسن يغزو، وكان مفتي البصرة جابر بن زيد أبو الشعثاء، ثم جاء الحسن، فكان يفتي. اهـ

“তিনি বাল্যকালে হাদিস অন্বেষণ করেননি। খুব বেশি জিহাদ করতেন। এমনকি খুরাসানের আমীর আর-রবি ইবনু যিয়াদের কাতেবে পরিণত হন।
সুলাইমান আততাইমি রহ. বলেন, হাসান রহ. জিহাদ করতেন। তখন বসরার মুফতি ছিলেন, আবুশ শা’ছা জাবির ইবনু যায়দ রহ.। এরপর যখন হাসান রহ. আসলেন, তখন তিনিই ফতোয়া দিতেন।”

ইতিহাসবিদ ফাসাবি রহ. (২৭৭হি.) ‘আলমা’রিফাতু ওয়াততারিখ’ কিতাবে জা’ফর ইবনু সুলাইমান রহ. থেকে বর্ণনা করেন (২/৪৯),

كان الحسن من أشد الناس إذا حضر الناس ... وكان المهلب إذا قاتل المشركين فكان الحسن من الفرسان الذين يقدمون. اهـ

“যুদ্ধ যখন বেঁধে যেতো, তখন হাসান রহ. অতীব জানবাজ ব্যক্তি পরিগণিত হতেন। ... (আমীর) মুহাল্লাব যখন

মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতেন, তখন হাসান রহ. ঐসকল বীর ঘোড়সওয়ারদের অন্তর্ভুক্ত থাকতেন, যাদেরকে অগ্রে রাখা হতো।”

আব্দুল্লাহ ইবনু আউন রহ. থেকে বর্ণনা করেন (২/৪৯),

سألت محمدا عن شيء من أمر الطعام في الغزو. فقال: سل الحسن فإنه كان يغزو. اهـ

“আমি মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন রহ. এর কাছে যুদ্ধের ময়দানে খাদ্য সংক্রান্ত একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ‘হাসানকে জিজ্ঞেস কর। কারণ, তিনি জিহাদ করতেন’।”

আবু খালিদ মুহাজির রহ. থেকে বর্ণনা করেন (২/৫২),

ذكر لأبي العالية الحسن، فقال: رجل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اهـ

“আবুল আলিয়া রহ. এর কাছে হাসান রহ. এর আলোচনা উঠল। তিনি বললেন, তিনি এমন একজন মুসলিম ছিলেন,

যিনি আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতেন।”

হাসান বসরী রহ. ১১০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: দুই. ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. (১৬২হি.)

দুই

ইবরাহীম ইবনু আদহাম আলবালখি রহ. (১৬২হি.)

সাইয়্যিদুয যুহহাদ ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. মূলত খুরাসানের বালখের অধীবাসী ছিলেন। পরে শামে চলে যান এবং সেখানেই রোমানদের বিরুদ্ধে রিবাতরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

আবু ইসহাক আসসাবিয়ী, মানসূর ইবনুল মু’তামির, মালিক ইবনু দিনার, সুলাইমান আলআ’মাশ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত

মুহাদ্দিস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সুফিয়ান সাওরি, বাক্কিয়্যাতুবনুল ওয়ালিদ, শাক্কিক্ক আলবালখি প্রমুখ বড় বড় ইমাম তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

সুফি দুনিয়ায় ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ.কে নিয়ে অনেক মাতামাতি হয়ে থাকে। তার নামে বানোয়াট অনেক কিছুই প্রচলিত আছে। তবে আমরা যদি তার বাস্তব ইতিহাস দেখতাম, তাহলে বুঝতে পারতাম, সুফিবাদিরা ইবরাহীম ইবনু আদহামের আদর্শ থেকে কত হাজারো কোটি মাইল দূরেই না অবস্থান করছে। বরং বলতে গেলে ভ্রান্ত সুফিবাদিরা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ইবরাহীম ইবনু আদহামের মতো যাহেদ ইমামদেরকে ব্যবহার করছে, আর বাস্তব জীবনে তারা এসকল ইমামদের অনুসরণ থেকে সম্পূর্ণই বিমুখ।

ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. বালখের এক উচ্চবংশীয় ও ধনাঢ্য রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঐশ্বর্য্যের কোন অভাব তার ছিল না। কিন্তু হালাল রিযিকের অন্বেষণে তিনি শুধু নিজ পরিবারই ত্যাগ করেননি, নিজ জন্মভূমিও ত্যাগ করেছেন।

প্রথমে তিনি ইরাক চলে যান। কিন্তু ইরাক তার কাছে ভাল ঠেকলো না। অনেকে পরামর্শ দিল, শামে চলে যান। সেখানে হালাল রিযিকের সন্ধান পাবেন। তিনি শাম চলে গেলেন। দিনমজুরি করে চলতে লাগলেন। একমাত্র নিজের হাতের হালাল কামাই ছাড়া অন্য কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছিলেন না যে, তাতে হারাম নেই। এজন্য তিনি পিতার ঐশ্বর্য্য ছেড়ে এসেছেন। আর রাজা বাদশাদের হাদিয়া তোহফা গ্রহণের তো কোনো প্রশ্নই নেই। কখনো ক্ষেতে কাজ করতেন, কখনো বাগান দেখাশুনার মজুরি নিতেন, কখনও বা অন্য কোন হালাল মজুরি। যখন প্রয়োজন হতো মজুরি করতেন। পারিশ্রমিক যা পেতেন ক্ষুধা নিবারণের প্রয়োজনটুকু রেখে বাকিটুকু সাদাকা করে দিতেন। এরপরও আপসোস করতেন আর কাঁদতেন এই ভয়ে যে, আখেরাতের নিয়ামত দুনিয়াতেই

ভোগ করে ফেলছেন কি’না।

এই মহামানবের রাত যেমন কাটতো ইবাদতে, দিন কাটতো রিবাতের ময়দানে। এমনকি তার শিষ্যত্ব যারা গ্রহণ করতো, তারাও মুজাহিদ হয়ে যেতো। এমনকি জিহাদ না করার কারণে তিনি জগদ্বিখ্যাত ইমাম, আমীরুল মু’মিনীন ফিল হাদিস: সুফিয়ান সাওরি রহ.কে-ও তিরস্কার করতেন। **যাহাবি রহ. (৭২৮হি.) খুরাইবি রহ. থেকে বর্ণনা করেন,**

جلست إلى إبراهيم بن أدهم، فكأنه عاب على سفيان ترك الغزو، وقال: هذا الأوزاعي يغزو، وهو أسن منه. اهـ

“একবার ইবরাহীম ইবনু আদহামের কাছে বসলাম। মনে হল তিনি জিহাদ তরক করার কারণে সুফিয়ান (সাওরি)কে তিরস্কার করেছেন এবং বলেছেন, এই যে আওযায়ী! তিনি জিহাদ করছেন অথচ তিনি সুফিয়ানের চেয়েও বয়স্ক।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/২৬৯

এই মর্দে মুজাহিদ মৃত্যুকালে জিহাদপ্রেমের যে দৃষ্টান্ত রেখে

গেছেন, আজকালকার জিহাদবিদ্বেষী সুফিমহল যদি একটু বিবেচনা করে দেখতো! **ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪হি.) বলেন,**

وذكروا إنه توفي في جزيرة من جزائر بحر الروم وهو مرابط، وأنه ذهب إلى الخلاء ليلة مات نحوا من عشرين مرة، وفي كل مرة يجدد الوضوء بعد هذا، وكان به البطن، فلما كانت غشية الموت قال: أوتروا لي قوسي، فأوتروه فقبض عليه فمات وهو قابض عليه يريد الرمي به إلى العدو رحمه الله وأكرم مثواه. اهـ

"ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, তিনি রোম সাগরের এক দ্বীপে রিবাতরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তারা লিখেছেন, যে রাত্রে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে রাত্রে বিশ বারের মতো ইস্তিনজাখানায় গিয়েছেন। প্রত্যেকবারই ইস্তিনজার পর (নামাযের জন্য) অজু করেছেন। তার পেট খারাপ ছিল। যখন (দেখলেন) মৃত্যুর আখিরি মূর্ছা শুরু হচ্ছে (সাথীদের) বললেন, 'আমার ধনুকে রশি লাগিয়ে দাও'। সাথীরা ধুনুকে রশি লাগিয়ে দিল। তিনি ধনুক হাতে নিলেন। (আকাঙ্খা: দুনিয়া থেকে এভাবে বিদায় হন যেন,) দুশমনদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন। এভাবে ধনুক হাতে অবস্থায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তার উপর রহম করুন। সম্মানজনক ঠিকানা দান করুন।"- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া

১০/১৫৪

ইবনে আসাকির রহ. (৫৭১হি.) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলেন,

قال: فدفناه في بعض الجزائر في بلاد الروم. اهـ

“বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা তাকে রোম সাম্রাজ্যের একটি দ্বীপে দাফন করলাম।”- তারিখে দিমাশক ৬/৩৪৯

বর্তমান সুফি দুনিয়াকে ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর সীরাতের সাথে তুলনা করলে কত বৈপরীত্বই না দেখতে পাবো:

- তিনি হালাল রিযিকের তালাশে নিজের পিতার রাজত্ব পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন, ক্ষেত খামারে দিনমজুরি করেছেন; পক্ষান্তরে আমাদের সুফি মহল সরকার, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ, যাদের অধিকাংশের অধিকাংশ মাল

সুনিশ্চিত হারাম, তাদের পকেটের দিকে তাকিয়ে থাকেন। হালাল হারামের কোন তোয়াক্কা না করে, যা আসে সবই গ্রহণ করে নেন।

- তিনি দুনিয়া খুব সামান্যই গ্রহণ করেছেন। ক্ষুধানিবারণের প্রয়োজনটুকুই শুধু গ্রহণ করেছেন; পক্ষান্তরে আমাদের সুফি মহলের ধন-ঐশ্বর্য্যের কোন শেষ নেই। একেক জন কলাগাছের মতো এমনই ফুলে উঠেছেন, যেন হস্তিপেট না হলে সুফিই হওয়া যায় না। বরং অবস্থা এমন ধারণ করেছে যে, ধন ভাণ্ডার আর আরাম আয়েশের লোভে এখন যে কেউ নিজেকে সুফি দাবি করে বসছে।

- আল্লাহ তাআলার দ্বীন বুলন্দ করার লক্ষ্যে খুরাসান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সুদূর রোম সাম্রাজ্যের এক নির্জন সমূদ্র-দ্বীপে তিনি রিবাতে চলে গেছেন; পক্ষান্তরে আমাদের সুফি মহল আজ একেতো অপব্যাখ্যা করে শরীয়তের জিহাদের প্রকৃত রূপ বিকৃত করেছেন, দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলার এই বিধানটিকে দুনিয়া থেকে বিলীন করে দেয়ার হীন উদ্দেশ্যে নিজেদের সর্বসামর্থ্য দিয়ে জিহাদের বিরোধীতা আর মুজাহিদদের সমালোচনা ও গালিগালাজ করে যাচ্ছেন

এবং তাদের নামে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট অপবাদ আরোপ করে যাচ্ছেন। এরপরও তাদের লজ্জা হয় না যে, নিজেদেরকে ইবরাহীম ইবনু আদহামের অনুসারি দাবি করে?!

শেষে ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর একটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি,

كل سلطان لا يكون عادلا فهو واللص بمنزلة واحدة، وكل عالم لا يكون ورعا فهو والذئب بمنزلة واحدة، وكل من خدم سوى الله فهو والكلب بمنزلة واحدة. اهـ

- "প্রত্যেক সুলতান যে আদেল-ন্যায়পরায়ণ না হবে, সে আর চোর একই কথা।

- প্রত্যেক আলেম যে পরহেযগার না হবে, সে আর হিংস্র বাঘ একই কথা।

- প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো সেবক হবে, সে আর কুকুর একই কথা।"- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/১৫১

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: তিন. আব্দুল্লাহ ইবনু আউন রহ. (১৫১হি.)

হাসান বসরী রহ. ও ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর মুজাহিদ শাগরেদ

আলহামদুলিল্লাহ! এতক্ষণ আমরা তাসাওউফ জগতের প্রথম সারির দু'জন শায়েখ নিয়ে আলোচনা করলাম। আমরা দেখলাম, তারা মুজাহিদ ছিলেন। এখন আমরা ইনশাআল্লাহ তাদের প্রত্যেকের দু'জন করে শাগরেদ নিয়ে আলোচনা করবো যারা মুজাহিদ ছিলেন। যাতে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, তাসাওউফ দুনিয়ায় যাদের দোহাই দিয়ে চলা হয়, তাদের বড় বড় মাশায়েখগণ নিজেরাই যে শুধু মুজাহিদ ছিলেন তাই নয়, তাদের সোহবতে যারা আসতো তারাও জিহাদি হয়ে যেত। যাতে এও স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, বর্তমান তাসাওউফের দাবিদার বহু শায়েখ, যাদের সংস্পর্শে আসলে পুরুষসুলভ গুণটিই নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয় এবং জিহাদের প্রতি অনিহা সৃষ্টি হয়: তারা আর যা কিছুই হোক, অন্তত আইম্মায়ে আহলে সুন্নাহর ত্বরীকার উপর নেই।

হাসান বসরী রহ. এর দু'জন মুজাহিদ শাগরেদ: হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনু আউন আলবাসরী রহ. (১৫১হি.) ও আর-রবি ইবনু সাবিহ আলবাসরী রহ. (১৬০হি.)।

ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর দু'জন মুজাহিদ শাগরেদ: শাকিক আলবালখি রহ. (১৯৪হি.) ও আলী ইবনু বাক্কার আলবাসরী রহ. (২০৭হি.)।

***

তিন

হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনু আউন আলবাসরী রহ. (১৫১হি.)

তিনি হাসান বসরী রহ. এর প্রথম সারির শাগরেদ। বসরার ইমাম। হাফিজুল হাদিস। নজীর বিহীন তাকওয়া-পরহেযগারির অধিকারী। বুখারি-মুসলিমসহ সুনানে

আরবাআর সকলেই নিজ নিজ সনদে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। **যাহাবি রহ. 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে বলেন (১/১১৭-১১৮):**

ابن عون الإمام شيخ أهل البصرة ... الحافظ

حدث عن: سعيد بن جبير وأبي وائل وإبراهيم النخعي وعطاء ومجاهد والشعبي والحسن والقاسم بن محمد وخلق.

وعنه: حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وإسحاق الأزرق ويزيد بن هارون وأبو عاصم الأنصاري ومسلم بن إبراهيم وخلق كثير.

قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالعراق أعلم بالسنة من بن عون. وقال قرة: كنا نعجب من ورع بن سيرين فأنساناه ابن عون. وقال شعبة: ما رأيت مثل أيوب وابن عون ويونس. وقال هشام بن حسان: لم تر عيناي مثل ابن عون. وقال ابن المبارك: ما رأيت أحدا أفضل من ابن عون. وقال شعبة: شك ابن عون أحب إلي من يقين غيره ... وقال ابن معين: ثقة في كل شيء. وقال بكار السيريني: كان ابن عون يصوم يوما ويفطر يوما وصحبته دهرا، وكان ... يختم كل أسبوع. اهـ

"ইমাম ইবনু আউন রহ. বসরার শায়েখ। ... হাফিজুল

হাদিস।

সাঈদ ইবনু যুবায়ের, আবু ওয়ায়িল, ইব্রাহিম নাখায়ি, আতা, মুজাহিদ, শা'বি, হাসান (বসরী) ও কাসিম ইবনু মুহাম্মাদসহ অসংখ্য মুহাদ্দিস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তার থেকে হাম্মাদ ইবনু যায়েদ, ইসামাঈল ইবনু উলাইয়া, ইসহাক আলআযরাক, ইয়াযিদ ইবনু হারুন, আবু আসিম আলআনসারি ও মুসলিম ইবনু ইব্রাহিমসহ অসংখ্য মুহাদ্দিস হাদিস রিওয়ায়াত করেছেন।

আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি রহ. বলেন, 'ইরাকে ইবনে আউনের চেয়ে সুন্নাহয় বড় আলেম আর কেউ নেই'।

কুররা রহ. বলেন, 'আমরা ইবনে সিরিনের তাকওয়া-পরহেযগারিতে আশ্চর্যান্বিত হতাম। কিন্তু পরে ইবনে আউন (আপন পরহেযগারির সামনে) ইবনে সিরিনের পরহেযগারির কথা (আমাদেরকে) ভুলিয়েই দিলেন'। ...

হিশাম ইবনু হাসসান রহ. বলেন, 'আমার দু' চক্ষু ইবনে

আউনের মতো ব্যক্তি দ্বিতীয়টি দেখেনি’।

ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, ‘ইবনে আউনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তি আমি দেখিনি’।

শু’বা রহ. বলেন, ‘ইবনে আউনের সংশয়জনক রিওয়ায়াতও আমাদের কাছে অন্যদের ইয়াকিনের তুলনায় অধিক প্রিয়’।

ইবনে মায়ীন রহ. বলেন, ‘তিনি সকল বিষয়েই নির্ভরযোগ্য’।

বাক্কার আসসিরিনি রহ. বলেন, ‘ইবনে আউন একদিন পর পর রোযা রাখতেন। আমি দীর্ঘ যামানা তার সোহবতে ছিলাম। ... তিনি প্রতি সপ্তাহে কুরআনে কারীম এক খতম করতেন’।”

এরপর ইমাম যাহাবি রহ. বলেন (১/১১৮):

لابن عون جلالة عجيبة ووقع في النفوس؛ لأنه كان إماما في العلم رأسا في التأله والعبادة حافظا لأنفاسه. كبير الشأن. مات في رجب سنة إحدى وخمسين ومائة رحمه الله تعالى. اهـ

“ইবনে আউন রহ. এর আশ্চর্য রকমের জালালত ও জনপ্রিয়তা ছিল। কেননা, তিনি ছিলেন ইলমের জগতে ইমাম। ইবাদাত ও আল্লাহমুখীতায় সকলের অগ্রগামী। আপন শ্বাস-প্রশ্বাসেরও হিফাজতকারী ছিলেন। বড় শানদার ব্যক্তি ছিলেন। রজব, ১৫১হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। রাহিমাহুল্লাহু তাআলা।”

অন্যত্র বলেন,

كان ابن عون عديم النظير في وقته، زهدا، وصلاحا. اهـ

“যুহদ ও বুযুর্গীতে আপন যামানায় ইবনে আউনের সমকক্ষ কেউ ছিল না।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৩৭৫

***

জিহাদের ময়দানে

ইলম ও আমলের ময়দানের এ শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিটি জিহাদের

ময়দানেও ছিলেন বাহাদুর। **তার দীর্ঘ দিনের শাগরেদ বাক্কার রহ. বলেন,**

وكان يغزو ويركب الخيل. بارز مرة علجا فقتله. اهـ

“তিনি জিহাদ করতেন এবং ঘোড়ায় সওয়ার হতেন। একবার এক মল্লযুদ্ধে এক (রুমান) বাহাদুরকে হত্যা করেছেন।”- তাযকিরাতুল হুফফাজ **১/১১৮**

বাক্কার রহ. আরো বলেন,

وكان - فيما حدثني بعض أصحابنا - لابن عون ناقة يغزو عليها، ويحج. اهـ

“ইবনে আউনের একটি উষ্ট্রী ছিল, যার উপর সওয়ার হয়ে তিনি জিহাদ ও হজ করতেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৩৭০

আরো বলেন,

وكان يغزو على ناقته إلى الشام، فإذا صار إلى الشام، ركب الخيل، وقد بارز روميا، فقتل الرومي. اهـ

“জিহাদে যাওয়ার সময় প্রথমে উষ্ট্রীটিতে চড়ে শাম যেতেন। শামে গিয়ে ঘোড়ায় চড়তেন। একবার এক রুমান সৈন্যের সাথে মল্লযুদ্ধে নেমেছিলেন। তিনি রুমান সৈন্যটিকে হত্যা করেছিলেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৩৭০

মল্লযুদ্ধের ঘটনাটি অন্য রেওয়াতে আরো চমৎকারভাবে এসেছে। ইমাম যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন (সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৩৬৮):

محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثني مفضل بن لاحق، قال: كنا بأرض الروم، فخرج رومي يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه رجل فقتله، ثم دخل في الناس، فجعلت ألوذ به لأعرفه، وعليه المغفر. فوضع المغفر يمسح وجهه، فإذا ابن عون!. اهـ

“মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আলআনসারি বলেন, আমাদের কাছে মুফাজজাল ইবনু লাহিক্ব বর্ণনা করেছেন, ‘আমরা একবার রোম সাম্রাজ্যে (জিহাদে) ছিলাম। তখন এক রুমান সৈন্য বেরিয়ে এল। সে মল্লযুদ্ধের জন্য ডাকাডাকি করতে লাগলো। তার ডাকে সাড়া দিয়ে (আমাদের) এক ব্যক্তি বের হলেন। তিনি সৈন্যটিকে হত্যা করে এসে লোকদের মাঝে ঢুকে পড়লেন। আমি তাকে চেনার জন্য তার পিছু নিলাম।

তার মাথায় তখন শিরস্ত্রাণ পরা ছিল। তিনি মুখ মুছতে মুছতে শিরস্ত্রাণটি খুললেন। আশ্চর্য! তাকিয়ে দেখি তিনি ইবনে আউন।”

এই ছিল সালাফদের অবস্থা। তারা ইলম ও আমলের ময়দানে যেমন ছিলেন অতুলনীয়, জিহাদের ময়দানেও ছিলেন বীর সেনানি।

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: চার-পাঁচ

চার

আর-রবি ইবনু সাবিহ আলবাসরী রহ. (১৬০হি.)

বসরার বিশিষ্ট আবেদ ও যাহেদ। হাসান বসরী রহ. এর শাগরেদ। এছাড়াও মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন, আতা ইবনু আবি রাবাহ, সাবিত বুনানি প্রমুখ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ওয়াকি ইবনুল জাররাহ, আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি, আবু দাউদ তায়ালিসি, সুফিয়ান সাউরি, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রমুখ তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন ও আহমাদ ইবনু হাম্বলসহ অনেকে তাকে ছিকাহ তথা হাদিসে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

আমীরুল মু'মিনীন মাহদির আমলে হিন্দুস্তানে জিহাদ করতে এসে তিনি মারা যান। বিজয়ের পর বাহিনি যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন বিশেষ এক রোগ দেখা দেয়। তাতে আক্রান্ত হয়ে রবি রহ. সহ এক হাজার মুজাহিদ মারা যান। তাছাড়া জাহাজ ডুবিতেও অনেকে মারা যান। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর রহম করুন। তাদেরই কুরবানির উসিলায় আজ আমরা ঈমানদার। **১৬০ হিজরির আলোচনায় ইমাম যাহাবি রহ. বলেন,**

وفيها افتتح المسلمون وعليهم عبد الملك المسمعي مدينة كبيرة بالهند ... وتُوفي في غزوة الهند في الرجعة بالبحر الربيع بن صبيح البصري صاحب الحسن. اهـ

“আব্দুল মালিক আলমিসমায়িির নেতৃত্বে এ বছর মুসলমানগণ হিন্দুস্তানের বিশাল একটি এলাকা বিজয় করেন। ... এ গাযওয়াতুল হিন্দে সমূদ্রপথে ফেরার সময় হাসান বসরী রহ. এর শাগরেদ রবি ইবনু সাবিহ রহ. মৃত্যুবরণ করেন।”- আলইবার ১/১৭৯

***

পাঁচ

শাকিক আলবালখি রহ. (১৯৪হি.)

ইব্রাহিম ইবনু আদহাম রহ. এর মুরীদ। তাসাউফ জগতে অতি পরিচিত ব্যক্তি। প্রথমে আবু হানিফা রহ. এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। তার ওফাতের পর যুফার রহ. এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উভয়ের কাছ থেকে ইলমে ফিকহ শিখেন। আবু ইউসুফ রহ. থেকেও ফিকহ শিখার সুযোগ হয়েছে।

তিনি এক দিকে যেমন ছিলেন দুনিয়া বিমুখ যাহেদ

ইবাদতগুজার, অন্যদিকে ছিলেন অনন্য সাধারণ মুজাহিদ।

ইমাম যাহাবি রহ. বলেন,

وقد جاء عن شقيق مع تألهه وزهده، أنه كان من رؤوس الغزاة.
وروى: محمد بن عمران، عن حاتم الأصم، قال: كنا مع شقيق ونحن مصافو العدو الترك، في يوم لا أرى إلا رؤوسا تندر ، وسيوفا تقطع، ورماحا تقصف، فقال لي: كيف ترى نفسك، هي مثل ليلة عرسك؟ قلت: لا والله. قال: لكني أرى نفسي كذلك. اهـ

“শাকিক রহ. এর ব্যাপারে জানা যায় যে, আবেদ ও যাহেদ হওয়ার পাশাপাশি তিনি শীর্ষস্থানীয় মুজাহিদ ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইমরান, হাতিম আলআছাম্ম থেকে বর্ণনা করেন, একবার তুর্কি দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শাকিকের সাথে আমরা কাতারবন্দী দণ্ডায়মান ছিলাম। সেদিন এমনই এক ভয়াবহ দিন ছিল যে, শুধু দেখছি- দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। তরবারি ভেঙে খানখান হচ্ছে। বৃষ্টির মতো তীর-বর্শা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এমন সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘নিজেকে কেমন অনুভব করছো? বাসর রাতের মতো মনে হচ্ছে কি’? আমি উত্তর দিলাম, ‘না তো’। তিনি বললেন, তবে আমার কিন্তু এমনই অনুভব হচ্ছে।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৮/৭১

এ মর্দে মুজাহিদ অবশেষে ১৯৪ হিজরিতে মা-ওয়ারাউন নাহরে এক যুদ্ধে শহীদ হন। **আব্দুল কাদির আলকুরাশি রহ. (৭৭৫হি.) বলেন,**

مات قتيلا شهيدا فى غزوة كولار سنة أربع وتسعين ومائة رحمه الله تعالى. اهـ

"১৯৪ হিজরিতে কুলার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। আল্লাহ তাআলা তার উপর রহম করুন।"- আলজাওয়াহিরুল মুজিয়্যাহ ফি তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ ২৫৮

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ছয়. আলী ইবনু বাক্কার (২০৭হি.)

ছয়

আলী ইবনু বাক্কার আবুল হাসান আলবাসরী রহ. (২০৭হি.)

আলী ইবনু বাক্কার

রিবাত-ই শান তার

পাহারায় পাহাড়

রণাঙ্গণে বারবার

জিহাদই প্রাণ তার

আবু নুআইম ইস্পাহানি রহ. (৪৩০হি.) ‘হিলইয়াতুল আওলিয়া’ গ্রন্থে (৯/৩১৭) তার আলোচনা এভাবেই শুরু করেছেন। (1)

তিনিও ইবরাহীম ইবনু আদহাম রহ. এর মুরীদ। বিশিষ্ট যাহেদ। ময়দানের বীর সেনানী। ইমাম যাহাবি রহ. বলেন,

الإمام، الرباني، العابد، أبو الحسن البصري، الزاهد، نزيل المصيصة، ومريد إبراهيم بن أدهم ... قال يوسف بن مسلم: بكى علي بن بكار حتى عمي، وكان قد أثرت الدموع في خديه. قلت: وكان فارسا، مرابطا، مجاهدا، كثير الغزو، فروي عنه أنه قال: واقعنا العدو، فانهزم المسلمون، وقصر بي فرسي، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفرس: نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون، حيث تتكل على فلانة في علفي، فضمنت أن لا يليه غيري. اهـ

“আবুল হাসান আলবাসরী। ইমামে রব্বানী। আবেদ। যাহেদ। (রিবাতের জন্য) মিসসিসিয়্যাতে এসে বসবাস করেন। ইবরাহীম ইবনু আদহামের মুরীদ। ...

ইউসুফ ইবনু মুসলিম বলেন, ‘আলী ইবনু বাক্কার রহ. এতে বেশি কাঁদতেন যে, কাঁদতে কাঁদতে শেষে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। চোখের পানিতে উভয় গালে দাগ পড়ে গিয়েছিল’।

আমি বলি (অর্থাৎ যাহাবি রহ. বলেন), তিনি বিশিষ্ট ঘোড়সওয়ারও ছিলেন। মুরাবিত ও মুজাহিদ ছিলেন। অনেক বেশি জিহাদ করতেন। তার থেকে একটি (আশ্চর্য) ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একবার আমরা শত্রুর উপর হামলা করলাম। কিন্তু মুসলিম বাহিনি পশ্চাদপসরণ করল। আমার ঘোড়া আমাকে নিয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারছিল না। আমি বলে উঠলাম, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন! তখন ঘোড়াও বলে উঠল, হ্যাঁ; এখন তো ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন- ই পড়তে হবে। আমার দানা-পানির দায়িত্ব যখন অমুক মহিলার হাতে সোপর্দ করে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন, তখন তো এমনটাই হবে। তখন থেকে ঠিক

করলাম, এ দায়িত্ব আমি নিজেই পালন করবো, অন্য কারো হাতে ছাড়বো না।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৮/২৩৪

***

প্রিয় পাঠক! যেহেতু একজন সুফি সাহেবের বিভ্রান্তিকর বয়ানের প্রেক্ষিতে আলোচনা শুরু হয়েছিল, তাই প্রথমে বিখ্যাত কয়েকজন যাহেদের আলোচনা আনলাম। সামনের পর্ব থেকে ইনশাআল্লাহ প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরামের আলোচনা আনবো।

***

---

1. المرابط الصبار المجاهد الكرار علي بن بكار - رحمه الله تعالى. سكن المصيصة مرابطا، صحب إبراهيم بن أدهم وأبا إسحاق الفزاري. اهـ

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: সাত. কাজি আসাদ ইবনুল ফুরাত রহ. (২১৩হি.)

সাত

কাজি আসাদ ইবনুল ফুরাত (২১৩হি.)

তিনি ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিমাহুমুল্লাহ-সকলের শাগরেদ। ইমাম মালেক থেকে মুআত্তা রিওআয়াত করেছেন। আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহিমাহুমাল্লাহর কাছে ফিকহ শিখেছেন। **'আলআসাদিয়া'** কিতাবের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। আবু ইউসুফ রহ. উস্তাদ হয়েও তার থেকে মুআত্তা মালেক রিওয়াত করেছেন।

তিনি বংশীয়ভাবে খুরাসানের নিশাপুরের মানুষ। তবে তার পিতার সাথে আফ্রিকার মাগরিবে কায়রাওয়ান শহরে চলে যান। তার পিতা সেনাবাহিনির উচ্চ পদস্থ সৈনিক ছিলেন। ইলম তলবের জন্য তিনি আবার মাশরিকে আসেন। মদীনায় ইমাম মালেক রহ. এর কাছে হাদিস পড়েন। ইরাকে গিয়ে আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মাদ রহ. এর কাছে ফিকহ শিখেন। ইরাকে থাকাবস্থায়ই ইমাম মালেক রহ. এর ইন্তেকাল হয়ে

যায়।

ইরাকে আবু হানিফা রহ. এর মাযহাব শিখে তিনি মিশরে চলে যান। সেখানে ইমাম মালেক রহ. এর বড় বড় দু'জন শাগরেদ বিদ্যমান ছিলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহব ও আব্দুর রহমান ইবনুল কাসিম। প্রথমে তিনি ইবনু ওয়াহব রহ. এর কাছে গিয়ে আবু হানিফা রহ. এর মাসআলাসমূহ পেশ করেন। আবেদন করেন, এর বিপরীতে প্রতিটি মাসআলায় ইমাম মালেকের কি অভিমত তা তুলে ধরতে। কিন্তু ইবনু ওয়াহব রহ. হিম্মত করেননি। তিনি ইবনুল কাসিম রহ. এর কাছে চলে যান। ইবনুল কাসিম রহ. প্রতিটি মাসআলায় ইমাম মালেক রহ. এর অভিমত তুলে ধরেন। যেখানে ইমাম মালেকের স্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই, সেখানে তার অন্যান্য বক্তব্যের আলোকে সমাধান কি হতে পারে তা বলে দেন। আসাদ রহ. এসব মাসআলা সংকলন করে মাগরিবে চলে যান। তার সংকলিত এ কিতাবগুলো **'আলআসাদিয়া'** নামে প্রসিদ্ধ।

কাজি ইয়াজ রহ. (৫৪৪ হি.) বলেন,

قال سلمان بن عمران: ... بسبب أسد ظهر العلم بإفريقية. قال غيره. كان أسد أعلم العراقيين بالقيروان كافة. ومذهبه السنة لا يعرف غيرها. اهـ

"সুলাইমান ইবনু ইমরান রহ. বলেন, আসাদ রহ. এর মাধ্যমেই আফ্রিকায় ইলমের প্রচার-প্রসার হয়েছে। অন্য একজন বলেন, ইরাক থেকে ইলম অর্জনকারীদের মধ্যে কায়রাওয়ান শহরে আসাদ রহ.- ই ছিলেন সবচেয়ে বড় আলেম। তার মাযহাব সম্পূর্ণ সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত (বিদআতি) কিছেই তিনি জানেন না।"- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০২

আরো বলেন,

قال عمران بن أبي محرز: جاءنا موت أسد فاستعظمه أبي، وقال: اليوم مات العلم. اهـ

"ইমরান ইবনু আবু মুহরিয রহ. বলেন, আমাদের কাছে আসাদ রহ. এর মৃত্যুর খবর আসলো। আমার পিতার কাছে

তার মৃত্যু অতিশয় দুঃখের বিষয় মনে হল। বললেন, আজ ইলমের মৃত্যু ঘটে গেছে।”- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০২

বীরত্ব

যাহাবি রহ. বলেন,

وكان مع توسعه في العلم فارسا، بطلا، شجاعا، مقداما. اهـ

“প্রভূত ইলমের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ঘোড়সওয়ার। বাহাদুর। সাহসী বীর। ময়দানের অগ্রসৈনিক।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৮/৩৫১

জিহাদ ও শাহাদাত

মাগরিরেবর গভর্নর যিয়াদাতুল্লাহ আলআগলাবি প্রথমে ২০৩/২০৪ হিজরিতে তাকে কায়রাওয়ানের কাজি নিয়োগ দেন। তিনি কাজি হিসেবেই বহাল ছিলেন। ২১২ হিজরিতে তিনি তাকে দশ হাজার সৈন্যের আমীর বানিয়ে সিকিল্লিয়া দ্বীপ বিজয়ের জন্য পাঠান। তখন তিনি একাধারে বাহিনির আমীর ও কাজি ছিলেন। সিকিল্লিয়ার সম্রাট দেড় লাখ সৈন্য নিয়ে তার মোকাবেলায় আসে। তিনি তাদের পরাজিত

করেন। পরে গিয়ে সারাকুসা অবরোধ করেন। এ অবরোধকালে তিনি মারা যান। আঘাতে আঘাতে গোটা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এ জখমেই তিনি শহীদ হন। রাহিমাহুল্লাহ। কাজি ইয়াজ রহ. (৫৪৪ হি.) বলেন,

قام قاضياً إلى أن خرج إلى صقلية، سنة اثنتي عشرة والياً على جيشها. وكان على علمه وفقهه أحد الشجعان. فخرج أسد في عشرة آلاف رجل منهم تسعمائة فارس ... فقال أسد إذ ذاك لزيادة الله: من بعد القضاء، والنظر في الحلال والحرام تعزلني وتوليني الإمارة؟ فقال: لا، ولكني وليتك الإمرة، وهي أشرف، وأبقيت لك اسم القضاء. فأنت أمير، قاض، فخرج إلى صقلية وظفر بكثير منها وتوفي وهو محاصر سرقوسة منها. اهـ

“২১২ হিজরিতে সেনাবাহিনির আমীর হিসেবে সিকিল্লিয়া রওয়ানা হওয়া পর্যন্তই তিনি কাজি ছিলেন। প্রভূত ইলম ও ফিকহের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন বিশিষ্ট বীর। আসাদ রহ. দশ হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন, যাদের মধ্যে নয়শো ছিল ঘোড়সওয়ার। ... তখন তিনি যিয়াদাতুল্লাহর কাছে আরজ করেন, এত দিন আমি কাজি ছিলাম। হালাল হারামের ফতোয়া দিতাম। (এখন) আমাকে (এ সম্মানিত পদ থেকে) বরখাস্ত করে আমীর বানাবেন?

তিনি উত্তর দেন, না! বরং আমি আপনাকে আমীর বানাচ্ছি- আর এটি অধিক সম্মানজনক- পাশাপাশি কাজি হিসেবেও বহাল রাখছি। আপনি আমীরও, কাজিও।

এরপর তিনি সিকিল্লিয়া রওয়ানা হন। সেখানকার অনেক এলাকা বিজয় করেন। সারাকুসা (সিকিল্লিয়ার একটা এলাকা) অবরোধ করা অবস্থায় সেখানেই ইন্তেকাল করেন।”- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০৪-৩০৫

আরো বলেন,

وحكى سليمان بن سالم أن أسداً لقي ملك صقلية في مائة ألف وخمسين ألفاً. قال الرواي فرأيت أسداً لقي ملك صقلية في مائة ألف وخمسين ألفاً. قال الرواي فرأيت أسداً وفي يده اللواء وهو يزمزم وأقبل على قراءة يس، ثم حرض الناس، وحمل وحملوا معه، فهزم الله جموع النصارى، ورأيت أسداً وقد سالت الدماء على قناة اللواء. حتى صار تحت إبطه، ولقد رد يده في بعض تلك الأيام فلم يستطع مما اجتمع من الدم تحت إبطه. اهـ

“সুলাইমান ইবনু সালিম রহ. বর্ণনা করেন, আসাদ রহ. সিকিল্লিয়া সম্রাটের মুখোমুখি হন। তখন সম্রাটের সৈন্য

সংখ্যা ছিল দেড় লাখ। বর্ণনাকারী বলেন, দেখলাম- দেড় লাখ সৈন্য-সমেত আগত সিকিল্লিয়া সম্রাটের সাথে আসাদ রহ. মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, দেখলাম আসাদ রহ. এর হাতে ঝাণ্ডা। গুণগুণ আওয়াজে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করতে করতে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। এরপর তিনি সৈন্যদের (জিহাদে) উৎসাহিত করলেন এবং শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সৈন্যরাও ঝাঁপিয়ে পড়লো। আল্লাহ তাআলা নাসারা বাহিনিকে পরাজিত করলেন। আসাদ রহ.কে দেখলাম, ঝাণ্ডার হাতল বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। এমনকি তার বগলের নিচে পর্যন্ত গড়িয়েছে। ঐ সময় এক দিন তিনি হাত নাড়াতে চাইলেন, কিন্তু বগলের নিচে এত রক্ত জমেছিল যে, হাত নাড়াতে পারছিলেন না।”- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০৬

শেষে বলেন,

وكانت وفاة أسد في حصار سرقوسة، من غزوة صقلية، وهو أمير الجيش وقاضيه. سنة ثلاث عشر ومائتين. وقيل أربع عشرة، وقيل سبع عشرة. وقبره ومسجده بصقلية. اهـ

“২১৩/২১৪/২১৭ হিজরিতে তার ওফাত। সিকিল্লিয়া যুদ্ধে সারাকুসা অবরোধকালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তিনি বাহিনির আমীর ও কাজি ছিলেন। সিকিল্লিয়াতে তার কবর ও মসজিদ বিদ্যমান।”- তারতিবুল মাদারিক ৩/৩০৯

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: আট. ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.)

আট

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. (১১৮-১৮১হি.)

আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আলমারওয়াজি। শাইখুল ইসলাম। আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদিস। যামানার অতুলনীয় ইমাম। যুহদ ও তাকওয়ার রাহবার।

তিনি খোরাসানের অধিবাসী। বংশগতভাবে তুর্কি। তার পিতা মুবারক বনু হানযালার এক ব্যবসায়ীর গোলাম ছিলেন। এজন্য ইবনুল মুবারককে আলহানযালি বলা হয়। এক ক্রিতদাসের ঔরসে আল্লাহ তাআলা এ মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন।

তলবে ইলমের উদ্দেশ্যে তিনি দূর-দূরান্তের দেশে সফর করেছেন। হারামাইন শরীফাইন, খোরাসান, শাম, ইরাক, মিশর- কোন দেশই বাকি রাখেননি। বিশেষভাবে আবু হানিফা রহ. এর কাছে ফিকহ ও সুফিয়ান সাওরি রহ. এর কাছে হাদিস পড়েছেন। চার হাজার উস্তাদ থেকে তিনি ইলম শিখেছেন। তার হাদিস গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।

তিনি সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। চার লাখ দিরহাম ছিল তার ব্যবসার মূলধন। যখন সফরে বের হতেন, তখন ব্যবসাও করতেন। মুহাদ্দিসিন, তুলাবা ও ফকির-মিসকিনদের মাঝে অকাতরে দান করতেন। এ উদ্দেশ্যেই মূলত তিনি ব্যবসা করতেন।

তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন। ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ রহ. বলেন,

لا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير، إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك. اهـ

“আল্লাহ তাআলা যত ভাল গুণ সৃষ্টি করেছেন, তার সবগুলোই আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে দান করেছেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৩৬৮

আব্বাস ইবনু মুসআব রহ. বলেন,

جمع عبد الله الحديث، والفقه، والعربية، وأيام الناس، والشجاعة، والسخاء، والتجارة، والمحبة عند الفرق. اهـ

“ফিকহ, আরবি ভাষার ব্যুৎপত্তি, ইতিহাস, বীরত্ব, দানশীলতা, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল কিছুর সমাহার আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এর মাঝে ঘটেছে এবং সকল মতাদর্শের লোকের কাছেই তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৩৬৭

ইবনুল মুবারক রহ. এর কৃতদাস হাসান ইবনু ঈসা রহ. বলেন,

اجتمع جماعة مثل الفضل بن موسى، ومخلد بن الحسين، فقالوا: تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير، فقالوا: العلم، والفقه، والأدب، والنحو، واللغة، والزهد، والفصاحة، والشعر، وقيام الليل، والعبادة، والحج، والغزو، والشجاعة، والفروسية، والقوة، وترك الكلام فيما لا يعنيه، والإنصاف، وقلة الخلاف على أصحابه. اهـ

"ফজল ইবনু মূসা ও মাখলাদ ইবনুল হুসাইনের মতো বিশিষ্ট এক দল আলেম সমবেত হলেন। তারা বললেন, চল! ইবনুল মুবারক রহ. এর মাঝে যেসব ভাল গুণ ছিল, আমরা সেগুলো হিসেব করি। তারা হিসেব করলেন, ইবনুল মুবারক রহ. নিম্নোক্ত সকল গুণের সমাহার ছিলেন: ইলম, ফিকহ, আদব, নাহু, লুগাত, যুহদ, ফাসাহাত, কাব্য, কিয়ামুল লাইল, ইবাদাত, হজ্ব, জিহাদ, বীরত্ব, ফিরাসাত-সুদূর প্রসারি অন্তর্দৃষ্টি, প্রভূত শারীকি শক্তি, অপ্রয়োজনীয় কোন কথা না বলা এবং যথাসম্ভব সাথী-সঙ্গীদের সাথে মতভেদ না করা।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৭৬

যাহাবি রহ. বলেন,

أكثر من الترحال والتطواف، وإلى أن مات في طلب العلم، وفي الغزو، وفي التجارة والإنفاق على الإخوان في الله، وتجهيزهم معه إلى الحج. اهـ

“মৃত্যু পর্যন্তই দূর-দূরান্তে সফর করেছেন। তলবে ইলম, জিহাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, আল্লাহর ওয়াস্তে দ্বীনি ভাইদের পেছনে খরচ করা এবং তাদের জন্য হজ্বের সামগ্রী প্রস্তুত ও ব্যবস্থা করে দেয়ার মাঝে জীবন অতিবাহিত করেছেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৩৬৫

সর্ব মহলে তিনি এমনই গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন যে, আসওয়াদ ইবনু সালিম রহ. এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন,

إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك، فاتهمه على الإسلام. اهـ

“কোন ব্যক্তিকে যদি দেখো যে, সে ইবনুল মুবারকের সমালোচনা করে, তাহলে তার মুসলমান দাবির ব্যাপারে তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৩৭৪

জিহাদ ও বীরত্ব

জিহাদের ময়দানে ইবনুল মুবারক রহ. এমনই প্রসিদ্ধ তারকাতুল্য যে, নতুন করে বলার কিছু নেই। ইলম ও জিহাদ উভয় ময়দানেই তিনি ছিলেন ঘোড়সওয়ার। এখানে তার বীরত্বের দু'টি ঘটনা তুলে ধরছি:

এক.

আবু হাতিম রাজি রহ. এর সূত্রে আবদা ইবনু সুলাইমান আলমারওয়াজি রহ. থেকে যাহাবি রহ. (৭৪৮ হি.) বর্ণনা করেন (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৭৪),

كنا سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان، خرج رجل من العدو، فدعا إلى البراز، فخرج إليه رجل، فقتله، ثم آخر، فقتله ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البزاز، فخرج إليه رجل، فطارده ساعة، فطعنه، فقتله، فازدحم إليه الناس، فنظرت، فإذا هو عبد الله بن المبارك، وإذا هو يكتم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه، فمددته، فإذا هو هو، فقال:

وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا!!. اهـ

“আমরা রোম সাম্রাজ্যে ইবনুল মুবারক রহ. এর সাথে এক যুদ্ধে গেলাম। শত্রু বাহিনি আমাদের মুখোমুখী হল। উভয় বাহিনি যখন সারিবদ্ধ দাঁড়ালো, তখন শত্রুদের এক যোদ্ধা এসে মুবারাযা (তথা মল্লযুদ্ধ)- এর জন্য আহ্বান করতে লাগল। তখন (মুসলিম বাহিনি থেকে) এক ব্যক্তি তার ডাকে সারা দিয়ে মোকাবেলার জন্য বের হল এবং শত্রুসৈন্যটিকে হত্যা করলো। শত্রু বাহিনির আরেক যোদ্ধা আসল। তিনি তাকেও হত্যা করলেন। (তৃতীয়) আরেক যোদ্ধা আসলো। তিনি তাকেও হত্যা করলেন। এরপর মুবারাযার জন্য শত্রু বাহিনিকে আহ্বান করতে লাগলেন। তাদের থেকে এক যোদ্ধা অগ্রসর হল। তার সাথে কিছুক্ষণ মোকাবেলার পর তিনি তাকেও আঘাতে হত্যা করলেন। লোকজন মুসলিম সৈন্যটিকে দেখার জন্য ভীড় করলো। আমিও তাকে দেখার জন্য তাকালাম। দেখি তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক! তিনি জামার আস্তিনের দ্বারা নিজের চেহারা লুকানোর চেষ্টা করছেন। আমি তার আস্তিনের এক পার্শ্ব ধরে টান দিলাম। (এতে চেহারা খোলে গেল এবং) দেখলাম যে, আসলেই তিনি ইবনুল মুবারক ...।”

দুই.

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না রহ. এর সূত্রে যাহাবি রহ. আব্দুল্লাহ ইবনু সিনান রহ. থেকে বর্ণনা করেন (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৮৩-৩৮৪),

كنت مع ابن المبارك، ومعتمر بن سليمان بطرسوس، فصاح الناس: النفير. فخرج ابن المبارك، والناس، فلما اصطف الجمعان، خرج رومي، فطلب البراز، فخرج إليه رجل، فشد العلج عليه، فقتله، حتى قتل ستة من المسلمين، وجعل يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة، ولا يخرج إليه أحد، فالتفت إلي ابن المبارك فقال: يا فلان! إن قتلت، فافعل كذا وكذا. ثم حرك دابته، وبرز للعلج، فعالج معه ساعة، فقتل العلج، وطلب المبارزة، فبرز له علج آخر، فقتله، حتى قتل ستة علوج، وطلب البراز، فكأنهم كاعوا عنه، فضرب دابته، وطرد بين الصفين، ثم غاب، فلم نشعر بشيء، وإذا أنا به في الموضع الذي كان، فقال لي: يا عبد الله! لئن حدثت بهذا أحدا، وأنا حي، فذكر كلمة. اهـ

"আমরা ইবনুল মুবারক রহ. ও মু'তামির ইবনু সুলাইমান রহ. এর সাথে তরাসুসে ছিলাম। এমন সময় লোকজন চিৎকার করে উঠল, এখনই জিহাদে বেরিয়ে পড়তে হবে। ইবনুল মুবারক রহ. সহ সকলেই বেরিয়ে পড়লো। উভয় বাহিনি যখন সারিবদ্ধ দাঁড়ালো, এক রোমান সৈন্য এসে

মুবারাযার জন্য আহ্বান করতে লাগল। মুসলিম বাহিনির এক ব্যক্তি তার ডাকে সাড়া দিয়ে অগ্রসর হল। সৈন্যটি তার উপর হামলা করে তাকে শহীদ করে দিল। এভাবে একে একে সে মুসলিম বাহিনির ছয়জন মুজাহিদকে হত্যা করল। এরপর উভয় বাহিনির মাঝখানে গর্বভরে হেঁলে-দুলে ফিরতে লাগল আর মুবারাযার আহ্বান করতে লাগল। কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিচ্ছিল না। এমন সময় ইবনুল মুবারক রহ. আমার দিকে তাকালেন। বললেন, হে অমুক! যদি আমি নিহত হই, তাহলে তুমি এই এই কাজগুলো সম্পাদন করবে। তারপর তিনি তার সওয়ারি হাঁকালেন এবং রোমান সৈন্যটির মোকাবেলায় গেলেন। কিছুক্ষণ মোকাবেলার পর তিনি সৈন্যটিকে হত্যা করলেন এবং মুবারাযার জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। এক সৈন্য তার ডাকে সাড়া দিয়ে অগ্রসর হল। তিনি তাকেও হত্যা করলেন। এভাবে একে একে তিনি ছয়জন সৈন্যকে হত্যা করলেন এবং মুবারাযার জন্য আহ্বান করতে লাগলেন। কিন্তু মনে হল, শত্রু বাহিনির লোকেরা তার মোকাবেলায় আসতে সাহস পাচ্ছে না। এরপর তিনি উভয় বাহিনির মাঝখানে তার সওয়ারি হাঁকালেন এবং অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ দেখি, তিনি আমার পাশে সে স্থানেই উপস্থিত, যেখানে আগে

ছিলেন। আমাকে বললেন, ‘হে আব্দুল্লাহ! আমি জীবিত থাকতে যদি তুমি এ ঘটনা কাউকে বলেছো তাহলে কিন্তু ....’ ... এখানে তিনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন (যা আমি বলতে চাচ্ছি না)।”

একটি স্বপ্ন

যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন,

قال محمد بن الفضيل بن عياض: رأيت ابن المبارك في النوم، قلت: الرباط. الأمر الذي كنت فيه :فقلت: أي العمل أفضل؟ قال والجهاد؟ قال: نعم. قلت: فما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة. اهـ

“ফুজাইল ইবনু ইয়াজের পুত্র মুহাম্মাদ রহ. বলেন, আমি ইবনুল মুবারক রহ.কে স্বপ্নে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, আমি যে কাজটি করতাম সেটি। আমি প্রশ্ন করলাম, রিবাত ও জিহাদ (-এর কথা বলছেন)? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার রব আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে মাফ করে দিয়েছেন।

এমন মাফ করেছেন, যার পর আর কোন মাফ হতে পারে না।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৩৯০

কবিতা

‘ইয়া আবিদাল হারামাইন’ নামে ফুজাইল ইবনু ইয়াজের কাছে পাঠানো ইবনুল মুবারকের একটি কবিতার কথা সকলেই জানি। জিহাদ নিয়ে তার আরো একটি হৃদয়গ্রাহী কবিতা আছে। যাহাবি রহ. সেটি উল্লেখ করেছেন (সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৩৮৯),

كيف القرار وكيف يهدأ مسلم ... والمسلمات مع العدو المعتدي

الضاربات خدودهن برنة ... الداعيات نبيهن محمد

القائلات إذا خشين فضيحة ... جهد المقالة ليتنا لم نولد

ما تستطيع وما لها من حيلة ... إلا التستر من أخيها باليد

“# কিভাবে স্থির থাকা যায়? কিভাবে কোনো মুসলিম প্রশান্তিতে থাকতে পারে? যেখানে মুসলিম নারীরা সীমালঙ্ঘনকারী শত্রুদের হাতে বন্দী?!

তারা তাদের নবী মুহাম্মাদকে ডেকে ডেকে মুখ চাপড়িয়ে রোনাজারি করে কাঁদছে।

যখন তারা সম্ভ্রমহানির ভয়ে শঙ্কিত, তখন শত আফসোস করে বলছে, হায়! যদি আমাদের জন্মই না হত!

নেই তার কোন শক্তি, নেই কোন উপায়। হাত ঠেকিয়ে ভাই থেকে মুখ লুকানো ছাড়া কিছুই তার করার নেই।"

বি.দ্র.

এতক্ষণ যে আটজনের আলোচনা গেল, তাদের মধ্যে

ইবরাহীম ইবনু আদহাম আলবালখি রহ. (১৬২হি.) এবং ইবনুল মুবারক রহ. (১৮১ হি.) আবু হানিফা রহ. এর শাগরেদ।

শাকিক আলবালখি রহ. (১৯৪হি.) আবু হানিফা, যুফার ও আবু ইউসুফ রাহিমাহুমুল্লাহ সকলের শাগরেদ।

কাজি আসাদ ইবনুল ফুরাত (২১৩হি.) আবু ইউসুফ রহ. ও মুহাম্মাদ রহ. এর শাগরেদ।

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: নয়. আওযায়ি রহ. (৮৮-১৫৭ হি.)

নয়

আওযায়ি রহ. (৮৮-১৫৭ হি.)

শাইখুল ইসলাম। ইমামু আহলিশ শাম। আবু আমর আব্দুর রহমান ইবনু আমর আলআওয়ায়ি। হাদিস, ফিকহ, ইবাদত-বন্দেগি, সত্যকথনে স্পষ্টবাদিতা: সকল ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ইমাম। আইম্মায়ে আরবাআর মতো তিনিও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মাযহাবের ইমাম ছিলেন। শাম ও আন্দালুসে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তার মাযহাব প্রচলিত ছিল। পরে তা মিটে যায়।

তার ইলমী মাকাম তুলে ধরতে গিয়ে কোন এক হাফেয বলেন,

وهو في الشاميين نظير معمر لليمانيين، ونظير الثوري للكوفيين، ونظير مالك للمدنيين، ونظير الليث للمصريين، ونظير حماد بن سلمة للبصريين. اهـ

“ইয়ামানবাসীর জন্য যেমন মা’মার, কূফাবাসীর জন্য যেমন সুফিয়ান সাওরি, মদীনাবাসীর জন্য যেমন ইমাম মালেক, মিশরবাসীর জন্য যেমন লাইস ইবনু সাদ এবং বসরাবাসীর জন্য যেমন হাম্মাদ ইবনু সালামা- শামবাসীর জন্য তেমনি আওযায়ি।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৫৫৬

রিবাতের ময়দানে আওযায়ি

প্রথমে তিনি ‘আলআওযা’ এলাকায় বাস করতেন। পরে রিবাতের জন্য বৈরুতে চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আওযায়ি রহ. নিজেই বলেন,

جئت إلى بيروت أرابط فيها. اهـ

“রিবাতের উদ্দেশ্যে আমি বৈরুতে আসি।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৫৫০

যাহাবি রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

كان يسكن بمحلة الأوزاع ... ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات. اهـ

“তিনি ‘আলআওযা’ এলাকায় বাস করতেন। ... তারপর রিবাতের উদ্দেশ্যে বৈরুত চলে যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৫৪২

ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪ হি.) বলেন,

لا خلاف أنه مات ببيروت مرابطا. اهـ

“এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, তিনি বৈরুতে রিবাতরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।”- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১০/১২৮

সত্য উচ্চারণে দ্ব্যর্থহীন আওযায়ি

উমাইয়া ইবনু ইয়াযিদ রহ. বলেন,

كان قد جمع العبادة، والعلم، والقول بالحق. اهـ

"প্রভূত ইলমের অধিকারী ও ইবাদতগুজার হওয়ার পাশাপাশি আওযায়ি ছিলেন হকের বেলায় স্পষ্টভাষী।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৫৪৪

জীবনের মায়া ত্যাগ করে তিনি জালেম শাসকদের সামনে হক কথা বলেছেন। আওযায়ি রহ. এর জন্ম হয় উমাইয়া আমলে। তার বয়স যখন চল্লিশেরে কোটা পেরিয়েছে, তখন ১৩২ হিজরিতে আব্বাসীরা উমাইয়াদের পরাজিত করে খেলাফত দখল করে। উমাইয়া খেলাফতের দারুল খিলাফা ছিল শাম। আওযায়ি রহ. শামের অধিবাসী ছিলেন। আবুল আব্বাস সাফফাহ ছিলেন আব্বাসীদের প্রথম খলিফা। তার চাচা আব্দুল্লাহ বিন আলী শামে উমাইয়াদের কচুকাটা করে। তার সাথে আওযায়ি রহ. এর ঘটনাটি প্রসিদ্ধ। আওযায়ি রহ. নিজের ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন,

بعث عبد الله بن علي إلي فاشتد ذلك علي، وقدمت فدخلت، والناس سماطان، فقال: ما تقول في مخرجنا، وما نحن فيه؟

أصلح الله الأمير قد كان بيني، وبين داود بن علي مودة :قلت
قال: لتخبرني. فتفكرت ثم قلت: لأصدقنه، واستبسلت للموت، ثم
رويت له عن يحيى بن سعيد حديث الأعمال، وبيده قضيب
ينكت به ثم قال: يا عبد الرحمن: ما تقول في قتل أهل هذا
البيت؟ قلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن
صلى الله عليه، وسلم- قال: "لا يحل قتل -عائشة عن النبي
المسلم إلا في ثلاث.."، وساق الحديث. فقال: أخبرني عن
الخلافة، وصية لنا من رسول الله -صلى الله عليه، وسلم-؟
فقلت: لو كانت وصية من رسول الله -صلى الله عليه، وسلم- ما
رضي الله عنه- أحدا يتقدمه. قال: فما تقول في -ترك علي
أموال بني أمية؟ قلت: إن كانت لهم حلالا فهي عليك حرام،
فأمرني، فأخرجت. .وإن كانت عليهم حراما فهي عليك أحرم
اهـ

“আব্দুল্লাহ ইবনু আলী আমাকে হাজির করার জন্য লোক পাঠাল। আমার কাছে বিষয়টা বিপদসংকুল ঠেকল। আমি গেলাম। তার কাছে হাজির হলাম। (অন্য বর্ণনায় এসেছে, দু’জন সৈন্য দু’বাহুতে ধরে তাকে হাজির করল।) তখন তার সৈন্যরা (অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায়) দু’ সারিতে দাঁড়ানো ছিল।

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা যে উমাইয়াদের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি এবং বর্তমানে আমরা যা করছি, সে ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? (তা কি জিহাদ গণ্য হবে?) ...

আমি কিছুক্ষণ ফিকির করলাম। তারপর মনে মনে বললাম, আমি তার সামনে সত্য কথাই বলবো (যদিও এ কারণে আমার মরণ হয়)। আর আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। (অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রথমে আমার মৃত্যুর ভয় লাগছিল। কিন্তু পরে যখন চিন্তা করলাম যে, এক দিন আল্লাহ তাআলার সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে, তখন সত্য সত্য জবাব দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিলাম।) (তার প্রশ্নের জবাবে) আমি এ হাদিসটি বর্ণনা করলাম, 'সকল কর্ম তার নিয়ত অনুযায়ী বিবেচিত হয়ে থাকে'। তার হাতে তখন একটি লাঠি ছিল। সেটি দিয়ে তিনি মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, হে আব্দুর রহমান! এ পরিবারের (তথা বনী উমাইয়ার) লোকদের হত্যার ব্যাপারে তোমার কি অভিমত?

জবাবে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিসটি বর্ণনা করলাম, 'তিন কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয় ...।' (অন্য বর্ণনায় এসেছে,

এ ধরণের নেতিবাচক উত্তরে তিনি রাগে ফুলে উঠছিলেন আর আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এবার হয়তো আমার মস্তক উড়িয়ে দেয়া হবে।)

এরপর জিজ্ঞেস করলেন, খেলাফতের ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তা আমাদের (তথা নবী বংশের লোকদের) জন্য অসিয়ত করে যাননি?

আমি উত্তর দিলাম, যদি অসিয়তই করে যেতেন, তাহলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্য কাউকে তা গ্রহণ করতে দিতেন না।

এরপর জিজ্ঞেস করলেন, বনী উমাইয়ার ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? (তা কি আমাদের জন্য হালাল?)

আমি উত্তর দিলাম, যদি তারা তা হালাল পন্থায় অর্জন করে থাকে, তাহলে আপনার জন্য তা হারাম। আর যদি তারা হারাম পন্থায় অর্জন করে থাকে, তাহলে আপনার জন্য তো

এর আগেই হারাম।

(এ ধরণের নেতিবাচক উত্তর শুনে) তিনি আমাকে বের করে দেয়ার আদেশ দিলেন। আদেশ মতো আমাকে বের করে দেয়া হল।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/৫৫২

তিনি বলেন, আমি সেখান থেকে বের হচ্ছিলাম আর প্রতিটি কদমে কদমে মনে হচ্ছিল, এখনি বুঝি আমার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর যাহাবি রহ. বলেন,

قلت: قد كان عبد الله بن علي ملكا جبارا، سفاكا للدماء، صعب المراس، ومع هذا فالإمام الأزواعي يصدعه بمر الحق كما ترى؛ لا كخلق من علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف، ويقلبون لهم الباطل حقا قاتلهم الله أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق. اهـ

“আমি বলি, আব্দুল্লাহ ইবনু আলী ভয়ানক প্রকৃতির স্বেচ্ছাচারি

শাসক ছিল। ছিল রক্ত পিপাসু। উদ্যত প্রকৃতির। এরপরও ইমাম আওযায়ী রহ. তার মুখের উপর হকের তিক্ত বাণী উচ্চারণ করেছেন- যেমনটা তুমি দেখেছো। উলামায়ে সূ-দের মতো আচরণ তিনি করেননি; যারা শাসকরা যত জুলুম-অবিচার করে থাকে, সব কিছুকেই সাজিয়ে গুছিয়ে তাদের সামনে সদাচাররূপে দেখিয়ে থাকে। বাতিলকে হকরূপে পেশ করে, কিংবা হক বলার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও চুপ থাকে। আল্লাহ তাআলা এদের ধ্বংস করুন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৫৫২

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: দশ. ইমাম বুখারি রহ. (১৯৪-২৫৬ হি.)

দশ.

ইমাম বুখারি রহ. (১৯৪-২৫৬ হি.)

আমাদের সালাফদের মধ্যে যাদের মূল ব্যস্ততা ছিল ইলম, তারাও সর্বদা জিহাদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতেন, যেন

প্রয়োজন হলেই ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। এর দৃষ্টান্ত ইমাম বুখারি রহ.। যার সারা জীবন হাদিস সাধনায় নিমজ্জিত, তিনিও জিহাদের জন্য সদা প্রস্তুত। ইমাম বুখারি রহ. এর শাগরেদ আবু হাতিম আলওয়াররাক রহ. এর বরাতে খতীব বাগদাদি রহ. বর্ণনা করেন,

كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ أحيانا ... ورأيته استلقى على قفاه يوما ونحن بفربر في تصنيف التفسير، وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث، فقت له: يا أبا عبد الله سمعتك تقول يوما إني ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فأي علم في هذا الاستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة ذلك، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك. اهـ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، 2/332-333

“যখন আবু আব্দুল্লাহ (বুখারি রহ.) এর সাথে সফরে থাকতাম, তখন আমি আর তিনি একই ঘরে থাকতাম। তবে বেশি গরম পড়লে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম হত। ... একদিন দেখলাম, তিনি উপর দিকে মুখ করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। এ সময় আমরা ফিরাবরাতে ছিলাম। আমাদের মগ্নতা ছিল

কিতাবুত তাফসির রচনা। অত্যধিক পরিমাণে হাদিস তাখরিজ করার কারণে সেদিন তিনি ক্লান্ত ছিলেন। এভাবে শুয়ে থাকতে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আবু আব্দুল্লাহ! একদিন শুনেছিলাম আপনি বলেছিলেন, 'যে দিন থেকে আমার বুঝ হয়েছে, সেদিন থেকে কখনও না বুঝে ইলম ছাড়াই কোন কাজ করিনি'। আপনি যে এভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন, এটা আপনি কি বুঝে করছেন? তিনি উত্তর দেন, আজ আমরা অনেক ক্লান্ত। আর এ এলাকাটা হচ্ছে সীমান্ত এলাকা। ভয় হচ্ছে, কাফেরদের থেকে কোন অঘটন ঘটতে পারে। এজন্য একটু বিশ্রাম নিয়ে মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছি। যদি শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে প্রফুল্লতার সাথে লড়তে পারবো।"- তারিখে বাগদাদ ২/৩৩২-৩৩৩

শাগরেদের প্রশ্ন জেগেছিল, এভাবে শুয়ে থাকা কি কোন কাজের কাজ? বুঝা গেল, এভাবে শুয়ে থাকা ইমাম বুখারির অভ্যাস ছিল না। তবে আজ যেহেতু কাফেরদের থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, তাই শুয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছেন, যেন লড়াইয়ের সময় ক্লান্তি না আসে।

এ হলেন ইমাম বুখারি। রিবাতের ভূমিতে বসে তিনি বুখারি শরীফ লিখেছেন। প্রয়োজনের সময় জিহাদের সংকল্পও করেছেন। আর স্পষ্ট যে, পূর্ব থেকে যথার্থ ট্রেনিং না থাকলে প্রথম দিনই যুদ্ধ করা যায় না। তাই স্পষ্ট এটাই যে, তিনি আগে থেকেই জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। অশ্ব চালনা, তীরন্দাজি, বর্শা ও তলোয়ার চালনা: সব কিছুরই প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছেন, যেন প্রয়োজনের সময় ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। এবার আমাদের সমাজে যারা বুখারি শরিফ পড়িয়ে শাইখুল হাদিস হচ্ছেন, বুখারি শরীফের জিহাদের হাদিসগুলোকে যারা অপব্যাখ্যা করে উম্মাহকে জিহাদ-বিমুখ করছেন, কিংবা অন্তত গোপন করে কিতমানে ইলম করছেন, চিন্তা করুন! এজন্যই কি ইমাম বুখারি কিতাব লিখেছেন রিবাতের ময়দানে বসে?

এগার.

মুহাম্মাদ ইবনু সীরিন রহ. (১১০হি.)

৭২ হিজরির আলোচনায় আহনাফ ইবনু কায়স রহ. এর জীবনীতে ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

قال الحاكم: وهو الذي افتتح مروالروذ، وكان الحسن وابن سيرين في جيشه. اهـ البداية والنهاية ط. إحياء التراث 8\360

“হাকেম রহ. বলেন, তিনিই হলেন সেই বীর যিনি মারওয়াররুজ বিজয় করেছেন। হাসান (বসরী) রহ. এবং ইবনে সীরিন রহ. সে বাহিনিতে ছিলেন।”- আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮/৩৬০

***

বার.

ইবরাহীম নাখায়ী রহ. (৯৬ হি.)

ফিকহ ও হাদিসের সাথে সামান্য সম্পর্ক রাখেন এমন যে কেউ ইবরাহীম নাখায়ী রহ.কে চেনেন। ইমাম হরব আলকিরমানী রহ. (২৮০ হি.) আবু ইসহাক আলফাজারি রহ. এর সূত্রে আ'মাশ রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

كان عبد الرحمن بن يزيد، وأبو حذيفة، وإبراهيم النخعي، وعمار بن عمير يغزون في أمرة الحجاج، قلت: أين كانوا يغزون؟ قال: خراسان، والديلم، وغير ذلك. فقال رجل من القوم: أكانوا يكرهون على ذلك؟ قال: لا، بل يخفون فيه ويعجبهم. اهـ
مسائل حرب الكرماني (280هـ): 3\1061

"আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াজিদ, আবু হুজায়ফা, ইবরাহীম নাখায়ী, আম্মার ইবনু উমায়র রাহিমাহুমুল্লাহ- এরা সকলেই হাজ্জাজের শাসনকালে জিহাদ করতেন। (আবু ইসহাক আলফাজারি রহ. বলেন) আমি (আ'মাশ রহ.কে) জিজ্ঞেস করলাম, তারা কোথায় জিহাদ করতেন? তিনি উত্তর দেন, 'খোরাসান ও দাইলামসহ বিভিন্ন এলাকায়'। উপস্থিত এক লোক জিজ্ঞেস করল, তাদেরকে কি জিহাদে যেতে বাধ্য করা হতো? তিনি উত্তর দেন, না! তারা স্বতস্ফূর্তভাবেই করতেন এবং এটি তাদের পছন্দের বিষয় ছিল।"- মাসায়িলু হরব আলকিরমানী ৩/১০৬১

হাজ্জাজ অত্যন্ত ভয়ানক প্রকৃতির জালেম শাসক ছিল। সকলেই তাকে ঘৃণা করত। এতদসত্ত্বেও আইম্মায়ে দ্বীন তাকে আমীর মেনে তার নেতৃত্বে জিহাদ করতেন। হাজ্জাজ অনেককে জোর করে জিহাদে পাঠাতো। কিন্তু ইবরাহীম নাখায়ী রহ. এর মতো ইমামগণ জিহাদের আকর্ষণে স্বেচ্ছায়ই জিহাদ করতেন। জোর করতে হতো না। বুঝা গেল, জিহাদের আমীর ফাসেক হলেও অসুবিধা নেই। আজ যারা মুজাহিদদের সামান্য ভুল-ত্রুটি দেখলেই সমালোচনার ঝড় তুলেন, তাদের এ বিষয়টা খেয়াল রাখা উচিৎ।

***

তের.

ইমাম নাসায়ী রহ. (৩০৩ হি.)

সিহাহ সিত্তার অন্যতম কিতাব নাসায়ী শরীফের সংকলক। হাদিসের জগতে নাসায়ী শরীফ এবং ইমাম নাসায়ী রহ. এর মান সম্পর্কে সকলে অবগত। ইবনুল ইমাদ আলহাম্বলী রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,

قال ابن المظفّر الحافظ: سمعتهم بمصر يصفون اجتهاد النّسائي في العبادة بالليل والنهار، وأنه خرج إلى الغزو مع أمير مصر، فوصف من شهامته وإقامته السّنن في فداء المسلمين، واحترازه عن مجالس الأمير. اهـ شذرات الذهب 4\15-16

"হাফেয ইবনুল মুজাফফার রহ. বলেন, মিশরে উলামা-সাধারণ থেকে শুনলাম, তারা ইমাম নাসায়ীর গুণ-গান গাইছেন যে, তিনি রাত-দিনে অত্যধিক পরিমাণে ইবাদতে মশগুল থাকেন। এও শুনলাম যে, তিনি মিশরের আমীরের সাথে জিহাদে গিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেন, নাসায়ী রহ. জিহাদের ময়দানে নিজের বাহাদুরির প্রমাণ দিয়েছেন। মুসলিম বন্দীদের মুক্তির শরয়ী সুন্নত কায়েম করেছেন। সব কিছু সত্ত্বেও সতর্কতার সাথে আমীরের দরবার থেকে দূরে দূরে থেকেছেন।"- শাযারাতুয যাহাব ৪/১৫-১৬

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৪. আবু ইসহাক আলফাযারি রহ. (১৮৬হি.)

চৌদ্দ.

আবু ইসহাক আলফাযারি রহ. (১৮৬হি.)

তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এর সমসাময়িক এবং তার সমমানের ইমাম। উভয়ই জগদ্বিখ্যাত ইমাম ও মুজাহিদ। কোন কোন সময় উভয়ে একই ভূমিতে রিবাতে মিলিত হতেন। তখনকার সময় মাসসিসাহ ছিল ভীতি সংকুল রিবাতের ভূমি। এখানে প্রায়ই রোমানদের সাথে যুদ্ধ বাঁধত। ইমাম ফাযারি রহ. এ ভূমিকেই নিজের রিবাতের স্থল হিসেবে গ্রহণ করেন। এখানেই আবাসস্থল গড়েন করেন। শেষে এখানেই ইন্তেকাল করেন।

যাহাবি রহ. তার আলোচনা এভাবে শুরু করেছেন,

أبو إسحاق الفزاري: الإمام، الكبير، الحافظ، المجاهد. اهـ

“বড় ইমাম, হাফেয ও মুজাহিদ আবু ইসহাক ফাযারি রহ.।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৪৭২

১৮৫ হিজরির আলোচনায় ইবনুল ইমাদ হাম্বলী রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,

فيها، وقيل: في التي تليها، توفي الإمام الغازي القدوة أبو إسحاق الفزاريّ إبراهيم بن محمّد بن الحارث الكوفيّ نزيل ثغر المصّيصة. اهـ

“এ বছর কিংবা মতান্তরে পরের বছর অনুসৃত ইমাম ও গাজি আবু ইসহাক ফাযারি রহ. ইন্তেকাল করেন, যিনি (নিজ ভূমি কূফা ছেড়ে) সীমান্তভূমি মাসসিসাকে আবাসস্থলরূপে গ্রহণ করেছিলেন।”- শাযারাতুয যাহাব ২/৩৮৩

আরো বলেন,

كان إماما، قانتا، مجاهدا، مرابطا، آمرا بالمعروف، إذا رأى بالثغر مبتدعا أخرجه. اهـ

“তিনি একাধারে ছিলেন একজন ইমাম। আল্লাহর অনুগত বান্দা। মুজাহিদ। মুরাবিত। সৎ কাজের আদেশদাতা। সীমান্তে কোন বিদআতিকে দেখলে বের করে দিতেন।”- শাযারাতুয যাহাব ২/৩৮৩

যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন,

وقال أحمد العجلي: كان ثقة، صاحب سنة، صالحا، هو الذي أدب أهل الثغر، وعلمهم السنة، وكان يأمر وينهى، وإذا دخل الثغر رجل مبتدع، أخرجه، وكان كثير الحديث، وكان له فقه. اهـ

“আহমাদ আলইজলি রহ. বলেন, ফাযারি রহ. ছিলেন নির্ভরযোগ্য ইমাম। সুন্নাহর অনুসারি নেককার ব্যক্তি। তিনিই সীমান্তবাসীদের শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। সুন্নাহ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সৎ কাজে আদেশ করতেন এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতেন। সীমান্তে কোন বিদআতি প্রবেশ করলে বের করে দিতেন। তিনি হাদিসের প্রভূত জ্ঞান রাখতেন। ফিকহেও দক্ষতা ছিল।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৪৭৩

ফুজাইল ইবনু ইয়াজ রহ. অনেক সময় শুধু ফাযারি রহ.কে দেখার জন্য মাসসিসায় যেতে পাগলপারা হয়ে উঠতেন।

ফাযারি রহ. মুজাহিদ ও মুরাবিতদের প্রয়োজনে জিহাদের উপর একটি বিখ্যাত কিতাবও লিখেছেন। ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন,

لم يصنف أحد في السير مثل كتاب أبي إسحاق. اهـ

“জিহাদের উপর আবু ইসহাক রহ. এর কিতাবের মতো কিতাব আর কেউ লিখতে পারেনি।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৭/৪৭৩

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৫-১৬: আলী ইবনু খাশরাম+শাকিক ইবনু সালামা

পনের.

আলী ইবনু খাশরাম রহ. (২৫৭ হি.)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাদিসের ইমাম। ইমাম মুসলিম, নাসায়ী ও তিরমিযি নিজ সনদে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রসিদ্ধ যাহেদ বিশরে হাফির ভাগ্নে।

সহীহ বুখারির রাবি ফিরাবরি রহ. (৩২০ হি.) এর আলোচনায় যাহাবি রহ. বলেন,

المحدث، الثقة، العالم، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري، راوي (الجامع الصحيح) عن أبي عبد الله البخاري، سمعه منه بفربر مرتين. وسمع أيضا من علي بن خشرم لما قدم فربر مرابطا. اهـ

“আবু আব্দুল্লাহ আলফিরাবরি। ইমাম বুখারি থেকে জামে সহীহ (বুখারি) এর বর্ণনাকারী। ইমাম বুখারি থেকে তিনি ফিরাবরায় সহীহ বুখারি দুইবার শুনেছেন। এছাড়া আলী ইবনু খাশরাম থেকেও হাদিস শুনেছেন, যখন আলী ইবনু খাশরাম রিবাতের উদ্দেশ্যে ফিরাবরায় এসেছিলেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা

১১/৩৫১

বুঝা গেল, আলী ইবনু খাশরাম রহ. ফিরাবরায় রিবাতে গিয়েছেন।

***

ষোল.

শাকিক ইবনু সালামা আবু ওয়ায়িল আলকূফি (৮২ হি.)

মুখাদরাম তাবিয়ি। জাহিলি যামানা পেয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের যামানা পেয়েছেন, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার সুযোগ হয়নি। সিহাহ সিত্তার সকলেই তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আসিম ইবনু বাহদালা রহ. বলেন,

كان لأبي وائل -رحمه الله- خص من قصب، يكون فيه هو وفرسه، فإذا غزا نقضه، وتصدق به، فإذا رجع أنشأ بناءه. اهـ

“আবু ওয়ায়িল রহ. এর একটি বাঁশের কুড়েঘর ছিল, যেখানে তিনি তার ঘোড়া নিয়ে থাকতেন। যখন জিহাদে যেতেন, কুড়েঘরটি ভেঙ্গে সাদাকা করে দিতেন। জিহাদ থেকে যখন ফিরে আসতেন, নতুন করে বানিয়ে নিতেন।”– সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৫/৯০

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ১৭. আবু ইসহাক আসসাবিয়ি রহ. (১২৭ হি.)

সতের.

আবু ইসহাক আসসাবিয়ি রহ. (১২৭ হি.)

হাফিজুল হাদিস। কূফার অধিবাসী। বিশিষ্ট তাবিয়ি। সর্বজন স্বীকৃত হাদিসের ইমাম। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের ২/৩ বছর বাকি থাকতে তার জন্ম। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন। বলা হয়, আটত্রিশ জন সাহাবিসহ চারশত শায়খের কাছে তিনি হাদিস পড়েছেন। ইবনু সিরিন, শুবা, যুহরি, কাতাদা, সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ তার শাগরেদ।

সিহাহ সিত্তার সকলে তার হাদিস বর্ণনা করেছেন।

যাহাবি রহ. বলেন,

غزا الروم في دولة معاوية. اهـ

“মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/১২২

সাবিয়ি রহ. নিজেই বলেন,

غزوت في زمن زياد -يعني: ابن أبيه- ست غزوات، أو سبع غزوات. اهـ

“যিয়াদ রহ. গভর্নর থাকাকালে আমি ছয়/সাতটি জিহাদে শরীক হয়েছি।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/১২৩

উল্লেখ্য, যিয়াদ রহ. মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহুর পক্ষ থেকে কূফার গভর্নর ছিলেন।

আটার.

আমর ইবনু মারযুক্ক আলবাসরী রহ. (২২৪হি.)

ইমাম আবু দাউদ রহ. এর বিশিষ্ট উস্তাদ। শু'বা, হাম্মাদ ইবনু যায়দ, হাম্মাদ ইবনু সালামা প্রমুখ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশিষ্ট মুজাহিদ ছিলেন।

আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. বলেন,

كان عمرو صاحب غزو وخير. اهـ

"আমর রহ. মুজাহিদ ও নেককার ব্যক্তি ছিলেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৮/৪৫৭

মুসলিম ইবনু ইব্রাহিম রহ. বলেন,

كان عمرو رجلا غزاء يغزو في البحر. اهـ

“আমর (ইবনু মারযুক্ব) রহ. মুজাহিদ ছিলেন। সমূদ্রপথে জিহাদ করতেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৮/৪৫৬

উল্লেখ্য, সমূদ্রপথে জিহাদের সওয়াব স্থল জিহাদের চেয়ে বেশি। কারণ, সমূদ্র-জিহাদ অধিকতর ভীতিসংকুল। হাদিসে এসেছে,

المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين- سنن ابي داود، رقم: 2493؛ ط. دار الرسالة العالمية، ت: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، قال الأرنؤوط: أسناده حسن. اهـ

“সমূদ্রপথে যার মাথা ঘুরে বমি এসে যায় সে এক শহীদের সওয়াব পাবে। আর যে ডুবে মারা যাবে সে দুই শহীদের সওয়াব পাবে।”- সুনানে আবু দাউদ ২৪৯৩

উনিশ.

হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ (১৩২ হি.)

তিনি ইয়ামানের রাজধানী সানআর অধিবাসী। সহিফায়ে হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহের জন্য প্রসিদ্ধ, যাতে একশো চল্লিশটির মতো হাদিস আছে, যেগুলো তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছেন। মুসলিম শরীফে হাম্মাম সূত্রে এ সহিফার হাদিস বর্ণিত আছে। যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন,

قال أحمد بن حنبل: كان يغزو. اهـ

“ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. বলেন, হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ রহ. জিহাদ করতেন।”- **সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৫৮**

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২০. আবু বকর আলমারওয়াযি রহ. (২৭৫ হি.)

বিশ.

আবু বকর আলমারওয়াযি রহ. (২৭৫ হি.)

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. এর সবচেয়ে যোগ্য ও প্রিয় শাগরেদ। আহমাদ রহ. তাকে সবার উপর প্রাধান্য দিতেন। মৃত্যুর পর তিনিই আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. এর চক্ষু বন্ধ করেছেন এবং তিনিই গোসল দিয়েছেন। আহমাদ রহ. থেকে তিনি অসংখ্য মাসআলা বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর উপর হাম্বলী মাযহাবের একটা বড় অংশের ভিত্তি।

মারওয়াযি রহ. এর যোগ্য শাগরেদ আবু বকর খাল্লাল (৩১১ হি.), যিনি আহমাদ রহ. থেকে বর্ণিত বিক্ষিপ্ত মাসআলাসমূহ একত্রিত করে সর্বপ্রথম হাম্বলী মাযহাবকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

খাল্লাল রহ. (৩১১ হি.) বলেন,

خرج أبو بكر إلى الغزو فشيعوه إلى سامراء، فجعل يردهم فلا يرجعون. قال: فحزروا فإذا هم بسامراء، سوى من رجع، نحو خمسين ألفا. اهـ

“একবার আবু বকর (মারওয়াযি) রহ. জিহাদে রওয়ানা হলেন। তাকে বিদায় জানাতে বাগদাদ থেকে সামেরা পর্যন্ত অগণিত লোকের ভিড় হল। তিনি ফিরে যেতে বললেও লোকজন ফিরে আসছিল না। সামেরায় গিয়ে আন্দাজ করা হল, এখনো যারা যারা রয়ে গেছে, তাদের সংখ্যাও পঞ্চাশ হাজারের মতো।”– সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১০/৩১৫

***

আল্লাহু আকবার জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২১. বাকি ইবনু মাখলাদ (২৭৬হি.)

একুশ.

বাকি ইবনু মাখলাদ (২৭৬হি.)

শাইখুল ইসলাম। হাফিজুল হাদিস। আবু আব্দুর রহমান বাকি ইবনু মাখলাদ আলআন্দালুসি আলকুরতুবি। তিনি আমাদের হারানো গৌরব স্পেনের ইমাম।

দুইশো হিজরির দিকে জন্ম। প্রথমে আন্দালুসে ইলম অর্জন শুরু করেন। তারপর জন্য বাহিরে পাড়ি জমান। হারামাইন শরিফাইন, ইরাক, শাম ও মিশরসহ দূর-দূরান্ত সফর করেন। অসংখ্য মুহাদ্দিস থেকে হাদিস সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. এর কাছেও এসেছিলেন। তবে রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে আহমাদ রহ. ততদিনে হাদিস বর্ণনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই আহমাদ রহ. এর কাছ থেকে তিনি হাদিস সংগ্রহ করতে পারেননি। তবে অনেক মাসায়েল ও ফাওয়ায়েদ অর্জন করেন।

আন্দালুসে তিনিই সর্বপ্রথম মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা নিয়ে যান। এছাড়াও আরো বেশ কিছু মূল্যবান ইলমী গ্রন্থ তিনি আন্দালুসে নিয়ে যান। তার মাধ্যমে আন্দালুসে হাদিসের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়।

যাহাবি রহ. (৭৪৮হি.) বলেন,

وعني بهذا الشأن عناية لا مزيد عليها، وأدخل جزيرة الأندلس علما جما، وبه وبمحمد بن وضاح صارت تلك الناحية دار حديث. اهـ

“হাদিস অধ্যয়নে তিনি এমনই মনোনিবেশ করেন যে, এর চেয়ে বেশি আর সম্ভব নয়। আন্দালুস দ্বীপে তিনি প্রভূত ইলমের সমাগম ঘটান। তার এবং মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াদদাহ এর মাধ্যমেই মূলত উক্ত অঞ্চল হাদিসের ভূমিতে পরিণত হয়।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১০/৩৭৮

তিনি আফ্রিকায় মালিকি মাযহাবের ইমাম সুহনূন রহ. এর কাছে ফিকহ শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। হাদিস ও ফিকহে ইজতিহাদের দরজায় উন্নীত হন। তাই নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের পাবন্দী করতেন না। সরাসরি কুরআন সুন্নাহ থেকে ফতোয়া দিতেন।

যাহাবি রহ. বলেন,

وكان إماما مجتهدا صالحا، ربانيا صادقا مخلصا، رأسا في العلم والعمل، عديم المثل، منقطع القرين، يفتي بالأثر، ولا يقلد أحدا. اهـ

“তিনি একজন নেকার মুজতাহিদ ইমাম ছিলেন। সাদিক ও মুখলিস আলেমে রব্বানী ছিলেন। ইলম ও আমল উভয়

ময়দানের শাহসওয়ার ছিলেন। এমন অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার কোন দৃষ্টান্ত মেলা ভার। হাদিস অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। কারো তাকলিদ করতেন না।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১০/৩৭৯

তিনি যখন কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী ফতোয়া দিতে শুরু করেন, তখন আন্দালুসের প্রচলিত আলেমরা তার বিরোধীতায় উঠে-পড়ে লাগে। তাকে বিদআতি এমনকি যিন্দিক আখ্যা দেয়। সুলতানের কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করে। প্রচলিত আলেমদের একমাত্র সম্বল ছিল মালিকি মাযহাব আর ফিকহের কিছু কিতাবাদি। কুরআন-হাদিসের সাথে তাদের তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি যখন কুরআন হাদিস মতে ফতোয়া দিতে শুরু করেন, সেগুলো অনেক সময় তাদের মাযহাব এবং প্রচলিত মাসআলার বিরুদ্ধে চলে যেতো। ফলে তারা তাকে গোমরাহ ও বিদআতি মনে করতে থাকে। আন্দালুসের তখনকার সুলতান ছিলেন উমাইয়া শাসক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান। তিনি নিজে বিদ্যান ব্যক্তি ছিলেন। ইলমের প্রতি তার মোহব্বাতও ছিল

যথেষ্ট। তিনি যাছাই করে দেখলেন যে, প্রচলিত আলেমদের দাবি সত্য নয়। তিনি তাদের দাবি প্রত্যাখান করে দেন এবং বাকি রহ.কে হাদিস ও ইলমের প্রচার প্রসারে উৎসাহ দেন। এভাবে আস্তে আস্তে আন্দালুস ভূমিতে হাদিসের বিস্তার হতে থাকে। **(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৮০-৩৮১)**

♣ গ্রন্থাদি

তার বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে। তবে দু'টি গ্রন্থ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। একটি তাফসিরে কুরআন, আরেকটি হাদিস গ্রন্থ।

ইবনু হাযম রহ. (৪৫৬হি.) তাফসির গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন,

أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل (تفسير) بقي، لا (تفسير) محمد بن جرير، ولا غيره . اهـ

"একথা অকাট্য সত্য যে, বাকি রহ. এর তাফসিরের সমকক্ষ তাফসির ইসলামে দ্বিতীয়টি লিখা হয়নি। তাফসিরে ইবনে জারিরও না, অন্য কোন তাফসিরও না।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৭৯

তাফসিরে ইবনে জারির ত্ববারি সম্পর্কে আশাকরি আমরা সকলে কমবেশ জানি। এটি একটি নজীরবিহীন তাফসির। ইবনে হাযম রহ. এর মতে বাকি ইবনু মাখলাদের তাফসিরের মান এরও উর্ধ্বে।

হাদিস গ্রন্থটি মুসনাদে বাকি ইবনু মাখলাদ নামে পরিচিত। এটি মুসনাদে আহমাদ ইবনু হাম্বলের সমমানের মানের কিতাব। অবশ্য মুসনাদে আহমাদের চেয়ে অতিরিক্ত একটি ফায়েদা এ কিতাবে আছে। তা হলো, তিনি শুধু হাদিস বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রত্যেক সাহাবির হাদিস ফিকহের অধ্যায় অনুপাতে বিন্যস্ত করেছেন।

ইবনে হাযম রহ. বলেন,

(مسند) بقي روى فيه عن ألف وثلاث مائة صاحب ونيف، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله. اهـ

“মুসনাদে বাকিতে তেরোশোরও বেশি সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেক সাহাবির হাদিস ফিকহের আবওয়াব অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। এজন্য গ্রন্থটি একই

সাথে মুসনাদ ও মুসান্নাফ। তার আগে এই মর্যাদা আর কারো অর্জন হয়েছে বলে আমার জানা নেই।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১০/৩৮১

♣ কারামত

তিনি মুসতাজাবুদ দাওয়াহ ছিলেন। ইবনে কাসির রহ. (৭৭৪হি.) তার একটি কারামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وكان مع ذلك رجلا صلاحا عابدا زاهدا مجاب الدعوة، جاءته امرأة فقالت: إن ابني قد أسرته الإفرنج، وإني لا أنام الليل من شوقي إليه، ولي دويرة أريد أن أبيعها لأستفكه، فإن رأيت أن تشير على أحد يأخذها لاسعى في فكاكه بثمنها، فليس يقر لي ليل ولا نهار، ولا أجد نوما ولا صبرا ولا قرارا ولا راحة.

فقال: نعم انصرفي حتى أنظر في ذلك إن شاء الله. وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو الله عز وجل لولدها بالخلاص من أيدي الفرنج، فذهبت المرأة فما كان إلا قليلا حتى جاءت الشيخ وابنها معها فقالت: اسمع خبره يرحمك الله. فقال: كيف كان أمرك؟ فقال: إني كنت فيمن يخدم الملك ونحن في القيود، فبينما أنا ذات يوم أمشي إذ سقط القيد من رجلي، فأقبل علي الموكل بي فشتمني وقال: لم أزلت القيد من رجليك؟ فقلت: لا والله ما شعرت به ولكنه سقط ولم أشعر به، فجاؤوا بالحداد فأعادوه

وأجادوه وشدوا مسماره وأيدوه، ثم قمت فسقط أيضا فأعادوه وأكدوه فسقط أيضا، فسألوا رهبانهم عن سبب ذلك، فقالوا: له والدة؟ فقلت: نعم، فقالوا: إنها قد دعت لك وقد استجيب دعاؤها، أطلقوه. فأطلقوني وخفروني حتى وصلت إلى بلاد الإسلام.
فسأله بقي بن مخلد عن الساعة التي سقط فيها القيد من رجليه، فإذا هي الساعة التي دعا فيها الله له ففرج عنه. اهـ

"(প্রভূত ইলমের অধিকারী হওয়ার) পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন নেককার, আবেদ, যাহেদ ও মুসতাজাবুদ দাওয়াহ ব্যক্তি। কুশায়রি রহ. (তার একটি কারামত) উল্লেখ করেছেন যে, একবার এক মহিলা এসে তার কাছে আরজ করল, আমার ছেলেকে ফরাসীরা বন্দী করে নিয়ে গেছে। ছেলে হারানোর ব্যথায় আমি রাত্রে ঘুমাতে পারছি না। আমার ছোট্ট একটি কুটির আছে। ছেলেকে ছাড়ানোর জন্য আমি এটি বিক্রি করতে চাচ্ছি। আপনি যদি কাউকে এটি ক্রয় করার পরামর্শ দিতেন, যাতে আমি এর মূল্য নিয়ে ছেলেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে পারি- তাহলে অনেক ভাল হত। দিন-রাত কখনোও আমি প্রশান্তি পাচ্ছি না। আমার ঘুম আসে না। আমি সবর করতে পারছি না। আমি স্থির হতে পারছি না। আমার কোন শান্তি নেই।

তিনি উত্তর দিলেন, ঠিক আছে। তুমি যাও। ইনশাআল্লাহ আমি কিছু করতে পারি কি'না দেখি। এরপর শায়খ মাথা নিচু করলেন। ঠোঁট নাড়িয়ে আল্লাহর কাছে ছেলেকে ফরাসীদের হাত থেকে মুক্ত করে দেয়ার দোয়া করতে লাগলেন। মহিলা চলে গেল।

অল্প (ক'দিন) পরেই মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে শায়খের কাছে হাজির হল। এসে আরজ করল, আল্লাহ তাআলা আপনার উপর রহম করুন! এর কাহিনিটা একটু শুনুন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি কাহিনি ঘটলো তোমার?

ছেলে উত্তর দিল, আমি ঐসব বন্দীদের মধ্যে ছিলাম যারা বাদশার খেদমত করতো। আমাদের শিকল পরিয়ে রাখা হত। একদিন (কাজের সময়) আমি হাঁটছিলাম। হঠাৎ পা থেকে আমার শিকল খুলে পড়ে গেল। আমার পেছনে নিযুক্ত সৈন্যটি আমাকে গালি দিয়ে বললো, অ্যাই! শিকল খুলেছিস কেন? আমি উত্তর দিলাম, 'না! আল্লাহর কসম! আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। শিকল এমনি এমনি খোলে গেলে। আমি

কিছুই বুঝতে পারিনি’। তারা শিকলওয়ালাকে ডেকে এনে পুনর্বার শিকল পরালো। ভাল করে লাগাল। পিনগুলো শক্ত করে লাগাল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। পরক্ষণে আবার খুলে গেল। তারা আবার লাগাল। আবার খুলে গেল। অবস্থা দেখে তারা তাদের আলেমদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করল। আলেমরা জানতে চাইল, এর কি মা আছে? আমি বললাম, ‘হ্যাঁ! আমার মা আছে’। তারা বলল, তোর মা তোর জন্য দোয়া করেছে এবং দোয়া কবুল হয়েছে। তোমরা একে ছেড়ে দাও। তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। পথ খরচও দিয়ে দেয়। এভাবে আমি মুসলিম ভূমিতে পৌঁছে যাই।

বাকি রহ. জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন্ সময়টাতে তার বেড়ি খুলে পড়েছিল? মিলিয়ে দেখা হল, ঠিক ঐ সময়ে, যখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। তার দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাকে মুক্ত করে দেন।”- আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১১/৬৬

♣ দু’টি মুনকার বর্ণনা

অনেকে বাকি রহ. এর ব্যাপারে বলে থাকেন যে, তিনি

ভিক্ষুকের বেশে আহমাদ রহ. এর কাছ থেকে হাদিস শিখেছেন। যাহাবি রহ. এ বর্ণনাকে মুনকার তথা ভিত্তিহীন বলেছেন।

তেমনিভাবে বলা হয়ে থাকে যে, খিযির আলাইহিস সালামের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে। এ বর্ণনাকে তিনি আগেরটার চেয়েও বেশি মুনকার বলেছেন। অতএব, বর্ণনা দু'টি ভিত্তিহীন।

♣ জিহাদে বাকি ইবনু মাখলাদ রহ.

যাহাবি রহ. বলেন,

ومن مناقبه أنه كان من كبار المجاهدين في سبيل الله، يقال: شهد سبعين غزوة. اهـ

"তার একটি বিশেষ মর্যাদা এই যে, তিনি আল্লাহর রাস্তার একজন বড় মাপের মুজাহিদ ছিলেন। সত্তরেরও বেশি জিহাদে তিনি শরীক হয়েছেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৮৪

আরো বর্ণনা করেন,

كان بقي يختم القرآن كل ليلة، في ثلاث عشرة ركعة، وكان
وكان كثير الجهاد، .يصلي بالنهار مائة ركعة، ويصوم الدهر
فاضلا، يذكر عنه أنه رابط اثنتين وسبعين غزوة. اهـ

"বাকি রহ. প্রতি রাত্রে তেরো রাকাআতে কুরআনে কারীম এক খতম করতেন। দিনে একশো রাকাআত নফল পড়তেন। আজীবন রোযা রাখতেন। অনেক বেশি জিহাদ করতেন। মর্যাদাশীল ব্যক্তি ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি বাহাত্তরটি জিহাদে রিবাতের দায়িত্ব পালন করেছেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৩৮২

আজ যারা আমরা ইলম নিয়ে এতোই ব্যস্ত যে, সারা দিনে দু'চার রাকাআত নফলেরও সুযোগ মিলে না; সারা মাসেও এক খতম কুরআনের সৌভাগ্যও হয় না; আর জিহাদের কথা তো বলাই বাহুল্য: তাদের উচিৎ আমাদের পূর্বসূরি ইমামদের জীবনীর দিকে একটু নজর দেয়া। কিভাবে তাদের জীবনে ইলম, ইবাদত, যুহদ ও জিহাদ সবকিছুর সমাহার ঘটেছিল?

একটু ফিকির করা উচিৎ। হে আল্লাহ! পূর্বসূরিদের পথে চলার তাওফিক আমাদের দাও।

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২২. মানসূর ইবনুল মু’তামির রহ. (১৩৩ হি.)

বাইশ.

মানসূর ইবনুল মু’তামির রহ. (১৩৩ হি.)

হাফিজুল হাদিস। কূফার অধিবাসী। হাদিসের সর্বজনস্বীকৃত ইমাম। ইব্রাহিম নাখায়ী, শা’বি, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনু জুবাইরসহ অসংখ্য হাদিসের ইমামের কাছে হাদিস পড়েছেন। আইয়্যুব আসসাখতিয়ানি, আ’মাশ, সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা, মা’মার ইবনু রাশিদ, ইব্রাহিম ইবনু আদহাম, ফুজাইল ইবনু ইয়াজ প্রমুখ স্বনামধন্য মুহাদ্দিস তার কাছে হাদিস পড়েছেন।

আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি রহ. বলেন,

لم يكن بالكوفة أحد أحفظ من منصور. اهـ

“কূফায় মানসূর রহ. এর চেয়ে বড় কোন হাদিসের হাফেয ছিল না।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৬/১২৯

তার মৃত্যুর পর তার এক প্রতিবেশি মহিলার ছেলে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, আম্মু! মানসূর সাহেবের বাড়ির ছাদে যে কাঠের খণ্ডটা দেখতাম সেটা তো দেখছি না? মা উত্তর দেন, আসলে এটা কাঠ ছিল না। মানসূর সাহেব নিজেই ছিলেন। তিনি মারা গেছেন। আল্লাহ তার উপর রহম করুন।

অর্থাৎ তিনি এমনই একনিষ্ট চিত্তে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যে, বাহির থেকে দেখলে কোন পিলার দাড়িয়ে আছে মনে হতো।

চল্লিশ বছর যাবত তিনি দিনে রোজা রেখেছেন, রাত্রে ইবাদত করেছেন। এত বেশি কাঁদতেন যে, কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল।

উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যায়দ বিন আলী রহ. যখন বিদ্রোহ করেন, তখন তিনিও বিদ্রোহে শরীক ছিলেন। **১২১ হিজরির আলোচনায় ইবনুল ইমাদ রহ. (১০৮৯ হি.) বলেন,**

وفيها قتل الإمام الشهيد زيد بن عليّ بن الحسين، رضي الله عنهم، بالكوفة، وكان قد بايعه خلق كثير، وحارب متولي العراق يومئذ لهشام بن عبد الملك، يوسف بن عمر الثقفي ... وكان ممن بايعه منصور بن المعتمر، ومحمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، وهلال بن خبّاب بن الأرتّ، قاضي المدائن، وابن شبرمة، ومسعر بن كدام، وغيرهم، وأرسل إليه أبو حنيفة بثلاثين ألف درهم، وحثّ النّاس على نصره، وكان مريضا. اهـ

"এ বৎসরে শহীদ ইমাম যায়দ বিন আলী বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুম *কূফায় শহীদ হন। অসংখ্য লোক তার হাতে বাইয়াত দিয়েছিল। তিনি তখনকার খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ইরাকের গভর্নর ইউসুফ বিন উমার আসসাকাফির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ...

তার হাতে যারা বাইয়াত দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন: মানসূর ইবনুল মু'তামির, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলা, মাদায়িনের কাযি হিলাল ইবনু খাব্বাব ইবনুল আরাত্ত, ইবনু শুবরুমা, মিসআর বিন কিদাম এবং আরো অনেকে। আবু হানিফা রহ. তার কাছে ত্রিশ হাজার দিরহাম (আর্থিক সাহায্য) পাঠান এবং তাকে নুসরত করার জন্য লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করেন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন (তাই যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি)।"- শাযারাতুয যাহাব ২/২৩০

এছাড়া তিনি রিবাত তথা সীমান্ত প্রহরার দায়িত্বও পালন করতেন। যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন,

قال سفيان بن عيينة: كان منصور في الديوان فكان إذا دارت نوبته لبس ثيابه وذهب فحرس يعني في الرباط. اهـ

"সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রহ. বলেন, রিবাত তথা সীমান্ত প্রহরায় মানসূর রহ.ও লিস্টিভুক্ত ছিলেন। তার পালা যখন আসতো, কাপড় পরিধান করে পাহাড়া দিতে চলে যেতেন।"- সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/১৩২

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২৩. ইবনু কুদামা আলমাকদিসি রহ. (৬২০ হি.)

তেইশ.

ইবনু কুদামা আলমাকদিসি রহ. (৬২০ হি.)

শাইখুল ইসলাম মুওয়াফফাক উদ্দীন ইবনু কুদামা। **‘মুগনি’** প্রণেতা হিসেবে সকলের কাছে প্রসিদ্ধ। ইসলামের ইতিহাসে মুগনির মতো কিতাব নেই বললেই চলে।

আমরা ইবনু কুদামা রহ. এর শুধু ইলমী যিন্দেগিটাই জানি। কিন্তু তিনিও একজন মুজাহিদ ছিলেন তা আমাদের কল্পনায় আসে না। হাফেয জিয়া উদ্দীন মাকদিসি রহ. বলেন,

سمعت البهاء يصفه بالشجاعة، وقال: كان يتقدم إلى العدو وجرح في كفه، وكان يرامي العدو. اهـ

“শায়খ বাহা ইবনু কুদামার পরিচয়ে বলেছেন যে, তিনি একজন বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আরো বলেছেন, ইবনু

কুদামা শত্রুর দিকে এগিয়ে যেতেন। একবার হাতে আঘাতও পেয়েছেন। তিনি শত্রুর সাথে তীরন্দাজিও করতেন।”- সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১৬/১৫২

বুঝা গেল,

- তিনি বীর ছিলেন।

- জিহাদ করতেন।

- ময়দানে সম্মুখভাগে থাকতেন এবং শত্রুর দিকে এগিয়ে যেতেন।

- শত্রুর সাথে তীরন্দাজি করতেন।

- আঘাতও পেয়েছেন।

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২৪.শাইখুল ইসলাম আবু উমার ইবনু কুদামা আলমাকদিসি রহ. (৬০৭ হি.)

চব্বিশ.

শাইখুল ইসলাম আবু উমার ইবনু কুদামা আলমাকদিসি রহ. (৬০৭ হি.)

তিনি 'আলমুগনি' প্রণেতা মুওয়াফফাক উদ্দীন ইবনু কুদামা রহ. (৬২০ হি.) এর বড় ভাই। তারা মূলত নাবুলুসে ছিলেন। ফরাসিরা তা দখল করে নেয়ার পর হিজরত করে দিমাশকে চলে আসেন। বিশিষ্ট ক্বারী, মুহাদ্দিস ও ফকিহ ছিলেন। বিশিষ্ট নেককার ও ইবাদাতগুজার বুযুর্গ ছিলেন। মুগনি প্রণেতাকে মূলত তিনিই লালনপালন করেছেন। প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনাকরে অগ্রগণ্য ছিলেন। কোন অন্যায় দেখলেই প্রতিহত করতেন। যখনই কোন জিহাদি কাফেলা রওয়ানা হতো, বেরিয়ে পড়তেন। এমন খুব কমই হতো যে, কাফেলা জিহাদে রওয়ানা হয়েছে আর তিনি তাতে শরীক হননি।

যাহাবি রহ. বলেন,

كان يكثر الصيام، ولا يكاد يسمع بجنازة إلا شهدها، ولا مريض إلا عاده، ولا جهاد إلا خرج فيه. اهـ

“অত্যধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন। কোনো জানাযার কথা শুনলেই তাতে শরীক হতেন। কেউ অসুস্থ জানতে পারলেই দেখতে যেতেন। কোনো জিহাদি কাফেলা রওয়ানা হলেই তাতে বেরিয়ে পড়তেন।” -সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১৬/৫৯

মুগনি গ্রন্থকার বলেন,

كان قلما يتخلف عن غزاة. اهـ

“এমন খুব কমই হতো যে, কোনো জিহাদি কাফেলা বের হয়েছে আর তিনি তাতে শরীক হননি।” -সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ১৬/৫৯

***

জিহাদি কাফেলায় আইম্মায়ে দ্বীন: ২৫. উয়াইস আলকারানি

পঁচিশ

উয়াইস আলকারানি আলইয়ামানি

খায়রুত তাবিয়িন। সর্বজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ। একজন বুযুর্গ হিসেবে মোটামুটি সকলে তাকে চেনেন। জনসাধারণ বিকৃত

উচ্চারণে **‘ওয়াস করনি’** নামে চেনে। বিদআতি বক্তারা গজলও গেয়ে থাকে: **‘নবীর প্রেমে ওয়াস করনি দন্ত দেয় ফেলে ...।’** অবশ্য দন্ত ফেলে দেয়ার ঘটনা সহীহ নয়। দন্ত কারো বাপের সম্পত্তি নয়। আল্লাহর দেয়া নেয়ামত। নষ্ট করা হারাম।

হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم -صحيح مسلم، رقم: 6655؛ ط. دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت

“সর্বশ্রেষ্ঠ তাবিয়ি হলো উয়াইস নামে এক ব্যক্তি। তার মা আছে। তার শরীরে শ্বেত রোগ ছিল। তোমরা তার কাছে আবেদন করবে, সে যেন তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে।” –সহীহ মুসলিম ৬৬৫৫

অন্য হাদিসে এসেছে,

يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل-

صحيح مسلم، رقم: 6656؛ ط. دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة - بيروت

"ইসলামের সাহায্যার্থে ইয়ামানের যে মুজাহিদ বাহিনি তোমাদের কাছে আসবে, তাদের সাথে আসবে উয়াইস ইবনু আমের। সে (ইয়ামানের) 'মুরাদ' গোত্রের 'কার্ন' গোত্রের লোক। তার শ্বেত রোগ ছিল। (দোয়ার বরকতে) তা থেকে সে সুস্থতা লাভ করেছে। তবে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান বাকি রয়ে গেছে (যেন তা দেখে অতীত অসুস্থতার কথা মনে পড়ে এবং আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে পারে)। তার মা আছে। সে তার মায়ের সাথে সদাচারি ও হক আদায়কারী। যদি সে আল্লাহর কাছে কোনো বিষয়ে কসম করে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার কসম পূর্ণ করবেন। তোমরা যদি তাকে দিয়ে তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করাতে পার, তাহলে করিয়ে নিয়ো।" –সহীহ মুসলিম ৬৬৫৬

হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ অসংখ্য মানুষ তার থেকে

দোয়া নিয়েছেন।

হিন্দুস্তান দীর্ঘদিন শীয়াদের দ্বারা শাসিত হওয়ার কারণে এবং হিন্দুস্তানে সুফিবাদ প্রাধান্য বিস্তার করার কারণে আজ আমরা উয়াইস কারানিকে একজন বুযুর্গ হিসেবেই কেবল জানি। তিনিও যে একজন মুজাহিদ ছিলেন এবং জিহাদ করতে করতে যে তিনি শহীদ হয়েছেন এ কথাটি যেন ভাবতেও অবাক লাগে। কিন্তু বাস্তবতা এমনই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ তাবিয়ি বলে গেছেন, তিনি যদি জিহাদের মতো শ্রেষ্ঠ আমলটি না করেন তাহলে করবে কে? এ আমলটি তো তার জন্যই মানায়। আর যে হাদিসে তাকে শ্রেষ্ঠ তাবিয়ি বলা হয়েছে, সেখানে এ কথাটিও আছে যে, তিনি ইয়ামানের মুজাহিদ বাহিনির সাথে আগমন করবেন। আর বাস্তবতাও এমনই হয়েছে। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় ইয়ামানের মুজাহিদ বাহিনি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আগমন করলে তিনি খোঁজ নেন যে, তাদের মাঝে উয়াইস নামের

কেও আছে কি'না। খোঁজ নিয়ে দেখেন, তিনি তাদের মাঝে আছেন। এরপর তিনি তার কাছে মাগফিরাতের দোয়া চান। আরো অনেকে তার কাছ থেকে দোয়া নেন। পরে তিনি কূফায় চলে যান।

শাহাদাত

এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে।

এক বর্ণনা মতে,

إنه غزا أذربيجان، فمات. اهـ

"তিনি আজারবাইযানে জিহাদে যান এবং সেখানেই মারা যান।" –সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৫২২

অন্য বর্ণনা মতে,

ثم هام على وجهه، فلم يوقف له بعد ذلك على أثر دهرا، ثم عاد في أيام علي -رضي الله عنه، فاستشهد معه بصفين، فنظروا فإذا عليه نيف وأربعون جراحة. اهـ

“লোকজন তাকে চিনে ফেলার পর তিনি কোথায় জানি উধাও হয়ে যান। দীর্ঘদিন যাবৎ তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে আবার ফিরে আসেন। তার সাথে সিফফিনের যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হন। দেখা গেল, তার শরীরে চল্লিশটিরও বেশি জখম ছিল।” -সিয়ারু আ’লামিন নুবালা ৪/৫২৬

***

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ১

ইদানিং কাশ্মীর জিহাদ নিয়ে আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেবের বক্তব্য আশাকরি সকলেই শুনে থাকবেন। তার বক্তব্যের সারকথা:

[জিহাদ একটি মুনাজ্জাম ও শৃংখলাবদ্ধ কাজ। এলোপাথারি মারামারি করে মরে যাওয়াই জিহাদ নয়। আর শৃংখলাবদ্ধভাবে জিহাদ করতে হলে জিহাদের স্থান লাগবে,

নিয়মিত সেনাবাহিনি লাগবে, কুদরত তথা শত্রুর সাথে পেরে উঠার সামর্থ্য লাগবে। সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা এমন শৃংখলাবদ্ধ জিহাদ সম্ভব নয়, এর জন্য রাষ্ট্র লাগবে। রাষ্ট্রীয় ঘোষণার দ্বারা জিহাদ করতে হবে। জিহাদ করবে রাষ্ট্রের সেনাবাহিনি। সাধারণ মানুষ জিহাদে যাবে না। তবে যদি সেনাবাহিনি সাধারণ মানুষদের যেতে বলে তাহলে যাবে। কারণ, সেনাবাহিনি তখন তাদেরকে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেবে। অন্যথায় সাধারণ মানুষ যাওয়া আত্মহত্যার শামিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ছাড়া তাদের জন্য জিহাদে যাওয়া হারাম হবে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার জিহাদে যাওয়ার ডাক না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেশের মুসলমানদের জন্য কাশ্মীর বা এ জাতীয় কোন ভূখণ্ডে যাওয়া হারাম।]

উপরোক্ত কথাটি (যদিও তাতে বেশ কিছু ভুল আছে তথাপি) এক পর্যায়ে মেনে নেয়ার মতো। কারণ, জিহাদ আসলে একটা জামাতবদ্ধ কাজ। এর জন্য একটা উপযুক্ত ময়দান এবং সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা না থাকলে তেমন ফলপ্রসূ হয় না। এটা অস্বীকার করার মতো নয়। এ জন্যই মুজাহিদিনে

কেরাম যার তার কথায় কোন ভূমিতে রওয়ানা দিতে নিষেধ করেন। বরং মুজাহিদদের নিয়ম হল, প্রত্যেকে আপন ভূমিতে থেকে জিহাদ করবে। কখনও প্রয়োজন পড়লে বাহিরে যাবে। ঢালাওভাবে সকলে হিজরত করে অন্য ভূমিতে চলে যাওয়া আন্তর্জাতিক উমারাদের নিয়ম বহির্ভূত। যাহোক, কথাটা এক পর্যায়ে মেনে নেয়ার তবে। তবে তার পুরো বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, তার এ আশঙ্কা শুধু একটা আশঙ্কা নয়, বরং অনেকগুলো ভ্রান্ত আকিদার নাতিজা-ফলাফল। **যেমন, আমাদের দেশের মুসলমান যুবকদের জন্য কাশ্মিরে যাওয়া হারাম হওয়ার কারণ বলেছেন,**

- রাষ্ট্রপ্রধান তাদেরকে অনুমতি দেয়নি।

- কাশ্মীরে জিহাদের জন্য কোথাও থেকে কোনো ডাক আসেনি। এমনকি তিনি দাবি করেছেন যে, বর্তমান বিশ্বে কোথাও জিহাদের ডাক নেই।

- কাশ্মীরিরা জিহাদে দাঁড়ায়নি। আর যখন তারা না দাঁড়াবে তখন আমাদের উপর তাদের সাহায্য করার দায়িত্ব নেই। তারা যখন দাঁড়াবে এবং দাঁড়ানোর পর মোকাবেলা করতে

অক্ষম হয়ে যাবে, তখন অন্যরা যেতে পারবে, নতুবা হারাম হবে।

- কাশ্মীরিরা দাঁড়ালেও তারা না পারলে প্রথম ফরয হতো পাকিস্তানীদের উপর। আমরা যারা দূরে আছি, তাদের জন্য যাওয়া হারাম হবে। এটা আত্মহত্যার শামিল।

- কাশ্মীরে জিহাদ দাঁড়ালে, তারা না পারলে, এমনকি আশপাশের মুসলমানরাও না পারলে তখন আমরা যেতে পারবো। তবে আমাদের মধ্যে কেবল সে সকল লোকই যাবে যারা সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত। সাধারণ মানুষ কখনও জিহাদে যাবে না। অবশ্য তিনি সামনে গিয়ে এর বিপরীত কথা বলেছেন যে, নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনি যদি সাধারণ মানুষকে যেতে বলে তাহলে তারা যাবে। সেনাবাহিনি তাদেরকে ট্রেনিং দেবে।

- যারা কাশ্মীরে যাওয়ার জন্য বলছে, তারা নিজেরা জিহাদে যায় না। অন্যদেরকে যেতে বলে নিজেরা বসে থাকে। এরা নিজেদের সুনাম বাড়ানোর জন্য জিহাদের কথা বলছে। এরা ধান্দাবাজ- ফেতনাবাজ। এদের কথা শুনা জায়েয হবে না।

- কাশ্মীরে কারা জিহাদ করছে তা জানা নেই। আর হাদিসে এসেছে, ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية "যে ব্যক্তি এমন ঝাণ্ডা তলে যুদ্ধ করে যা হক না বাতিল জানা নেই, যে তার আপন গোত্রের স্বার্থে ক্রোধান্বিত হয় কিংবা গোত্রের দিকে আহবান করে বা অন্যায়ভাবে গোত্রের সহায়তা করে আর এভাবেই মারা যায়, তাহলে সে জাহিলী মরা মরল।"- মুসলিম: ৪৮৯২

এছাড়াও আরও অনেক কিছু বলেছেন। সংক্ষেপে একটু গুছিয়ে বলতে গেলে এভাবে বলা যায়-

[কোন মুসলিম ভূখণ্ডে কাফেররা আগ্রাসন চালালে প্রথমত যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে মোবাবেলা করা তাদের উপর ফরযে আইন- যদি মোকাবেলার সামর্থ্য তাদের থাকে। মোকাবেলার সামর্থ্য না থাকলে ফরয নয়। তখন হয়তো হিজরত করবে, নয়তো সবর করবে (তথা মার খেতে থাকবে)। আর সামর্থ্যের মাপকাটি হল, কাফেরদের সংখ্যা

মুসলমানদের ডবলের চেয়ে বেশি না হওয়া।

আক্রান্ত মুসলমানরা যদি জিহাদে না দাঁড়ায়, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের হয়ে জিহাদ করা বাহিরের মুসলামনদের দায়িত্ব নয়। বাহিরের মুসলমানদের উপর তখনই জিহাদ ফরয হবে, যখন আক্রান্তরা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি তথা আমীরের অধীনে মোকাবেলায় দাঁড়াবে। যখন তারা আমীরের অধীনে দাঁড়াবে এবং মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে পড়বে তখনই কেবল বাহিরের মুসলমানদের উপর ফরয হবে, অন্যথায় নয়।

যদি তারা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি তথা আমীরের অধীনে মোকাবেলায় দাঁড়ায় কিন্তু মোকাবেলা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাষ্ট্রের সকলের উপর জিহাদ ফরয হবে না, কেবল সেনাবাহিনির উপর ফরয হবে। সাধারণ জনগণের উপর ফরয হবে না। তবে সেনাবাহিনি যদি সাধারণ জনগণকে যেতে বলে তাহলে যাবে এবং সেনাবাহিনি তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করবে।

পার্শ্ববর্তীরা যদি জিহাদে যায় এবং তারাও মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে দূরবর্তীদের উপর জিহাদ ফরয। পার্শ্ববর্তী দেশের মুসলমানরা যদি জিহাদে না যায়, তাহলে দূরবর্তী দেশগুলোর মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয নয়। (শায়খ যদিও কথাটি এত পরিষ্কার করে বলেননি, তবে বয়ান থেকে কথাটি স্পষ্ট।)

তবে সেনাবাহিনি হোক, সাধারণ মুসলমান হোক, পার্শ্ববর্তী হোক বা দূরবর্তী হোক: তাদের জন্য তখনই জিহাদে যাওয়া জায়েয হবে, যখন রাষ্ট্র প্রধান অনুমতি দেবে। রাষ্ট্র প্রধান অনুমতি না দিলে জিহাদে যাওয়া হারাম।]

এককথায়, সব বিভ্রান্তির গোঁড়া হল, ইমাম। শায়খের মতে জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য ইমাম, ইমামের আহ্বান ও অনুমতি লাগবে। যারা আক্রান্ত হয়েছে, তাদেরও একজন ইমাম লাগবে; আর বাহিরের মুসলমান যারা জিহাদে যেতে

চাচ্ছে তাদেরও তাদের ইমাম তথা রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি লাগবে। অবশ্য তিনি এতটুকু ব্যবধান করেছেন যে, যারা বাহিরের তাদের জন্য তো নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র প্রধান লাগবে; কিন্তু যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য এমন রাষ্ট্র প্রধান লাগবে না। অন্তত জিহাদে অভিজ্ঞ এমন কোন ব্যক্তির অধীনে জিহাদে দাঁড়াতে হবে। যদি তারা জিহাদে দাঁড়ায় তাহলেই কেবল বাহিরের মুসলমানদের জন্য এখানে এসে জিহাদ করা জায়েয হবে, অন্যথায় যদি তারা শুধু মারই খেতে থাকে, অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির অধীনে জিহাদে না দাঁড়ায়, তাহলে বাহিরের মুসলমানদের জন্য তাদেরকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসা জায়েয নয়, হারাম। কারণ, যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের কোন ইমাম নেই।

দ্বিতীয়ত যদি তারা কোন আমীরের নেতৃত্বে দাঁড়ায়ও এবং অক্ষম হয়ে মারও খেতে থাকে, তথাপি বাহিরের মুসলমানদের জন্য তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম, যতক্ষণ না তাদের রাষ্ট্র প্রধান তাদেরকে

অনুমতি দেয়।

এর দলীল তিনি দিয়েছেন নিচের হাদিসটি দিয়ে-

إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به

“ইমাম হচ্ছেন ঢালস্বরূপ। তার পেছনে থেকে যুদ্ধ করা হবে এবং তার দ্বারা আত্মরক্ষা করা হবে।”- বুখারি ২৭৯৭, মুসলিম ১৮৪১

অতএব, যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে তাদেরও একজন ইমাম লাগবে, আর বাহিরের মুসলমান যারা যাবে, তাদেরও ইমামের অনুমতি লাগবে। এ হাদিসের আলোচনা আমরা সামনে করবো ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, শায়খ বলেছেন, যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে তাদের উপর জিহাদ তখনই ফরয হবে, যখন শত্রু প্রতিহত করার কুদরত তাদের থাকবে। এর মাপকাটি তিনি

বুঝাচ্ছেন, শত্রু সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণের বেশি না হওয়া। দ্বিগুণের বেশি হলে কুদরত নেই ধরা হবে। তখন আর ফরয থাকবে না। ধরলাম ফরয নয়, তাহলে অন্তত প্রতিরোধ করা জায়েয হবে কি'না? এ ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট কিছু না বললেও যতটুকু বুঝা যায়, তার মতে এমতাবস্থায় প্রতিরোধ করা হারাম হবে। কেননা, এটা 'ইলক্বাউন নাফস ইলাততাহলুকা' তথা আত্মহত্যার শামিল। শায়খের আরেকটা কথা থেকে এমনটা বুঝা যায়। তাহ হল, শায়খ যখন বলেছিল, রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি না হলে জিহাদে যাওয়া হারাম, তখন একজন সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে এর আপত্তি করেছিল-

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾

"তোমাদের কী হলো! তোমরা কিতাল করছো না আল্লাহর রাস্তায় এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য? যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করে নিন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং নিযুক্ত

করে দিন আপনার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্যকারী।”- নিসা ৭৫

আপত্তি করেছিল যে, এ আয়াতে তো রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি লাগবে বলা হয়নি। তখন তিনি আজগুবি একটা জওয়াব দিয়েছেন। সাথে এও বলেছেন, দুর্বলদেরকে তো একথা বলা হয়নি যে, তোমরা জিহাদ শুরু কর। তাদেরকে সবর করতে বলা হয়েছে।

শায়খের এ কথা এবং আগের কথা মিলালে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি বুঝাচ্ছেন, দুর্বলদের জন্য জিহাদ করা হারাম। এটা আত্মহত্যার নামান্তর। এছাড়াও আরো বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তিনি বিষয়টি বুঝানোর পায়তারা করেছেন। যদি এমনটাই হয়, তাহলে শায়খের এ দাবি নির্জলা মিথ্যা। কারণ, আয়াতে তো এ কথা বলা হয়নি যে, ‘তোমরা মার খেয়ে যাও, তবুও জিহাদ শুরু করবে না। তোমরা দুর্বল। জিহাদ শুরু করা তোমাদের জন্য হারাম হবে’। বেশির চেয়ে বেশি একথা বলা

যায়, দুর্বলদের জন্য জিহাদ ফরযে আইন করা হয়নি। তাই না করার অনুমতি আছে। কিন্তু করলে হারাম হবে একথা তো বলা হয়নি। বরং করাটাই প্রশংসনীয়। মার খেয়ে খেয়ে ধুকে ধুকে মরার চেয়ে, ইজ্জত-আব্রু হারিয়ে মরার চেয়ে যুদ্ধ করে মরে যাওয়া প্রশংসনীয়। এ ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ আমরা সামনে আলোচনা করবো।

অধিকন্তু দুর্বলদের জন্য জিহাদ না করে থাকার অনুমতি আছে কথাটা ঢালাওভাবে সহীহ নয়। কাফেররা আপনাকে, আপনার সামনে আপনার ছেলে-মেয়ে, মা-বাপা ও ভাই-বোনকে নির্যাতন ও হত্যা করছে আর আপনি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন? কিছুই করবেন না? এটার অনুমতি শরীয়ত দেয় না। সামর্থ্যে যতটুকু আছে আপনাকে করতে হবে। বসে বসে মার খেয়ে খেয়ে, নিজের ইজ্জত-আব্রু হারিয়ে মরার অনুমতি শরীয়ত দেয় না। সামনে ইনশাআল্লাহ এর আলোচনা করবো।

আর শায়খ শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হলেই যে জিহাদ ফরয নয় বলেছেন, সেটা মূলত তার অজ্ঞতার ফল। আহযাবের যুদ্ধে যখন কুরাইশরা আরবের বড় বড় কয়েকটি কাফের গোত্র এবং মদীনার ইয়াহুদিদের সমন্বয়ে বহুজাতিক বাহিনি গঠন করে মদীনা অবরোধ করেছিলে, তখন কি কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি ছিল না? তখন কি জিহাদ ফরযে আইন ছিল না? না'কি হারাম ছিল? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নিয়ে যে প্রতিরোধ করেছেন তা কি হারাম করেছেন? শায়খ আপনি কি বলছেন? আপনার মাথা ঠিক আছে তো? আমার মনে হয় শায়খ কি যে বলেন তা চিন্তা করেন না। মুখে যা আসে বলে দেন। এজন্য শায়খের আগে পিছে কথার মধ্যে অনেক গড়মিল দেখা যায়। ২০ মিনিটের দু'টো বয়ানে মধ্যেও শায়খের অনেক গড়মিল আছে। বরং বলতে গেলে শায়খের প্রতিটি কথাতেই একেকটি মহা বিভ্রান্তি লুকায়িত। সব আলোচনা করতে গেলে বিশাল কিতাব লিখতে হবে। আলোচনা সংক্ষেপ করতে চাচ্ছি।

***

তাহলে এখন মুসলমানদের করণীয় কি? বাইরের মুসলামানদের করণীয় বলেছেন, দোয়া করা এবং যাদেরকে বললে কাজ হবে তাদেরকে বলা। এর বাইরে কোন কাজ নেই। এমনকি কাশ্মীরিদের দাবিতে মিছিলও করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

দোয়ার বিষয়টা মেনে নিলাম। মুসলমানের বিপদে অন্য মুসলমান দোয়া করবে এটাই তো ভ্রাতৃত্বের দাবি। এতে আপত্তি নেই। আপত্তি হলো, দোয়া ছাড়া আর কিছু করণীয় আছে কি'না- সেটা নিয়ে।

তিনি দোয়া ছাড়া আর করণীয় বলেছেন, **'যাদেরকে বললে কাজ হবে তাদেরকে বলা'।** এর দ্বারা তিনি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর তাগুত শাসকগোষ্ঠী, অন্যান্য কাফের রাষ্ট্রের শাসকদের বুঝিয়েছেন। জাতিসংঘকেও হয়তো বুঝিয়ে থাকবেন। কিন্তু তাদের কাছে যদি বলা না যায় (বিশেষত যখন তিনি মিছিল করতেও নিষেধ করেছেন তখন বলার আর কি সূরত বাকি রইল? আর শাসকগোষ্ঠীর কাছে দাবি

নিয়ে পৌঁছা যে মোটামুটি অসম্ভব আশাকরি বর্তমানে কারো কাছে অস্পষ্ট নয়; আর পৌঁছতে পারলেও তাতে সমূহ বিপদের আশঙ্কা); কিংবা বলার পর যদি তারা কোন কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে কি করণীয় তা তিনি বলেননি। তবে তিনি এতটুকু বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার যদি ভারতের পক্ষ হয়ে কাশ্মীরিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে ভারতের পক্ষে যোগ দেয়া আমাদের জন্য জায়েয হবে না। সাথে এ কথাও বলেছেন যে, বাংলাদেশ সরকার ভারতকে সমর্থন করে যাচ্ছে। **তবে আরো কিছু প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে গেছেন, যেগুলো বর্তমান পরিস্থিতিতে আরো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন,**

- সরকার যখন কুফরের পক্ষ নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন সরকারের কি বিধান? সে মুসলমান থাকবে কি'না বা তার আনুগত্য জরুরী কি'না বা সে আমীরুল মু'মিনীন হিসেবে বহাল থাকবে কি'না (যেমনটা তারা বর্তমানে সরকারকে আমীরুল মু'মিনীন মনে করে থাকে এবং তার আনুগত্য ফরয বলে থাকে)?

- সরকার যদি নিজেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে এবং

জিহাদেরও অনুমতি না দেয় তখন মুসলমানদের কি করণীয়?

- সরকার যদি ভারতের পক্ষে যোগ দেয়, তাহলে এদেশের মুসলমানদের কি করণীয়?

এসব প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে গেছেন।

***

ফতোয়ার নাতিজা-ফলাফল

শায়খের ফতোয়া অনুযায়ী ফলাফল কি দাঁড়াচ্ছে একটু লক্ষ করি:

শায়খ বলেছেন, কাশ্মীরে যে পরিমাণ হিন্দু সৈন্য আছে এবং তাদের যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আছে, তার সামনে কাশ্মীর মুসলমানদের দাঁড়ানোর সামর্থ্য নেই। এমনকি এও বলেছেন, বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ কাশ্মীরে চলে গেলেও কিছু করতে পারবে না। এতই যখন দুর্বল, তখন কাশ্মীরিদের জন্য জিহাদে দাঁড়ানো আত্মহত্যার শামিল। শায়েখের ফতোয়া

অনুযায়ী (যদি আমি শায়খের কথা সঠিক বুঝে থাকি) কাশ্মীরিদের জন্য জিহাদে দাঁড়ানো হারাম। কিংবা অন্তত ফরয নয়। আর শায়খ বলেছেন, কাশ্মিরিরা জিহাদে দাঁড়ায়নি। মোটকথা দাঁড়ানো হারামই হোক কিন্তু এমনটাই হয়ে থাকুক যে, তারা দাঁড়ায়নি- সর্বাবস্থায় বহির্বিশ্বের মুসলমানদের জন্য কাশ্মিরে যাওয়া হারাম। কারণ, এক দিকে তারা নিজেরা যখন দাঁড়ায়নি (যদিও শায়খের এ বক্তব্য সঠিক নয়, বরং কাশ্মিরিরা টুকটাক হলেও জিহাদ করে যাচ্ছে) তখন শায়খের দরবারি ফতোয়া অনুযায়ী তাদেরকে সাহায্য করা বাকি মুসলমানদের দায়িত্ব নয়। অধিকন্তু পাকিস্তান যেহেতু এগিয়ে যায়নি, তাই আমাদের কোন দায়িত্ব নেই। সর্বোপরি রাষ্ট্রপ্রধানের যেহেতু অনুমতি হয়নি, তাই বাহিরের মুসলমানদের জন্য কাশ্মিরে সহায়তা করতে যাওয়া হারাম। অতএব, এখন যদি গোটা কাশ্মীরকে মৃত্যুপুরীও বানানো হয়; কাশ্মীরের নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সকলকেও যদি ধরে ধরে যবাই করা হয় বা বোম্বিং করে উড়িয়ে দেয়া হয়; যদি মা-বোনদের আহাজারিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিতও হয়, যদি তাদের প্রতি দরদে হৃদয় ফেঁটে টুকরো টুকরোও হয়ে যায়, তথাপি আমাদের জন্য এবং বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য জিহাদে যাওয়া হরাম! হারাম! হারাম!

কাঁদতে পারবেন, দোয়া করতে পারবেন, জিহাদ করতে পারবেন না। এমনকি মিছিলও করতে পারবেন না। করলেই হারাম হবে। জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহর সামনে কেয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে- কেন তুমি রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি ছাড়া জিহাদে গেলে? তাগুতদের কথা মতো কেন ঘরে বসে থাকলে না? কেন কাশ্মীরিদের নীরবে হত্যা করতে দিলে না? কেন মালউনদেরকে বাধা দিলে? আরো হাজারো জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে!!

এই হল ফতোয়ার সারকথা। বাহ! অনেক সুন্দর ফতোয়া। এ ধরণের সরকারি ফতোয়া দেয়ার জন্যই বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরি কুকুরদেরকে রুটি আর উচ্ছিষ্ট দিয়ে তাগুতগোষ্ঠী পোষে যাচ্ছে। না হলে তাদের কি-ই বা দরকার পড়েছে যে, এদেরকে তারা পোষে যাবে- যদিও তা উচ্ছিষ্ট দিয়েই হোক না কেন!!

(চলমান ইনশাআল্লাহ)

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস-০২

উপরে আমরা দরবারি ফতোয়াটি দেখেছি। এবার একটু পর্যালোচনায় যাব। শায়খের সংশয়গুলোর উপর একটু আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথমে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সুবিধাবাদিরা কাফের-মুরতাদদের পক্ষে যতই ওকালতি করুক; যতই তাবিল, তাহরিফ ও অপব্যাখ্যা করুক- আল্লাহ তার দ্বীনকে বিজয়ী করবেনই। আল্লাহ তাআলার চিরসত্য ওয়াদা-

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)

"ওরা আল্লাহর নূরকে নিজেদের মুখের (ফুঁ) দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তার নূরের পূর্ণতা বিধান ব্যতীত বাকি সকল কিছুতেই অসম্মত- যদিও কাফেররা (তা) অপছন্দ করে। তিনিই তো সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করেন- যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"- তাওবা ৩২-৩৩

♣ সংশয়: ইমামের অনুমতি

এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা আগেও হয়েছে। তবে শায়খের বক্তব্য যেহেতু নতুন করে ফিতনার সৃষ্টি করেছে তাই কিছু আলোচনা সমীচিন করছি। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

সরকারি মোল্লারা মূলত কথার একাংশ বলে আরেকাংশ বাদ দিয়ে ফিতনার সৃষ্টি করে। পূর্ণ কথাটি বললে তখন সকলেই সঠিক বিষয়টি বুঝতে পারতো। **ইমামের আনুগত্য আমরা অস্বীকার করি না, ফরয মনে করি।** যেমনটা আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আদেশ মান্য কর এবং আদেশ মান্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল, তাদের।”- নিসা ৫৯

কিন্তু এ আনুগত্য দু’টি শর্ত সাপেক্ষে:

প্রথম শর্ত:

ইমাম মুসলমান হতে হবে। কাফের কখনও মুসলমানদের ইমাম হতে পারে না। যেমনটা এ আয়াতেও বলা হয়েছে (مِنْكُمْ) তথা ইমাম মুসলমান হতে হবে। **শায়খ আব্দুল্লাহ আদদুমাইজি বলেন,**

فقوله تعالى (منكم) نص على اشتراط أن يكون ولي الأمر من المسلمين ، قال د . محمود الخالدي : [ولم ترد كلمة (أولي الأمر) إلا مقرونة بأن يكونوا من المسلمين ، فدل على أن ولي الأمر يشترط أن يكون مسلما]. اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী (منكم)- ‘তোমাদের মধ্য থেকে’ সুস্পষ্ট ভাষ্য যে, উলূল আমর মুসলমানদের মধ্য থেকে হওয়া শর্ত। ডক্টর মাহমুদ

আলখালিদি বলেন, ‘(উলূল আমর) শব্দটি যত জায়গায় এসেছে, সব খানেই (মুসলমানদের মধ্য থেকে হওয়া) কথাটির সাথে মিলে এসেছে। বুঝা গেল, উলূল আমর মুসলমান হওয়া শর্ত’।”- আলইমামতুল উজমা ১৫৭

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

‘আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য মু’মিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখবেন না।’- নিসা: ১৪১

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন,

لا ولاية لكافر على مسلم لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141]. اهـ

“কোন মুসলমানের উপর কোন কাফেরের কোন কর্তৃত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- ‘আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য মু’মিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখবেন না’।”- ফাতহুল কাদীর: ৫/২৬৫

দ্বিতীয় শর্ত:

আদেশ বা নিষেধ শরীয়তসম্মত হতে হবে। শরীয়ত পরিপন্থী আদেশ-নিষেধে কোন আনুগত্য নেই। যেমনটা হাদিসে এসেছে যে, **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,**

« على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ».

“পছন্দ-অপছন্দ সকল বিষয়ে মুসলমানের জন্য শ্রবণ ও আনুগত্য আবশ্যক। তবে যদি গুনাহের আদেশ করা হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। গুনাহের আদেশ করা কোন হলে শ্রবণ বা আনুগত্য নেই।”- মুসলিম ৪৮৬৯, বুখারি ৬৭২৫

এটাই আমাদের আকীদা। যেমনটা **ইমাম ত্বহাবি রহ. (৩২১হি.) আহলুস সন্নাহর আকীদায় লিখেছেন,**

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز و جل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. اهـ

“আমরা আমাদের আইম্মা ও আমাদের দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয মনে করি না- যদিও তারা জুলুম করে। তাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করি না। আনুগত্যের হাতও গুটিয়ে নিই না। (বরং) তাদের আনুগত্যকে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লাহ-এর আনুগত্য মনে করি ও ফরয মনে করি- যতক্ষণ তারা কোনো গুনাহের আদেশ না দেন।”- আলআকিদাতুত ত্বহাবিয়্যাহ ৪৭

***

শর্তের ব্যতয় ঘটলে

উপরোক্ত দুই শর্তের কোন একটায় ব্যাত্যয় ঘটলেই হুকুম বিপরীত হবে।

যদি প্রথম শর্তে ব্যত্যয় ঘটে তথা ইমাম মুসলমান না থাকে, তাহলে শরীয়তের নির্দেশ: যুদ্ধ করে হলেও তাকে অপসারণ করে দিতে হবে।

যেমনটা হাদিসে এসেছে যে, হযরত উবাদ ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ. فكان فيما أخذ علينا أَنْ بَايَعَنَا على السمع والطاعة في مَنشَطِنا ومَكْرَهِنا، وعُسرنا ويُسرنا، وَأَثَرَة علينا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَه. قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. (متفق عليه وهذا لفظ مسلم.)

"আমাদেরকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাকলেন এবং আমরা তাঁর হাতে বাইআত হলাম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইআত নিলেন তার মধ্যে একটি ছিল: আমরা আমাদের পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপর যদি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় তথাপি (আমীরের কথা) শুনবো ও আনুগত্য করবো এবং আমরা দায়িত্বশীলের সাথে দায়িত্ব নিয়ে বিবাদে জড়াবো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে- তাহলে ভিন্ন কথা।"- সহীহ বোখারি: ৬৬৪৭, সহীহ মুসলিম: ৪৮৭৭

এটি মুসলিম উম্মাহর ইজমায়ী তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। **ইমাম নববি রহ. (৬৭৬ হি.) কাজি ইয়াজ রহ. (৫৪৪ হি.) এর বক্তব্য বর্ণনা করেন,**

قال القاضي عياض: أجمع العلماءُ على أن الإمامةَ لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفرُ انعزل. اهـ

"উলামায়ে কেরাম সবাই একমত যে, কোনো কাফেরকে খলিফা নিযুক্ত করলে সে খলিফা হবে না এবং কোনো খলিফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হবে যাবে।"- শরহে

নববি আলা মুসলিম ১২/২২৯

আরো বলেন,

قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته. اهـ

“কাজী ইয়ায রহ. আরও বলেন, শাসকের উপর যদি কুফর আপতিত হয় এবং সে যদি শরীয়া বিনষ্ট করে অথবা বিদআত করে, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে।”- শরহে নববি আলা মুসলিম ১২/২২৯

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

يَنعَزِلُ بالكفر إجماعا فيجبُ على كل مسلمٍ القيامُ في ذلك، فمن قَوِيَ على ذلك فله الثوابُ، ومن داهن فعليه الإثمُ، ومن عَجَزَ وجبتْ عليه الهجرةُ من تلكَ الأرضِ. اهـ

“কুফরীর কারণে শাসক সর্বসম্মতিক্রমে অপসারিত হয়ে যাবে। তখন প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ হলো, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। যে তাতে সক্ষম হবে, তার জন্য রয়েছে প্রতিদান। যে শিথিলতা করবে, সে গুনাহগার হবে। আর যে অক্ষম, তার জন্য আবশ্য হলো ঐ ভূমি থেকে হিজরত করা।”– ফাতহুল বারি: ১৩/১৫৩

আর যদি দ্বিতীয় শর্তের ব্যত্যয় ঘটে তথা ইমাম শরীয়ত বহির্ভূত আদেশ দেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তো করা যাবে না, তবে

তার উক্ত আদেশ বা নিষেধ মেনে চলা যাবে না। বরং যা শরীয়তের নির্দেশ তাই পালন করতে হবে।

***

আমাদের প্রেক্ষাপট

উপরোক্ত সারসংক্ষেপ কথা বুঝার পর এবার আমাদের প্রেক্ষাপটে আসি। আমরা জানি, বর্তমান তাগুত শাসকগোষ্ঠী মুরতাদ। আল্লাহর শরীয়ত প্রত্যাখান করে কুফরি শাসন প্রবর্তন, ইসলাম ও মুসলামানদের বিপক্ষে যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষাবলম্বন, শরীয়তের বিধি বিধান নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল ইত্যাদি অসংখ্য কারণে এরা মুরতাদ হয়ে আছে। এমতাবস্থায় জিহাদের মাধ্যমে এদেরকে অপসারণ করে মুসলিম ভূমি এদের থেকে উদ্ধার করা ফরয। তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার তো কোন প্রশ্নই নেই।

শায়খের কথা মতো যদি এসব তাগুতকে মুসলমান এবং আমীরুল মু'মিনীন ধরেও নিই, তথাপি জিহাদের অনুমতি না দেয়া বা তাতে বাধা দেয়া সুস্পষ্ট শরীয়ত বহির্ভূত কাজ। এ ধরণের আদেশ-নিষেধে কোনো আনুগত্য নেই। আল্লাহ তাআলার আদেশ আমীরের আদেশের অগ্রবর্তী। জিহাদ আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। আমীরের নিষেধের কারণে তা থেকে বিরত থাকা যাবে না। যারা আমীরের নিষেধের কারণে জিহাদ থেকে বিরত থাকবে, তাদেরকে ফরয তরকের গোনাহ মাথায় নিয়ে অপরাধী অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে হবে। এ বিষয়টি সামনে ইনশাআল্লাহ আমরা আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো।

***

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৩

আমীরের অনুমতি মাসলাহাতের সাথে সম্পৃক্ত

জিহাদ একটি নাজুক ইবাদত। এখানে সামান্য ভুল ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এজন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্দেশনা ছাড়া এখানে কাজ করা শঙ্কামুক্ত নয়। সাধারণত জিহাদের ব্যাপারে ইমামুল মুসলিমীন ও তার উমারাগণ অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন। আর তারা হবেন-ই বা না কেন, তাদেরকে তো এ কাজের জন্যই নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারা তো সর্বক্ষণ এ কাজেই থাকেন। অধিকন্তু যে যার মতো

জিহাদ করতে গেলে বিশৃংখলা দেখা দেবে। তাই শরীয়ত আমীর উমারাদের মেনে চলতে বলেছে। ইকদামি জিহাদের ক্ষেত্রেও এ কথা, দিফায়ী জিহাদের ক্ষেত্রেও এ কথা। ইকদামি জিহাদের বিষয়টা তো স্পষ্টই। আর দিফায়ির ক্ষেত্রেও বিষয়টা এমনই। কারণ, সব সময় এমন হয় না যে, শত্রু এসেই হঠাৎ সকলের অগোচরে হামলা করে বসে। বরং অনেক সময় আগে থেকেই জানা যায় যে, শত্রু আসছে। আবার অনেক সময় শত্রু এসে অবরোধ করে, আক্রমণ করে না। এসব ক্ষেত্রেও শরীয়ত যুদ্ধ শুরুর আগে ইমামের সাথে আলোচনা করে নিতে বলে। কারণ, সাধারণ মানুষ অনেক সময় শত্রুর অবস্থা, শক্তি, যুদ্ধের কলা-কৌশল ভাল জানে না। উমরাগণ এসব বিষয় ভাল জানেন। তাই তাদের অনুমতি ও নির্দেশনা নিয়ে কাজ করা উচিৎ। হঠাৎ কিছু করতে গেলে বিপদের আশঙ্কা। তবে কোথাও যদি এমন হয় যে, শত্রু হামলা করে দিয়েছে এবং ইমামের নির্দেশনা নেয়ারও সুযোগ নেই, তখন ইমামের অনুমতি ছাড়াই হামলা প্রতিরোধ করবে। কারণ, ইমামের নির্দেশনা নিতে বলা হয়েছিল তো মূলত শত্রু প্রতিহত করার জন্যই। যখন ইমামের অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে শত্রু প্রতিহত করা সম্ভব হচ্ছে না বা আরো কষ্টকর হচ্ছে, তখন

আর অনুমতির দরকার নেই। এখানে নিজেরা জিহাদ শুরু করে দেয়ার মাঝেই মাসলাতাহ।

দলীল

সুন্নাহ থেকে এর প্রকৃষ্ট দুটি দলীল বিদ্যমান।

এক. গাযওয়ায়ে যু কারাদ

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একপাল উষ্ট্রী মাঠে চড়ছিল। কাফেররা হঠাৎ আক্রমণ করে সেগুলো ছিনিয়ে নেয়। হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহিরে বের হয়েছিলেন। যখন তিনি দেখলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীপাল ছিনতাই হয়েছে, অনুমতির অপেক্ষা না করে এদের পেছনে ধাওয়া করেন এবং উটগুলো ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে খুশি হন।

যেহেতু অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে উটগুলো উদ্ধার করা সম্ভবপর ছিল না, তাই অনুমতি ছাড়াই তিনি কিতালে জড়ান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কাজে খুশি হন

এবং তার প্রশংসা করেন এবং অধিক পরিমাণে গনিমত দেন। বুঝা গেল, এ ধরণের পরিস্থিতিতে অনুমতির প্রয়োজন নেই। হাদিসটি সহীহাইনে এসেছে। **মুসলিম শরীফে সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যবানিতে হাদিসটি নিম্নরূপ:**

خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترعى بذى قرد - قال - فلقينى غلام لعبد الرحمن بن صلى الله عليه وسلم- فقلت -عوف فقال أخذت لقاح رسول الله من أخذها قال غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه. قال فأسمعت ما بين لابتى المدينة ثم اندفعت على وجهى حتى أدركتهم بذى قرد وقد أخذوا يسقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلى وكنت راميا ... حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة - قال - وجاء النبى -صلى الله عليه وسلم- والناس ... قال - ثم رجعنا ويردفنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ناقته حتى دخلنا المدينة.

“ফজরের আযান হওয়ার আগেই আমি বের হলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধাল উষ্ট্রীগুলো যু কারাদে চড়ছিল। তখন আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক গোলামের সাথে সাক্ষাৎ হল। সে বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীপাল লুণ্টন হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কে নিয়েছে? উত্তর দিল, গাতফান গোত্রের লোকেরা।

তিনি বলেন, তখন আমি (মদীনাবাসীকে সতর্ক করা এবং তাদের থেকে সাহায্য চাওয়ার উদ্দেশ্যে) তিনবার ‘ইয়া সাবাহা....’ বলে চিৎকার দিলামা। তিনি বলেন, সমগ্র মদীনায় আমার আওয়াজ পৌঁছাতে সক্ষম হলাম। এরপর দিলাম সামনের দিকে দৌঁড়। অবশেষে গিয়ে যু কারাদে তাদের নাগাল পেল। তারা তখন পানি উঠাচ্ছিল। আমি আমার তীর তাদের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলাম। আর আমি ভাল তীরন্দাজ ছিলাম। ... এভাবে অবশেষে তাদের থেকে সকল উষ্ট্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হলাম এবং আরো ত্রিশটি চাদরও তাদের থেকে চিনিয়ে নিলাম। তিনি বলেন, এরপর রাসূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য লোক এসে উপস্থিত হল। ... তিনি বলেন, এরপর আমরা মদীনার দিকে ফিরলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার উষ্ট্রীর পেছনে সওয়ার করালেন। এভাবে মদীনায় পৌঁছলাম।”- সহীহ মুসলিম ৪৭৭৮

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

فلما أصبحنا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ». قال ثم أعطانى

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهمين سهم الفارس وسهم الراجل

"(পরদিন) যখন সকাল হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার আবু কাতাদা আর শ্রেষ্ঠ পদাতিক সালামা। তিনি বলেন, এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে গনিমতে দুই ভাগ দিলেন: এক ভাগ অশ্বারোহীর, আরেক ভাগ পদারোহীর।"- সহীহ মুসলিম ৪৭৭৯

দুই. ইমাম মুরতাদ হয়ে গেলে

ইমাম যখন মুরতাদ হয়ে যাবে, তাকে অপসারণ করা ফরয। যারা কাফের ইমামের পক্ষ নেবে, তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। এটিই শরীয়তের নির্দেশ, যেমনটা হযরত উবাদা ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস থেকে আমরা আলোচনা করে এসেছি। এখানে তো মুসলমানদের কোন ইমাম নেই। ইমাম তো মুরতাদ হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম নেই বলে শরীয়ত জিহাদ বন্ধ রাখতে বলেনি। সম্ভব হলে একজনকে ইমাম বানিয়ে নেবে। সম্ভব না হলে আপাতত

একজনকে আমীর বানিয়ে নিয়ে মুরতাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে। মুরতাদ সরে গেলে নিজেরা একজনকে ইমাম বানিয়ে নেবে। তাতারদের বিরুদ্ধে সাইফুদ্দিন কুতজ এর জিহাদ এভাবেই হয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদও এভাবেই হয়েছে।

এবার ফুকাহায়ে কেরামের কয়েকটি বক্তব্য লক্ষ করুন-

ইবনে কুদামা রহ. (৬২০ হি.) বলেন,

وواجب على الناس إذا جاء العدو، أن ينفروا؛ المقل منهم، والمكثر، ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه، فلا يمكنهم أن يستأذنوه. اهـ

"শত্রু এসে পড়লে ধনী-গরীব সকলের জন্য বের হয়ে পড়া ফরয। তবে ইমামের অনুমতি ছাড়া শত্রুর দিকে রওয়ানা দেবে না। তবে যদি এমন কোন শক্তিধর শত্রু হঠাৎ আক্রমণ করে বসে যার (সাথে কিতাল করতে দেরি করলে তার) থেকে

সকলে অনিষ্টের আশঙ্কা করছে, যার ফলে ইমামের অনুমতি নেয়া সম্ভব হচ্ছে না- তাহলে কথা ভিন্ন।”- আলমুগনি ৯/২১৩

সামনে বলেন,

لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه، لأنه أحوط للمسلمين؛ إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه، لتعين الفساد في تركهم، ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي - صلى الله عليه وسلم - فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة، تبعهم، فقاتلهم، من غير إذن، فمدحه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع. وأعطاه سهم فارس وراجل. اهـ

“আমীরের অনুমতি ছাড়া বের হবে না। কারণ, যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব তারই উপর ন্যাস্ত। শত্রুর সংখ্যা কম না বেশি এবং শত্রুর গোপন ঘাঁটি ও কৌশল-ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনিই ভাল অবগত। তাই তার মতামতই মেনে নেয়া চাই। এটাই মুসলামনদের জন্য অধিক কল্যাণ। তবে শত্রু যদি আকস্মিক আক্রমণ করে বসে, যার ফলে অনুমতি নেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তখন অনুমতি নেয়া আবশ্যক নয়। কেননা, তখন

শত্রুর সাথে কিতাল করা এবং তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার মাঝেই সনিশ্চিত কল্যাণ আর তাদেরকে ছেড়ে রাখার মাঝেই সুনিশ্চিত ক্ষতি। এ কারণেই কাফেররা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটপালের উপর আক্রমণ করেছিল এবং সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনার বাহিরে তাদের নাগাল পেলেন, তিনি অনুমতি ছাড়াই তাদের পেছনে ধাওয়া করলেন এবং কিতাল করলেন। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশংসা করে বলেছেন, 'সালামা আমাদের পদাতিক বাহিনির শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা' এবং তাকে একজন ঘোড়সওয়ার ও একজন পদাতিক যোদ্ধার সমপরিমাণ গনিমত দিয়েছেন।"- আলমুগনি ৯/২১৩-২১৪

এ আলোচনা ফরযে আইনের সময়কার। মাসলাহাতের খাতিরে এখানেও অনুমতির কথা বলেছেন। তদ্রূপ যখন অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে কিতাল শুরু করার মাঝেই মাসলাহাত তখন অনুমতি ছাড়াই জিহাদ শুরু করতে বলেছেন। বুঝা গেল, ইমাম বা আমীরের অনুমতি এমন কোন বিষয় নয় যা ব্যতীত জিহাদ সর্বাবস্থায় নাজায়েয। বরং বিষয়টি মাসলাহাতের সাথে সম্পৃক্ত।

খতিব শারবিনি রহ. (৯৭৭ হি.) বলেন,

لا تتسارع الطوائف والآحاد منا إلى دفع ملك منهم عظيم شوكته دخل أطراف بلادنا لما فيه من عظم الخطر. اهـ

"কাফেরদের প্রভূত শক্তিধর কোন সম্রাট আমাদের (দারুল ইসলাম) রাষ্ট্রের সীমান্তে প্রবেশ করে গেলে (আমীরের অনুমতি ও নির্দেশনা ছাড়া) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা সাধারণ জনগণ তাকে প্রতিহত করতে তাড়াহুড়া করে কোন ব্যবস্থা নেবে না। কেননা, এতে ভীষণ বিপদের আশঙ্কা আছে।"- মুগনিল মুহতাজ ৬/২৪

এ আলোচনাও ফরযে আইনের বেলায়। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা আছে বিধায় ইমামের অনুমতি ছাড়া জনগণ তড়িঘড়ি কোন ব্যবস্থা নিতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আকস্মিক শত্রু আক্রমণ করে বসলে ভিন্ন কথা- যেমনটা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে কুদামা রহ. (৬২০ হি.) বলেন,

فان عدم الامام لم يؤخر الجهاد لان مصلحته تفوت بتأخيره، وان حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع، قال القاضي وتؤخر قسمة الاماء حتى يقوم إمام احتياطا للفروج.اهـ

“যদি ইমাম না থাকে তাহলে এ কারণে জিহাদ পিছিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা, পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা জিহাদে নিহিত মাসলাহাত ও কল্যাণসমূহ হাতছাড়া হয়ে যাবে। গনীমত লাভ হলে হকদারদের মাঝে শরীয়তে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী বণ্টন করে নেবে। তবে কাজী রহ. বলেন, ইমাম নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতাবশত দাসীদের বণ্টন স্থগিত রাখবে।”- আলমুগনী ১০/৩৭৪

বুঝা গেল, জিহাদ ফরযে আইন হোক আর ফরযে কিফায়া হোক সকল অবস্থায় ইমাম বা আমীরের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। এর মাঝে মাসলাহাত। তবে যখন অনুমতি নিতে গেলে মাসলাহাত নষ্ট হবে, তখন অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করবে। তদ্রূপ যদি ইমাম না থাকে, তথাপি বসে থাকা যাবে না। অবশ্য জিহাদ শুরু করার সময় তৎক্ষণাৎ একজনকে আমীর

বানিয়ে নেবে। তদ্রূপ আমীর শহীদ হয়ে গেলেও একজনকে ততক্ষণাৎ আমীর বানিয়ে নেবে, যাতে শৃংখলা ঠিক থাকে; যেমনটা মূতার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম করেছিলেন।

ইবনে কুদামা রহ. (৬২০ হি.) বলেন,

فإن بعث الإمام جيشا، وأمر عليهم أميرا، فقتل أو مات، فللجيش أن يؤمروا أحدهم، كما فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في جيش مؤتة، لما قتل أمراؤهم الذين أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمروا عليهم خالد بن الوليد، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضي أمرهم، وصوب رأيهم، وسمى خالدا يومئذ: " سيف الله ". اهـ

“ইমাম যদি কাউকে আমীর নির্ধারণ করে তার নেতৃত্বে কোন বাহিনি পাঠান, অতঃপর উক্ত আমীর নিহত হয় বা মারা যায়, তাহলে বাহিনি নিজেরা নিজেদের একজনকে আমীর বানিয়ে নিতে পারবে। যেমনটা মূতার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতৃক নির্ধারিত আমীরগণ যখন সকলে শহীদ হয়ে যান, তখন তারা খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজেদের আমীর বানিয়ে নেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ

সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের এ কাজে সন্তুষ্ট এবং একে সঠিক বলেন। সেদিনই খালেদ রাদিয়াল্লাহুকে তিনি 'সাইফুল্লাহ'- 'আল্লাহর তরবারি' উপাধি দেন।"- আলমুগনি ৯/২০২-২০৩

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.) বলেন,

وإن نادى منادي الأمير بالنهي عن الخروج للعلافة فلا ينبغي لأهل منعة ولا لغيرهم أن يخرجوا. إلا أنه ينبغي للإمام أن يبعث لذلك قوماً وينبغي أن يؤمر عليهم أميراً لتتفق كلمتهم ويتمكنوا من المحاربة مع المشركين إن ابتلوا بذلك وكذلك إن خرجوا مفريقين قبل نهي الإمام فهجم عليهم العدو فينبغي لهم أن يجتمعوا ويؤمروا عليهم أميراً ثم يقاتلوا. اهـ

"(যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার পর) আমীরের ঘোষক যদি ঘোষণা দেয় যে, দানা পানির জন্য বাহিরে যাওয়া নিষেধ- তাহলে সংঘবদ্ধ হোক বা না হোক- কারো জন্যই বাহিরে যাওয়া উচিৎ হবে না। তবে ইমামের উচিৎ দানা পানির জন্য কিছু লোককে পাঠানো এবং পাঠানোর সময় একজনকে আমীর বানিয়ে দেয়া। যাতে তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হলে যেন যুদ্ধ করতে সমর্থ্য হয়।

তদ্রূপ ইমাম নিষেধ করার পূর্বেই যদি (আমীর ছাড়া) বিক্ষিপ্তভাবে বেরিয়ে পড়ে অতঃপর তাদের উপর শত্রুরা আকস্মিক আক্রমণ করে বসে, তাহলে তাদের উচিৎ ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়া তারপর যুদ্ধ শুরু করা।”- শরহুস সিয়ারিল কাবির ১/৯৪

সারমর্ম

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম, জিহাদের জন্য একজন আমীর এবং তার নির্দেশনা আবশ্যক। আমীরের অনুমতি ব্যতীত নিজেরা কিছু করতে যাবে না। তবে বিষয়টি মাসলাহাতের সাথে সম্পৃক্ত। যেখানে আমীরের অনুমতি নিতে গেলে মাসলাহাত ছুটে যাবে, সেখানে আমীরের অনুমতি নিতে হবে না। আমীরের অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করবে। তবে উপস্থিত সময়ে ঐক্য ঠিক রাখার জন্য আমীর না থাকলে একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে। তদ্রূপ আগের আমীর শহীদ হয়ে গেলে বা মারা গেলেও নিজেদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে তারপর কিতাল শুরু করবে। আমীর না বানিয়ে কিতাল শুরু করা উচিৎ নয়।

***

যখন প্রমাণ হল, আমীরের সম্পর্ক মাসলাহাতের সাথে তখন আমাদের সামনে নিম্নের সূরতগুলো আপনা আপনি সমাধান হয়ে যাবে:

♣ ইমাম ফরযে আইন জিহাদে বাধা দিলে

ইমাম মুহাম্মদ রহ. 'আসসিয়ারুল কাবীর' এ বলেন,

وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفير عاما. اهـ

"ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ করে, তাহলে তাদের জন্য তার আদেশ অমান্য করা

জায়েয হবে না। তবে যদি নাফীরে আম হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।” -শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮

অর্থাৎ নাফিরে আম হয়ে গেলে তথা কাফেররা মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালালে ইমাম নিষেধ করলেও জিহাদে যেতে হবে। কাফেররা আক্রমণ করার কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে। ইমাম যদি এ জিহাদে বের হতে নিষেধ করেন, তাহলে তিনি আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী আদেশ দিলেন যা মান্য করা যাবে না। যেমনটা আমরা আগে আলোচনা করে এসেছি। আরেকটি হাদিসে কথাটি এভাবে এসেছে,

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

“খালেকের নাফরমানী করে মাখলূকের আনুগত্য বৈধ নয়।”-মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ৩৪৪০৬

মালিকী মাযহাবের কিতাব ‘ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক’ এ বলা হয়েছে:

قال ابن حبيب سمعت أهل العلم يقولون إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يزحمهم العدو وقال ابن رشد طاعة الإمام لازمة , وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين.اهـ

“ইবনে হাবীব রহ. বলেন, আমি আহলে ইলমদেরকে বলতে শুনেছি, ইমাম কোন মাসলাহাতের প্রতি লক্ষ্য করে কিতাল করতে নিষেধ করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তবে যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে ভিন্ন কথা। ইবনে রুশদ রহ.বলেন, ইমাম ন্যায় পরায়ণ না হলেও তার আনুগত্য আবশ্যক, যতক্ষণ না কোন গুনাহের আদেশ দেন। আর ফরযে আইন জিহাদে বাধা দেয়া গুনাহের কাজ।”- ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক: ৩/৩

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেন-

و لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهي عن جهاد الكفار و أمر بإسلام حريم المسلمين إليهم ...اهـ

“কুফরের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে বাধা দেয়া এবং মুসলমানদের ভূমিকে তাদের হাতে সমর্পণ করতে আদেশ করার চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই।” -আল-মুহাল্লা:

৭/৩০০

অতএব, ইমাম জিহাদে বাধা দিলে তার নিষেধাজ্ঞা মান্য করা যাবে না। শত্রু আক্রমণ করে বসলে আল্লাহ তাআলার আদেশ হল তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা। আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে ইমামের নিষেধের কোন মূল্য নেই।

♣ ইমাম জিহাদ না করলে বা জিহাদের অনুমতি না দিলে

ইবনু আসাকির রহ. (৫৭১হি.) আহমাদ ইবনু সা'লাবা আলআমিলি রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

سئل وكيع بن الجراح عن قتال العدو مع الإمام الجائر قال: إن كان جائرا وهو يعمل في الغزو بما يحق عليه فقاتل معه. وإن كان يرتشي منهم ويهادنهم فقاتل على حيالك. اهـ

“জালেম ইমামের সাথে মিলে শত্রুর (তথা কাফেরদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ওয়াকি’ ইবনুল জাররাহ রহ.

(১৯৭হি.) এর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তর দেন, জালেম হলেও যদি যথাযথভাবে জিহাদ করে, তাহলে তার সাথে মিলেই যুদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি শত্রুদের থেকে ঘুষ নেয় এবং তাদের সাথে স্বজনপ্রীতির আচরণ করে, তাহলে তুমি তোমার নিজের মতো করে (আলাদা) জিহাদ করো।”- তারিখে দিমাশক ৭১/৪৭

লক্ষ্যণীয়, ইমাম বিদ্যমান থাকাকালেও যদি ইমাম খিয়ানত করে, অর্থের লোভে জিহাদ বন্ধ করে দেয় বা শত্রুদের সাথে স্বজনপ্রীতি দেখায়, তাহলে ইমামের অনুমতি ছাড়াই আলাদা জিহাদ করার কথা বলেছেন। এ কথা বলেননি যে, ইমাম জিহাদ বন্ধ করে রাখলে, তিনি অনুমতি না দিলে নিজে থেকে জিহাদ করতে যেও না; নিজে থেকে করতে গেলে হারাম হবে- এসব কিছুই বলেননি। বরং জিহাদ করতে বলেছেন। এবার আমাদের সরকারগুলোর অবস্থা বিবেচনা করুন।

খতীব শারবিনী শাফিয়ি রহ. (৯৭৭ হি.) বলেন,

فصل] فيما يكره من الغزو ، ومن يحرم أو يكره قتله من] الكفار ، وما يجوز قتالهم به (يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه) تأدبا معه ، ولأنه أعرف من غيره بمصالح الجهاد ، وإنما لم يحرم ؛ لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفوس وهو جائز في الجهاد...

. تنبيه : استثنى البلقيني من الكراهة صورا

. إحداها : أن يفوته المقصود بذهابه للاستئذان

ثانيها : إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا . كما يشاهد

ثالثها : إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له . اهـ

"ইমাম বা তার নায়েবের অনুমতি ছাড়া জিহাদ মাকরুহ। ... তবে বুলকিনি রহ. কয়েক সূরতকে এর ব্যতিক্রম বলেছেন।

১. অনুমতি নিতে গেলে যদি জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হাতছাড়া হয়ে যায়।

২. যদি ইমাম ও তার সৈন্য-সামন্ত জিহাদ ছেড়ে দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে যায়।

৩. যদি প্রবল ধারণা হয় যে, অনুমতি চাইলে অনুমতি দেবে না।" – মুগনিল মুহতাজ: ১৭/২৮৭

অর্থাৎ যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে আর ইমামের অনুমতি নিতে গেলে শত্রুর পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে

অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করবে। কেননা, এখানে অনুমতি নিতে গেলে জিহাদের উদ্দেশ্য- তথা শত্রু প্রতিহত করা- ব্যহত হবে। তদ্রূপ ইমাম যদি জিহাদ ছেড়ে বসে থাকে বা কোন ওজর ছাড়াই কাউকে জিহাদে যেতে নিষেধ করবে মনে হয়ে থাকে, তাহলে ইমামের অনুমতি ছাড়া নিজেরাই জিহাদ করে নেবে। শারবিনী রহ. এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, জিহাদ আল্লাহ তাআলার বিধান। ইমাম শুধু শৃংখলার জন্য। যখন ইমামের অনুমতি নিতে গেলে যখন এ ফরযে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা থাকবে, তখন অনুমতি নেবে না। তদ্রূপ, ইমাম এ ফরয আদায়ে গাফলতি করলে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকেই আদায় করতে হবে।

***

♣ কাশ্মীর জিহাদ ও রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝলাম: ইমাম না থাকলেও জিহাদ ছাড়া যাবে না; তদ্রূপ ইমাম জিহাদ না করলে, অনুমতি না দিলে বা বাধা দিলে ইমামের অনুমতি ব্যতিরেকেই জিহাদ করে

নিতে হবে। অর্থাৎ আমরা জিহাদের দায়িত্বটা ইমামের হাতে তখনই ন্যাস্ত করবো, যখন ইমাম নিয়মিত জিহাদ করবেন। এর ব্যতিক্রম হলে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকেই আদায় করতে হবে।

এবার আমাদের বাংলাদেশসহ অন্য সকল তাগুতি রাষ্ট্রের দিকে তাকাই। আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এরা মুরতাদ। স্বয়ং এদের বিরুদ্ধেই জিহাদ ফরয। আর তাদের আনুগত্যের তো কোন প্রশ্নই আসে না। যেমনটা আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً

“হে নবী, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজান্তা ও মহাপ্রজ্ঞাময়।” – সূরা আহযাব: ১

কাজেই তাদের আদেশ নিষেধের কোন মূল্য নেই।

আর আবু বকর যাকারিয়া সাহেবের মতো যারা এদেরকে মুসলমান এবং আমীরুল মুমিনীন মনে করেন, তাদের ধারণা অনুযায়ীও কাশ্মীর বা অন্য কোন ভূখণ্ডে জিহাদে যেতে এদের অনুমতি লাগবে না। তারা যখন জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে, অন্যদেরকেও করতে দিচ্ছে না, বরং তারা নিজেরাই কাফেরদের বাহিনিতে পরিণত হয়েছে, তখন এদের আদেশ নিষেধের কোন মূল্য নেই। কাজেই বর্তমান তাগুতি রাষ্ট্রগুলোতে বসবাসরত যেকোন মুসলমান – নিরাপত্তা ও মাসলাহাতের দিকটি বিবেচনায় রেখে- পৃথিবীর যেকোন রাষ্ট্রে গিয়ে জিহাদে শরীক হতে পারবে। শরয়ী *দৃষ্টিকোণ থেকে কোনই বাধা নেই; বরং এটাই দায়িত্ব। অবশ্য আগেও বলেছি,

- যার-তার কথায় চলে যাবে না। মুজাহিদদের সাথে নিরাপদ ও পাকাপোক্ত যোগাযোগ হওয়ার পরই কেবল যাবে।

- তদ্রূপ এ কথাও বলেছি, নিজ দেশের তাগুতদের বিরুদ্ধে জিহাদের দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা করাই নিয়ম। বিশেষ দরকার পড়লেই কেবল অন্য ভূমিতে হিজরত করবে, অন্যথায় নয়। সারা দুনিয়াই এখন জিহাদের ময়দান। সুবিধামতো সব

জায়গাতেই জিহাদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করতে হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

***

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০4

সংশয়: দুর্বলতা এবং শত্রু সৈন্যের আধিক্যতা

শায়খের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে, ভারতের মোকাবেলা করার মতো শক্তি কাশ্মিরিদের নেই। ভারতের সৈন্য সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। এমতাবস্থায় জিহাদ করতে যাওয়া 'ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা' তথা আত্মহত্যা হবে। কাজেই কাশ্মিরিদের জন্য জিহাদে দাঁড়ানো হারাম।

পর্যালোচনা

প্রথমত

কাশ্মিরে অন্তত ২০/২৫ লাখের মতো যুদ্ধোপোযোগি যুবক আছে। তারা অন্তত তাদের দ্বিগুণ তথা ৪০/৫০ লাখ মুশরিকের মোকাবেলা করতে সক্ষম। আর যদি ভারতের মুসলমানদের ধরা হয়, তাহলে সমগ্র ভারতে অন্তত ৩/৪ কোটি যুদ্ধোপোযোগি যুবক আছে। এরা অন্তত ৬-৮ কোটি মুশরিকের মোকাবেলা করতে সক্ষম। তাহলে মুসলমানরা দুর্বল কোথায়? আমাদের দুর্বলতা ফ্রিজে পানি বরফ করে রেখে ঠাণ্ডার অজুহাতে তায়াম্মুম করার মতো।

দ্বিতীয়ত

শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণ হলে জিহাদ হারাম বলে কোন কথা শরীয়তে নেই। এটি সম্পূর্ণই বানোয়াট। ইয়াহুদিদের মানস সন্তান দরবারি আলেমরাই কেবল এ কথা বলে বেড়ায়। নতুবা কুরআন, হাদিস বা আইম্মায়ে কেরামের কারো বক্তব্যে আপনি এ ধরণের কথা পাবেন না। আল্লাহ তাআলা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর উপর রহম করুন, তিনি এসব

নিফাকপ্রসূত সংশয়ের অপনোদন করে উম্মাহর সঠিক রাহনুমায়ি করে গেছেন সাতশো বছর আগেই। এ ব্যাপারে قاعدة في الإنغماس في العدو তথা 'শত্রুবাহিনির ব্যূহের ভেতরে ঢুকে আক্রমণ' নামক তার একটি স্বতন্ত্র রিসালা রয়েছে। ইনশাআল্লাহ সেখান থেকে চয়নকৃত কিছু বক্তব্য পেশ করবো। বিস্তারিত ঐ রিসালাতে দেখা যেতে পারে।

♣ শত্রুবাহিনি দ্বিগুণের বেশি হলে

এ ব্যাপারে প্রথমে আমরা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ কুরআনে কারীমের আয়াতগুলো দেখি। আল্লাহা তাআলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65)

"৬৪. হে নবী! আপনার এবং আপনার অনুসারি মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট (কাজেই জনবল ও সরঞ্জামাদির স্বল্পতায় আপনি ঘাবড়াবেন না)।

৬৫. হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করুন। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়পদ-অবিচল ব্যক্তি

থাকে, তাহলে (ওদের) দু’শো জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের একশো থাকলে তারা কাফেরদের হাজার জনের উপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা (কাফেররা) এমন সম্প্রদায় যারা (জিহাদের ফজিলত) বুঝে না। (তারা যুদ্ধ করে দুনিয়ার জন্য, আর তোমরা দ্বীনের জন্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মহা প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে। কাজেই তারা তোমাদের সামনে দৃঢ়পদ থাকতে পারবে না।)।”- আনফাল ৬৪-৬৫

ইসলামের শুরু যামানায় একজন মুমিন দশজন কাফেরের মোকাবেলা করা ফরয ছিল। আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিয়েছেন, তোমাদের যদি একজন দশজনের মোকাবেলাও করতে হয় তথাপি তোমরাই বিজয়ী হবে। শর্ত হল, সবরের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন মুহাজির ও আনসারদের বাহিরের লোকজনও মুসলমান হতে থাকলো, যাদের ঈমানী মজবুতি ও সবর তাদের সমান ছিল না, তাই তাদের পক্ষে একজন দশজনের মোকাবেলা কঠিন ছিল। এ দিকটি বিবেচনা করে আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব হালকা করে দিয়েছেন। বিধান দিয়েছেন, একজন দু’জনের মোকাবেলা

করতে হবে। দ্বিগুণের বেশি হলে মোকাবেলা ফরয নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)

“আল্লাহ এখন ভার লাঘব করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। অতএব, তোমাদের যদি একশো দৃঢ়পদ-অবিচল ব্যক্তি থাকে, তাহলে দু’শো জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের এক হাজার থাকলে আল্লাহর হুকুমে দু’ হাজারের উপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ সবরকারী-দৃঢ়পদ লোকদের সাথে আছেন। (সংখ্যায়-সরঞ্জামে স্বল্প হলেও আল্লাহ তাদের নুসরত করবেন)।”- আনফাল ৬৬

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

এক.

শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণ হলে মোকাবেলা ফরয নয়। কিন্তু এর অর্থ

এই নয় যে, মোকাবেলা জায়েয নয়। বরং শরীয়তের অন্যান্য দলীল দ্বারা স্পষ্ট যে, শত্রু সংখ্যা অনেক গুণ বেশি হলেও, মৃত্যু নিশ্চিত হলেও ময়দান ত্যাগ না করে লড়াই করে যাওয়া এমনকি শহীদ হয়ে যাওয়া আল্লাহ তাআলার পছন্দ। এ ব্যাপারে আমরা সামনে ইনশাআল্লাহ দলীলভিত্তিক আলোচনা করবো। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

هذا أكثر ما فيه أنه لا تجب المصابرة لما زاد على الضعف ليس في الآية أن ذلك لا يستحب ولا يجوز. اهـ

"এখানে বেশির চেয়ে বেশি এ কথা বলা যায় যে, দ্বিগুণের বেশি হলে মোকাবেলা ফরয নয়। আয়াতে এ কথা নেই যে, মোকাবেলা মুস্তাহাব নয় বা জায়েয নয়।"- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৫৭

দুই.

প্রথমে একজন দশজনের মোকাবেলা ফরয ছিল। পরে আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে দায়িত্ব হালকা করে দিয়েছেন। বুঝা গেল, একজন মুমিন হিম্মত করলে দশজনের মোকাবেলা করতে সক্ষম। এক হাজার দশ হাজরের, এক লাখ দশ লাখের মোকাবেলা করতে সক্ষম। যদি তারা সবরের সাথে

মোবাবেলা করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তারা বিজয়ী হবে। জাসসাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন,

قوله تعالى {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} لم يرد به ضعف القوى والأبدان وإنما المراد ضعف النية لمحاربة المشركين فجعل فرض الجميع فرض ضعفائهم. اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী- ‘আল্লাহ এখন ভার লাঘব করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে’: এখানে সাজ-সরঞ্জাম ও শারিরীক শক্তির দুর্বলতা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল, মুশরিকদের বিরুদ্ধে কিতালের নিয়্যত ও হিম্মতের দুর্বলতা। দুর্বল হিম্মতের লোকদের ফরয যতটুকু (তথা দু’জনের মোকাবেলা করা), (উচ্চ হিম্মতের লোকসহ) সকলের বেলায় সেটুকুই ফরয করা হয়েছে।”- আহকামুল কুরআন ৩/৯২

অর্থাৎ ফরয তো সকলের জন্য একই, কিন্তু হিম্মত করলে একজন দশজনের মোকাবেলা করতে পারবে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন,

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“কত ছোট ছোট দল রয়েছে যারা আল্লাহর হুকুমে বড় বড় বাহিনির উপর বিজয়ী হয়েছে!! আল্লাহ সবর ও অবিচলতার পরিচয়দাতাদের সাথে আছেন।”- বাকারা ২৪৯

তিন.

দ্বিগুণের বেশি হলে মোকাবেলা ফরয নয়- এ বিধান ইকদামি জিহাদে। পক্ষান্তরে দিফায়ি জিহাদ তথা যেখানে মুসলমানরা নিজেরাই আগ্রাসনের শিকার, সেখানে বিধান ভিন্ন। সেখানে শত্রু সংখ্যা যতই বেশি হোক মোকাবেলা করতে হবে। একান্তই যদি কেউ মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়ে তার কথা ভিন্ন। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فإذا كان المؤمنون طالبين لم تجب عليهم أن يصابروا أكثر من ضعفيهم، وأما إذا كانوا هم المطلوبين وقتالهم قتال وقع عن أنفسهم فقد تجب المصابرة كما وجبت عليهم المصابرة يوم أحد ويوم الخندق مع أن العدو كانوا أضعافهم.

وذم الله المنهزمين يوم أحد والمعرضين عن الجهاد يوم الخندق في سورة آل عمران والأحزاب؛ بما هو ظاهر معروف. اهـ

“যখন মুমিনরা (কাফেরদের ভূমি বিজয়ের জন্য) কাফেরদের উপর আক্রমণ করতে যাবে, তখন দ্বিগুণের বেশির মোকাবেলা ফরয নয়। পক্ষান্তরে যখন মুমিনরা নিজেরাই আগ্রাসনের

শিকার হবে এবং তাদের কিতাল হবে আত্মরক্ষার্থে, তখন মোকাবেলা ফরয। যেমন, উহুদ ও খন্দকের দিন মোকাবেলা ফরয ছিল- অথচ শত্রুবাহিনি অনেক গুণ বেশি ছিল। উহুদের দিন যারা ময়দান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল এবং খন্দকের দিন যারা জিহাদবিমুখতা প্রদর্শন করেছিল, আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরান ও আহযাবে তাদের যে কত কুৎসা বর্ণনা করেছেন তা (সকলের) কাছে সুস্পষ্ট ও জানাশুনা।"- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৫৭

[বি.দ্র. কিতাবে ظالمين ও المظلومين লেখা আছে। তবে আলোচনার আগ-পর থেকে স্পষ্ট যে, طالبين ও المطلوبين হবে।]

উহুদে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সাতশো আর কাফেররা ছিল তিন হাজার, তদ্রূপ খন্দকে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন তিন হাজার আর কাফেররা ছিল দশ হাজার- যা তাদের তিনগুণেরও বেশি। তখন মোকাবেলা ফরয ছিল। উহুদে মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তার তিনশো সাথীসহ চলে আসে। খন্দকে মুনাফিকরা বিভিন্ন বাহানা তুলে জিহাদ থেকে

সরে পড়তে চেয়েছিল। কুরআনে কারীমে তাদের সকলের নিফাক তুলে ধরে সমালোচনা করা হয়েছে। বুঝা গেল, দিফায়ি জিহাদে সংখ্যার হিসাব নেই। সামর্থ্যানুযায়ী দিফা করতে হবে। যেমনটা ইবনে তাইমিয়া রহ. অন্যত্র বলেছেন,

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. اهـ

"প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ মুসলমানদের দ্বীন ও সম্মানের উপর আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ স্তর, যা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয। যে আগ্রাসী শক্তি মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া উভয়টিকে ধ্বংস করে, ঈমান আনার পর তাকে প্রতিরোধের চেয়ে কোনো গুরুতর ফরয নেই। এই ক্ষেত্রে কোনো শর্ত প্রযোজ্য নয়, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের ফুকাহাগণ ও অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্টভাবে তা বর্ণনা করেছেন।"- আলফাতাওয়াল কুবরা ৪/৬০৮

অন্যত্র বলেন,

فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجبًا على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين؛ لإعانتهم، كما قال الله تعالى : {وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعليكم النَّصْرُ إِلاَّ على قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ} [الأنفال : 72]، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة، والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج. بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم: {يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا} [الأحزاب: 13]. اهـ

“শত্রু যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করে, তখন যাদের উপর আক্রমণ করতে চায়, তাদের সকলের উপর ফরজ হয়ে যায় তাদেরকে প্রতিহত করা। যাদের উপর আক্রমণ করেনি, তাদের উপরও আক্রান্তদের সাহায্যে শত্রুর মোকাবেলা করা ফরজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘আর যদি তারা দ্বীনের জন্য তোমাদের সাহায্য চায়, তাহলে তোমাদের কর্তব্য তাদের সাহায্য করা। তবে তা যেন এমন ক্বওমের বিরুদ্ধে না হয়, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে।’ যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মুসলমানের সাহায্য করার আদেশ দিয়েছেন। (যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে) সে ব্যক্তি চাই যুদ্ধের জন্য বেতনভুক্ত হোক বা না হোক (উভয় অবস্থায়ই তার উপর আবশ্যক সাহায্য করা)। প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী জান এবং মাল দিয়ে সাহায্য করা ফরজ। কম-বেশি, পায়দল কিংবা সওয়ার হয়ে- যেভাবে সম্ভব। যেমন, খন্দকের বছর (আহযাব যুদ্ধে) যখন শত্রুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়, তখন আল্লাহ তায়ালা কাউকেই জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দেননি; যেমন অনুমতি দিয়েছিলেন আক্রমণাত্মক জিহাদের বেলায়, যেখানে আগে বেড়ে কাফেরদের উপর হামলা করা হয়। সেখানে মুসলমানদেরকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। অংশগ্রহণকারী ও তরককারী। কিন্তু এখানে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিহাদ ত্যাগ করার অনুমতি চেয়েছিল, তাদের তিরস্কার করে বলেছেন, ‘তাদের একদল এই বলে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চাইল যে, আমাদের বাড়ি-ঘরগুলো অরক্ষিত। অথচ বাস্তবে সেগুলো অরক্ষিত ছিল না; বরং তাদের অভিপ্রায় ছিল (কোনো উপায়ে) পালিয়ে যাওয়া’।”- মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৩৫৮

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.) বলেন,

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا ولهذا يتعين على كل أحد. يجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بدون إذن أبويه والغريم بغير إذن غريمه وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار. اهـ

“দিফায়ি জিহাদ ইকদামি জিহাদের তুলনায় বিস্তৃত ও ব্যাপকভাবে ফরজ হয়। এ কারণেই তা প্রত্যেকের উপর ফরজে আইন। গোলাম তাতে মনিবের অনুমতি নিয়ে, না নিয়ে উভয় অবস্থায়ই জিহাদ করবে। সন্তান পিতা-মাতার এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণদাতার অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করবে। *এই প্রকার জিহাদের দৃষ্টান্ত উহুদ ও খন্দকের জিহাদ। এই প্রকার জিহাদে শত্রুসংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণ বা তার কম হওয়া শর্ত নয়। কারণ, উহুদ ও খন্দকে কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি ছিল। এরপরও জিহাদ ফরজ ছিল।* কারণ, এ জিহাদ করতে হয় জরুরি ভিত্তিতে এবং আক্রমণকারী শত্রুর প্রতিরোধে। এটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত (তথা ইকদামি) জিহাদ নয়।”- আলফুরূসিয়্যাতুল মুহাম্মাদিয়া ১৮৮

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মোকাবেলা করা জায়েয বরং প্রশংসনীয়

পূর্বোক্ত আলেচনা থেকে স্পষ্ট, শত্রু সংখ্যা যতই হোক, মোকাবেলা করা কাশ্মিরিদের জন্য ফরয। দ্বিগুণ বা তার কম হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য নয়। এ আলোচনা থেকে আশাকরি শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়ার মূর্খতাও স্পষ্ট। শরীয়তের এমন সুস্পষ্ট বিষয় এবং যার ব্যাপারে স্বয়ং ইবনে তাইমিয়া রহ. এর স্পষ্ট নসও বিদ্যমান (যে ইবনে তাইমিয়াকে আশ্রয় করে তারা নিজেদেরকে সালাফি দাবি করে)- এমন স্পষ্ট বিষয়কে যারা অস্বীকার করে, অপব্যাখ্যা করে: তারা কিসের সালাফি? সালাফিয়্যাত আর হাদিস হাদিস করে এরা উম্মাহকে ধোঁকায় ফেলতে চায়। তাগুতের নেক

দৃষ্টি লাভের জন্য তারা সব কিছুই করে। এদের সাথে ইবনে তাইমিয়ার কি সম্পর্ক, আর সালাফিয়্যাতেরই বা কি সম্পর্ক? এগুলো সব ধোঁকা। শুধু আল্লাহ আরশে সমাসীন কি'না, তাবিজ ব্যবহার বৈধ কি'না- এসব মাসআলার জিগির তোলে সালাফিয়্যাতের রং লাগাতে চায়। যখন কুফর বিততাগুতের কথা আসে, কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর কথা আসে- তখন মুনাফিকদের মতো এদের চোখ ছানা বড় হয়ে যায়, যেন মৃত্যুর মূর্চা শুরু হয়ে গেছে। এরা আর যাই হোক- ইবনে তাইমিয়ার সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। সালাফিয়্যাত থেকেও এরা হাজারো লাখো ক্রোশ দূরে।

যাহোক, শায়খ মূর্খতা বা স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কুরআনে কারীমের আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করে শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হলে জিহাদ নিষেধ করে দিয়েছেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ দেখিয়েছি, কুরআন সুন্নাহর আলোকে এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা আর ধোঁকা। শত্রু সংখ্যা বেশি এবং মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মোকাবেলা করা শুধু জায়েযই নয় বরং

প্রশংসনীয়। **শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কয়েকটি সূরত তুলে ধরে বলেন,**

الرجل أو الطائفة يقاتل منهم أكثر من ضعفيهم إذا كان في "
"قتالهم منفعة للدين، وقد غلب على ظنهم أنهم يقتلون

كالرجل: يحمل وحده على صف الكفار ويدخل فيهم. ويسمي العلماء ذلك: "الانغماس في العدو"؛ فإنه يغيب فيهم كالشيء ينغمس فيه فيما يغمره.

وكذلك الرجل: يقتل بعض رؤساء الكفار بين أصحابه. مثل أن يثب عليه جهرة إذا اختلسه، ويرى أنه يقتله ويغتفل بعد ذلك

والرجل: ينهزم أصحابه فيقاتل وحده أو هو وطائفة معه العدو وفي ذلك نكاية في العدو، ولكن يظنون أنهم يقتلون
فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. وليس في ذلك إلا خلافا شاذا. وأما الأئمة وغيرهما فقد نصوا على "المتبعون كـ: "الشافعي" و"أحمد وغيرهما. "جوز ذلك. وكذلك: هو مذهب: "أبي حنيفة، و"مالك ودليل ذلك: الكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة. اهـ

"মাসআলা: কোনো একক ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র একটি দল তাদের

দ্বিগুণের চেয়েও বেশি শত্রুর মোকাবেলা করা- যখন তাদের কিতালে দ্বীনের কোনো উপকার সাধিত হয়, তবে তাদের প্রবল ধারণা যে, তারা সকলে নিহত হবে;

- যেমন, কোনো ব্যক্তি একাই কাফেরদের সারিতে হামলা করে এবং তাদের ব্যূহ ভেদ করে একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ...

- এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি কাফেরদের অভ্যন্তরস্থ কোনো কাফের নেতাকে হত্যা করে। যেমন, চুপিসারে সুযোগ খুঁজতে লাগলো। যখন মনে করল যে তাকে হত্যা করতে পারবে, সকলের সম্মুখে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

- কোনো ব্যক্তির সকল সাথি পলায়ন করলো। তখন সে একাই বা ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেল। এ যুদ্ধে কাফেরদের কিছু ক্ষতি তো হবে, তবে মোটামুটি নিশ্চিত যে, তারা সকলে নিহত হবে।

চার মাযহাবের আইম্মায়ে কেরামসহ অন্য সকল ইমামের মতে এ সকল সূরত জায়েয। কিছু ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন কয়েকটি

মত ছাড়া এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। শাফিয়ি ও আহমাদসহ অন্যান্য অনুস্বরণীয় ইমাম সুস্পষ্ট বলে গেছেন যে, এগুলো জায়েয। আবু হানিফা ও মালেকসহ অন্যান্য ইমামের মাযহাবও এমনই। কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাহর সালাফগণের ইজমা এর স্বপক্ষে দলীল।"- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ২১-৩১

এর পর তিনি কুরআন সুন্নাহ থেকে এর দলীল পেশ করেন। সেখান থেকে সহজ কয়েকটি দলীল তুলে ধরছি। বিস্তারিত উক্ত রিসালায় দেখা যেতে পারে।

কুরআনে কারীম থেকে দলীল

ক. আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

"মানুষদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তাআলা (এরূপ) লোকদের প্রতি অতিশয় দয়ালু।"- বাকারা ২০৭

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন বিকিয়ে দেয়ার ব্যাখ্যা ইবনে তাইমিয়া রহ. এভাবে দেন,

وذلك يكون بأن يبذل نفسه فيما يحبه الله ويرضاه، وإن قتل أو غلب على ظنه أنه يقتل. اهـ

"তা এভাবে হবে যে, এমন পথে নিজের জীবন উৎস্বর্গ করে দেবে, যে পথ আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন ও যাতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট- যদিও মৃত্যু নিশ্চিত হয় বা প্রবল ধারণা হয় যে, সে নিহত হবে।"- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৩২

আয়াতের শানে নুযূল থেকে বিষয়টি পরিষ্কার। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وقد ذكر أن سبب نزول هذه الآية
أن صهيبا خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلحقه المشركون وهو وحده. فنثل كنانته، وقال:
والله لا يأتي رجل منكم إلا رميته. فأراد قتالهم وحده، وقال: إن أحببتم أن تأخذوا مالي بمكة فخذوه، وأنا أدلكم عليه. ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
"ربح البيع أبا يحي".

وروى أحمد بإسناده: أن رجلا حمل وحده على العدو فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: كلا بل هذا ممن قال الله فيه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ} (البقرة:207) . اهـ

"আয়াতে কারীমার শানে নুযূল প্রসঙ্গে বলা হয়:

ক. সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়ার জন্য হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় রওয়ানা দেন। মুশরিকরা তার পশ্চাদ্ধাবন করে। তখন তিনি একা মাত্র। তিনি তূণীর থেকে তীর নিলেন। বললেন, আল্লাহর কসম, যে কেউ সামনে আসবে তাকেই বিদ্ধ করবো। তিনি একাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছা করলেন এবং বললেন, যদি আমার সম্পদ নিয়ে নেয়া (এবং বিনিময়ে আমাকে নিরাপদে হিজরতে যেতে দেয়া) তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে নিতে পার। আমি তা কোথায় আছে বলে দেব। এরপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আবু ইয়াহইয়া! তোমার বিক্রি লাভেই হয়েছে'।

খ. ইমাম আহমাদ রহ. নিজ সনদে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি একাই শত্রু বাহিনির উপর আক্রমণ করলো। তখন কিছু লোক বলতে লাগলো, লোকটি নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করেছে। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু (তাদের কথা প্রত্যাখান করে) বললেন, কিছুতেই নয়! বরং সে তো ঐসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'মানুষদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তাআলা (এরূপ) লোকদের প্রতি অতিশয় দয়ালু'।"-
কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৩১-৩২

খ. আল্লাহ তাআলার বাণী-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ্ মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে। অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত,

ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী কে আছে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সাথে) যে লেন-দেন করেছো, তার উপর আনন্দিত হও। আর এটাই মহা সাফল্য।"- তাওবা ১১১

আল্লাহ তাআলা যখন জান-মাল কিনে নিয়েছেন, তখন তা আল্লাহর হাতে সমর্পণ করতে হবে। **ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,**

فإن المشتري يسلم إليه ما اشتراه، وذلك ببذل النفس والمال في سبيل الله وطاعته، وإن غلب على ظنه أن النفس تقتل والجواد يعقر، فهذا من أفضل الشهادة. اهـ

"কেননা, ক্রেতা যা ক্রয় করেছে, তা তার তাতে সমর্পণ করে দিতে হবে। আর তা এভাবে হবে যে, জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় ও তার আনুগত্যে উৎস্বর্গ করবে- যদিও প্রবল ধারণা হয় যে, তার প্রাণ সংহার হবে এবং ঘোড়া কাটা পড়বে। আর এটাই শাহাদাতের সর্বশ্রেষ্ট পন্থা (যেমনটা হাদিসে এসেছে)।"- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৩৩

এরপর ইবনে তাইমিয়া রহ. বেশ কিছু আয়াত থেকে বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় আমরা সেগুলো এখন উল্লেখ করছি না।

(ইনশাআল্লাহ চলমান)

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৬

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মোকাবেলা করা জায়েয বরং প্রশংসনীয়

সুন্নাহ থেকে দলীল

ক. বদরের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল তিনশোর চেয়ে কিছু বেশি, পক্ষান্তরে শত্রু সংখ্যা ছিল তিনগুণ বা তারও

বেশি।

খ. উহুদ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সাতশোর মতো, পক্ষান্তরে শত্রু সংখ্যা ছিল তিন হাজারের মতো।

গ. খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের সম্মিলিত জোটে সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাজারের অধিক, যা সাহাবায়ে কেরামের কয়েক গুণ।

ঘ. অনেক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতেই কোনো কোনো সাহাবি একা একা কাফের বাহিনির উপর হামলা করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশংসা করতেন।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فعلم: أن القوم يشرع لهم أن يقاتلوا من يزيدون على ضعفهم، ولا فرق في ذلك بين الواحد والعدد، فمقاتلة الواحد لثلاثة كمقاتلة الثلاثة للعشرة. اهـ

“বুঝা গেল, শত্রু বাহিনি দ্বিগুণের বেশি হলেও কিতাল জায়েয। এক্ষেত্রে একক ব্যক্তি জামাতের মাঝে কোন তফাৎ নেই। কেননা, এক ব্যক্তি তিনজনের মোকাবেলা করা তিন ব্যক্তি

মিলে দশজনের মোকাবেলা করারই মতো।"- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৪৫

৬. আসিম ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা। ইমাম বুখারি রহ. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من مائتي رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا .

قال عاصم بن ثابت أمير السرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن في هؤلاء لأسوة يريد القتلى فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোয়েন্দাগিরির জন্য দশ সদস্যের একটি সারিয়্যা পাঠান। আসিম ইবনু সাবিত আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের আমীর নির্ধারণ করেন। তারা রওয়ানা হন। উসফান ও মক্কার মধ্যস্থ হাদআ নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন, হুজাইল গোত্রের বনু লিহইয়ান কবিলার কানে তাদের সংবাদ গেল। প্রায় দু’শো লোক, যাদের প্রত্যেকেই দক্ষ তীরন্দাজ ছিল, তাদেরকে ধরার জন্য রওয়ানা দিল। ... আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গীগণ যখন এদেরকে দেখলেন, একটি উঁচু স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। লোকেরা চতুর্দিক থেকে তাদেকে ঘিরে ফেলল। বললো, ‘নেমে এস। আত্মসমর্পণ কর। আমরা অঙ্গিকার করছি, তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না’।

সারিয়্যার আমীর আসিম ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আর যাই হোক, আল্লাহর কসম! আজকের দিনে আমি কোনো কাফেরের আশ্রয়ে নামবো না। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সংবাদ আপনার নবীর কাছে পৌঁছে দিন’। এতে কাফেররা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সাতজনকে হত্যা করল। বাকি তিনজন অঙ্গিকার মতো নিচে নেমে এলেন। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনু দাসিনা রাদিয়াল্লাহু আনহু

এবং আরেকজন। যখন কাফেররা তাদেরকে বাগে পেল, তাদের তীরের রশিগুলো কেটে দিল এবং তাদেরকে বেঁধে ফেল। তখন তৃতীয়জন বললেন, ‘এই তো প্রথম গাদ্দারি। আল্লাহর কসম আমি তোমাদের সাথে যাব না। ঐসব (নিহত) সঙ্গীদের মাঝে গ্রহণ করার মতো আদর্শ আমার জন্য আছে (অর্থাৎ আমিও তাদের মতো শহীদ হয়ে যাব)’। কাফেররা তাকে টেনে হেঁচড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু তিনি কোনো মতেই গেলেন না। ফলে তারা তাকে হত্যা করে দিল এবং খুবাইব ও ইবনু দাসিনা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে নিয়ে চললো। অবশেষে বদরের পর মক্কায় তাদেরকে বিক্রি করে দিল।”- সহীহ বুখারি ২৮৮০

দীর্ঘ হাদিস। এরপর খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করার ঘটনা এবং আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশ মৌমাছির দ্বারা সংরক্ষণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فهؤلاء عشرة أنفس قاتلوا أولئك المائة أو المائتين، ولم يستأسروا ثم لما استأسروا الثلاثة امتنع الواحد .لهم حتى قتلوا منهم سبعة من إتباعهم حتى قتلوه. اهـ

“এই যে এরা মাত্র দশজন লোক। ঐ একশো বা দুইশো লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আত্মসমর্পণ করেননি। এভাবে তাদের সাতজন শহীদ হয়েছেন। এরপর যখন তিনজন আত্মসমর্পণ করলেন, একজন তাদের সাথে চলতে অস্বীকৃতি জানালেন, ফলে তারা তাকেও হত্যা করে দিল।”- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৫২

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (৪৯০হি.) বলেন,

ولا بأس بالصبر أيضا بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء النفس في التهلكة، بل في هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى، فقد فعله غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -، منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر، وأثنى عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فعرفنا أنه لا بأس به.اهـ

“ময়দানে টিকে থাকতেও কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু কতক লোক এর বিপরীত কথা বলে। তারা বলে, এটা না’কি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। তাদের কথা

সঠিক নয়। বরং এ তো হচ্ছে বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়া। অনেক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম এমনটা করেছেন। হযরত আসিম ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরই একজন। যাকে মৌমাছি দিয়ে হেফাযত করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণে তাদের প্রশংসা করেছেন। বুঝা গেল, এতে কোন অসুবিধে নেই।”- শরহুস সিয়ারিল কাবীর ১/ ৮৫

ইবনে তাইমিয়া রহ. এছাড়াও আরো দলীল পেশ করেছেন। আলোচনা সংক্ষেপণার্থে আমরা আর সামনে বাড়বো না। যতটুকু উল্লেখ করেছি, সত্যানুসন্ধানীর জন্য এতেই অনেক খোরাক আছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্য বুঝার ও মেনে চলার তাওফিক দান কর!

(চলমান)

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৭

♣ ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা

দুর্বলতার হালতে জিহাদ করাকে শায়খ ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা তথা আত্মহত্যার নামান্তর এবং হারাম বলেছেন। এ ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এতক্ষণ যথেষ্ট আলোচনা করেছি। এবার শুধু ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা- এর স্বরূপটা তুলে ধরার চেষ্টা করবো, যাতে পাঠকগণ বুঝতে পারেন যে, ইয়াহুদি চরিত্রের এসব আলেম কত ধোঁকাবাজ। শরীয়তের সুস্পষ্ট বিষয়গুলোকেও এরা কিভাবে বিকৃত করে যাচ্ছে।

ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা প্রমাণ করতে তারা সূরা বাকার এ আয়াতটির অপব্যাখ্যা করে,

{ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}

“তোমরা (অকাতরে) আল্লাহর রাস্তায় (অর্থ-সম্পদ) ব্যয় কর। (অর্থ-সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজ হাতে নিজেদেরকে

ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না। আর ইহসান (সুকর্ম) কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিন(সুকর্মশীল)দের ভালোবাসেন।”- বাক্বারা: ১৯৫

আল্লাহ তাআলা বলছেন,

তোমরা যদি অর্থ-সম্পদ অর্জনের দিকে মনোনিবেশ কর, সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখ, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে তা ব্যয় না কর, তাহলে কাফেররা তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবে। জিহাদ ছেড়ে অর্থ-সম্পদের দিকে মনোনিবেশ করে নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযি রহ. বর্ণনা করেন-

عن أبي عمران التجيبي قال: "غزونا من المدينة نريد القسطنطينية , وعلى أهل مصر عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأخرج

الروم إلينا صفا عظيما منهم وألصقوا ظهورهم بحائط المدينة فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر , فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم , فصاح الناس وقالوا: مه , مه؟ , لا إله إلا الله , يلقي بيديه إلى التهلكة فقام , أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل , وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار , لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه , قال بعضنا لبعض - سرا دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أموالنا قد ضاعت , وإن الله قد أعز الإسلام , وكثر ناصروه فأنزل الله على , , فلو أقمنا في أموالنا , فأصلحنا ما ضاع منها نبيه - صلى الله عليه وسلم - يرد علينا ما قلنا: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} فكانت التهلكة أن نقيم قال أبو عمران: فلم يزل .في أموالنا ونصلحها , وندع الجهاد أبو أيوب شاخصا يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية"
[جامع الترمذي: 2972]

“আবু ইমরান আত-তুজিবি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুসতুনতুনিয়ার জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলাম। তখন মিশরের গভর্নর ছিলেন হযরত উকবা ইবনু আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু। আমাদের জামাতের আমির

ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনু খালেদ বিন ওয়ালিদ রহ.। রোমবাসী আমাদের বিরুদ্ধে তাদের বিশাল এক বাহিনী পাঠাল। তারা নগরপ্রাচীরকে পশ্চাতে রেখে যুদ্ধের সারি সাজালো। তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের থেকে তেমনই কিংবা তার চেয়েও বড় এক বাহিনী বের হল। মুসলমানদের এক ব্যক্তি রোমানদের বিশাল সারিতে একাই হামলা করে বসল এবং তাদের সারির একেবারে ভেতরে প্রবেশ করে গেল (যার ফলে তার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল)। তখন লোকজন চিৎকার করে বলতে লাগলো- '(কি কর?) থাম! থাম! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এ ব্যক্তি নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করছে।' তখন আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'ওহে লোক সকল! তোমরা এ আয়াতের এই ব্যাখ্যা করছো? (তোমাদের ব্যাখ্যা সঠিক নয়।) এ আয়াত তো আমরা আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন ইসলামকে শক্তিশালী করলেন, তার সাহায্যকারীও অনেক হয়ে গেল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগোচরে আমাদের একে অপরকে বললো- আমাদের ধন-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে গেল। এদিকে আল্লাহ তাআলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীও তৈয়ার হয়েছে অনেক। আমরা যদি (কিছু

দিন জিহাদ বন্ধ রেখে) আমাদের ধন-সম্পদের কাছে অবস্থান করে সেগুলোর পরিচর্যা করতাম (তাহলে ভাল হতো না?)! তখন আমাদের এই মতামতকে প্রত্যাখান করে আল্লাহ তাআলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ আয়াত নাযিল করলেন-

{وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}

"তোমরা (অকাতরে) আল্লাহর রাস্তায় (অর্থ-সম্পদ) ব্যয় কর। (অর্থ-সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না।"

অতএব, ধ্বংসে নিক্ষেপ করার অর্থ- জিহাদ ছেড়ে আমাদের ধন-সম্পদের পরিচর্যায় লিপ্ত হওয়া।'

আবু ইমরান রহ. বলেন, এরপর আবু আইয়ূব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু জিহাদ করতে থাকেন। অবশেষে যখন শহীদ হলেন, কুসতুনতুনিয়ায় তাকে দাফন করা হয়।"- জামে তিরমিযি: হাদিস নং ২৯৭২

পাঠক দেখুন! আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি আর দরবারিরা কি

ব্যাখ্যা করছে!!

***

খোলাসা

- ইসলামের শুরু যামানায় শত্রু সংখ্যা দশগুণ হলেও মোকাবেলা করা ফরয ছিল।

- দুর্বল হিম্মতের মুসলমানদের প্রতি লক্ষ রেখে আল্লাহ তাআলা এ সীমা কমিয়ে দ্বিগুণে নিয়ে এসেছেন। শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণ হলে মোকাবেলা করতে হবে। এর বেশি হলে ফরয নয়।

- ফরয না হলেও মুস্তাহাব এবং আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়।

- উপরোক্ত আয়াত ইকদামি জিহাদের বেলায় প্রযোজ্য। দিফায়ী জিহাদের বেলায় শত্রু সংখ্যা যত বেশিই হোক, সামর্থ্যানুযায়ী মোকাবেলা করতে হবে। যেমনটা উহুদ ও খন্দকে আমরা দেখেছি।

- নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মোকাবেলা করা এবং জীবন দিয়ে দেয়া জায়েয বরং আল্লাহ তাআলার কাছে প্রসংশনীয়। যেমনটা আসিম ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গী সাহাবাগণ করেছেন।

- শত্রুর ভয়ে জিহাদ পরিত্যাগ করা মুনাফিকি।

- নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কিতাল করা ও জীবন দিয়ে দেয়া 'ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা' নয়। 'ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা' হল জিহাদ ও জিহাদে সম্পদ ব্যয় করা পরিত্যাগ করা।

***

কাশ্মিরিদের উপর জিহাদ ফরযে আইন

উপরোক্ত আলোচনার পর স্পষ্ট, বর্তমান কাশ্মিরের পরিস্থিতি খন্দক যুদ্ধের মতো। মুশরিকরা চতুর্দিক থেকে তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় তাদের উপর প্রতিরোধ ফরযে আইন। যে যেভাবে পারে প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধ

করতে গিয়ে যারা নিহত হবে তারা শহীদ বলে গণ্য হবে- যদি জাতীয়তাবাদি চেতনা না থাকে। যারা সামর্থ্যানুযায়ী প্রতিরোধ না করবে, তারা মদীনার মুনাফিকদের মতোই তিরস্কারের যোগ্য এবং ফরযে আইন তরকের গুনাহয় লিপ্ত। আর বহির্বিশ্বের মুসলমানদের উচিৎ সামর্থ্যানুযায়ী সহায়তা করা। এ ব্যাপারে শায়খের বিভ্রান্তির খণ্ডনে আমরা সামনে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবো।

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৮

♣ সংশয়.ক: আক্রান্তরা না দাঁড়ালে কি বাকিদের উপর ফরয নয়?

♣ সংশয়.খ: পার্শ্ববর্তীরা সহযোগিতা না করলে কি পরবর্তীদের উপর ফরয নয়?

ফিকহের কিতাবাদিতে এ দু'টি সংশয়ের জওয়াব এক জায়গায় বরং একই লাইনে দেয়া হয়েছে। আমরাও তাই

একসাথেই আলোচনা করবো।

সংশয়: শায়খ বলছেন,

- কাশ্মিরিরা যদি জিহাদে না দাঁড়ায়, তাহলে তাদের সহায়তার জন্য যাওয়া অন্য মুসলিমদের কোন দায়িত্ব নয়, বরং হারাম।

- কাশ্মিরিদের সহায়তা করার প্রথম দায়িত্ব পাকিস্তানের। তারা না করলে পরবর্তীদের জন্য সাহায্যে যাওয়া হারাম।

(লক্ষ্যণীয়, শায়খ কিন্তু কাশ্মিরিরা জিহাদে দাঁড়ালে নাজায়েয হবে বলেছেন। কারণ, ভারতের সৈন্য অনেক বেশি। আবার বলছেন, তারা না দাঁড়ালে বাহিরের মুসলমানরা যেতে পারেবে না। গেলে হারাম হবে। এক দিকে কাশ্মিরিরা দাড়ালে হারাম হবে, অপরদিকে বাইরের মুসলমান গেলেও হারাম হবে। ভিতর থেকেও জিহাদ হারাম, বাহির থেকেও জিহাদ হারাম। মুসলমানকে যাতাকলে পিষে ফেলার স্বপক্ষে এমন ফতোয়া মনে হয় কাফের বিশ্ব কমই পেয়ে থাকে।)

শায়খের এ দু'টো সংশয় দেখে বড়ই অবাক হতে হলো। কিতাবুল জিহাদের প্রথম দিকের কিছু পৃষ্ঠাও যাদের পড়া আছে, তারাও অবাক না হয়ে পারবে না। বুঝলাম না যে, আহকামুস সিয়ারের ব্যাপারে শায়খ কি আসলেই এতোটা অজ্ঞ? না'কি শায়খ উপরের নির্দেশে সত্যকে মিথ্যা বানাচ্ছেন? স্বার্থপরতা বা হুমকি ধমকি কি উম্মাহকে গোমরাহ করার পথে টেনে নিয়েছে শায়খকে? আল্লাহ মা'লূম। আমি প্রথমে ফিকহের কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরছি-

বিভিন্ন কিতাবের বরাতে আল্লামা ইবনু আবিদিন শামী রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم. فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا: فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. اهـ

“যদি শত্রুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে (প্রথমত) জিহাদ ফরজে আইন হয় ঐসব মুসলমানের উপর, যারা শত্রুর সবচেয়ে নিকটবর্তী। আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে, (শত্রু প্রতিহত করতে) যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে তাদের উপর জিহাদ (ফরজে আইন নয়; বরং) ফরজে কেফায়া। এ অবস্থায় তাদের জিহাদে শরীক না হওয়ার অবকাশ থাকে। তবে শত্রুর নিকটে যারা রয়েছে, তারা যদি শত্রু প্রতিরোধে অপারগ হয় বা অলসতাবশত জিহাদ না করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে; যেমন নামাজ-রোজা ফরজে আইন। তখন তাদের জন্য জিহাদ না করার কোনো অবকাশ থাকে না। এভাবে তার পরের এবং তার পরের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে মাশরিক-মাগরিব; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।”- রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৪

আল্লামা ইবনু নুজাইম মিসরী রহ. (৯৭০ হি.) বলেন,

المراد هجومه على بلدة معينة من بلاد المسلمين فيجب على جميع أهل تلك البلدة، وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية، وكذا من يقرب ممن يقرب إن لم يكن ممن يقرب كفاية أو تكاسلوا وعصوا وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الاسلام شرقا وغربا. اهـ

"এখানে উদ্দেশ্য হল, কোনো নির্দিষ্ট মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ। তখন সে এলাকার সকলের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে। যদি তারা যথেষ্ট না হয়, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর একই হুকুম বর্তাবে। যদি তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানরাও যথেষ্ট না হয় অথবা (আল্লাহর) নাফরমানী করে অলসতা করে (জিহাদ না করে), তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর এই হুকুম বর্তাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে পূর্ব থেকে পশ্চিম; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে।"- আলবাহরুর রায়েক ১৩/২৮৯

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (৪৫৬হি.) বলেন,

ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم: أن يقصدهم مغيثا لهم . اهـ

"পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদ বৈধ হবে না। তবে শত্রুরা কোনো মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করলে তখন যে ব্যক্তিই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম, তার উপরই ফরজ তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।"- আলমুহাল্লা ৫/১২২

দাগ দেয়া অংশটুকু লক্ষ করুন-

- আক্রান্তদের ব্যাপারে ইবনে আবিদিন রহ. এর বক্তব্য: আক্রান্তরা 'যদি শত্রু প্রতিরোধে অপারগ হয় বা অলসতাবশত জিহাদ না করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে; যেমন নামাজ-রোজা ফরজে আইন'।

- পার্শ্ববর্তীরা সহায়তা না করলে ইবনু নুজাইম রহ. এর বক্তব্য: যদি তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানরাও যথেষ্ট না হয়

অথবা (আল্লাহর) নাফরমানী করে অলসতা করে (জিহাদ না করে), তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর এই হুকুম বর্তাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে পূর্ব থেকে পশ্চিম; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে’।

পরিষ্কার যে, আক্রান্তরা যদি অলসতা করে জিহাদ না করে তাহলে অন্যদের উপর ফরযে আইন। তদ্রূপ পার্শ্ববর্তীরা যদি অলসতা করে জিহাদ না করে তাহলে অন্যদের উপর জিহাদ ফরযে আইন। আর ইবনে হাযমের বক্তব্য তো আরো স্পষ্ট। যেই সহায়তা করতে সক্ষম তাকেই সহায়তা করতে হবে।

বক্তব্যগুলোর সাথে শায়খের বক্তব্য মিলেয়ে দেখুন। শায়খ কি এসব বক্তব্য দেখেননি? না দেখে থাকলে এ ব্যাপারে কথা বলার আগে অন্তত ফিকহের দুয়েকটি কিতাব পড়ে দেখার দরকার ছিল। আর যদি দেখে থাকেন, তাহলে তো স্পষ্টই ধোঁকাবাজি।

***

তায়েফায়ে মানসূরা: বিভ্রান্তির নিরসন, বাস্তবতার উন্মোচন

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد ...

কিছু দিন যাবৎ কয়েকটা আইডি থেকে জিহাদি তানজীম নাজায়েজ প্রমাণ করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। দুয়েকজন ব্যক্তির পদস্খলনসহ দুয়েকটি হাদিস ও আইম্মায়ে কেরামের কিছু বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ অপপ্রয়াস চালানো হয়েছিল। আলহামদু লিল্লাহ! ফোরামের হকপন্থী ভাইদের প্রতিবাদ ও খণ্ডনের সামনে এ প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আসলে আল্লাহ তাআলা যখন পরিবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন শত বাধাও তা ঠেকাতে পারে না। আল্লাহ তাআলা উম্মাহর সন্তানদের মাঝে – বিশেষত যুবকদের মাঝে – এমন এক জোয়ার সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, বাতিল তাতে কচুরিপানার মতো ভেসে যেতে বাধ্য। ফালিল্লাহিল হামদ। বিশেষ করে হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস এবং হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর বক্তব্যের ভুল ব্যাখার মাধ্যমে এ প্রয়াস চলেছিল। আলহামদু লিল্লাহ! আমরা হাদিসের সহীহ

ব্যাখ্যা এবং হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর বক্তব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য তুলে ধরেছি। জিহাদি তানজীম গঠন জায়েয, বরং আবশ্যক হওয়ার দলীল প্রমাণও তুলে ধরেছি। এরপর আশাকরি ভাইদের মাঝে কোন সন্দেহ থাকবে না।

সংশয় সৃষ্টিকারীদের খণ্ডনকল্পে তাদের কাছে কিছু ইলজামি প্রশ্ন করা হয়েছিল। তারা সেগুলোর কোনটারই কোন সহীহ জওয়াব দিতে সমর্থ্য হয়নি। **প্রশ্নগুলো মৌলিকভাবে এরকম ছিল:**

ক. জিহাদের অসংখ্য আয়াত ও হাদিসের কি ব্যাখ্যা?

খ. উম্মাহর উপর কাফেরদের আগ্রাসন হলে জিহাদ ফরযে আইন- এর কি ব্যাখ্যা?

গ. শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয- এর কি ব্যাখ্যা?

ঘ. তায়েফায়ে মানসূরার হাদিস; তথা যেসব হাদিসে এসেছে যে, একটা দল সব সময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কিতাল করতে থাকবে- এগুলোর কি ব্যাখ্যা?

ঙ. খেলাফত না থাকার সময়ে যেসব জিহাদ হয়েছে – বিশেষত তাতারদের বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে – সেগুলোর কি বিধান?

মৌলিকভাবে এ প্রশ্নগুলো তাদের করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর কোন জওয়াব দিতে পারেনি। অবশেষে মূল প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য একটি বিষয়ে সংশয় সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছে। সেটা হল, তায়েফায়ে মানসূরার হাদিস। আমরা বলেছিলাম, তায়েফায়ে মানসূরা একটা দল সব সময় হকের উপর থেকে কিতাল করতে থাকবে। এটা দলীল যে, খেলাফত না থাকার সময়েও জিহাদি তানজীম গঠন করা যাবে। সংশয় সৃষ্টিকারীরা এতে আপত্তি জানিয়ে বিষয়টিকে ভিন্ন দিকে ঘুরানোর চেষ্টা করেছে। হাদিসে যদিও স্পষ্ট এসেছে যে, তায়েফায়ে মানসূরা যে দলটি হবে, সেটি একটি জিহাদি দল- এতদসত্ত্বেও তারা দাবি করছে, তায়েফায়ে মানুসূরা কোন জিহাদি দল নয়। বরং তায়েফায়ে মানসূরা হচ্ছে, আলেম উলামা। তারা এ দাবিটি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে করেছে এবং আমাদের উপর আপত্তি করেছে যে, আমরা সালাফের ব্যাখ্যা প্রত্যাখান করে নিজে থেকে মনমতো

ব্যাখ্যা করছি।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, তানজীম বৈধ হওয়ার ব্যাপারে শুধু তায়েফায়ে মানসূরার হাদিসই দলীল নয়। এর পক্ষে অনেক দলীল প্রমাণ আছে, যেগুলো ফোরামে আলোচিত হয়েছে। এতএব, তায়েফায়ে মানসূরার হাদিস যদি বাদও দিই, তাহলেও আমাদের দাবিতে কোন ফরক পড়ে না। তবে যেহেতু একটা ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে এবং বিষয়টি জিহাদের সাথে বিশেষভাবে সম্পক্ত, এ কারণে এর সহীহ ব্যাখ্যা তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। যাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, যেন তিনি আমাকে প্রকৃত বাস্তবতা উন্মোচন করে সত্যটি ফুটিয়ে তোলার তাওফিক দান করেন।

তায়েফায়ে মানসূরা কারা?

তায়েফায়ে মানসূরার ব্যাপারে যেসব হাদিস এসেছে, সেগুলো

অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। অর্থাৎ এ বিষয়ে বিভিন্ন সাহাবী থেকে – বলা হয় ২০ জন সাহাবী থেকে – এত অধিক পরিমাণ হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত তায়েফায়ে মানসূরা একটা দল কেয়ামত অবধি দুনিয়াতে বিদ্যমান থাকবে।

জিহাদ ছাড়া কি তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব?

সংশয়বাদিদের দাবি হচ্ছে, তায়েফায়ে মানসূরা মূলত কোন জিহাদি দল নয়। তায়েফায়ে মানসূরা হচ্ছে: উলামা, ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন প্রমুখ। কিন্তু সাধারণ আরবী বুঝে এমন কোন ব্যক্তিও যদি তায়েফায়ে মানসূরার হাদিসগুলোর দিকে তাকায়, তাহলে অনায়াসে বুঝতে পারবে, তায়েফায়ে মানসূরা মূলত একটা জিহাদি দল। তারা হকের উপর থেকে কিতাল করতে থাকবে। তাদের মাঝে উলামা, ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন, সাধারণ মুসলমান- সকলেই থাকতে পারেন। সকলে মিলেই এ তায়েফায়ে গঠিত। জিহাদের দায়িত্ব

আঞ্জাম দেয়ায় রত। যারা জিহাদে জড়িত নন- তারা উলামা, ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন যাই হোন না কেন, তায়েফায়ে মানসূরা নন। তারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত এবং হকপন্থী হতে পারেন, কিন্তু তায়েফায়ে মানসূরা নন। তায়েফায়ে মানসূরা উম্মাহর আহলুস সুন্নাহর একটা অংশ। আহলুস সুন্নাহর সকলেই তায়েফায়ে মানসূরা নন। আহলুস সুন্নাহর যারা হক জিহাদে লিপ্ত, তারাই কেবল তায়েফায়ে মানসূরা। অন্যরাও আহলুস সুন্নাহ এবং হকপন্থী, কিন্তু তায়েফায়ে মানসূরা নন। তায়েফায়ে মানসূরা হতে হলে জিহাদে জড়িত হতে হবে। হাদিসে বিষয়টা সুস্পষ্ট।

সারকথা:

- তায়েফায়ে মানসূরা আহলুস সুন্নাহর একটা অংশ। আহলুস সুন্নাহর সকলেই তায়েফায়ে মানসূরা নন। আহলুস সুন্নাহর যারা হক জিহাদে জড়িত, তারাই কেবল তায়েফায়ে মানসূরা।

- কেউ তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি আহলুস সুন্নাহ ও আহলে হক থেকে বহিষ্কৃত। যদি আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ভিন্ন কোন কারণ না

থাকে, তাহলে তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হয়েও আহলুস সুন্নাহ হতে পারেন।

তায়েফায়ে মানসূরা সংক্রান্ত হাদিস

উপরোক্ত কথাগুলো বুঝার পর আমরা তায়েফায়ে মানসূরা সংক্রান্ত কিছু হাদিসের দিকে নজর দিই। ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিমের কিতাবুল ইমারাতে এ সংক্রান্ত অনেকগুলো হাদিস উল্লেখ করেছেন। কিতাবুল ঈমানেও একটি হাদিস এনেছেন। প্রথমে সহীহ মুসলিমের হাদিসগুলো উল্লেখ করছি। তারপর অন্যান্য কিতাব থেকে কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করছি।

হাদিস ১:

« لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة - قال - فينزل عيسى ابن مريم -صلى الله عليه وسلم- فيقول أميرهم تعال صل لنا. فيقول لا. إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة ».

“আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। (তাদের শত্রুদের উপর) হবে প্রতাপশালী। (এই ধারাবাহিকতা চলতে চলতে) অবশেষে ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম (তাদের মাঝে) অবতরণ করবেন। তখন তাদের আমীর (অর্থাৎ ইমাম মাহদি) তাঁকে বলবেন, ‘আসুন, আমাদের নিয়ে নামায পড়ান।’ তিনি বলবেন, না। তোমরা নিজেরাই পরস্পর পরস্পরের আমীর। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ উম্মতের সম্মানস্বরূপ।” – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং ৪১২

হাদিস ২:

« لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة ».

“এ দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (কারণ,) কেয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের একটা দল বিজয়ী বেশে (দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে) কিতাল করতে থাকবে।” – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬২

হাদিস ৩:

« لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ».

"আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। (তাদের শত্রুদের উপর) হবে প্রতাপশালী।" – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬৩

হাদিস ৪:

« من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة »

"আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনি ইলমের সঠিক বুঝ দান করেন। আর মুসলমানদের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের বিরোধীদের উপর হবে প্রতাপশালী।" – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬৫

হাদিস ৫:

« لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك ».

"আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে আল্লাহর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের শত্রুদের উপর হবে প্রতাপশালী। তাদের বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের উপর কেয়ামত আসা পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬৬

এগুলো মুসলিম শরীফের হাদিস। সবগুলো হাদিসেই এসেছে যে, তারা কিতাল করতে থাকবে।

ইমাম আবু দাউদ রহ. বর্ণনা করেন,

হাদিস ৬:

« لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال ».

“আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের বিরোধীদের উপর হবে প্রতাপশালী। (এ ধারাবাহিকতা চলতে চলতে) তাদের সর্বশেষ দলটি মাসিহে দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে।” – সুনানে আবু দাউদ, বাবু: ফি দাওয়ামিল জিহাদ, হাদিস নং ২৪৮৬

ইমাম নাসায়ী রহ. বর্ণনা করেন,

হাদিস ৭:

عن سلمة بن نفيل الكندي قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا الآن الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة [المجتبى من السنن للنسائي: 3561]

“হযরত সালামা ইবনে নুফাইল আলকিন্দি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকজন ঘোড়া গুটিয়ে নিয়েছে। অস্ত্র রেখে দিয়েছে। বলছে, এখন আর কোন জিহাদ নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চেহারা মোবারকসমেত আমাদের দিকে ফিরে ইরশাদ করলেন, ‘তারা ভুল বলেছে। এখন তো মাত্র কিতালের যামানা শুরু হল। আমার উম্মতের একটা দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বদা কিতাল করতে থাকবে। তাদের সাথে কিতালের জন্য আল্লাহ তাআলা কতক সম্প্রদায়ের অন্তর ঘুরিয়ে দেবেন এবং এদের থেকে তাদেরকে রিযিক দেবেন। কিয়ামত অবধি এবং আল্লাহ তাআলার ফায়সাকৃত বিষয়টি (তথা কেয়ামতের আগে যে বাতাসের দ্বারা মু’মিনগণের মৃত্যু হবে সেটি) আসা পর্যন্তই এই ধারাবাহিকতা চলবে। আর (শুনে রাখ,) কিয়ামত অবধিই ঘোড়ার অগ্রকেশে কল্যাণ নিহিত রাখা হয়েছে’।” – সুনানে নাসায়ী (সুগরা); হাদিস নং ৩৫৬১

উপরোক্ত সবগুলো হাদিসেই আমরা দেখেছি, তায়েফায়ে

মানসূরার বিশেষ যে সিফাতটি বলা হয়েছে, তা হলো, তারা কিতাল করতে থাকবে। অতএব, কিতালবিহীন কোন দল তায়েফায়ে মানসূরা হতে পারে না। সামনে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ।

***

তায়েফায়ে মানসূরার উপরোক্ত হাদিসগুলো দেখার পর এবার আমরা এগুলো থেকে সাব্যস্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করবো:

এক.

হকপন্থী একটা দল সর্বদাই জিহাদ করতে থাকবে

তায়েফায়ে মানসূরার উপরোক্ত হাদিসগুলোতে এ কথাটি দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, হকপন্থী একটা দল সর্বদাই কিতালরত থাকবে। খেলাফত থাকুক বা না থাকুক, সর্বাবস্থায় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দল কিতাল করতে থাকবে।

পূর্বোক্ত ২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল মালাক রহ. (৮৫৪ হি.) বলেন,

لا يخلو وجه الأرض من الجهاد إن لم يكن في ناحية يكون في ناحية أخرى. اهـ

"ভূপৃষ্ঠ কখনোই জিহাদশূন্য হবে না। এক ভূখণ্ডে না হলে অন্য ভূখণ্ডে হবে।" – শরহুল মাসাবিহ লি ইবনিল মালাক: ৪/৩১২

আল্লামা তিবি রহ. (৭৪৩ হি.) বলেন,

وفيه معجزة ظاهرة؛ فإن هذا الوصف لم يزل بحمد الله تعالي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلي الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله تعالي. اهـ

"এ হাদিস একটি সুস্পষ্ট মু'জিযা। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানা থেকে এখন পর্যন্ত সর্বদাই এই

অবস্থাটি চলে আসছে এবং আল্লাহ তাআলার ফায়সাকৃত বিষয়টি (তথা কেয়ামতের আগে যে বাতাসের দ্বারা মু'মিনগণের মৃত্যু হবে সেটি) আসা পর্যন্ত চলতেই থাকবে।" – আলকাশিফ আন হাকায়িকিস সুনান; পৃষ্ঠা ২৬৩২

উপরোক্ত ৬ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

((يقاتل آخرهم المسيح الدجال)) أي لا تنقطع تلك الطائفة المنصورة، بل تبقى إلي أن يقاتل آخرهم الدجال. اهـ

"তাদের সর্বশেষ দলটি মাসিহে দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে। অর্থাৎ ঐ তায়েফায়ে মানসূরা কখনোও বিলুপ্ত হবে না। বরং তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সাথে কিতাল করা পর্যন্তই তারা বিদ্যমান থাকবে।" – আলকাশিফ আন হাকায়িকিস সুনান; পৃষ্ঠা ২৬৪৪

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন,

لا يخلو زمان إلا وتوجد فيه تلك الطائفة القائمة على الحق. اهـ

“কোনো যামানাই উক্ত তায়েফাশূন্য হবে না। প্রত্যেক যামানাতেই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত উক্ত তায়েফাটি বিদ্যমান থাকবে।” – ফায়জুল বারী; ১/১৭১, কিতাবুল ইলম, বাব: মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ..., ছাপা: আলমাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেউবন্দ

খেলাফত না থাকাবস্থায় জিহাদি তানজীম বৈধ

তায়েফায়ে মানসূরার হাদিস এবং মুহাদ্দিসিনে কেরামের ব্যাখ্যা থেকে দেখলাম, একটা হকপন্থী দল সর্বদা জিহাদ করতেই থাকবে। অপরদিকে বিভিন্ন হাদিস থেকে প্রমাণিত, এমন এক সময় আসবে, যখন খেলাফত থাকবে না। যেমন, বর্তমানে নেই। উভয় শ্রেণীর হাদিস সমন্বয় করলে ফলাফল দাঁড়ায়, খেলাফত না থাকাবস্থায়ও একটা হকপন্থী দল কিতালরত থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, খেলাফত না থাকাবস্থায়

জিহাদি তানজীম গঠন ও তাতে যোগ দেয়া বৈধ। এমন সুস্পষ্ট বিষয়টি যারা অস্বীকার করতে চায়, তাদের জন্য বড়ই আপসোস!

দুই.

তায়েফায়ে মানসূরা আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে পরিচালিত

হাদিসে তায়েফায়ে মানসূরার বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে যে, তারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কেয়ামত অবধিই তারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ থেকে স্পষ্ট যে, তারা কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত আহলুস সুন্নাহর একটা জামাত হবে। এও স্পষ্ট যে, হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হলে হক বুঝা জরুরী। অতএব, তায়েফায়ে মানসূরা এমন একটি দল হবে, যাদের মাঝে দ্বীনের

সঠিক বুঝসম্পন্ন আহলুস সুন্নাহর বিশিষ্ট আলেম উলামা, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফুকাহা থাকবেন, যারা এ দলটিকে সর্বদা হকের উপর পরিচালিত করবেন। এ থেকে স্পষ্ট, আহলুস সুন্নাহর বহির্ভূত – যেমন, রাফেজি, খারেজী, মু'তাজেলী, মুরজিয়া ইত্যাদি - বিদআতি ফেরকা তায়েফায়ে মানসূরা হতে পারবে না। এ হিসেবেই সালাফের অনেকে বলেছেন, তায়েফায়ে মানসূরা হচ্ছে- আহলে ইলম, আহলুস সুন্নাহ ও মুহাদ্দিসিনে কেরাম। যেমন,

ইমাম বুখারী রহ. বলেন,

هم أهل العلم. اهـ

"তারা হচ্ছেন আহলে ইলমগণ।"

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. اهـ

"তারা যদি মুহাদ্দিসগণ না হয়ে থাকেন, তাহলে আমার বুঝে আসে না যে, আর কারা হবে।"

কাযি ইয়াজ রহ. বলেন,

إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. اهـ

“ইমাম আহমাদের উদ্দেশ্য, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ এবং মুহাদ্দিসগণের মত-পথের বিশ্বাসীরা।”

[দেখুন, বদরুদ্দীন আইনী রহ. কৃত সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ: উমদাতুল ক্বারী; ১৩/৬৬]

ইমাম আহামদ রহ. এর যামানায় হাদিস বিশারদ মুহাদ্দিসগণই ছিলেন আহলুস সুন্নাহর প্রতীক। তাই মুহাদ্দিসগণ দ্বারা তার উদ্দেশ্য, আহলুস সুন্নাহ- যেমনটা কাযি ইয়াজ রহ. বলেছেন।

সালাফের এসব বক্তব্যে আহলে ইলম ও মুহাদ্দিসগণ তথা আহলুস সুন্নাহকে তায়েফায়ে মানসূরা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য, তায়েফায়ে মানসূরা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হবে। কোন বিদআতি ফিরকা তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। সামনে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. এর বক্তব্য থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

তিন.

জিহাদ ব্যতীত তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয়

তায়েফায়ে মানসূরার একান্ত বিশিষ্ট যে গুণটির কথা বলা হয়েছে তা হল, তারা কিতাল করতে থাকবে এবং তাদের দুশমনদেরকে বিভিন্নভাবে পর্যদুস্ত করতে থাকবে। এ থেকে সুস্পষ্ট যে, এ বিশেষ গুণটি – তথা কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল – ছাড়া তায়েফায়ে মানসূরা হওয়া সম্ভব নয়। তায়েফায়ে মানসূরা হতে হলে অবশ্যই কিতালে জড়িত হতে হবে। ইলম ছাড়া যেমন আলেম হওয়া যায় না, হাদিস ছাড়া মুহাদ্দিস হওয়া যায় না, তাফসীর ছাড়া মুফাসসির হওয়া যায় না, ফিকহ ছাড়া ফকিহ হওয়া যায় না- তদ্রূপ কিতাল ছাড়া তায়েফায়ে মানসূরা হওয়া যায় না।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

فالتحقيق أن المراد بالطائفة الجماعة المجاهدة. اهـ

“তাহকিকি ও বাস্তবসম্মত কথা হচ্ছে, তায়েফায়ে মানসূরা দ্বারা মুজাহিদ জামাত উদ্দেশ্য।” – মিরকাত: ১১/৪৪১

বি.দ্র.

আমি আগেও বলেছি, তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত। এমনও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ধরুন, জিহাদ যখন ফরযে কেফায়া থাকবে, তখন জিহাদে না যাওযার সুযোগ আছে। আহলুস সুন্নাহর মধ্যে যারা তখন জিহাদে যাবে, তারা তায়েফায়ে মানসূরা। তারা যাবে না, তারা তায়েফায়ে মানসূরা নয়; কিন্তু আহলুস সুন্নাহ। অতএব, ক্ষেত্র বিশেষে তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হয়েও আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। কাজেই, লক্ষ রাখবো, দু’টোর মাঝে গরমিল যেন না করে ফেলি। এমন অভিযোগ যেন কেউ না করে যে, মুজাহিদগণ বাকি সকলকে আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত দাবি করে। তবে আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কার হওয়ার মতো কোন আকীদা পাওয়া গেলে তখন ভিন্ন কথা। তখন সে ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহ থেকে বহিষ্কৃত। তবে জিহাদে না যাওয়ার

কারণে নয়, বিদআতি আকীদার কারণে। তদ্রূপ, জিহাদ যখন ফরযে আইন থাকে, তখন জিহাদে না গেলে এবং তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত না হলে গোনাহগার হবে।

** ইমাম আহমাদ রহ. এর বক্তব্য এবং একটি বিভ্রান্তির নিরসন

আমরা দেখেছি, তায়েফায়ে মানসূরা আহলুস সুন্নাহর একটা দল। আহলুস সুন্নাহর সকলেই তায়েফায়ে মানসূরা নয়। হাদিস থেকে বিষয়টা একেবারেই সুস্পষ্ট। কিন্তু সালাফের কারো কারো বক্তব্য থেকে কেউ কেউ বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। যেমন, একটু আগেই ইমাম আহমাদ রহ., ইমাম বুখারী রহ. এবং কাযি ইয়াজ রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি। বাহ্যত তাদের কথার সারমর্ম, আহলুস সুন্নাহ কিংবা আহলুস সুন্নাহর আহলে ইলম ও মুহাদ্দিসগণ হচ্ছেন তায়েফায়ে মানসূরা। বাহ্যত তাদের কথা থেকে বুঝা যায়, তায়েফায়ে মানসূরা হওয়ার জন্য জিহাদ শর্ত নয়। কিন্তু পাঠক মাত্রই দেখতে পাচ্ছেন, এ কথা

হাদিসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তায়েফায়ে মানসূরার জন্য জিহাদ শর্তের কথাটা হাদিসে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এসেছে। ইমাম আহমাদ ও ইমাম বুখারীর মতো ব্যক্তিদের কাছে বিষয়টা অজানা নয়। এমন সুস্পষ্ট হাদিস থাকার পরও তারা কিছুতেই বলতে পারেন না যে, জিহাদ ছাড়াও তায়েফায়ে মানসূরা হওয়া যাবে। বরং তাদের কথা উদ্দেশ্য – যেমনটা একটু আগেও উল্লেখ করা হয়েছে – তায়েফায়ে মানসূরা আহলে ইলম ও আহলুস সুন্নাহ থেকে হবে। কোন বিদআতি ফিরকা তায়েফায়ে মানসূরা হতে পারবে না। তাদের কথার এ অর্থ করলে তখন হাদিসের সাথে আর কোন বিরোধ থাকে না। **আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন,**

واختلف في تعيين مصداقِهِ وكلٌّ ادّعى بما بدا له. قلت: كيف مع أنه منصوصٌ في الحديث وهم المجاهدون في سبيل الله؟ ثم رأيت عن أحمد رحمه الله أن تلك الطائفة إن لم تكن من أهل السنة والجماعة فلا أدري من هي؟ ولم أكن أفهم مراده لأنك قد علمت أنها المجاهدون بنص الحديث. ولا يمكن عنه الغفلة لمثل أحمد رحمه الله فكيف قال إنها أهل السنة والجماعة؟ ثم بدا لي مراده: وهو أن المجاهدين ليسوا إلا من أهل السنة، فعلمت أنه عيَّنَهم من تلقاء جهادهم لا من جهة عقائِدِهم، ويشهد له التاريخ فإنه لم يُوفَّق

للجهاد أحد غيرُ تلك الطائفة. وأكثر تخريب السلطنة الإسلامية كان على أيدي الروافض خذلهم الله ولعنهم. اهـ

"তায়েফায়ে মানসূরা কারা এ নিয়ে মতভেদ আছে। প্রত্যেকে নিজের বুঝ অনুযায়ী একেকটাকে তায়েফায়ে মানসূরা দাবি করেছে। (আশ্চর্য যে,) কিভাবে এখানে মতভেদ করা সম্ভব, অথচ হাদিসের সুস্পষ্ট ভাষ্য হচ্ছে, তারা হচ্ছেন আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণ?! ইমাম আহমাদ রহ. থেকে দেখেছি যে, তিনি বলেছেন, 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ যদি ঐ তায়েফা না হয়, তাহলে আমার বুঝে আসে না যে, আর কারা হবে'! আমি আহমাদ রহ. এর কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছিলাম না। কারণ, আপনি দেখেছেন, হাদিসের সুস্পষ্ট ভাষ্য, তারা হচ্ছেন মুজাহিদগণ। আহমাদ রহ. এর মতো ব্যক্তির কাছে বিষয়টা অজানা থাকতে পারে না। এরপরও তিনি কিভাবে বলতে পারেন, সে তায়েফা হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ?! পরে আমার আহমাদ রহ. এর উদ্দেশ্য বুঝে আসলো। তা হলো, মুজাহিদগণ কেবল আহলুস সুন্নাহর মধ্য থেকেই হয়ে থাকেন। কাজেই, আপনি বুঝতে পারছেন, তিনি আহলুস সুন্নাহকে তায়েফায়ে মানসূরা বলেছেন, তাদের জিহাদের দিকটি বিবেচনা করে; (শুধুমাত্র) আকীদার দিকে লক্ষ করে নয়। আর ইতিহাসও এর সাক্ষ্যি। আহলুস সুন্নাহ ছাড়া আর

কারো জিহাদের তাওফিক হয়নি। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ ইসলামী সালতানাত তো রাফেজীদের হাতেই ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ তাদের অপদস্ত ও অভিশপ্ত করুন।” – ফায়জুল বারী; ১/১৭১, কিতাবুল ইলম, বাব: মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ..., ছাপা: আলমাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেউবন্দ

চার.

তায়েফায়ে মানসূরা শুধু শামে সীমাবদ্ধ নয়

তায়েফায়ে মানসূরার ব্যাপারে বর্ণিত সহীহ হাদিসসমূহে ‘তায়েফায়ে মানসূরা কোন ভূখণ্ডে থাকবে’- এমন কোন সুনির্দিষ্ট নাম আসেনি। এ থেকে স্পষ্ট যে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন হকপন্থী মুজাহিদ জামাতই তায়েফায়ে মানসূরা। তবে কোনো কোনো হাদিসে এসেছে যে, তারা বাইতুল মুকাদ্দাস এবং তার আশেপাশের এলাকায় তথা শামে

থাকবে। যেমন, **ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর বর্ণনায় এসেছে,**

لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم الا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. [تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح لغيره دون قوله : " قالوا : يا رسول الله وأين هم ...إلخ " وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن عبد الله السيباني الحضرمي]

"আমার উম্মতের একটা দল সর্বদা দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা তাদের শত্রুদের উপর হবে প্রতাপশালী। তাদের বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, (অনেক সময়) তারা কষ্ট ও সংকীর্ণতার শিকার হবে। আল্লাহ তাআলার ফায়সাকৃত বিষয়টি (তথা কেয়ামতের আগে যে বাতাসের দ্বারা মু'মিনগণের মৃত্যু হবে সেটি) আসা পর্যন্তই তাদের এ ধারাবাহিকতা চলমান থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন, বাইতুল মাকদিস ও বাইতুল মাকদিসের আশেপাশে।"
– মুসনাদে আহমাদ; হাদিস নং ২২৩৭

এ হাদিস এবং এ জাতীয় আরো কিছু হাদিস, যেগুলোতে বাইতুল মুকাদ্দাস ও শামের কথা এসেছে, সেগুলো যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে এর উদ্দেশ্য: বাইতুল মুকাদ্দাস ও পূণ্যভূমি শামের সাথে তায়েফায়ে মানসূরার বিশেষ সম্পৃক্ততা থাকবে এবং সেখানে সর্বদাই তায়েফায়ে মানসূরার একটা জামাত থাকবে। অন্যান্য ভূখণ্ডে তায়েফায়ে মানসূরার কোন জামাত না থাকলেও শামে একটা জামাত থাকবে। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তায়েফায়ে মানসূরা কেবল শামেই থাকবে আর কোথাও থাকবে না।

মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

قيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك. قلت: فيه بحث فإن أهل المغرب أيضا من الأروام وغيرهم يحاربون الكفار ; أيدهم الله تعالى. فالتحقيق أن المراد بالطائفة الجماعة المجاهدة لا على التعيين، فإن فيما وراء النهر أيضا طائفة يقاتلون الكفرة قواهم الله تعالى، وجزى المجاهدين عنا خيرا حيث قاموا بفرض الكفاية وأعطوا التوفيق والعناية. اهـ

“কেউ কেউ বলেন, তায়েফায়ে মানসূরা হল শাম এবং তৎপরবর্তী এলাকার অধিবাসীগণ। তবে আমি বলি, এতে

আপত্তি আছে। কেননা, মাগরিবের রোম ও অন্যান্য এলাকার অধিবাসীগণও কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের নুসরত করুন। তাই, তাহকিকি ও বাস্তবসম্মত কথা হল, তায়েফায়ে মানসূরা দ্বারা মুজাহিদ জামাত উদ্দেশ্য; তবে (সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডের) সুনির্দিষ্ট কোন জামাত নয়। কেননা, মাওয়ারাউন নহরেও একটা দল আছে, যারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল করছে। আল্লাহ তাআলা তাদের শক্তিশালী করুন। তারা ফরযে কেফায়ার দায়িত্ব আদায় করছেন। আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে তাওফিক ও কৃপা লাভ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের পক্ষ থেকে মুজাহিদগণকে উত্তম বিনিময় দান করুন।" – মিরকাত: ১১/৪৪১

অতএব, এ কথা বলা যায়, শামে তায়েফায়ে মানসূরার একটা জামাত সব সময় থাকবে। পাশাপাশি অন্যান্য ভূখণ্ডেও থাকতে পারে। তায়েফায়ে মানসূরা শুধু শামেই সীমাবদ্ধ নয়। বাস্তবতাও এর সাক্ষ্যি। শামের ইতিহাস দেখলে দেখা যায়, শামে সব সময়ই কোনো না কোনো জামাত জিহাদে লিপ্ত ছিল। বাইতুল মুকাদ্দাস যখন ক্রুসেডারদের দখলে ছিল, তখনও শামে জিহাদ চলমান ছিল। পাশাপাশি অন্যান্য অনেক

ভূখণ্ডেও আমরা দেখছি যে, আলহামদু লিল্লাহ, জিহাদ চলে আসছিল এবং এখনও চলছে।

পাঁচ.

তায়েফায়ে মানসূরার জিহাদের বরকতেই দ্বীন টিকে আছে

তায়েফায়ে মানসূরা সংক্রান্ত উল্লিখিত হাদিসগুলোর ২ নং হাদিসটি ছিল,

« لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة ».

"এ দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (কারণ,) কেয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের একটা দল বিজয়ী বেশে (দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে) কিতাল করতে থাকবে।" – সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬২

এ হাদিসের দু’টি অংশ;

ক. لن يبرح هذا الدين قائما ‘এ দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে’।

খ. يقاتل عليه عصابة من المسلمين ‘মুসলমানদের একটা দল বিজয়ী বেশে (দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে) কিতাল করতে থাকবে’।

হাদিসের দ্বিতীয় অংশটি প্রথম অংশের কারণ বর্ণনা করছে। অর্থাৎ এ দ্বীন এ কারণে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যে, মুসলমানদের একটা জামাত সর্বদা কিতাল করতে থাকবে। তাদের কিতালের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা এ দ্বীন টিকিয়ে রাখবেন।

আরেকটু স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, যখন বলা হল, ‘এ দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে’ তখন যেন একটা প্রশ্নের উদ্রেগ হল যে, এ দ্বীন কেন প্রতিষ্ঠিত থাকবে? এ প্রশ্নের *উত্তরে দ্বিতীয় বাক্যটি বলা হল। অর্থাৎ এ দ্বীন টিকে থাকার কারণ হচ্ছে, মুসলমানদের একটা জামাত সর্বদাই দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকবে। তাদের কিতালের বদৌলতেই দ্বীন টিকে থাকবে।

আল্লামা তিবি রহ. (৭৪৩ হি.) বলেন,

((يقاتل عليه)) جملة مستأنفة بيانا للجملة الأولي ... أي يظاهرون بالمقاتلة علي أعداء الدين، يعني أن هذا الدين لم يزل قائما بسبب مقاتلة هذه الطائقة. اهـ

" ... 'কিতাল করতে থাকবে' বাক্যটি একটি নতুন বাক্য, যা প্রথম বাক্যটির (তথা তা থেকে সৃষ্ট প্রশ্নের উত্তরের) বিবরণ দিচ্ছে। ... উদ্দেশ্য, এই তায়েফার কিতালের বদৌলতে এ দ্বীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" – আলকাশিফ আন হাকায়িকিস সুনান; পৃষ্ঠা ২৬৩২

এখানে **ইমাম জাসসাস রহ.** এর সেই অবিস্মরণীয় কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যেখানে তিনি জিহাদের বাস্তবতাটি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

وليس بعد الإيمان بالله ورسوله فرض آكد ولا أولى بالإيجاب من الجهاد، وذلك أنه بالجهاد يمكن إظهار الإسلام وأداء الفرائض، وفي ترك الجهاد غلبة العدو ودروس الدين، وذهاب الإسلام. اهـ

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার পর জিহাদের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যক কোন ফরজ নেই। তা

এ কারণে যে, জিহাদের দ্বারাই ইসলামের বিজয় এবং ফারায়েযগুলো আদায় করা সম্ভব। আর জিহাদ ছেড়ে দিলেই শত্রু বিজয়ী হয়ে যাবে, দ্বীন মিটে যাবে এবং ইসলাম নিঃশেষ হয়ে যাবে।" - আহকামুল কুরআন; খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪৯

আজ যারা নির্বিঘ্নে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছেন, মাদ্রাসায় নিরাপদে দরস দিতে পারছেন, মসজিদে নিশ্চিন্তে রবের ইবাদত করতে পারছেন, আর দাবি করছেন- এগুলো তাদের নেক আমলের ফসল: তাদের উচিৎ এ হাদিসটি নিয়ে চিন্তা করা। একটু ভাবা উচিৎ, আসলে কি এগুলো শুধু তাদের নেক আমলেরই ফসল, না'কি মুজাহিদিনে কেরামের কুরবানী আর শহীদানের রক্তের বরকত।

সারকথা:

- তায়েফায়ে মানসূরা আহলুস সুন্নাহর মধ্য থেকে হবে; বিদআতিদের মধ্য থেকে হবে না। ইমাম আহমাদ রহ. সহ আরো যাদের থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ- এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

- তারা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকবে।

- তারা একটি জিহাদি জামাত হবে। যারা জিহাদে জড়িত হবে না, তারা আহলুস সুন্নাহ হওয়া সম্ভব হলেও তায়েফায়ে মানসূরা হতে পারবে না।

- তায়েফায়ে মানসূরা শুধু শামেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য ভূখণ্ডের হকপন্থী জিহাদি জামাতগুলোও তায়েফায়ে মানসূরার অংশ।

- তায়েফায়ে মানসূরা সর্বদাই বিদ্যমান থাকবে। কোন যামানাই তায়েফায়ে মানসূরাশূন্য হবে না। এক ভূখণ্ডে না থাকলে অন্য ভূখণ্ডে থাকবে। তাদের সর্বশেষ দলটি ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে মিলে দাজ্জালের বিরুদ্ধে কিতাল করা পর্যন্তই

তারা কিতাল করে যেতে থাকবে।

- তাদের জিহাদের বদৌলতে এ দ্বীন টিকে থাকবে।

- তায়েফায়ে মানসূরা সর্বদা বিদ্যমান থাকাটা এ বিষয়ের একটা দলীল যে, খেলাফত না থাকাবস্থায় জিহাদি তানজীম গড়ে তোলা এবং তাতে যোগ দেয়া যাবে। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে খেলাফত না থাকাবস্থায় যেসকল দল পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে, তার দ্বারা না-হক্ক দল উদ্দেশ্য। আহলুস সুন্নাহর অনুসারি হক দল উদ্দেশ্য নয়।

والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

তায়েফায়ে মানসূরা সম্পর্কে আরো দু'টি কথা

তায়েফায়ে মানসূরা সংক্রান্ত পোস্টে আমি বলেছিলাম যে, কিতাল তায়েফায়ে মানসূরার আবশ্যকীয় সিফাত। কিতালে

জড়িত হওয়া ছাড়া তায়েফায়ে মানসূরা হওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে কাশ্মিরী রহ. এর বক্তব্যও উল্লেখ করেছিলাম। কাশ্মিরী রহ. এর বক্তব্য থেকে সালাফের বক্তব্যসমূহের উদ্দেশ্যও বুঝা যায়।

আমার এ বক্তব্য থেকে কারো কারো সংশয় হতে পারে যে, তাহলে আলেম উলামা, যারা দ্বীনের জন্য তাদের সর্ব সামর্থ্য ব্যয় করে গেছেন, তারা কি তায়েফায়ে মানসূরা নন?

উত্তর:

বিষয়টা বুঝার আগে বুঝা দরকার- জিহাদ কাকে বলে?

আমরা জানি, জিহাদ একটি ব্যাপক আমল। এখানে অনেক শ্রেণী ও ভাগ থাকে। একদল সরাসরি কিতালে থাকেন। বাকিরা জিহাদের প্রয়োজনমাফিক অন্যান্য কাজে থাকেন। কেউ চিকিৎসা বিভাগে থাকেন। কেউ অস্ত্র তৈরিতে থাকেন। কেউ অর্থনৈতিক বিষয়াদি দেখাশুনা করেন। কেউ মিডিয়ার কাজ করেন। কেউ কিতাব লেখা ও রচনায় থাকেন। কেউ ফতোয়া দেয়া ও মাসআলা মাসায়েল বয়ানে থাকেন। এভাবে

বিভিন্নজন বিভিন্ন কাজে রত থাকেন। তাদের এ কাজগুলোর সবগুলোই জিহাদে শামিল। সবাই নিজ নিজ মেহনত ও প্রয়োজন অনুসারে সওয়াব পাবেন। সকলেই মুজাহিদ।

অতএব, যেসকল আলেম উলামা দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের মাসায়েল বলা ও খেদমত করার পাশাপাশি জিহাদের বিষয়েও ফতোয়া দিচ্ছেন বা লেখালেখি করছেন, তারাও মুজাহিদ। তারাও তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত। যারা সরাসরি কিতালে আছেন, তারা যেমন তায়েফায়ে মানসূরা, যারা জিহাদের সাথে জড়িত হয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে লিপ্ত আছেন, তারাও তায়েফায়ে মানসূরা।

দ্বিতীয়ত: সহীহ হাদিসে এসেছে, **'যে ব্যক্তি কোন মুজাহদিকে জিহাদের খরচ সরবরাহ করলো, সেও জিহাদ করলো।'**

একজন জান দিয়ে করলো, আরেকজন মাল দিয়ে করলো। একজন প্রত্যক্ষভাবে করলো, আরেকজন পরোক্ষভাবে করলো। এভাবে যে কেউ যেকোন ভাবে জিহাদে সহায়তা করলো, তারাও পরোক্ষভাবে মুজাহিদ। তারাও পরোক্ষভাবে

তায়েফায়ে মানসূরা।

তৃতীয়ত: হকপন্থী আলেম উলামারা কোন সময় জিহাদবিরোধী হতে পারেন না। জিহাদবিরোধী হলে আর হকপন্থী থাকে না। তাহলে যারা হকপন্থী আলেম, তারা সরাসরি জিহাদে না গেলেও জিহাদের সমর্থক হওয়ার কারণে পরোক্ষভাবে জিহাদে শরীক আছেন। এ হিসেবে তারাও পরোক্ষভাবে তায়েফায়ে মানসূরায় পড়েন।

এ হিসেবে আমরা বলতে পারি, যারা সরাসরি কিতালে আছেন বা সরাসরি জিহাদের কাজে লিপ্ত আছেন- চাই ইলমী কাজই হোক না কেন- তারা সরাসরি তায়েফায়ে মানসূরা। আর যারা সরাসরি জিহাদে লিপ্ত নেই, সহায়তায় আছেন কিংবা সমর্থন করছেন, তারাও পরোক্ষভাবে তায়েফায়ে মানসূরা।

অধিকন্তু বলতে গেলে, আহলুস সুন্নাহর প্রকৃত আকীদা বিশ্বাস পোষণকারী ব্যক্তি কোনভাবেই জিহাদ বিরোধী হতে পারে না। তারা- ফরযে আইন না হলে- জিহাদ না করলেও বা সহায়তায় না থাকলেও সমর্থক হওয়ার কারণে পরোক্ষভাবে তারাও তায়েফায়ে মানসূরা। এ হিসেবে যদি বলা হয় যে, আহলুস সুন্নাহর সকলেই তায়েফায়ে মানসূরা, তাহলে তাও ঠিক আছে।

তাহলে বলা যায়, যারা সরাসরি জিহাদ বা কিতালে আছেন, তারা সরাসরি তায়েফায়ে মানসূরা। আর আলেম উলামা ও প্রকৃত আহলুস সুন্নাহগণ, তারা সরাসরি জিহাদে না থাকলেও সহায়তার মাধ্যমে কিংবা সমর্থনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জিহাদে জড়িত আছেন। তারাও পরোক্ষভাবে তায়েফায়ে মানসূরা। এ হিসেবে সালাফের যারা বলেছেন যে, তায়েফায়ে মানসূরা হলো- আহলে ইলম, আহলুল হাদিস বা আহলুস সুন্নাহ: তাদের কথায় কোন বৈপরীত্ব নেই।

মোল্লা আলী কারী রহ. (১০১৪ হি.) বলেন,

نعم هذه الأحاديث شاملة للعلماء أيضا حتى قيل المراد بهم علماء الحديث والله أعلم. اهـ

“হ্যাঁ, তায়েফায়ে মানসূরার হাদিসগুলো (মুজাহিদগণের পাশপাশি) উলামায়ে কেরামকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এমনকি এও বলা হয় যে, তায়েফায়ে মানসূরা দ্বারা উদ্দেশ্য- হাদিস বিশেষজ্ঞ উলামাগণ।”- মিরকাত ৬/২৬৬২

এ কথাগুলো তায়েফায়ে মানসূরার সংক্রান্ত আগের পোস্টেই বলা দরকার ছিল। আমার মাথায় সেগুলো ছিল। বিভিন্ন কারণে বলতে পারিনি। পরে দেখলাম, এ থেকে কারো কারো সংশয় হচ্ছে যে, আমরা সালাফের পথ পরিত্যাগ করে নিজেরা মনমতো ব্যাখ্যা করছি। এ সংশয় দূর করার জন্য এখন বলে দিচ্ছি। আমরা সালাফের পথ ছাড়িনি। সালাফের বক্তব্যসমূহের সহীহ ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছি। এতে হাদিসের সাথে সালাফের বক্তব্যসমূহের আর দ্বন্ধ থাকে না। ফালিল্লাহিল হামদ।

এখানেআরো দুটিকথাবলেদেয়ামুনাসিবমনেকরছি:

এক.

তায়েফায়ে মানসূরার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট যদিও কিতাল, কিন্তু এটাই তাদের একমাত্র বৈশিষ্ট নয়। গোটা দ্বীনই তাদের কর্মের পরিধি। গোটা দ্বীনের জন্যই তাদের মেহনত-মুজাহাদা-কুরবানী। অতএব, তারা কিতালে যেমন লিপ্ত থাকবেন, পাশাপাশি দ্বীনের অন্যান্য কাজেও লিপ্ত থাকতে পারেন। শিরক, বিদআন, ইলহাদ, যান্দাকাসহ সকল বাতিলের বিরুদ্ধে তারা কাজ করে যেতে পারেন। উভয়টার মাঝে কোন বৈপরীত্ব নেই।

দুই.

তায়েফায়ে মানসূরা দ্বারা যা-ই উদ্দেশ্য হোক, এতটুকুতে তো সকলেই একমত যে, হকপন্থী মুজাহিদগণ অবশ্যই তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত। তারা তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আশাকরি কারো কোন দ্বিমত নেই। আলেম উলামা যারা জিহাদে সরাসরি জড়িত নন, তারা তায়েফায়ে

মানসূরার অন্তর্ভুক্ত কি’না সেটাতে দ্বিমত হতে পারে। কিন্তু মুজাহিদগণ যে, তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত, তাতে আশাকরি কারো দ্বিমত নেই।

আবার এতটুকুতেও কোন দ্বিমত নেই যে, খেলাফত না থাকার সময়ও তায়েফায়ে মানসূরা বিদ্যমান থাকবে।

যদি তায়েফায়ে মানসূরাকে ব্যাপকার্থবোধক ধরা হয়, তাহলে অন্তত এতটুকু বলা যায় যে, খেলাফত না থাকার সময় জিহাদি জামাত থাকতে পারে। খেলাফত না থাকাবস্থায় আলেম উলামা যেমন থাকতে পারেন, জিহাদি জামাতও থাকতে পারে। তায়েফায়ে মানসূরাকে ব্যাপাকার্থে ধরার এবং আলেম উলামাদেরকেও কিংবা গোটা আহলুস সুন্নাহকেই তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত ধরার অর্থ তো এই নয় যে, মুজাহিদগ তায়েফায়ে মানসূরার অন্তর্ভুক্ত নন। বরং অর্থ- মুজাহিদগণের পাশাপাশি অন্যরাও হতে পারেন।

যদি এমনটাই হয়, তাহলে বলতে হবে, যখন খেলাফত থাকবে না, তখন জিহাদরত মুজাহিদ জামাত ও তানজীম – আবশ্যিকভাবে সর্বদা বিদ্যমান না থাকলেও- বিদ্যমান থাকাতে কোন বাধা নেই। অতএব, খেলাফত না থাকাবস্থায় মুজাহিদ জামাত থাকতে কোন অসুবিধা নাই। গঠন করতেও কোন অসুবিধা নাই।

মোটকথা, তায়েফায়ে মানসূরার অর্থ যাই ধরা হোক না কেন, এ থেকে এতটুকু সকলের ঐক্যমতে সাব্যস্ত হবে যে, খেলাফত না থাকাবস্থায় আহলুস সুন্নাহর আকীদা মানহাজ বিশিষ্ট জিহাদি তানজীম গঠন করতে কোন বাধা নেই। ফিতনা অধ্যায়ের হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সকল দলমত পরিত্যাগ করার হাদিসকে তায়েফায়ে মানসূরার হাদিসগুলোর সাথে মিলালে বলা যায়, হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে যেসব দল ত্যাগ করতে বলা হয়েছে সেগুলো গোমরাহ, ভ্রান্ত ও আহলুস সুন্নাহর বহির্ভূত দল উদ্দেশ্য। হক দল বা তানজীম ত্যাগ করা উদ্দেশ্য নয়।

আমি আমার সামর্থ্যানুযায়ী বিষয়টা বুঝানোর চেষ্টা করেছি। কারো কাছে আমার কোন ভুল ধরা পড়লে আমাকে অবগত করলে আমি শুকরিয়া আদায় করব। নিজেকে শুধরে নেবো। আর সঠিক *বুঝ দেয়ার মালিক তো এক আল্লাহ তাআলা।

হে আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন!

ভোট: ইসলামের নামে ধোঁকা!

বিসমিল্লাহ্! ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দাহ্! আম্মা বা'দ...

মুহতারাম এক ভাই **(ইসলামে ভোট হালাল কি?)** শিরোনামে ফোরামে একটা পোস্ট দিয়েছেন। সেখানে একজনের একটা লেখা তুলে দিয়ে ইসলামে ভোটের বিধান কি তা জানতে চেয়েছেন। স্বাভাবিকই লেখাটি মুহতারাম ভাইয়ের কাছে আপত্তিজনক মনে হচ্ছে। লেখাটি বাস্তবেও তেমনি, বরং আরোও জঘন্য।

লেখকের লেখাটি মূলত তাকী উসমানী সাহেব যা বলেছেন তারই আপডেট ভার্সন। তাকী সাহেবের লেখাটার সাথে আরোও বিভিন্ন মাত্রা-উপমাত্রা যোগ করেছেন। হাকিকত ও বাস্তবতার অস্বীকার এবং ফেরেব ও ধোঁকায় আরেকটু অগ্রগতি এনেছেন।

আসলে এসব কথা এতই সুস্পষ্ট বাতিল ও ধোঁকায় পূর্ণ যে, সামান্য দ্বীনি-বুঝ সম্বলিত প্রতিটি মুসলমানেরই তা বুঝার কথা। কিন্তু যামানার আবর্তে অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, এসব অসাড় প্রলাপেরও রদ লিখতে হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!

লেখকের দাবি- খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে ইসলামে সুনির্দিষ্ট কোন ত্বরীকা নেই। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নির্ধারিত হবে: খলিফা কিভাবে নির্বাচিত হবে। এর দলীল তিনি দিয়েছেন- খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন প্রক্রিয়া এক রকম ছিল না। একেক জন একেকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। কাজেই বুঝা গেল- খলিফা নির্বাচনে ইসলামে নির্ধারিত কোন ত্বরীকা নেই। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে খলিফা নির্ধারিত হবে। তবে

মতামত প্রদানের ত্বরীকা সময়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হবে। আর মতামত প্রদানের আধুনিক পদ্ধতি হল- ভোট। কাজেই ভোট আধুনিক যামানায় খলিফা নির্বাচনের ইসলামী ত্বরীকা।

লেখক এখানে অনেকগুলো বাস্তবতাকে এড়িয়ে গিয়ে কোনমতে ধামা-চাপা দিয়ে গলার জোরে নিজের দাবি প্রমাণ করার বরং অকাট্য সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। অথচ এই বাস্তবতাগুলো এড়িয়ে গিয়ে কিছুতেই খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতির দিকে যাওয়া যায় না। এই বাস্তবতাগুলোর উপর সামান্য একটু আলোকপাত এখানে আমি করছি-

• আমাদের আলোচনা প্রথমে খলিফা নির্বাচন নিয়ে হবে না, বরং আলোচনা হবে কুফরী শাসন দিয়ে শাসনকারী তাগুত ও মুরতাদ শাসকদেরকে অপসারণ নিয়ে। প্রশ্ন করি- মুরতাদদের হটানোর জন্য শরীয়ত কি ভোটে নামতে আদেশ দিয়েছে না'কি কতল ও কিতালের আদেশ দিয়েছে? মুরতাদের শাস্তি কি ভোটের মাধ্যমে তাকে অপসারণ করে দেয়া, না'কি হত্যা করা? অপসারণ করে ক্ষান্ত রাখা তো পরের কথা, কোন মুরতাদকে হত্যা না করে জেলে ভরে রাখার অনুমতিটুকুও কি শরীয়ত

দেয়? উত্তর যদি না হয়, তাহলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ভোটে নামবো কোন শরীয়তের আলোকে?!

• লেখক হয়তো বলবেন- 'আমরা তাগুতদেরকে মুরতাদ মনে করি না।' তাহলে জিজ্ঞেস করি- কি মনে করেন? অবশ্যই জঘন্য রকমের জালেম ও পাপিষ্ঠ মনে করেন? আর এরা অবশ্যই সাধারণ জালেম শাসকের মতো নয়। কারণ-

- সাধারণ জালেম শাসকরা শরীয়ত প্রত্যাখান করে কুফরী শাসনব্যবস্থা চালু করে না।
- সাধারণ জালেম শাসকরা তাগুত নয়, কিন্তু এরা তাগুত।
- সাধারণ জালেম শাসকরা কাফেরদের দ্বারা নির্বাচিত তাদেরই অনুগত দাস ও দালাল কিংবা তাদের কুফরের একনিষ্ঠ সাহায্যকারী নয়, কিন্তু এরা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।

কাজেই এদের বিধান সাধারণ জালেম শাসকদের বিধান নয়। এখন লেখককে জিজ্ঞাস করি- শরীয়তের কোথায় এসব জালেম তাগুতকে অপসারণের জন্য ভোটে নামার আদেশ দিয়েছে আমাদের একটু দেখাবেন কি?

• বর্তমান ভোটাভুটিকে খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন-প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করা নিতান্তই ফেরেব ও ধোঁকা। কারণ- রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কিংবা আবু বকর রাদি., উমর রাদি., উসমান রাদি., বা আলী রাদি. এর কারো ওফাতের পর মুসলিম বিশ্বের অবস্থা হল- খলিফার পদ খালি রয়েছে, জরুরী ভিত্তিতে একজন খলিফা নির্বাচন করতে হবে। পক্ষান্তরে বর্তমানের অবস্থা হল- কাফের ও তাগুত-মুরতাদরা মুসলিম খলিফা ও সুলতানগণকে অপসারণ করে, মুসলিমদেরকে রক্তের সাগরে ভাসিয়ে গোটা মুসলিম বিশ্ব তাদের কব্জায় নিয়ে নিয়েছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের ফরজ দায়িত্ব- এসব কাফের মুরতাদ ও তাগুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে হটানো। এরপর সামর্থ্যানুযায়ী একজন খলিফা নিয়োগ দেয়া। খলিফা সম্ভব না হলে অন্তত সুলতান নিয়োগ দেয়া। এই দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট বাস্তবতাকে অস্বীকার করে আগে খলিফা নির্বাচনের স্লোগান উঠানো মূলত ফরয দায়িত্ব এড়ানোর একটা বাহানা। শুধু তাই নয়, বরং মনগড়া এই ভোটাভুটিকে শরীয়ত-নির্ধারিত দায়িত্ব আখ্যায়িত করে নিজেদের গোমরাহি ঢাকা দেয়ার অপচেষ্টা। শুধু তাই নয়, বরং গোটা উম্মাহকে এই গোমরাহিতে লিপ্ত করার অনন্ত প্রয়াস।

• দ্বিতীয়ত: লেখকের দাবি খলিফা নির্বাচনে ইসলামে নির্ধারিত কোন ত্বরীকা নেই। বাতিলপন্থীদের অনেকেই এ দাবিটি করে

থাকে। এর উদ্দেশ্য- যাতে নিজেদের মনগড়া পদ্ধতিকে ইসলামের নামে চালিয়ে দিতে পারে। পক্ষান্তরে তারা যদি মেনে নেয়- ইসলামে খলিফা নির্বাচনের নির্ধারিত পন্থা রয়েছে, তাহলে তাদের ধোঁকার রাজনীতি মাঠে মারা যাবে। জনগণের কাছে তারা শরীয়তবর্জনকারী নব্য-বিদআতি মতালম্বী বলে প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে। এ জন্য তারা হাঁক-ডাক করে বেড়ায়: ইসলামে খলিফা নির্বাচনে নির্ধারিত কোন পন্থা নেই। এর পক্ষে খোঁড়া দলীল- খুলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন প্রক্রিয়া একেজনের একেক রকম ছিল।

কিন্তু এই ফেরেববাদিদের কে বুঝাবে যে, ***খুলফায়ে রাশেদীনের নির্বাচন প্রক্রিয়ার দ্বারা খলিফা নির্বাচনে স্বাধীনভাবে মনগড়া যা ইচ্ছা তা-ই করার সুযোগ সৃষ্টি হয় না, বরং খলিফা নির্বাচনের প্রক্রিয়া কি হবে তা সুনির্ধারিত হয়।*** উম্মাহর ফুকাহায়ে কেরাম এমনই বুঝেছেন। তেরোশ বছর এভাবেই চলে আসছে। কিন্তু আজ যামানার আবর্তে এই ফেরেববাদিদের জন্ম হল, যারা এসে দাবি করছে- ইসলামে খলিফা নির্বাচনে নির্ধারিত কোন পন্থা নেই।

খুলাফায়ে রাশিদীনের নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে ফুকাহায়ে কেরাম

খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি দুটির কোন একটি হবে বলে নির্ধারণ করেছেন:

এক.

الأختيار তথা উম্মাহর আহলে হল ওয়াল আকদ যারা আছেন, তারা উপযুক্ত একজন ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে নির্ধারণ করবেন। যেমন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর মদীনার আহলে হল ওয়াল আকদ সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর রাদি. কে নির্বাচন করেছেন। তেমনই উসমান রাদি. এর শাহাদাতের পর আলী রাদি. কে নির্বাচন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, খলিফা নির্বাচনের অধিকার কেবল উম্মাহর আহলে হল ওয়াল আকদ ব্যক্তিগণই রাখেন। সাধারণ জনগণ এই অধিকার রাখে না। হযরত উসমান রাদি. এর শাহাদাতের পর লোকজন আলী রাদি. এর হাতে বাইয়াতের জন্য আসে। তখন তিনি বলেন-

ليس ذلك إليكم، إنما هو لاهل الشورى وأهل بدر، فمن رضى به أهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفة، فنجتمع وننظر في هذا الامر فأبى أن يبايعهم، فانصرفوا عنه. اهـ

"তোমাদের এই অধিকার নেই। এটা তো আহলে শূরা এবং বদরী সাহাবীদের দায়িত্ব। আহলে শূরা এবং বদরী সাহাবীরা যাকে নির্বাচন করবে, তিনিই খলিফা হবেন। তাই আমরা সমবেত হয়ে এ ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করবো। তিনি বাইয়াত নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। ফলে তারা চলে গেল।" **['আল-ইমামাতু ওয়াস-সিয়াসাহ্' লি-ইবনি কুতাইবা (মৃত্যু: ২৭৬হি.): ১/৯৯]**

দুই.

الاستخلاف তথা পূর্ববর্তী খলিফা, তার পরে কে খলিফা হবেন তার প্রস্তাব করে যাওয়া। যেমন- আবু বকর রাদি. তাঁর পর উমর রাদি. এর প্রস্তাব করে গিয়েছিলেন, উমর রাদি. তাঁর পর ছয় জনের মধ্য থেকে এক জনকে খলিফা নির্বাচন করার প্রস্তাব করে গিয়েছিলেন। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী খলিফার এ প্রস্তাবের দ্বারাই প্রস্তাবিত ব্যক্তি খলিফা হয়ে যাবেন না, বরং উম্মাহর আহলে হল ওয়াল আকদ ব্যক্তিগণ যদি তার প্রস্তাবকে

কবুল করে নিয়ে প্রস্তাবিত ব্যক্তির হাতে খেলাফতের বাইয়াত দেন, তাহলেই কেবল তিনি খলিফা হবেন, অন্যথায় নয়।

ফুকাহায়ে কেরাম এই দুই পদ্ধতির কথাই বলে গেছেন। তৃতীয় কোন পন্থার কথা বলে যাননি।

সাথে সাথে তার সুস্পষ্ট বলে গেছেন, খলিফা নির্বাচনের অধিকার শুধু আহলে হল ওয়াল আকদ যারা থাকবেন, তাদেরই রয়েছে। অন্য কারো তাতে কোন অধিকার নেই। সাথে সাথে তাঁরা এও বলে গেছেন, কয়েক প্রকার ব্যক্তি খলিফা নির্বাচনের অধিকার রাখে না-

১. কাফের, চাই হারবী হোক কি যিম্মি হোক।
২. ফাসেক মুসলমান।
৩. সাধারণ দ্বীনদার মুসলমান, যারা খলিফা নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত শরয়ী ও জাগতিক ইলম, হিকমত ও অভিজ্ঞতা রাখে না।
৪. মহিলা।

৫. নাবালেগ।

শরীয়ত যেখানে সাধারণ মুআমালাতেও এদের রায় গ্রহণ করে না, সেখানে খলিফা নির্বাচন, যা গোটা উম্মাহর সাথে জড়িত- সেখানে কিভাবে এদের রায় গ্রহণ করবে??

কিন্তু তেরোশ বছর পর আজ নব্য বিদআতি গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে, যারা দাবি করছে, ইসলামে খলিফা নির্বাচনের নির্ধারিত কোন পন্থা নেই। মুসলিম-কাফের, নাস্তিক-মুরতাদ, যিন্দিক-মুলহেদ, আদেল-ফাসেক, মহিলা-পুরুষ, বালেগ-নাবালেগ সকলকেই তারা খলিফা নির্বাচনের অধিকার দিয়ে দিয়েছে। আবার দাবি করছে- এটাই নাকি আধুনিক যামানায় ইসলামী ত্বরীকা। লা'নত এই ত্বরীকার উপর যা কুরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত, লা'নত এই ত্বরীকার উপর যা সালাফে সালেহীনের পরিপন্থী, লা'নত এই ত্বরীকার উপর যা ঈমান-কুফর, মুসলিম-অমুসলিম, ফাসেক ফুজ্জার সকলকে বরারব বানিয়ে ফেলেছে। কসম আল্লাহর! কিছুতেই এই ত্বরীকা ইসলামী ত্বরীকা হতে পারে না। আল্লাহ যদি কাউকে অন্ধ না বানিয়ে দেন, তাহলে অবশ্যই তা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সহীহ ইলম দান করুন। ফিরাসত, বাসীরত ও অন্তর্দৃষ্টি দান কর। সব রকরেম ফিতনা ও গোমরাহি থেকে হিফাজত কর। আমীন!

নির্বাচন: প্রার্থী, ভোট ও ভোটারের শরয়ী বিধান

প্রার্থী

প্রথমত:

যে কোন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছে, তাকে অবশ্যই এ বলে মনোনয়ন নিতে হবে যে, সে সংবিধন বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ করবে। অধিকাংশ সংসদ সদস্য যে আইনে সম্মত হবে, সেটাই হবে আইন। সেটাকে সম্মান ও ইহতিরামের সাথে বাস্তবায়ন আবশ্যক হবে। এ শপথ নিয়েই তাকে মনোনয়ন নিতে হবে।

অর্থাৎ আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে বহাল থাকা আইন বাস্তবায়ন করা এবং শরীয়ত বিরোধী নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করার শপথ ও অঙ্গীকার করে মনোনয়ন নিতে হবে। আর স্পষ্ট যে, এটি সর্বসম্মতভাবে কুফর। যে ব্যক্তি এমনটা করবে, সে সর্বসম্মতভাবে কাফের।

আর প্রার্থী হওয়ার অর্থ নির্বাচনে জয়লাভ করলে কাফের হয়ে যাবে- এই অঙ্গীকার করা। যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে কাফের হয়ে যাবে বলে ইচ্ছা করেছে, সে এখনই কাফের হয়ে যাবে। অতএব, সংসদীয় নির্বাচনে যত প্রার্থী দাঁড়িয়েছে- পাস করুক আর ফেল করুক- সকলে ইতোমধ্যে কাফের হয়ে গেছে। পাস করার পর যখন শরীয়ত বিরোধী আইনগুলো বহাল রাখবে এবং নতুন নতুন শরীয়ত বিরোধী আইন করবে, তখন কুফর আরো বৃদ্ধি পাবে। অন্যথায় প্রার্থী হওয়ার সাথে সাথেই ইতোমধ্য কাফের হয়ে গেছে।

ইসলামী দলের প্রার্থীর বিধান

যে কুফরের কথা উপরে বলা হয়েছে, সে কুফরে ইসলামী

প্রার্থীও লিপ্ত। এ হিসেবে তারাও কাফের হয়ে যাওয়ারই কথা। তবে তাদের তাবিলের কারণে- যদিও ভুল তাবিল হয়- আমরা তাদেরকে কাফের বলবো না। গোমরাহ ও হারামে লিপ্ত বলবো। আর তাদের বাকি হিসাব-নিকাশ আল্লাহর সাথে হবে।

দ্বিতীয়ত:

নির্বাচনে দাঁড়ানোর অর্থ: দেশব্যাপী অনাচার, অবিচার, খুন-খারাবী, সন্ত্রাসী, ডাকাতি, যিনা ব্যভিচার ও যাবতীয় অপকর্মের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। তবে বেশ-কম এতটুকু যে, আওয়ামী লীগ একটু বেশি করবে, বিএনপি একটু কম করবে। আর ইসলামী দল বিএনপির সমান বা কাছাকাছি করবে। তবে ব্যবধান হল, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এগুলোকে হালাল ও বৈধ মনে করে করবে আর ইসলামী দল তাবিলের ভিত্তিতে বা হারাম মনে করে করবে। অর্থাৎ সকল দলই সব ধরণের অন্যায় অনাচার করবে, তবে ইসলামী দল একটু কম করবে এবং তাবিলের সাথে বা হারাম মনে করে করবে। ইসলাম কায়েম কারো দ্বারাই হবে না।

তাহলে প্রার্থী হওয়ার অর্থ হলো-

ক. নিজেকে বিধানদাতা ও রবরূপে দাঁড় করানো এবং এজন্য জনগণের সমর্থন ও সহায়তা কামনা করা।

খ. কাফের হয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করা এবং কুফর প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের সমর্থন ও সহায়তা কামনা করা।

গ. সব ধরণের অন্যায় অনাচারের অঙ্গীকার করা এবং জনগণের কাছে এ জন্য সমর্থন ও সহায়তা কামনা করা।

ভোট

ভোটের অর্থ-

ক. কুফর প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমর্থন দেয়া।

খ. আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের জন্য ভিন্ন মা'বূদ ও বিধানদাতা নির্ধারণের পক্ষে রায় দেয়া।

গ. সব ধরণের অন্যায় অনাচারের পক্ষে রায় দেয়া।

ভোটার

ক. কুফরের সমর্থক ও সহায়ক।

খ. আল্লাহকে বাদ দিয়ে মাখলুককে মা’বূদ ও বিধানদাতারূপে গ্রহণকারী।

গ. সব ধরণের অন্যায় অনাচারের সমর্থক ও সহায়ক।

তাহলে স্পষ্ট, ভোট একটি কুফরী ও হারাম কাজ।

তবে আমরা জনগণকে কাফের বলতে পারবো না বিশেষত দুই কারণে-

ক. ব্যাপকভাবে তাদের মাঝে অজ্ঞতা বিদ্যমান। যেসব মাসআলা আমরা বুঝতে পারছি, সেগুলো তাদের জানা নেই। আর সমাজটাও এমন যে, এখানে আলেমদের বিশাল অংশও মাসআলাগুলো বুঝে না। জনগণের কথা তো বলাই বাহুল্য। অতএব, উজর বিল জাহলের কারণে আমরা তাকফির করবো না।

খ. ব্যাপকভাবে তাবিল বিদ্যমান। জনগণ এ নিয়তে ভোট দেয় না যে, তারা কুফর বা হারামের সমর্থন করছে। অনেকে জানেও না যে, সংসদ সদস্যদের কাজ কি। তারা শুধু এতটুকু বুঝে যে, অমুক এমপি হলে উন্নয়ন হয় বেশি।

অমুক হলে দ্বীনের কাজে সহায়তা করবে। অমুক হলে করবে না। অমুক হলে রাস্তাঘাট হয়। ভাতা-টাতা পাওয়া যায়। ইত্যাদি দুনিয়াবি সুবিধা। এ তাবিলের কারণে তাকফির করা যাবে না। তবে একান্তই যারা সব কিছু বুঝে এবং বুঝে শুনে ও কুফর বাস্তবায়নের জন্য ভোট দেবে- বিশেষত উচ্চ পর্যায়ের দলীয় ব্যক্তিরা- তারা কাফের হয়ে যাবে।

সারকথা

♣ সংসদীয় নির্বাচনের সকল প্রার্থী কুফরে লিপ্ত। তবে ইসলামী দলের প্রার্থীদেরকে তাবিলের কারণে কাফের বলবো না। বাকিরা কাফের।

♣ ভোট একটি হারাম ও কুফরি কাজ। তবে জনগণের জাহালত-অজ্ঞতা ও তাবিলের কারণে তাদের তাকফির করা হবে না।

বিশেষ আবেদন

তাকফিরের মাসআলা অনেক জটিল। ভাইদের কাছে আবেদন, আমরা জনগণের তাকফিরের পেছনে পড়বো না। আমাদের উচিৎ জনগণকে এ কুফর ও হারাম সম্পর্কে দরদ ও হেকমতের সাথে বুঝানো। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমীন।

ফিকহুল জিহাদ: ০১- উম্মাহর প্রতিটি নারী পুরুষের উপর জিহাদ ফরয

আমাদের সামর্থ্য নেই তাই জিহাদ ফরয নয় -এ উজরটা সমাজে ব্যাপক। বরং বলতে গেলে উলামা তুলাবাদের মাঝে এ সংশয়টা বেশি। এ বিষয়ে আগেও কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। কয়েক পর্বে ইনশাআল্লাহ আবারও কিছু বলার চেষ্টা করবো।

***

০১- উম্মাহর প্রতিটি নারী পুরুষের উপর জিহাদ ফরয

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(41)

হালকা ভারী সর্বাবস্থায় (জিহাদে) বেরিয়ে পড় এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এটিই তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা জান। -তাওবা: ৪১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ. -مسند أحمد: 12246، سنن أبي داود: 2504؛ قال المحققون إسناده صحيح. اهـ

তোমরা নিজেদের জান, মাল ও যবান দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। -মুসনাদে আহমাদ: ১২২৪৬, সুনানে আবু দাউদ: ২৫০৬

অতএব, জান-মাল-যবান সবগুলো দিয়ে জিহাদ করা ফরয।

তবে আল্লাহ তাআলার নীতি হলো, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا - সামর্থ্যের অধিক দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা কাউকে দেন না। অতএব, যে যতটুকুতে অক্ষম ততটুকু মাফ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ [الفتح: 17]

(যুদ্ধ না করাতে) অন্ধ ব্যক্তির কোনো গুনাহ নেই, খোঁড়া ব্যক্তিরও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ব্যক্তিরও কোনো গুনাহ নেই। -সূরা ফাতহ: ১৭

অন্ধ, খোঁড়া ও রুগ্ন ব্যক্তি যারা সরাসরি অস্ত্র হাতে ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তবে যতটুকু তারা করতে সক্ষম ততটুকু করতে হবে। ততটুকুতে মাফ নেই।

যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) [التوبة: 91]

দুর্বল লোকদের (যুদ্ধে না যাওয়াতে) কোনো গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও গুনাহ নেই, যাদের কাছে খরচ করার মতো কিছু নেই; যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়। মুহসিন ও সৎলোকদের সম্পর্কে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -সূরা তাওবা: ৯১

যাদের জান মাল কোনোটার সামর্থ্যই নেই তাদেরও মুক্তি নেই। তারা মুক্তি পাবে এ শর্তে- যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন,

ومن كان عاجزا بنفسه معدما فعليه الجهاد بالنصح لله ولرسوله

-أحكام القرآن للجصاص: 3\151

যে শারীরিক দিক থেকেও অক্ষম এবং তার মালও নেই, তার জন্য ‘আন-নুসহু লিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি’-‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামিতা’র মাধ্যমে জিহাদে শরীক হওয়া আবশ্যক। -আহকামুল কুরআন: ৩/১৫১

আরও বলেন,

وكان عذر هؤلاء ومدحهم بشريطة النصح لله ورسوله... ومن النصح لله تعالى حث المسلمين على الجهاد وترغيبهم فيه والسعي في إصلاح ذات بينهم ونحوه مما يعود بالنفع على الدين، ويكون مع ذلك مخلصا لعمله من الغش; لأن ذلك هو النصح، ومنه التوبة النصوح. أحكام القرآن للجصاص ط - العلمية: 3/ 186

আল্লাহ তাআলা মা’জুরদের উজর কবুল করেছেন এবং তাদের প্রশংসা করেছেন এ শর্তে যে, তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের কল্যাণকামী হতে হবে। ... যেমন অন্যান্য মুসলিমদেরকে জিহাদে উৎসাহ দেয়া ও উদ্বুদ্ধ করা। তাদের পরস্পরের বিবাদ মিমাংসা করে দেয়া। এছাড়াও এজাতীয় অন্যান্য কাজ যেগুলোর দ্বারা দ্বীনের উপকার হয়। পাশপাশি এসকল কাজে তাদেরকে মুখলিস হতে হবে। ধোঁকা,

প্রতারণা ও মতলববাজি থেকে মুক্ত হতে হবে। কেননা, কল্যাণকামীতা এরই নাম ...। -আহকামুল কুরআন: **৩/১৮৬**

আরও বলেন,

فلم يخل من أسقط عنه فرض الجهاد بنفسه وماله للعجز والعدم من إيجاب فرضه بالنصح لله ورسوله فليس أحد من المكلفين إلا وعليه فرض الجهاد على مراتبه التي وصفنا. -أحكام القرآن للجصاص: 3\148

শারীরিক অক্ষমতা ও সম্পদহীনতার কারণে আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার ফরজ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিয়েছেন, তারাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কল্যাণকামিতার মাধ্যমে জিহাদ করার ফরজ দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। অতএব, প্রত্যেক আকেল বালেগ ব্যক্তির উপরই কোনো না কোনো স্তরে জিহাদের ফরজ দায়িত্ব রয়েছে, যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি। –আহকামুল কুরআন: ৩/১৪৮

বুঝা গেল, উম্মাহর প্রতিটি নারী পুরুষ জিহাদের জন্য আদিষ্ট। জান, মাল, যবান সব দিয়ে। যে যতটুকুতে অক্ষম ততটুকু মাফ। সামর্থ্য যতটুকু আছে করতে হবে। এমনকি অন্ধ, খোঁড়া, প্যারালাইসিস কেউই মাফ পাবে না। মাল থাকলে মাল দেবে। অস্ত্র হাতে নেয়ার শক্তি থাকলে অস্ত্র হাতে নিতে হবে। কোনো কিছু না পারলে অন্তত অন্য সক্ষম মুসলিমদের উৎসাহ হলেও দিতে হবে। মুজাহিদদের পরিবার পরিজনের দেখাশুনা হলেও করতে হবে।

যেমনটা হাদিসে এসেছে,

من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا.

যে ব্যক্তি (জিহাদের সরঞ্জাম ও খরচাদি সরবরাহ করে) আল্লাহর রাস্তার কোন মুজাহিদকে (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত করে দিল, সেও জিহাদ করল। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তার কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে উত্তমভাবে তার পরিবারের দেখাশুনা করল, সেও জিহাদ করল। -বুখারি: ২৬৮৮

***

একটি সংশয় ও জওয়াব

ফিকহের সব কিতাবেই যে কথাটি আছে; **যেমন কুদুরিতে বলা হয়েছে,**

ولا يجب الجهاد على صبي ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع. -مختصر القدوري (ص: 231)

নাবালেগ, গোলাম, মহিলা, অন্ধ, পঙ্গু ও হাত নেই ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরয নয়। -মুখতাসারুল কুদুরি: ২৩১

এ কথার কি অর্থ?

উত্তর: এখানে জিহাদ দ্বারা ময়দানের লড়াই উদ্দেশ্য। আগে পড়ে দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার। নাবালেগ তো মুকাল্লাফই না। আর বাকিদের উপর ময়দানের লড়াই ফরয নয়। তবে অন্যান্য দায়িত্ব যার যতটুকু সামর্থ্য আছে আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে আনওয়ার আওলাকি রহ. এর **‘জিহাদে অংশগ্রহণের ৪৪টি উপায়’** দেখা যেতে পারে।

***

ফিকহুল জিহাদ: ০২- কুফরের শক্তি চূর্ণ হওয়া পর্যন্ত জিহাদ ফরয

গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম যে, প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর কোনো না কোনো স্তরে জিহাদ ফরয। কেউ এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। এখন প্রশ্ন হলো, **এ ফরয বহাল থাকবে কতদিন?**

সহজে বললে এ ফরয বহাল থাকবে আজীবন। যতদিন আপনি জীবিত থাকবেন এ ফরয আদায় করে যেতে হবে। এভাবেই চলবে কেয়ামত পর্যন্ত। কারণ, যতদিন কুফরের শক্তি থাকবে ততদিন তা চূর্ণ করে ইসলাম বিজয়ী করার জন্য আপনাকে জিহাদ করে যেতে হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাক, যতক্ষণ না (যাবতীয়) ফিতনার (চূড়ান্ত) অবসান হয় এবং আল্লাহর (যমিনে আল্লাহর দেয়া) জীবনব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপে ক্ষমতাসীন হয়। -আনফাল: ৩৯

ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. اهـ

অতএব, যদি জীবনব্যবস্থার কিছু অংশ আল্লাহর হয় আর কিছু অংশ গাইরুল্লাহর হয়, তাহলে কিতাল ফরয- যাবৎ না আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপে ক্ষমতাসীন হয়। -মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৫১১

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অত:পর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন

তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করা এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে – মুসলমান হয়ে যায় – এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। –তাওবা: ৫

আরো ইরশাদ করেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।" –তাওবা: ২৯

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন:

فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية.اهـ

এ দুই আয়াত বুঝাচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া ফরয, যতক্ষণ না তারা হয়তো মুসলমান হয়ে যায়, নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। -আহকামুল কুরআন: ৩/৫২১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এই স্বাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং

নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। -সহীহ বুখারি: ২৫

অতএব, যতদিন পৃথিবীর বুকে কুফরের দাপট থাকবে ততদিন

জিহাদ ফরয। হয় মুসলমান হবে নয়তো জিযিয়া দিয়ে নত হয়ে মুসলিমদের অধীনে বসবাস করবে। তৃতীয় কোনো পথ নেই। আর স্পষ্ট যে, কেয়ামত অবধি কুফরের এ শক্তি কোথাও না কোথাও থেকেই যাবে। এটিই আল্লাহ তাআলার ফায়সালা। তাই জিহাদও ফরয থেকে যাবে। কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الجهادُ ماضٍ منذُ بعثني اللهُ إلى أن يقاتلَ آخِرُ أُمتي الدجالَ، لا يبطِلُه جَوْر جائرٍ، ولا عَدل عادلٍ. -سنن أبي داود: 2532، قال المحققون: حسن لغيره. اهـ

যখন থেকে আমাকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন তখন থেকে নিয়ে আমার উম্মতের শেষ অংশ দাজ্জালের বিরুদ্ধে কিতাল করা পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে। কোনো জালেমের জুলুম বা কোনো ইনসাফগারের ইনসাফ তা বাতিল করতে পারবে না। -সুনানে আবু দাউদ: ২৫৩২

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন,

لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك

আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে আল্লাহর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের শত্রুদের উপর হবে প্রতাপশালী। তাদের বিরোধীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কেয়ামত অবধি তারা এ অবস্থার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। –সহীহ মুসলিম: ৫০৬৬

অতএব, জিহাদের দায়িত্ব শেষ- এমন ভাবার কোনো সুযোগ কোনো মুমিনের নেই মৃত্যু অবধি।

ফিকহুল জিহাদ: ০৩- ফরয আদায়ে ই’দাদ

গত দুই পর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, যতক্ষণ পৃথিবীতে কুফরের দাপট থাকবে ততক্ষণ জিহাদ ফরয। কুফরের প্রতাপ চূর্ণ করে সারা বিশ্বে তাওহিদের পতাকা উড্ডীন করা পর্যন্ত এ ফরয থেকে যাবে। সহজে বলতে গেলে বর্তমান পৃথিবীতে যতগুলো কুফরি ও তাগুতি রাষ্ট্র আছে সবগুলোকে চূর্ণ বিচূর্ণ

করে খেলাফতে ইসলামিয়া কায়েম করা পর্যন্ত জিহাদ ফরয।

যদি আমরা হিন্দুস্তান নিয়ে কথা বলি আমাদের সামনে মুরতাদ রাষ্ট্র আছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মালদ্বীপ। কাফের রাষ্ট্র আছে ভারত, নেপাল, বার্মা, ভুটান, শ্রীলংকা। এ সবগুলো বিজয় হয়ে ইসলামী খেলাফত কায়েম হতে হবে। যদি আরও একটু আগে বাড়ি তাহলে আছে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, ফিলিপাইন। আছে চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, কোরিয়া ইত্যাদি। এগুলো বিজয় হয়ে ইসলামি খেলাফত কায়েম হতে হবে। এভাবে মাশরিক থেকে মাগরিব, শিমাল থেকে জুনুব পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চিতে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হতে হবে। প্রচলিত ভাষায় বললে তালেবানি শাসন কায়েম হতে হবে। এর আগ পর্যন্ত জিহাদ ফরয।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন;

যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। -সফ: ৯

হয়তো আপনার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, এটাও কি সম্ভব? পৃথিবীর প্রতিটি পরাশক্তি, প্রতিটি সুপার পাওয়ার, প্রতিটি ক্ষমতাধর রাষ্ট্র যাদের দম্ভে আজ দুনিয়া কম্পমান- এরা সবাই মুসলিমদের হাতে পরাজিত হবে? সবার শক্তি-দাপট চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ইসলামী খেলাফত কায়েম হবে? এটাও কি সম্ভব?

হ্যাঁ, এটাও সম্ভব। আল্লাহর শক্তির সামনে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সুসংবাদই উম্মতকে দিয়ে গেছেন।

ইরশাদ করেন,

لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ، وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيلٍ، إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا. -مسند أحمد: 23814، قال المحققون: إسناده صحيح. اهـ

দুনিয়ার বুকে প্রতিটি জনপদের প্রতিটি ঘরে ঘরে আল্লাহ তাআলা ইসলামের কালিমা প্রবেশ করাবেন। যাকে চান

ইজ্জতের সাথে, যাকে চান লাঞ্ছিত করে। হয়তো ইসলামের অনুসারি বানিয়ে তাদের সম্মানীত করবেন; নয়তো (হত্যা, বন্দী ও জিযিয়ার মাধ্যমে) অপদস্ত করবেন, ফলে তারা ইসলামের (শাসনের) অধীনস্ততা গ্রহণে বাধ্য হবে। -মুসনাদে আহমাদ: ২৩৮১৪

আরও ইরশাদ করেন,

لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ. -مسند أحمد: 16957، قال المحققون: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ

যতখানে রাত্র দিন আসে, এ দ্বীন অবশ্যই অবশ্যই সেখানে পৌঁছবে। প্রতিটি জনপদের প্রতিটি ঘরে ঘরে আল্লাহ তাআলা এ দ্বীন প্রবেশ করাবেন। যাকে চান ইজ্জতের সাথে, যাকে চান লাঞ্ছিত করে। যে ইজ্জতের মাধ্যমে তিনি ইসলামকে সম্মানীত করবে। যে লাঞ্ছনার মাধ্যমে তিনি কুফরকে অপদস্ত করবেন। -মুসনাদে আহমাদ: ১৬৯৫৭

অন্য হাদিসে এসেছে,

عن أبي هريرة، أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: ليس بيني وبينه نبيٌّ -يعني عيسى ابن مريم- وإنه نازلٌ ... فيُقاتِلُ الناسَ على الإسلامِ، فيدُقُ الصَّلِيبَ، ويقتُلُ الخِنزيرَ، ويضَعُ الجزيةَ، ويُهلِكُ اللهُ في زمانه المِلل كلَّها إلا الإسلامَ. -مسند أحمد: 9270، سنن أبي داود: 4324، قال المحققون: حديث صحيح. اهـ

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার এবং তাঁর – অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালামের- মাঝখানে কোনো নবী নেই। আর অচিরেই তিনি যমিনে অবতরণ করবেন। ... অবতরণ করে ইসলাম গ্রহণের জন্য সকলের বিরুদ্ধে কিতাল করবেন। ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। শুকর হত্যা করে ফেলবেন। জিযিয়ার বিধান উঠিয়ে দেবেন (ফলে মুসলমান না হলে হত্যা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো রাস্তা থাকবে না)। তার যামানায় আল্লাহ তাআলা একমাত্র ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্ম নিঃশেষ করে দেবেন। -মুসনাদে আহমাদ: ৯২৭০, সুনানে আবু দাউদ: ৪৩২৪

অতএব, প্রতিটি সুপার পাওয়ারের দম্ভ চূর্ণ করে ইসলামের কালিমা উড্ডীন করা আপনি আমার ফরয দায়িত্ব। এ টার্গেটে পৌঁছা পর্যন্ত উম্মাহর কোনো মুক্তি নেই।

***

এখন তাহলে প্রশ্ন, **আমরা এ টার্গেটে কিভাবে পৌঁছতে পারি? আমরা তো দুর্বল।**

এ প্রশ্নের জওয়াবই মূলত আজকের পর্বের উদ্দেশ্য।

***

মূলনীতি: ফরযের পূর্বশর্তগুলোও ফরয

উসূলে ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো, যে কাজ ফরয তার পূর্বশর্তগুলোও ফরয।

ইমাম সারাখসি রহ. (৪৯০হি.) বলেন,

ما لا يتأتى إقامة الفرض إلا به يكون فرضا في نفسه. المبسوط للسرخسي (30/ 245)

যে জিনিস ছাড়া ফরয আদায় সম্ভব নয় সেটিও স্বয়ং ফরয। -মাবসূত: ৩০/২৪৫

ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

الأمر بالشيء أمر بلوازمه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مجموع الفتاوى: 10/ 531

কোনো কাজের আদেশ দেয়া হলে তা সম্পাদনের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলোরও আদেশ দেয়া হয়। আর যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় সম্ভব নয় তাও ফরয। -মাজমুউল ফাতাওয়া: ১০/৫৩১

যেমন,

নামায ফরয। তাহারাত ও সতর ঢাকা ছাড়া নামায হয় না। তাই তাহারাত অর্জন করা এবং সতর ঢাকার ব্যবস্থা করাও

ফরয।

ঋণ আদায় করা ফরয। অর্থ কড়ি না থাকলে ঋণ আদায়ের জন্য কামাই করা ফরয।

বিবি বাচ্চার নাফাকা তথা ভরণ পোষণ ফরয। ব্যবস্থা না থাকলে কামাই করা ফরয।

আত্মহত্যা হারাম। তাই জীবন বাঁচে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ ফরয। ব্যবস্থা না থাকলে কামাই করা ফরয।

এসব মাসআলা শরীয়তের স্বীকৃত মাসআলা। তাই কিতাবাদি ও আইম্মায়ে কেরামের উদ্ধৃতি দিতে যাচ্ছি না। তবে এ ব্যাপারে আপনারা চাইলে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর **‘কিতাবুল কাসব’** দেখতে পারেন। ইমাম সারাখসির শরাহসহ মাবসূতের ত্রিশ নং খণ্ডের শেষের দিকে তা সংযুক্ত আছে। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ রহ. এর তাহকিকে তা আলাদাভাবেও ছেপেছে।

একটি সুন্দর উদাহরণ

ইমাম নাসাফি রহ. (৭১০হি.) তার ‘মানার’ কিতাবের শরাহ ‘কাশফুল আসরার’-এ (খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১১১) এর একটি সুন্দর

উদাহরণ দিয়েছেন। মুনীব তার গোলামকে কোনো কাজে ছাদে উঠতে বলল। ছাদে তো মই ছাড়া উঠা সম্ভব না। মই লাগানো থাকলে তো ভাল, অন্যথায় মই লাগানো গোলামের দায়িত্ব। আগে মই লাগাবে তারপর ছাদে উঠবে।

জিহাদের জন্য ই'দাদ

যখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, জিহাদ একটি ফরয দায়িত্ব, যতদিন কুফর থাকবে ততদিন জিহাদ করতে থাকতে হবে: তখন আর এই উজরের কোনো হেতু নেই যে, আমরা দুর্বল। জিহাদ যখন ফরয তখন শক্তি অর্জনও ফরয। শক্তি ছাড়া তো আর জিহাদ করা যায় না। অতএব, উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জিহাদের জন্য ই'দাদ করে শক্তি অর্জন করা ফরয। আল্লাহ তাআলা যে শব্দে নামায ফরয করেছেন একই শব্দে জিহাদ ফরয করেছেন। নামাযের জন্য যখন তাহারাত হাসিল করা ফরয, তখন জিহাদের জন্যও ই'দাদ করাও ফরয। অতএব, দুর্বলতার উজর গ্রহণযোগ্য নয়।

যাহোক, এ হলো মূলনীতির দাবি। বুঝানোর স্বার্থে এভাবে আলোচনায় আনা হল। নয়তো ই'দাদের আদেশ তো আল্লাহ তাআলা স্বতন্ত্রভাবে কুরআনে কারীমে দিয়েই রেখেছেন। এরপর আর দুর্বলতার বাহানা ধরে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। তবে দুর্বলতার কারণে এতটুকু ছাড় পাওয়া যাবে যে, যতদিন প্রয়োজনীয় শক্তি হাসিল হচ্ছে না যুদ্ধ বিলম্ব করা যাবে। এ ব্যাপারে আমরা ইনশাআল্লাহ সামনের পর্বে আলোচনা করবো।

ফিকহুল জিহাদ: ০৪- ই'দাদ এবং দু'টি সংশয় নিরসন

গত তিন পর্বে আমরা দেখলাম, জিহাদ ফরয এবং জিহাদের প্রয়োজনে ই'দাদও ফরয। এ পর্বে আমরা ইনশাআল্লাহ বিপরীতমুখী দু'টি সংশয় নিয়ে আলোচনা করবো। একটি সংশয় জিহাদবিমুখ ভাইদের আরকটি সংশয় জিহাদি ভাইদের।

সংশয় ০১: সামর্থ্য না থাকলে জিহাদ ফরয নয়, ই’দাদও ফরয নয়

এ সংশয়টি জিহাদবিমুখ ভাইদের।

আমরা দেখেছি দুনিয়াতে যতদিন কুফর থাকবে জিহাদ থাকবে। জিহাদের প্রয়োজনে ই’দাদ। প্রথমে ই’দাদ। সামর্থ্য অর্জন হলে জিহাদ। জিহাদবিমুখ ভাইয়েরা মনে করেন, জিহাদ ফরয বা ই’দাদ ফরয সবই ঠিক, কিন্তু যখন সামর্থ্য থাকবে। অন্যথায় নয়। আমাদের বর্তমানে শক্তি নেই। তাই জিহাদ বা ই’দাদ কোনোটাই ফরয নয়।

জিহাদ ফরযের জন্য সামর্থ্য শর্ত নয়

জিহাদবিমুখ ভাইয়েরা মনে করেছেন জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য জিহাদ আদায়ের সামর্থ্য থাকা শর্ত। আসলে বিষয়টা এমন নয়। শরীয়তের কোনো কোনো ফরয এমন আছে যে, তা ফরয হওয়ার জন্য উক্ত ফরযটি আদায় করার সামর্থ্য থাকতে হয়। যেমন হজ। কুরআনে কারীমে হজ ফরয করা হয়েছে আদায়ের সামর্থ্য থাকার শর্তে –من استطاع إليه سبيلا ।

এ ধরনের ফরযের ক্ষেত্রে সামর্থ্য না থাকলে অর্জন করা ফরয নয়। যেমন যার অর্থ সম্পদ নেই, হজ আদায়ের জন্য তাকে অর্থ সম্পদ কামাই করতে হবে না। যেহেতু অর্থ সম্পদ না থাকলে হজ ফরযই নয়।

পক্ষান্তরে শরীয়তের কিছু ফরয আছে যেগুলো আদায়ের সামর্থ্য না থাকলেও ফরয। তাই সামর্থ্য না থাকলে ফরয আদায়ের জন্য সামর্থ্য অর্জন করা জরুরী। যেমন ঋণ, স্ত্রী সন্তানের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। জিহাদ ফরযটি এ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি প্রসঙ্গে ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০হি.) বলেন,

وإن قالوا للمسلمين: وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا- فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك لقوله تعالى: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون} [آل عمران: 139] . ولأن الجهاد فرض، فإنما طلبوا الموادعة على أن تترك فريضة، ولا يجوز إجابتهم إلى مثل هذه الموادعة، كما لو طلبوا الموادعة على أن لا يصلوا ولا يصوموا، إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم المسلمون، فحينئذ لا بأس بأن يوادعهم إلى أن يظهر للمسلمين قوة

ثم ينبذ إليهم ... وهو بمنزلة إنظار المعسر إلى الميسرة، كما قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .
شرح السير الكبير ص: 190-

কাফেররা যদি প্রস্তাব দেয় 'চল আমরা চুক্তি করে নিই যে, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়বো না, তোমরাও আমাদের বিরুদ্ধে লড়বে না' তাহলে এ প্রস্তাবে সাড়া দেয়া মুসলমানদের অনুচিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা হীনমন্য হয়ো না চিন্তিতও হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী হবে'। -আলে ইমরান ১৩৯

তাছাড়া কথা হলো, জিহাদ ফরয। তারা একটি ফরয ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করছে। এ ধরনের প্রস্তাবে সায় দেয়া জায়েয হবে না। যেমন জায়েয হতো না যদি তারা এ শর্তে চুক্তির প্রস্তাব দিতো যে, মুসলিমরা নামায-রোযা করতে পারবে না। হাঁ, কাফেররা যদি এত শক্তির অধিকারী হয় যে, মুসলমানরা তাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না, তাহলে চুক্তি করতে সমস্যা নেই। পরে যখন মুসলিমদের শক্তি অর্জিত হবে চুক্তি রহিত করে দেবে (এবং কিতাল করবে)। ... এ অপশনটি মূলত ঋণ আদায়ে অপারগ ব্যক্তিকে সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার অনুরূপ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

‘দেনাদার অস্বচ্ছল হলে স্বচ্ছলতা লাভ পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে’। -বাকারা: ২৮০ (শরহুস সিয়ারিল কাবির: ১৯০)

বুঝা গেল, জিহাদ ঋণের মতো। সামর্থ্য না থাকার সময়ও ঋণের মতো তা ফরয।

ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেন,

كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُعْسِرِ السَّعْيُ فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَالِ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ إلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَكَمَا يَجِبُ الِاسْتِعْدَادُ لِلْجِهَادِ بِإِعْدَادِ الْقُوَّةِ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ فِي وَقْتِ سُقُوطِهِ لِلْعَجْزِ فَإِنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ بِخِلَافِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْحَجِّ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُهَا لِأَنَّ الْوُجُوبَ هُنَا لَا يَتِمُّ إلَّا بِهَا. - مجموع الفتاوى: 28/ 259

যেমনিভাবে অভাবী ঋণগ্রস্তের জন্য ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করা ফরয, যদিও নগদে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হবে না। এবং যেমন সামর্থ্য না থাকার সময়ে যখন (এ মূহুর্তে) জিহাদ করা ফরয থাকে না, তখন শক্তি

অর্জন ও পালিত ঘোড়া প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ফরয। কারণ যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় করা যায় না, তাও ফরয। পক্ষান্তরে হজ ইত্যাদির সামর্থ্যের বিষয়টা এর ব্যতিক্রম। এখানে সামর্থ্য অর্জনের চেষ্টা করা ফরয নয়। কারণ, এখানে সামর্থ্য ব্যতীত বিধানটি ফরযই হয় না। – মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯

বুঝা গেল, হজ ইত্যাদির মতো বিধান সামর্থ্য না থাকলে ফরযই হয় না। পক্ষান্তরে জিহাদের মতো বিধান সামর্থ্য না থাকলেও ফরয। উম্মাহর উপর তা ঋণ হয়ে থাকবে। সামর্থ্য অর্জন করে তা আদায় করতে হবে। সামর্থ্য নেই বাহানায় বসে থাকার সুযোগ নেই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

***

ফিকহুল জিহাদ: ০৫- সংশয়: জিহাদ ফরযে আইন হলে যুদ্ধবিরতি চুক্তি জায়েয নেই

সংশয় ০২

এ সংশয়টি জিহাদি ভাইদের। এটি জিহাদবিমুখ ভাইদের ঠিক বিপরীত। এ সংশয়টিকে দু'টি পয়েন্টে ভাগ করতে পারি:

এক. জিহাদ ফরযে আইন হলে যুদ্ধবিরতি চুক্তি জায়েয নেই

দুই. জিহাদ ফরযে আইন হলে আসকারি ই'দাদ সর্বাবস্থায় সকলের জন্য আবশ্যক, কোনো মারহালায় বন্ধ রাখার কোনো সুযোগ নেই

***

সংশয়: এক. জিহাদ ফরযে আইন হলে যুদ্ধবিরতি চুক্তি জায়েয নেই

জিহাদবিমুখ পক্ষ ই’দাদ ফরয হওয়াকেই অস্বীকার করছে, ঠিক বিপরীতে অনেক জিহাদি ভাই সর্বাবস্থায় যুদ্ধ জারি রাখা ফরয ভাবছেন। প্রতিপক্ষের সাথে চুক্তি করে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ রাখাকে নাজায়েয ভাবছেন। তারা মনে করছেন, জিহাদ যখন ফরযে আইন তখন আর যুদ্ধ ব্যতীত কোনো পথ নেই। প্রতিপক্ষের সাথে চুক্তি করে যুদ্ধ বন্ধ রাখা নাজায়েয। কাফের পক্ষ যতদিন আমাদের ভূমি ছেড়ে যাচ্ছে না, ততদিন তাদের সাথে চুক্তি জায়েয নেই। আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. আদদিফা আন আরাদিল মুসলিমিন কিতাবে এ ব্যাপারে কিছুটা আলোচনাও করেছেন। সেখান থেকেও কারো কারো সংশয়টা সৃষ্টি হতে পারে। ফলে তালেবান বা অন্য কোনো জিহাদি দল কাফের পক্ষের সাথে চুক্তি করলে তারা সেটাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন।

প্রথমে এখানে একটি কথা বুঝে নিতে হবে যে, যুদ্ধবিরতি চুক্তির অর্থ উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ রাখবে। এমন না যে মুসলিম পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ রাখবে আর কাফের পক্ষ আমাদের হত্যা করতে থাকবে। এ ধরনের চুক্তি তো জায়েয হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। কোনো হকপন্থী জিহাদি দল তা করতেও পারে না। কাফেররা যখন আমাদের উপর হামলা করতে থাকবে তখন

প্রতিরোধ করা আবশ্যক। তখন কোনো চুক্তি নেই। আগে কোনো চুক্তি থাকলে সে চুক্তি ভেঙে যাবে। আমরা যে চুক্তির কথা আলোচনা করতে যাচ্ছি তা হল, উভয় পক্ষ চুক্তি করে সাময়িক যুদ্ধ বন্ধ রাখছে বা কমিয়ে আনছে। এ ধরনের চুক্তির কি বিধান?

কোনো কোনো ভাইয়ের ধারণা, কাফেররা যতদিন মুসলিম ভূমিতে দখলদারিত্ব কায়েম রাখছে ততদিন তাদের সাথে কোনো ধরনের চুক্তি জায়েয নেই। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। চুক্তি করলে নাজায়েয হবে।
আসলে এ ধারণা অনেকাংশে সঠিক হলেও সর্বাবস্থায় যে তা সহীহ তা নয়। চুক্তি করে সাময়িক জিহাদ বন্ধ রাখা জায়েয হওয়া না হওয়া নির্ভর করে চুক্তিটি মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর না'কি ক্ষতিকর?

এখানে এসে দু'টি ভাগ হবে:
ক. যদি মুসলিমদের যথাযথ শক্তি থাকে, কাফেরদের বিতাড়িত করার সামর্থ্য থাকে, তাহলে চুক্তি করে যুদ্ধ বন্ধ রাখা নাজায়েয। এতে মুসলমানদের কোনো কল্যাণ নেই। অহেতুক

একটি ফরয আদায়ে বিলম্ব হচ্ছে। কাফেরদের দখলদারিত্ব দীর্ঘায়িত হচ্ছে। তা জায়েয হবে না।

খ. পক্ষান্তরে মুসলিমদের যদি সে পরিমাণ শক্তি না থাকে, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে কিছুদিন যুদ্ধ বন্ধ রেখে ই’দাদ করে সামর্থ্য অর্জন করে নেয়াই ভাল মনে হয়, তাহলে সে চুক্তি জায়েয। এখানে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে বন্ধ নেই। আমরা নতুন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি। সবকিছু গুছিয়ে আনতে আমাদের কিছু সময় দরকার। এরই স্বার্থে আমরা যুদ্ধ বন্ধ রাখছি। এ ধরনের চুক্তি জায়েয। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মক্কাবাসীর সাথে দশ বৎসর যুদ্ধ বন্ধ রাখার চুক্তি করেছেন।

এমনকি অবস্থা যদি বেগতিক হয় তাহলে আমরা কাফেরদেরকে কিছু অর্থ-কড়ি প্রদান করবো শর্তেও চুক্তি করা জায়েয। এটি মুসলিমদের জন্য নিতান্ত অপমানজনক হলেও নিরুপায় অবস্থায় তা করা জায়েয। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকদেরকে মদীনার খেজুরের এক তৃতীয়াংশ দেবেন শর্তে চুক্তি করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য সাহাবায়ে কেরাম এ ধরনের অপমানজনক চুক্তির চেয়ে

মোকাবেলাকেই প্রাধান্য দিলেন। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তি বাদ দিলেন। তবে যেহেতু রাসূল নিজে চুক্তি করতে রাজি হয়েছিলেন, বুঝা গেল নিরুপায় অবস্থায় এ ধরনের চুক্তিও জায়েয।

মোল্লা আলী কারি রহ. (১০১৪হি.) বলেন,

ولو حاصر العدوّ المسلمين، وطلبوا الصلح بمالٍ يأخذونه من المسلمين، لا يفعل ذلك (الإمام)، لما فيه من إعطاء الدَّنيّة وإلحاق المذلة بالمسلمين، إلاّ إذا خاف الهلاك، لأن رفع الهلاك بأي طريق أمكن واجبٌ. وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أن يصرف الكفّار عن المسلمين بثلث ثمار المدينة كلَّ سنة. -فتح باب العناية: 6/ 84

শত্রুরা যদি মুসলিমদের অবরোধ করে মালের বিনিময়ে চুক্তির আহ্বান জানায় তাহলে ইমামুল মুসলিমিন এ ধরনের প্রস্তাবে সাড়া দেবেন না। কারণ, এটি মুসলিমদের জন্য অবমাননাকর। তবে যদি আশঙ্কা হয় যে, চুক্তি না করলে ধ্বংস হতে হবে, তাহলে সমস্যা নেই। কারণ, যেভাবেই সম্ভব ধ্বংসের হাত থেকে আত্মরক্ষা জরুরী। আর কেনোই বা নাজায়েয হবে অথচ স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাবের যুদ্ধে প্রতি বৎসর মদীনার এক তৃতীয়াংশ খেজুর প্রদানের শর্তে

কাফেরদের অবরোধ হটাতে মনস্থির করেছিলেন। -ফাতহু বাবিল ইনায়া: ৬/৮৪

সংঘবদ্ধ মুরতাদ দলের সাথে চুক্তি প্রসঙ্গে ইমাম সারাখসি রহ. (৪৯০হি.) বলেন,

وإن طلب المرتدون ... الموادعة مدة لينظروا في أمورهم فلا بأس بذلك إن كان ذلك خيرا للمسلمين، ولم يكن للمسلمين بهم طاقة؛ لأنهم لما ارتدوا دخلت عليهم الشبهة، ويزول ذلك إذا نظروا في أمرهم، وقد بينا أن المرتد إذا طلب التأجيل يؤجل إلا أن هناك لا يزاد على ثلاثة أيام لتمكن المسلمين من قتله، وههنا لا طاقة بهم للمسلمين فلا بأس بأن يمهلوهم مقدار ما طلبوا من المدة لحفظ قوة أنفسهم ولعجزهم عن مقاومتهم، وإن كانوا يطيقونهم، وكان الحرب خيرا لهم من الموادعة حاربوهم؛ لأن القتال معهم فرض إلى أن يسلموا قال الله تعالى: {تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16]، ولا يجوز تأخير إقامة الفرض مع التمكن من إقامته. -المبسوط للسرخسي (10/ 117)

মুরতাদরা যদি একটা সময় পর্যন্ত চুক্তি করে নেয়ার প্রস্তাব দেয় যাতে তারা আরও চিন্তা ভাবনা করে দেখতে পারে, তাহলে যদি চুক্তি মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং মুরতাদদের বশীভূত করার শক্তি তাদের না থাকে তাহলে চুক্তি করতে সমস্যা নেই। কেননা, তারা যখন মুরতাদ হয়ে গেছে

তখন ইসলামের ব্যাপারে তাদের অবশ্যই কোনো সংশয় দেখা দিয়েছে। চিন্তাভাবনা করে দেখলে হয়তো সে সংশয় দূর হয়ে যাবে। আমরা আগে বলে এসেছি যে, মুরতাদ যদি সময় চায় তাহলে সময় দেয়া হবে। অবশ্য সেখানে তিন দিনের বেশি সময় দেয়া হবে না; যেহেতু আমরা তাকে হত্যা করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে এখানে তাদের বশীভূত করার শক্তি মুসলিমদের নেই। তাই তারা যে পরিমাণ সময় চেয়েছে সে পরিমাণ অবকাশ দিতে সমস্যা নেই। যাতে মুসলিমরা নিজেদের শক্তি সংরক্ষণ করতে পারে। অধিকন্তু যেহেতু তারা তাদের মোকাবেলা করতে এ মূহুর্তে অক্ষম। পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের মোকাবেলা করার সামর্থ্য রাখে এবং চুক্তির চেয়ে যুদ্ধই অধিক উপকারী হয় তাহলে যুদ্ধই করতে হবে। কারণ, মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাওয়া ফরয। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়'। -সূরা ফাতহ: ১৬ আর সামর্থ্য থাকাবস্থায় কোনো ফরয কায়েমে বিলম্ব করা জায়েয নয়। -মাবসূত: ১০/১১৭

অর্থাৎ দারুল ইসলামের কোনো মুসলিম যদি মুরতাদ হয়ে যায়

এবং তাকে কাজির দরবারে হাজির করা হয়, তাহলে তিন দিনের বেশি সময় দেয়া হবে না। এর মধ্যে মুসলমান হলে ভাল অন্যথায় হত্যা করে দেয়া হবে। কিন্তু গোটা একটা ভূখণ্ডই যদি মুরতাদ হয়ে যায়, সেখানে তারা দখলদারিত্ব কায়েম করে এবং তাদের ধরে হত্যা করার শক্তি মুসলিমদের না থাকে, তাহলে শক্তি অর্জন ও সুযোগ সন্ধানের জন্য মুরতাদদের সাথে চুক্তি করে নেয়া জায়েয। স্বাভাবিক অবস্থায় যদিও মুরতাদকে তিন দিনের বেশি সময় দেয়া হবে না, কিন্তু যখন তারা সংঘবদ্ধ বাহিনিতে পরিণত হয়েছে, তাদের হত্যা করার সামর্থ্যও আমাদের নেই, তখন সামর্থ্য অর্জন ও ফুরসত পাওয়ার লক্ষ্যে চুক্তি করে নিতে সমস্যা নেই।

ইবনে নুজাইম রহ. (৯৭০হি.) বলেন,

وأطلق في جواز صلح المرتدين وهو مقيد بما إذا غلبوا على بلدة وصار دارهم دار الحرب وإلا فلا؛ لأن فيه تقرير المرتد على الردة وذلك لا يجوز. -البحر الرائق: 5/ 86

কানযুদদাকায়িক গ্রন্থকার মুরতাদদের সাথে চুক্তি বৈধ হওয়ার কথাটা নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করলেও এটি মূলত ঐ হালতে প্রযোজ্য যখন তারা কোনো ভূখণ্ডে দখলদারিত্ব কায়েম করে

এবং তাদের ভূখণ্ডটি দারুল হারবে পরিণত হয়। অন্যথায় জায়েয নয়। কেননা, তখন তো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুরতাদকে তার রিদ্দাহর উপর বহাল রাখা হচ্ছে। আর তা জায়েয নয়। -আলবাহরুর রায়িক: ৫/৮৬

খোলাসা কথা দাঁড়াচ্ছে, যখন আমরা এ মূহুর্তে কাফেরদের পরাভূত করতে পারছি না, তখন যদি যুদ্ধ বন্ধ রেখে এ সুযোগে ই'দাদ করে নেয়াই ভাল মনে হয়, তাহলে চুক্তি করা যাবে। এটি বাহিরের কাফেরের সাথে যেমন জায়েয, মুসলিম ভূমিতে দখলদার কাফেরের সাথেও জায়েয। যেমন আমরা মাবসূত ও বাহরের বক্তব্যে দেখেছি যে, মুরতাদরা দারুল ইসলামের একটা ভূখণ্ড দখল করে নেয়ার পরও মুনাসিব মনে হওয়ায় তাদের সাথে চুক্তি করা জায়েয হয়েছে। অথচ এখানে মুরতাদদের হত্যা করা এবং তাদের কবল থেকে দারুল ইসলাম উদ্ধার করা ফরয ছিল। তথাপিও মাসলাহাতের বিবেচনায় ই'দাদের স্বার্থে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি জায়েয হচ্ছে। আমেরিকার সাথে তালেবানের চুক্তিকে আমরা এ দৃষ্টিতেই বিবেচনা করি। তদ্রূপ কাবুল প্রশাসনের সাথে যদি তালেবানদের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয় তাহলে এটাকেও আমরা

ইনশাআল্লাহ এ দৃষ্টিতেই দেখবো। না জেনে না বুঝে আমরা অনর্থক মুজাহিদদের সমালোচনা করবো না। বিশেষত যারা চার দশক ধরে সুপার পাওয়ারদের সাথে লড়ে আসছেন। তাদের ময়দানের অবস্থা তারাই ভাল জানেন। রাজনৈতিক মারপ্যাঁচও আলহামদুলিল্লাহ তারা ভাল বুঝেন। এমনকি তালেবান নিজেরা স্পষ্ট বলেছেনও যে, এ সুযোগে তারা দ্রুত অগ্রগতি করে নেবেন। তখন দূরে থেকে বিরূপ ধারণা পোষণ করা বড়ই গর্হিত কাজ হবে। অন্যান্য মুখলিস মুজাহিদদের বিষয়টাকেও আমরা ইনশাআল্লাহ এভাবেই দেখবো। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআলা আ'লাম।

***

ফিকহুল জিহাদ: ০৬- সংশয়: কোনো সময় আসকারি ই'দাদে বিরতি দেয়ার কোনো সুযোগ কারো জন্য নেই

সংশয় দুই

জিহাদ ফরযে আইন হলে আসকারি ই’দাদ সর্বাবস্থায় সকলের জন্য আবশ্যক, কোনো অবস্থায় কারো জন্য বন্ধ রাখার কোনো সুযোগ নেই

এ সংশয়টিও জিহাদি ভাইদের। ইতোমধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বুঝতে পারলাম, জিহাদ ফরয। জিহাদের প্রয়োজনে ই’দাদও ফরয। সামর্থ্য নেই বাহানায় বসে থাকার সুযোগ নেই। সামর্থ্য না থাকায় আপাতত জিহাদ বন্ধ রাখার সুযোগ আছে। তা এমনিতেই হোক বা প্রয়োজন পড়লে কাফের-মুরতাদদের সাথে চুক্তি করেই হোক। তবে ই’দাদ লাগবে। ই’দাদের ফরয থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই।

যেকোনো যুদ্ধের জন্য বহুমুখী ই’দাদের প্রয়োজন। বিশেষ করে

বর্তমান গোটা কুফরি ও তাগুতি বিশ্ব মুসলিমদের বিরুদ্ধে। সে তুলনায় মুজাহিদদের সংখ্যা এবং সামর্থ্য নিতান্তই কম। কাজেই প্রতিটি কদম হিসেব করে ফেলতে হবে। নয়তো অঙ্কুরেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট। হিসেব নিকেশ না বুঝার কারণে আই এসের কি দশা আমরা নিজেরা স্বচক্ষেই দেখেছি।

যেহেতু আমাদের সংখ্যা ও সামর্থ্য নিতান্তই কম তাই সরাসরি সংঘর্ষে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি এ মূহুর্তে আমাদের নেই। আমাদের এখন মাঠ প্রস্তুত করার মারহালা। এ এক দীর্ঘ মারহালা। জাতির অধঃপতন যেমন হয়েছে দীর্ঘ দিনে, ঘুরে দাঁড়াতেও সময় লাগবে। দাওয়াত ও তাহরিদ থেকে শুরু করে কিতাল পর্যন্ত অনেক মারহালা পার হয়ে আমাদের চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামতে হবে। এটি দু'চার দিনের ব্যাপার নয়, দু'চার বছরেরও নয়।

এখন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ালো, আমাদের কি কি মারহালা পার হতে হবে? এ মারহালাগুলোতে আমাদের কাজের ধরন কি

হবে? এর জন্য সময় কত লাগবে?

সময়ের ব্যাপারে কথা সেটাই যেটা তালেবানরা তাদের আলোচনার ব্যাপারে বলেছেন। অনেকে জিজ্ঞেস করছেন যে, তালেবানদের আলোচনা কখন শেষ হবে? তাঁরা উত্তর দিয়েছেন-

যুদ্ধ দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ চলছে। আমাদের মূল বিষয় হলো, সমাধান ও ইসলামি শাসন কায়েম। এটাই মূল বিষয়। সময় কম বেশি কথা না। চল্লিশ বৎসরের আগুন এক দু দিনে নিভবে না। কাজেই সময় কত দিন লাগবে সেটা বিষয় না, সমাধান হচ্ছে কি'না সেটা বিষয়। এর জন্য দীর্ঘ সময় লাগতে পারে।

ই'দাদের ব্যাপারেও একই কথা: সময় কতদিন লাগছে সেটা বিষয় না, যে মারহালায় যতটুকু প্রস্তুতি পূর্ণ হওয়ার দরকার, হচ্ছে কি'না সেটাই মূল বিষয়।

যেহেতু আগের মারহালাগুলো পূর্ণ সম্পন্ন হওয়া ছাড়া আমরা কিতালের মারহালায় যেতে পারছি না, তাই সেগুলো সম্পন্ন করা আবশ্যক। আর প্রত্যেক মারহালার ই’দাদ তার ধরন অনুযায়ী। আবার সে মারহালায় সকল মুজাহিদ যে একই কাজ করবে তাও না। একেক জনের একেক কাজ। যখন যেটা প্রয়োজন। যার জন্য যেটা মুনাসিব। যে ভাই যে কাজের উপযুক্ত। এভাবে মারহালাগুলো পার করতে হবে। এ হিসেবে কেউ হয়তো লেখালেখির কাজ করবেন। কেউ দাওয়াহর কাজ। কেউ মিডিয়ার কাজ। কেউ আসকারি ই’দাদ। এভাবে কাজ ভাগ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আসকারি ই’দাদ ছাড়া জিহাদ সম্ভব না এটাই বাস্তব। তবে সে মারহালায় পৌঁছতে যে ই’দাদগুলো লাগে সেগুলো আগে পূর্ণ করতে হবে। আজই যদি সবাই চাপাতি হাতে ময়দানে নেমে পড়ে তাহলে যে ফাতাহ হয়ে যাবে তা না। বর্তমান গ্লোবাল বিশ্বে এটা সম্ভব না। তাই হিসেব করে এগুতে হবে। কোনো কাজ আগে কোনো কাজ পরে। কোনো ভাইয়ের জন্য হয়তো এখন আসকারি ই’দাদ মুনাসিব। কোনো ভাইয়ের জন্য হয়তো ইলমি ই’দাদ মুনাসিব। যার জন্য যেটা মুনাসিব তানজিম সে হিসেবে ভাগ করে দায়িত্ব দিয়ে থাকে। আমাদের উচিৎ তানজিমের ফায়সালা মেনে

আনুগত্যের সাথে কাজ করে যাওয়া।

হ্যাঁ, একটা সময় আসবে যখন মোটামুটি সকলকেই অস্ত্র ধরার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সে মারহালায় কেউ আসকারি ই'দাদ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তবে সে মারহালা আসার আগ পর্যন্ত যে ভাইকে যে কাজ দেয়া হয় সেটা করার মাঝেই খায়র। এমন মনে করা ঠিক হবে না যে, জিহাদ ফরয তাহলে আমাকে কেন অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে দেয়া হচ্ছে না? আপনি যেটা করছেন সেটাও জিহাদের অংশ। ই'দাদের অংশ। এখন এ মারহালা আপনি পার হোন। সামনে যখন আপনাকে আসকারি ই'দাদের আদেশ দেয়া হবে তখন মনে প্রাণে করবেন।

অধিকন্তু স্বাভাবিক বডি ফিট রাখতে যে ধরনের শারীরিক প্রশিক্ষণ দরকার, যেগুলো মোটামুটি নজর এড়িয়ে করা যায়, সেগুলোতে তানজিম সব সময়ই উৎসাহ দিয়ে থাকে। বরং অনেক ক্ষেত্রে নিয়মও করে দেয়। সেগুলো করতে থাকুন। মনে রাখবেন জিহাদের কোনো মারহালাই কম গুরুত্বের নয়। আসকারি কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না বাহানায় অন্য কাজে শিথিলতা করা ইখলাস পরিপন্থী; বরং নিফাকের আলামত। আল্লাহ আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন।

ইশকাল

আপনি হয়তো বলবেন, সবার উপর একই সাথে সব ধরনের ই’দাদ (যার মাঝে অস্ত্র চালনাও শামিল) আরোপ করলে সমস্যা কি?

উত্তর

সমস্যার কারণেই তো ভাগ করা হয়।

যেমন ধরুন কোনো একজন ভাই ভার্সিটিতে পড়েন। আবাসিক থাকেন। সব ধরনের ছাত্রই সেখানে থাকে। বিএনপি, জামাত, আওয়ামিলীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, তাবলীগ, নাস্তিক, মুরতাদ, ধর্মনিরপেক্ষ, মুসলিম, হিন্দু সব। কে দাড়ি রাখলো, কে নামায পড়লো, কে জিহাদি বই পড়লো সব কিছুর হিসাব হয়। এমন একটা পরিবেশে ভাইয়ের জন্য অস্ত্র চালনার ট্রেনিং নেয়া সহজ নয়। তাওহিদ ও জিহাদের মৌলিক বুঝটুকু হাসিল করা বা দাওয়াহ দেয়াও তো এখানে কঠিন। তাকে আমরা বলতে পারি না, বাঁচেন আর মরেন আপনাকে অস্ত্র

চালনা শিখতেই হবে।

কিংবা ধরুন কোনো ভাই এমন একটা মাদ্রাসায় পড়েন যেটা জিহাদ বিরোধী। ছাত্ররা কি করে না করে নিয়মিত তদারকি হয়। এখানে আমরা বলতে পারি না, বাঁচেন আর মরেন অস্ত্র চালনা আপনাকে শিখতেই হবে। আমরা তাকে নিশ্চিত রিস্কে ফেলে কাজ করতে বলবো না অবশ্যই।

এজন্য একেক কাজের জন্য একেকটা গ্রুপ বাছাই করে নেয়া হয়। যার জন্য যে কাজ মুনাসিব ও সহজ। নজরে এড়িয়ে যে কাজ যার জন্য করা সহজ সেটাই করতে দেয়া হয়। এভাবে আস্তে আস্তে এগুতো এগুতো একদিন পূর্ণতায় পৌঁছা যাবে। আজই সব করতে গেলে সোনার হাসের পেট কেটে সোনার ডিম বের করার পরিণতি দাঁড়াবে। মূলনীতি আছে,

مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ

এজন্য ভাইদের জন্য এবং জিহাদের জন্যও কল্যাণকর এটাই হবে যে, তানজিমের আনুগত্য করা। যাকে যে কাজের মুনাসিব মনে করে যে মারহালায় যে কাজ যতটুকু দেয়া হয় সন্তুষ্টচিত্তে তা করে যাওয়া। অবশ্য আপনার পরামর্শ আপনি পেশ করতে পারেন। আপনার মতামত জানাতে পারেন। আপনিও তো তানজিমের একজন। আপনাদেরকে নিয়েই তো তানজিম। তবে আপনার মতামত গ্রহণ না হলে মন খারাপ করবেন না। মত দেয়া থেকে বিরতও হয়ে যাবেন না। আবার মন মতো কাজও করাও শুরু করে দেবেন না। আনুগত্য ছাড়া কখনও জিহাদের কাজ সফল হবে না। আর আপনার জিহাদও আনুগত্য ছাড়া কবুল হবে না। জিহাদ কবুল হওয়ার পাঁচ শর্তের একটা হলো আনুগত্য। আনুগত্যের বাহিরে চলে যাওয়ার কারণে উহুদের যুদ্ধে কি যে বিপদ নেমে এসেছিল তা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ। এজন্যই আল্লাহ তাআলা এ ঘটনাকে দীর্ঘ করে বয়ান করেছেন কুরআনে কারিমে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমাদের সকলের সকল মেহনত-প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.

ফিকহুল জিহাদ: জিহাদ উম্মাহর প্রত্যেকের দায়িত্ব!

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন তাঁর দ্বীনকে পূর্ণ করার জন্য। তাঁর দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (ছফ: ৯)

দ্বীনের বিজয় তখনই হবে যখন সারা দুনিয়ার সকল মানুষ একচ্ছত্রভাবে দ্বীনে ইসলামের আনুগত্য মেনে নেবে। আর তা দু'ভাবে হতে পারে।

এক. হয়তো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাবে।

দুই. কিংবা ইসলামী আইন দ্বারা শাসিত ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য মেনে নিয়ে জিযিয়া প্রদানপূর্বক মুসলামনদের অধীনস্ত হয়ে তাতে বসবাস করবে।

অতএব, কাফেরদের কোন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র থাকতে পারবে না। হয়তো মুসলমান হতে হবে, নয়তো ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্ত হয়ে থাকতে হবে। যেসব কাফের এই দুইটির কোন একটাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেন তিনি যেন তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করে যান, যতক্ষণ না তারা এ দুয়ের কোন একটা মেনে নিতে সম্মত হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(অত:পর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা করা এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে – মুসলমান হয়ে যায় – এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।)

[তাওবা: ৫]

তিনি আরো ইরশাদ করেন:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

(তোমরা কিতাল কর আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও

তার রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।)

[তাওবা: ২৯]

ইমাম জাসসাস রহ.বলেন:

فتضمنت الآيتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية.اهـ

"এ দুই আয়াত বুঝাচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া ফরয, যতক্ষণ না তারা হয়তো মুসলমান হয়ে যায়, নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়।"

[আহকামুল কুরআন: ৩/৫২১]

বুখারী শরীফে হযরত ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

"আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এই স্বাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই , মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে।" (সহীহ বুখারী: কিতাবুল ঈমান, হাদিস নং ২৫)

সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে:

عن سليمان بن بريدة عن ابيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امّر اميرا على جيش أو سرية ... قال: اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ... وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)، فايتهن ما اجابوك

فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فان هم ابوا فسلهم الجزية، فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.اهـ

"হযরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা - বুরাইদা রাদি. - থেকে বর্ণনা করেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোন বাহিনী বা সারিয়্যা-ছোট দলের আমীর নিযুক্ত করতেন ... তখন তাকে বলে দিতেন, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর নামে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে। ... যখন তুমি তোমার দুশমন মুশরেকদের মোকাবেলায় যাবে, তখন তাদেরকে তিনটি জিনিসের আহ্বান জানাবে। এর যে কোন একটায় তারা সম্মত হলে তুমি তাদের থেকে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা পরিত্যাগ করবে। (প্রথমত) তাদেরকে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। আর যদি তারা এতে অসম্মতি জানায় তাহলে জিযিয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায়, তাহলে তাদের থেকে তা গ্রহণ করে নেবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে। যদি তারা এতেও অসম্মতি জানায় তাহলে আল্লাহ তাআলার

কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে।”
[সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৭৩১; বাব: তা’মীরুল ইমামিল উমারা আ’লা বুয়ূস।]

অতএব, কাফেরদেরকে তাদের কুফরীতে ছেড়ে রাখার কোন অবকাশ নেই। হয়তো মুসলমান হতে হবে, নতুবা জিযিয়া দিয়ে যিম্মি হতে হবে। আল্লাহ তাআলার আইন মেনে নিয়ে মুসলমানদের অধিনস্থ হয়ে থাকতে হবে। স্বতন্ত্র পাওয়ার নিয়ে, নিজস্ব শক্তিবলে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহ তাআলার এই আদেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন।

তাঁর ওফাতের পর তাঁর খলিফা ও প্রতিনিধিরূপে প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয় অথবা জিযিয়া দিতে বাধ্য হয়।

ইমাম সারাখসী রহ. বলেন,

ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك ... وإن امتنعوا منهما فحينئذ يقاتلون ... وكل مسلم في هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد بعث داعياً إلى ما بينا وأمر بالقتال على ذلك مع من أبى.اهـ

“ইমামের জন্য যায়েয নেই কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিযিয়া প্রদানের আহ্বান ব্যতীতই ছেড়ে দেয়া, যখন তা সম্ভবপর হয়। ... তারা যদি এ উভয়টা থেকেই বিরত থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। ... প্রতিটি মুসলমান এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি। কেননা, তাঁকে পাঠানো হয়েছে উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাতে এবং যারা তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাঁকে আদেশ করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে। [শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/১২০]

অতএব, কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল করা উম্মাহর প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। এটা কেবল ইমামের দায়িত্ব নয় যে, তিনি করলে তো করলেনই আর না করলে উম্মাহকে এ ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসবাদ করা হবে না। যেহেতু এটি উম্মাহর সকলের উপর ফরয, কাজেই ইমাম থাকুক বা না থাকুক, করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় উম্মাহকে এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে। যে-ই এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবে সে-ই গোনাহগার হবে। কারো বাধার কারণে, কারো নিষেধের কারণে এ দায়িত্ব পালন থেকে দূরে সরা যাবে না। পিতা-মাতা, আত্নীয়-স্বজন, স্ত্রী-সন্তান কেউ এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। এমনকি স্বয়ং ইমামুল মুসলিমীনও যদি বাধা দেন তবুও না। বরং তার বাধা উপেক্ষা করে ফরয জিহাদের দায়িত্ব আদায় করতে হবে। কারণ, কারো শরিয়ত বিরোধী বাধা নিষেধের কারণে আল্লাহ তাআলার আদেশ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. ‘আসসিয়ারুল কাবীর’ এ বলেন:

وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفير عاما.اهـ

“ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ করে, তাহলে তাদের জন্য তার আদেশ অমান্য করা জায়েয হবে না। তবে যদি নফীরে আম এর হালত তৈরী হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।”

ইমাম সারাখসী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন:

لأن طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب كطاعة السيد على عبده فكما أن هناك بعد نهي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفير عاما فكذلك ها هنا. اهـ

“যেখানে ইমামের আদেশ পালন করতে গেলে নাফরমানীতে লিপ্ত হতে হয় না, সেখানে ইমামের আনুগত্য ফরয। যেমন, গোলামের জন্য তার মনিবের আনুগত্য ফরয। নফীরে আম না হলে যেমন মনিব নিষেধ করলে জিহাদে যাবে না, ইমামের

ক্ষেত্রেও তেমনি।”

[শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮]

মালিকী মাযহাবের কিতাব ‘ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক’ এ বলা হয়েছে:

قال ابن حبيب سمعت أهل العلم يقولون إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يزحمهم العدو وقال ابن رشد طاعة الإمام لازمة , وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين.اهـ

“ইবনে হাবীব রহ. বলেন, আমি আহলে ইলমদেরকে বলতে শুনেছি, ইমাম কোন মাসলাহাতের প্রতি লক্ষ্য করে কিতাল করতে নিষেধ করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তবে যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে ভিন্ন কথা। ইবনে রুশদ রহ.বলেন, ইমাম ন্যায় পরায়ণ না হলেও তার আনুগত্য আবশ্যক, যতক্ষণ না কোন গুনাহের আদেশ দেন। আর ফরযে আইন জিহাদে বাধা দেয়া গুনাহের কাজ।”

[ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক: ৩/৩]

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেন-

و لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهي عن جهاد الكفار و أمر بإسلام حريم المسلمين إليهم ...اهـ

“কুফরের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে বাধা দেয়া এবং মুসলমানদের ভূমিকে তাদের হাতে সমর্পণ করতে আদেশ করার চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই।”

[আল-মুহাল্লা: ৭/৩০০]

এমনকি যে ইমাম জিহাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার বিরুদ্ধে কিতাল করে তাকে অপসারণ করা ফরয।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:

فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، أو الصيام،

أوالحج، أو عن التزام تحريم الدماء، والأموال، والخمر، والزنا، والميسر، أو عن نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، وغير ذلك من واجبات الدين و محرماته التي لاعذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها: فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها و إن كانت مقرة بها، و هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.اهـ

“কিতাল করা হবে প্রত্যেক এমন জামাআতের বিরুদ্ধে যারা কোন ফরয নামায, রোযা বা হজ্ব আদায়ে অস্বীকৃতি জানায়; কিংবা অন্যায়ভাবে জান-মাল হরণ করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয়; কিংবা মদ, যিনা, জুয়া থেকে বিরত থাকতে বা নিজের মাহরাম মহিলাদেরকে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয়; কিংবা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বা আহলে কিতাবদের উপর জিযিয়া আরোপ করতে সম্মত না হয়; এছাড়াও দ্বীনের আবশ্যকীয় যে কোন বিধান বা যে কোন হারামকৃত বিষয়, যেগুলো অস্বীকার বা তরক করার ক্ষেত্রে কারো কোন ওযর ধর্তব্য নয় এবং যেগুলোর ফরয হওয়া অস্বীকারকারী কাফের বলে গণ্য হবে- কোন জামাআত যদি সেগুলো পালন করতে বা সেসব হারাম থেকে বিরত থাকতে সম্মত না হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। তারা যদি এসব বিধান স্বীকার করেও নেয় তবুও – আদায়ে বা বিরত থাকতে সম্মত না হলে – তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা

হবে। এতে ওলামাদের কারো কোন দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।”

[মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৫০৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি স্পষ্ট যে, জিহাদ ইমামের একক দায়িত্ব নয়, বরং উম্মাহর সকলের দায়িত্ব। কাজেই ইমাম থাক বা না থাক সর্বাবস্থায় এই ফরয দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

ফিকহুল জিহাদ: কাফেরদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিধান!

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ফরয যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয় অথবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। যুদ্ধবিরতি চুক্তির অর্থ হচ্ছে, উপরোক্ত দুইটির কোন একটি ছাড়াই জিহাদ বন্ধ করে দেয়া। কাজেই যুদ্ধের সামর্থ্য থাকা অবস্থায় তা জায়েয হবে না। তবে যদি মুসলমানদের মাঝে দুর্বলতা থাকে তাহলে (কাফেররা প্রস্তাব দিলে) যুদ্ধের পর্যাপ্ত শক্তি সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করতে পারবে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হবে ই'দাদ করে যুদ্ধের পর্যাপ্ত সামর্থ্য অর্জন করা। ই'দাদ ছেড়ে দিয়ে আরাম আয়েশে দিন কাটানোর উদ্দেশ্যে চুক্তি করা জায়েয হবে না। ই'দাদ করত পর্যাপ্ত শক্তি অর্জন হলে তখন কাফেরদেরকে অবগত করাবে যে, 'আমরা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম যুদ্ধ না করার। এখন আমরা উক্ত চুক্তি আর বহাল রাখতে চাচ্ছি না। এখন থেকে তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন চুক্তি নেই। তোমরা হয় ইসলাম গ্রহণ করবে নতুবা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হবে। অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।' তবে তাদেরকে অবগত না করিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া জায়েয হবে না। কেননা, তা গাদ্দারী। আর ইসলাম গাদ্দারী হারাম করেছে।

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. বলেন,

وإن قالوا للمسلمين: وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك لقوله تعالى: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون} [آل عمران: 139] . ولأن الجهاد فرض، فإنما طلبوا الموادعة على أن تترك فريضة، ولا يجوز إجابتهم إلى مثل هذه الموادعة، كما لو طلبوا الموادعة على أن لا يصلوا ولا يصوموا، إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم المسلمون، فحينئذ لا بأس بأن يوادعهم إلى أن يظهر للمسلمين قوة ثم ينبذ إليهم.

قال الله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61] .

وصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، ولأن حقيقة الجهاد في حفظ المسلمين قوة أنفسهم أولا، ثم في قهر المشركين وكسر شوكتهم، فإذا كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم كان عليهم أن يحفظوا قوة أنفسهم بالموادعة إلى أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم، فحينئذ ينبذون إليهم ويقاتلونهم، وهو بمنزلة إنظار المعسر إلى الميسرة، كما قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] .اهـ

“তারা যদি মুসলমানদের কাছে প্রস্তাব পেশ করে যে, তোমরা আমাদের সাথে এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হও যে, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না, তোমরাও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না; তাহলে মুসলমানদে জন্য এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া জায়েয

হবে না। কেননা,

(১). আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিতও হয়ো না (যে, ভয় ও হীনমন্যতার কারণে কাফেরদের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করে বসবে)। প্রকৃত মু’মিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।” [আলে ইমরান: ১৩৯]

(২). তাছাড়া (আরেকটি কারণ হচ্ছে,) জিহাদ ফরজ। তারা চাইছে আমরা আমাদের একটি ফরয পরিত্যাগ করার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হই। অথচ এ ধরণের চুক্তিতে সম্মত হওয়া জায়েয নয়। যেমন জায়েয নয় এই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যে, মুসলমানরা নামায পড়তে পারবে না, রোযা রাখতে পারবে না। তবে যদি তাদের শক্তি সামর্থ্য এত বেশি থেকে থাকে যদ্দরুণ মুসলমানরা তাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না, তাহলে ভিন্ন কথা। তখন তাদের সাথে ততদিনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া জায়েয আছে যতদিন না মুসলামনদের শক্তি সামর্থ্য অর্জন হয়। শক্তি সামর্থ্য অর্জন হলে তখন তাদেরকে অবগত করিয়ে পূর্বকৃত চুক্তি রহিত করে দেবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

(আর তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আপনিও সেদিকেই আগ্রহ প্রকাশ করুন।) [আনফাল: ৬১]

(৩). (আরেকটি দলীল হচ্ছে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার সময় মক্কাবাসীর সাথে দশ বছরের যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করেছিলেন।

(৪). তাছাড়া (আরোও একটি কারণ হচ্ছে,) জিহাদের হাকিকত হল, প্রথমত মুসলমানদের নিজেদের শক্তি হিফাযত করা, তারপর কাফেরদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া। যখন তারা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চূর্ণ করতে অক্ষম তখন তাদের কর্তব্য হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার সামর্থ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজেদের শক্তি হিফাযত করা। সামর্থ্য অর্জন হলে তখন তাদেরকে অবগত করিয়ে পূর্বকৃত চুক্তি রহিত করে দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে। (সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি চুক্তির) এই অবকাশ প্রদান, ঋণ পরিশোধে অক্ষম গরীব ব্যক্তিকে পরিশোধের সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত অবকাশ প্রদানের অনুরূপ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}

(আর যদি সে অস্বচ্ছল হয় তাহলে স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তার

অবকাশ রয়েছে।) [বাকারা: ২৮০]”

((শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/১৯০-১৯১))

***

লক্ষ্যনীয়:

১. আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

(আর তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আপনিও সেদিকেই আগ্রহ প্রকাশ করুন।) [আনফাল: ৬১]

এখানে বলা হয়েছে, কাফেররা যদি নিজে থেকে স্বেচ্ছায় মুসলমানদেরকে চুক্তির প্রস্তাব পেশ করে তাহলে প্রয়োজন বোধ হলে মুসলমানরা তাতে সম্মত হতে পারবে। কাজেই, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মুসলমানরাই আগে আগে নিজেদের থেকে কাফেরদেরকে চুক্তির প্রস্তাব দিতে পারবে না। যেমনটা আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন,

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم

(অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চুক্তির প্রতি আহ্বান জানিও না। তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে

আছেন।) [মুহাম্মাদ: ৩৫]

২. আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

(আর তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আপনিও সেদিকেই আগ্রহ প্রকাশ করুন।) [আনফাল: ৬১]

এটি কেবল ঐ অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন মুসলমানরা দুর্বলতার কারণে জিহাদ করতে সমর্থ্য না হয়। জিহাদের সামর্থ্য থাকা অবস্থায় এই আয়াত প্রযোজ্য। কাজেই, কেউ যদি এই আয়াত দিয়ে দলীল পেশ করে যে, সর্বাবস্থায় চুক্তি জায়েয, তাহলে তা গলদ হবে।

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন:

فالحال التي أمر فيها بالمسألة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم والحال التي أمر فيها بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم.اهـ

"সন্ধির আদেশ দেয়া হয়েছে ঐ অবস্থায় যখন মুসলমানগণ সংখ্যায় থাকে অল্প আর শত্রু সংখ্যা অনেক। আর মুশরেকদেরকে কতল করা এবং আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হওয়া পর্যন্ত কিতাল করে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে যখন মুসলমানরা সংখ্যায় হয় অনেক

এবং শত্রুদের উপর হয় ক্ষমতাবন।” [আহকামুল কুরআন: ৩/৯০]

৩. যুদ্ধের সামর্থ্য না থাকলে ই’দাদ-জিহাদের প্রস্তুতি ফরয। যেমনটা আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত কর, যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখবে এবং ঐ সব দুশনমনকেও যাদেরকে তোমরা জাননা কিন্তু আল্লাহ জানেন।” [আনফাল: ৬০]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:

يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.اهـ

“সামর্থ্য না থাকার কারণে জিহাদ করা সম্ভব না হলে, শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করার মাধ্যমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ ফরয হবে। কেননা, যে জিনিস ব্যতীত ফরয আদায় করা সম্ভব না হয় সেটাও ফরয হয়ে থাকে।” [মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৫৯]

ইমাম সারাখসী রহ. তাঁর বক্তব্য-

وهو بمنزلة إنظار المعسر إلى الميسرة، كما قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280]. اهـ

“(সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি চুক্তির) এই অবকাশ প্রদান, ঋণ পরিশোধে অক্ষম গরীব ব্যক্তিকে পরিশোধের সামর্থ্য অর্জন হওয়া পর্যন্ত অবকাশ প্রদানের অনুরূপ।”

তাঁর এই বক্তব্যে তিনি এ বিষয়টির প্রতিই ঈঙ্গিত করেছেন। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য না থাকলে তার থেকে ঋণের দায়িত্ব রহিত হয়ে যায় না। ঋণ মাফ হয়ে যায় না। ঋণের দায়িত্ব তার উপর থেকেই যাবে। পরিশোধ তাকে করতেই হবে। তবে সামর্থ্য না থাকার কারণে আপাতত তাকে চাপ দেয়া হবে না। কিন্তু তার উপর ফরয হবে ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থ উপার্জন করা। সামর্থ্য নেই অজুহাত দেখিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই।

তদ্রূপ, জিহাদের সামর্থ্য না থাকলে জিহাদের দায়িত্ব রহিত হয়ে যায় না। জিহাদ মাফ হয়ে যায় না। জিহাদ ফরয থেকেই যাবে। আদায় করতেই হবে। তবে সামর্থ্য না থাকার কারণে এক্ষুনি জিহাদে নেমে যাওয়া ফরয থাকবে না। কিন্তু জিহাদ আদায় করার জন্য ই’দাদ-জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ ফরয হবে।

সামর্থ্য নেই অজুহাত দেখিয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। মোটকথা, ঋণ আদায়ে অক্ষম ব্যক্তির উপর যেমন উপার্জন ফরয, জিহাদের সামর্থ্য না থাকলেও তদ্রূপ ই'দাদ ফরয।

বি.দ্র: যখন ইকদামী তথা আক্রমণাত্মক জিহাদের জন্যই ই'দাদ ফরয, তখন দিফায়ী তথা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের জন্য ই'দাদ ফরয হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকতে পারে!! কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মুসলিম ভূমি কাফেরদের হাতে থাকা সত্ত্বেও, প্রতিটি ভূমিতে মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত হতে থাকা সত্ত্বেও আলেম উলামারা বলে বেড়াচ্ছে, জিহাদ ই'দাদ কোনটাই ফরয নয়। তারা না ইকদামী জিহাদকে ফরয বলছে, না দিফায়ী জিহাদকে ফরয বলছে, না কোনটার জন্য ই'দাদকে ফরয বলছে। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!

মুফতী তাকী উসমানী এবং ইসলামী খেলাফত ও রাজনীতি-১

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد...

ইসলামী খেলাফত, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাকী উসমানী সাহেব 'ইসলাম আউর সিয়াসী নজরিয়্যাত' নামে একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটি বাংলাদেশে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। কোন কোন দারুল ইফতায় এটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নেসাবভুক্ত করা হয়েছে। বাংলায় এর একাধিক তরজমাও হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে আলেম উলামাদের অনেকের কাছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ময়দানে কিতাবটি দিশারী হিসেবে গৃহিত হয়েছে। কিতাবটি হাতে পেয়ে অনেকে যেন বর্তমান সময়ের অনেক জটিল সমস্যার সঠিক সমাধান পেয়ে

গেছেন। ইসলামী রাজনীতির সঠিক নির্দেশনা পেয়ে গেছেন বলে মনে করছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দুস্তানী একজন লেখকের এমন একটি কিতাবকে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের চলার পথের পাথেয় ও যথাযোগ্য রাহবার বলে মনে করছেন। কিতাব ও কিতাবের লিখককে হিন্দুস্তানের গৌরব বলে মনে করছেন।

কিন্তু যারা দ্বীনে ইসলামের মেজাজ সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখেন; ইসলামী খেলাফত, রাষ্ট্রনীতি ও ইসলামী ফিকহ সম্পর্কে মোটামুটি অবগত আছেন এবং বর্তমান বিশ্ব-শাসনব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে কিছুটা সচেতন রয়েছেন- তাদের কাছে আশাকরি অস্পষ্ট থাকবে না যে, কিতাবটিতে মূলত সঠিক ইসলামী খেলাফত ও রাষ্ট্রনীতি পেশ করার নাম করে প্রচলিত ইসলাম বিরোধি শাসনব্যবস্থাকে ইসলামের নামে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এ হিসেবে কিতাবটিকে হিন্দুস্তানের গৌরব গণ্য করার পরিবর্তে হিন্দুস্তান থেকে উদ্ভূত এক ফিতনা বলে গণ্য করা উচিৎ।

কিতাব সম্পর্কে মন্তব্য:

সার কথায় যদি কিতাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে চাই তাহলে বলা যায়,

১. কিতাবের লিখক মনে হয় হীনমন্যতার শিকার, যার বহি:প্রকাশ তার এ কিতাবে ঘটেছে। বর্তমান কুফরী শাসন ব্যবস্থা এবং কাফের ও তাদের দালালদের জয় জয়কার দেখে তিনি হয়তো ভড়কে গিয়েছেন। ফলে তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সঠিক মেজাজ তুলে ধরার পরিবর্তে ইসলামকে বরং যেন আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়ে তার পক্ষে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

২. কাফেররা যে ইসলাম ও মুসলামনদের দুশমন, ইসলাম গ্রহণ কিংবা ইসলামী হুকুমতের অধীনস্থ হয়ে জিযিয়া দিয়ে জীবন যাপনের অধিকার লাভ ব্যতীত যে তাদের দুনিয়াতে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই- এই ধ্রুব সত্যটি তুলে ধরার পরিবর্তে তিনি কাফেরদের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ, তাদের সাথে উত্তম আচরণ, তাদের সাথে কৃত চুক্তি রক্ষার গুরুত্ব

ইত্যাদী নরম নরম বিধানাবলীর আলোচনা মন ভরে করেছেন। তাদের সাথে জিহাদের ঘোষণা না দিয়ে বরং সমঝোতার পথ বেঁচে নিয়েছেন। পরিণতিতে কিতাবটিতে ইসলামের সঠিক মেজাজ চরমভাবে প্রহসনের শিকার হয়েছে।

৩. জিহাদের আলোচনা অতি সংক্ষিপ্তাকারে করেছেন অথচ কাফেরদের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ, তাদের সাথে উত্তম আচরণ, তাদের সাথে কৃত চুক্তি রক্ষার গুরুত্ব ইত্যাদী আলোচনা বেশ দীর্ঘায়িত করেছেন। শুধু তাই নয়, ইসলামের জিহাদের বিধানকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পরিবর্তে আলোচনাকে এদিক সেদিক ঘুরিয়েছেন। দিফায়ী জিহাদের কথা কিছুটা সুস্পষ্ট বললেও ইকদামী জিহাদের আলোচনা এমনভাবে করেছেন যে, তাতে ইকদামী জিহাদের মূল রূহটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

৪. প্রচলিত কুফরী শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামী শাসন, শাসকদেরকে খলিফাতুল মুসলিমীন প্রমাণ করার এবং কুফর শাসনাধীন রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রমাণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। যথাসম্ভব শাসকদের কুফরী কর্মের বিরুদ্ধে বলার পরিবর্তে বরং তাদেরকে রক্ষা

করার চেষ্টা করেছেন। তাদের আনুগত্যকে ফরয সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এর অনেক ক্ষেত্রে তিনি কুরআন, হাদীস ও আইম্মায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করার পরিবর্তে আলোচনাকে এদিক সেদিক ঘুরিয়েছেন। আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে নিজে থেকে মত দিয়ে এবং আইম্মায়ে কেরামের সুস্পষ্ট বক্তব্য পরিত্যাগ করে অস্পষ্ট কিছু বক্তব্য এনে সেগুলোকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে প্রচলিত কুফরী শাসন ও শাসকদের বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

৫. অনেক ক্ষেত্রে তাহকীকের বেলায় বড়ই দুর্বলতার প্রমাণ দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তো এমন তাহকীক ও মতামত পেশ করেছেন যে, সাধারণ তালিবুল ইলমরাও বুঝতে পারবে, এখানে কারচুপি করা হচ্ছে কিংবা লিখক পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছেন কিংবা শাসকদের রোষানল থেকে নিজেকে রক্ষার নিমিত্তে সত্য কথাটা গোপন করেছেন কিংবা কিছু একটা এখানে হয়েছে।

৬. আল্লাহ তাআলার শরীয়ত বিরোধি আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা কুফর, এই ধরণের শাসক মুরতাদ, এদেরকে অপসারণ করা ফরয, এইসব রাষ্ট্র দারুল হরব, গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্রে বসবাসরত কাফেররা জিম্মি নয়... ইত্যাদী যেসব মাসআলায় বর্তমান মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এবং কিছুকাল পূর্বের বিশ্ববরেণ্য উলামা মাশায়েখগণ সুস্পষ্ট মত দিয়ে গেছেন সেগুলোতে তিনি ভিন্নমত পোষণ করেই ক্ষান্ত হননি বরং তার নিজের মতামতকে এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যেন এটিই শরীয়তের শত-সিদ্ধ সিদ্ধান্ত।

৭. অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে পরিহার করে এমনভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলোচনা করেছেন যে, তাতে বাস্তবতাটা মাটিচাপা পড়ে গেছে।

কিতাব সম্পর্কে এই যা কিছু আমি বললাম এগুলো বানানো কিছু নয়। ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে অতিরঞ্জনও নয়। তিলকে তাল বানানোও নয়। কিতাব সকলের সামনেই আছে। পড়ে দেখলেই মন্তব্যের বাস্তবতা বুঝা যাবে।

পাঠকের পক্ষ থেকে আপত্তি:

১. কোন কোন পাঠক হয়তো এখানে আপত্তি উঠাতে পারেন যে, তাকী উসমানী সাহেব তার এ কিতাবে তো আর দুনিয়ার সব কিছু বর্ণনা করার দায়িত্ব নেননি। যতটুকু মুনাসিব মনে করেছেন বর্ণনা করেছেন। বাকিটা ছেড়ে দিয়েছেন। এটা দোষের কি হলো যে সমালোচনা লিখতে হবে??

২. কেউ কেউ হয়তো এও বলতে পারেন, বর্তমান শাসকরা যে কতটা ভয়ংকর তা সকলেরই জানা। এমতাবস্থায় পরিষ্কার সত্য বলতে গেলে জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু সব কিছুই হারানোর আশংখা রয়েছে। কাজেই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললে যাতে শাসকদের বিরুদ্ধে না যায় তাতে দোষের কি আছে??

৩. এও বলা হতে পারে যে, তাকী উসমানী সাহেব কিতাবে নিজের ব্যক্তিগত মতামত পেশ করেছেন। এতে যদি ভুল হয় তো মানুষ হিসেবে ভুল হতেই পারে। এতে সমালোচনা লিখে জন সম্মুখে প্রকাশ করার কি আছে??

৪. তাকী উসমানী সাহেবের মত তো আরো অনেকেই এই ধরণের আকীদা পোষণ করেন। কথায় কাজে, লেখা-লেখিতে, বয়ান-বক্তৃতায় তা প্রকাশও করেন। তাদের সমালোচনা না করে তাকী উসমানী সাহেবের কিতাবের দিকে কেন নজর দিলেন?

আপত্তির জওয়াব:

প্রথম আপত্তির ক্ষেত্রে বলবো, কোন বিষয় আলোচনা না করা এক জিনিস আর ভুল আলোচনা করা বা অনিচ্ছাকৃক ভুলের শিকার হওয়া কিংবা আলোচনা করে তাকে বিকৃত করা এবং বাস্তবতাকে ধামাচাপা দেয়া আরেক জিনিস। প্রথমটা ক্ষেত্র বিশেষে সমালোচনাযোগ্য না হলেও দ্বিতীয়টার সমালোচনা আবশ্যক। কেননা, এতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত লিখক যখন তাকী উসমানী সাহেবের মত গণ্যমান্য ও অনুসরণীয় কেউ হন।

দ্বিতীয় আপত্তির জওয়াব: শাসকের ভয়ে অনেক সময় চুপ থাকার বৈধতা আছে। কিন্তু নিজেকে রক্ষার জন্য এমন আলোচনা ছড়ানোর অনুমতি নেই যার কারণে জনগণ বিভ্রান্তির শিকার হতে পারে। বিশেষত যখন তা শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে বরং ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশংখা থাকে। যেমনটা তাকী উসমানী সাহেবের এ কিতাবের বেলায় ঘটেছে যে তা গোটা হিন্দুস্তানে ছড়িয়েছে। এমতাবস্থায় এর প্রকাশ্য ও ব্যাপক সমালোচনা ব্যতীত মানুষকে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

তৃতীয় আপত্তির জওয়াব: তাকী উসমানী সাহেব যা কিছু পেশ করেছেন দু'য়েক জায়গা ব্যতীত বাকি সকল কিছুকেই শরীয়তের সিদ্ধান্ত হিসেবেই পেশ করেছেন। একথা বলেননি যে, এগুলো আমার ব্যক্তিগত অভিমত। এতে অন্যদের দ্বিমত রয়েছে। অধিকন্তু যদি সেগুলো ব্যক্তিগত অভিমতও হয়ে থাকে তবুও পাঠক বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। কারণ, তারা

সেটাকে শরীয়তের সিদ্ধান্ত হিসেবেই গ্রহণ করবে, তাকী উসমানী সাহেবের নিজস্ব মতামত হিসেবে নয়। শুধু এতটুকুই নয়, বরং যারা এই মতের বিরুদ্ধে যাবে অনেক পাঠক তাদেরকে গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করবে। এমতাবস্থায় এর পর্যালোচনা জরুরী।

চতুর্থ আপত্তির জওয়াব: প্রথমত আমি ব্যক্তির সমালোচনা করছি না, বিষয়বস্তুর সমালোচনা করছি। এতে তাকী উসমানী সাহেবের খণ্ডন হয়ে গেলে বাকি সকলেরই খণ্ডন হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত তাকী উসমানী সাহেবেরটা লোকজনে গ্রহণ করছেন বেশি। তার দ্বারা যতটা প্রভাবিত তারা হচ্ছেন অন্যদের দ্বারা ততটা হচ্ছেন না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকী উসমানী সাহেবের কিতাবের পর্যালোচনা আগে শুরু করাটাই যুক্তি যুক্ত।

মোটকথা, তাকী উসমানী সাহেব বাংলাদেশী উলামা-তুলাবার কাছে একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। তার কথাকে সহজে সকলে

মেনে নিচ্ছে এবং নেবে। এমতাবস্থায় যদি কিতাবটির সমালোচনা ও পর্যালোচনা না লিখা হয় তাহলে ব্যাপক বিভ্রান্তির আশংখা আছে। এ দিকে লক্ষ্য করেই পর্যালোচনায় হাত দিয়েছি।

বি.দ্র.

১. কেউ কেউ বলে থাকেন, 'তাকী উসমানী সাহেব কাফেরদের দালাল।' আমি এতে একমত নই। কেননা, যথার্থ দলীল প্রমাণ ব্যতীত কারোও ব্যাপারে কিছু বলা যায় না। বরং আমি এতটুকু মনে করি যে, তাকী উসমানী সাহেব অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে ভুল করেছেন কিংবা পারিপার্শ্বিকতা ও যুগের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

২. আমি তাকী উসমানী সাহেবের দ্বীনদারির উপর হামলা করছি না। তার নিয়তের উপরও না। তিনি হয়তো যা লিখেছেন খালেছ দ্বীনি উপকারের জন্যই লিখেছেন। কিন্তু দ্বীনদারী কিংবা ইখলাস ভুল-শুদ্ধের মাপকাটি নয়। একান্ত দ্বীনদার এবং মুখলিস ব্যক্তিও ভুলের শিকার হতে পারেন। পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। দলীল প্রমাণ ব্যতীত কারো ইখলাস ও দ্বীনদারির উপর হামলা না করে শরীয়তের নিক্তিতে তার কথার ওজন করাই মূল কাজ।

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, যেন তিনি সমালোচনার ক্ষেত্রে ইনসাফ বজায় রাখার তাওফীক দেন। কোন প্রকার ইফরাত-তাফরীত ব্যতীত হকটা প্রকাশ করার তাওফীক দেন। আমীন! আমীন! আমীন!

মুফতী তাকী উসমানী এবং ইসলামী খেলাফত ও রাজনীতি-২

আরেকটি আপত্তি:

কেউ কেউ হয়তো আরো একটি আপত্তি করতে পারেন যে, সিয়াসত ও খেলাফত অত্যন্ত বড় একটি বিষয়। আপনি যার কিতাবের পর্যালোচনা লিখতে যাচ্ছেন তিনিও একজন বড় ব্যক্তিত্ব। কাজেই আপনার কাজটা অত্যন্ত বড় একটা কাজ। এ কাজের জন্য আপনি নিজেকে কিভাবে উপযুক্ত মনে করলেন? এ কাজের জন্য তো বড় বড় হাস্তি দরকার। তারা সেটার উপযুক্ত। আপনি ছোট মানুষ হয়ে এত বড় কাজের সাহস কিভাবি করলেন?

জওয়াব দেয়ার আগে এক বড় ব্যক্তির একটা কাহিনী শুনাই।

এক বড় ব্যক্তির কাছে আসিম উমার হাফিযাহুল্লাহ এর 'আদইয়ান কি জঙ্গ' কিতাবটি পৌঁছল। কিতাব দেখে তিনি

মন্তব্য করলেন, এত বড় বিষয়ে কলম ধরার জন্য আসেম উমারের মত সাধারণ ব্যক্তি কেন?? এর জন্য বড় বড় উলামায়ে কেরাম আছেন। তারা তাতে কলম ধরবেন। আসেম আবার উমার কলম ধরার কে??

আশ্চর্য্যের বিষয়! গোটা উপমহাদেশের মুজাহিদদের আমীর আসিম উমারকে তিনি যোগ্য মনে করলেন না অথচ তিনি নিজেই খেলাফত ও রাজনীতি বিষয়ে একটি কিতাব লিখেছেন, যেখানে তিনি মুফতি তাকী উসমানী সাহেবের চেয়েও আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। আল্লাহ মা'লূম তিনি নিজেকে কিভাবে এ বিষয়ে কলম ধরার যোগ্য মনে করলেন।

যাহোক, এবার আসুন জওয়াবে যাই... বড়রা থাকতেও আমি কেন কলম ধরলাম!!

জওয়াব সহজ। বড়রা যখন কলম ধরছেন না তখন ছোটদেরকেই ধরতে হবে।

প্রশ্ন: বড়রা কলম ধরছেন না কেন?

উত্তর: বড়রা বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ হয়ে আছেন,

ক. অনেক বড়'র অবস্থা হচ্ছে যেমন আমি একেবারে শুরুতে বলেছি,"বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে আলেম উলামাদের অনেকের কাছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ময়দানে কিতাবটি দিশারী হিসেবে গৃহিত হয়েছে। কিতাবটি হাতে পেয়ে অনেকে যেন বর্তমান সময়ের অনেক জটিল সমস্যার সঠিক সমাধান পেয়ে গেছেন। ইসলামী রাজনীতির সঠিক নির্দেশনা পেয়ে গেছেন বলে মনে করছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দুস্তানী একজন লেখকের এমন একটি কিতাবকে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের চলার পথের পাথেয় ও যথাযোগ্য রাহবার বলে মনে করছেন। কিতাব ও কিতাবের লিখককে হিন্দুস্তানের গৌরব বলে মনে করছেন।"

তারা কিতাব এবং কিতাবের আদর্শ প্রচার প্রসারের যথাসাধ্য

চেষ্টা করছেন।

খ. অনেক বড়’র অবস্থা একটু আগে যে বড়’র কথা শোনালাম তার মত।

গ. অনেক বড়’র বড় কাজ আছে। তারা সেগুলোতেই ব্যস্ত। এসব বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার মত সময় তাদের হাতে নেই।

ঘ. অনেক বড় অনেক বড় বুযুর্গ। তারা রাজনীতির ময়দান থেকে যেমন দূরে থাকাকে সালামাত মনে করেন, তার আলোচনা থেকে দূরে থাকাকেও তেমনি সালামতের কারণ মনে করেন।

ঙ. অনেক বড় কিতাবের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে সংশয়ে আছেন। সঠিক সমাধান কি বুঝতে পারছেন না।

চ. অনেক বড় সমালোচনা লিখতে হিম্মত করতে পারছেন না। কারণ, এতে তাঁর মানসাব ছুটে যাওয়ার কিংবা সমালোচনা লিখতে গিয়ে নিজেই সমালোচিত হওয়ার কিংবা সরকারের রোষানলে পড়ার; জঙ্গী, উগ্রবাদি, তাকফীরি ইত্যাদী অনাকাঙ্খিত পদবীতে ভূষিত হওয়ার আশংখায় আছেন। তাই কলম ধরতে পারছেন না।

বড়রা উপরোল্লিখিত কারণসমূহ এবং এছাড়াও আরোও বিভিন্ন কারণে কলম ধরতে পারছেন না। কিন্তু কিতাবের আদর্শ তো আর থেমে থাকছে না। তা তো দিন দিন প্রচার হয়ে চলছে। এমতাবস্থায় ছোটদের উপরেই কলম ধরার দায়িত্ব বর্তায়।

তবে আরেক প্রকার বড় আছেন যারা কলম ধরতে চান। কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতির শিকার হয়ে কিংবা উম্মাহর বড় কোন খিদমাতে লিপ্ত থাকার কারণে কলম ধরতে পারছেন না। তবে আকাঙ্খা করছেন- যদি কেউ কলম ধরতো! তারা যদি শুনেন আমি কলম হাতে নিয়েছি তাহলে তারা আমার জন্য প্রাণভরে দোয়া করবেন। এই বড়দের দোয়া লাভের নিমিত্তে কলম ধরছি। মুসলিম ভাই-বোনদের সামান্য হলেও ফায়েদা হবে, কিছু না কিছু হলেও বিভ্রান্তির অপনোদন হবে আশা করে কলম ধরছি।

পর্যালোচনার বিষয়াবলী:

কিতাবে পর্যালোচনার অনেক কিছু রয়েছে। সবগুলো পর্যালোচনা করতে গেলে দীর্ঘ সময়, শ্রম ও সবর প্রয়োজন। মৌলিকভাবে যেসব বিষয়ে পর্যালোচনা করতে চাচ্ছি সেগুলো নিম্নরূপ:

১. শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নামায-রোযা ইত্যাদী বিধান পালন করতে পারাই কি দ্বীনে ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্য না'কি রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী শাসন কায়েম করারও উদ্দেশ্য?

২. খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা আছে কি? গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রী, এমপি ও রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি কি ইসলামী পদ্ধতি?

৩. সংসদ সদস্য ও রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের যে পদ্ধতি তাকী উসমানী সাহেব বাতলিয়েছেন তার পর্যালোচনা। পাঁচ বছর বা অন্য কোন নির্দিষ্ট মেয়াদে খলিফা নির্ধারণের নজীর কি ইসলামের ইতিহাসে আছে? এতে কি শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোন আপত্তি আছে?

৪. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচিত রাষ্ট্র প্রধান ও মন্ত্রী এমপিরা কোন পন্থায় নির্বাচিত: উম্মাহ স্বত: স্ফূর্ত নির্বাচন? না'কি জবর দখল?

৫. জবরদস্তী ক্ষমতাদখলকারীর আনুগত্য করা কি মুসলমানদের উপর আবশ্যক? হলে কখন? যে কেউ ক্ষমতা দখল করে নিলেই কি তার আনুগত্য করা ফরয হয়ে যাবে?

৬. মুসলিম বিশ্বে একই সময়ে একাধিক খলিফা হতে পারে কি? কুফরী আইন দিয়ে শাসনকারী শাসকবর্গ কি ইসলামের দৃষ্টিতে নিজ নিজ রাষ্ট্রে উক্ত রাষ্ট্রের মুসলমানদের ইমাম, খলিফা বা সুলতান হিসেবে গণ্য? তাদের আনুগত্য কি ফরয?

৭. শূরা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কতক বিষয়। মহিলা এবং কাফের কি মজলিসে শূরার সদস্য হতে পারে?

৮. ইসলামী হুকুমতের উদ্দেশ্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট তাকী উসমানী সাহেবের বক্তব্য।

৯. কাফেরদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের ধরণ কিরূপ:

বন্ধুত্বের? সহমর্মিতার? না'কি দুশমনির? কাফের রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি কেমন হবে?

১০. কাফেরদের সাথে সন্ধির বিধান কি? চুক্তি কখন বৈধ আর কখন অবৈধ?

১১. আহলে যিম্মা কারা? বর্তমান মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে বসবাসরত কাফেররা কি শরীয়তের দৃষ্টিতে আহলে যিম্মা বলে গণ্য?

১২. দারের প্রকারভেদ। দারুল ইসলাম ও দারুল হরব কাকে বলে? কুফরী আইন দিয়ে শাসিত গণতান্ত্রিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম না দারুল হরব?

১৩. ইসলামে কি শুধু দিফায়ী-আত্মরক্ষামূলক জিহাদই ফরয না'কি ইকদামী-আক্রমণাত্মক জিহদাও ফরয? ইকদামী জিহাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ।

১৪. শাসক কত প্রকার? তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান কি? বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদের কি হুকুম?

এছাড়াও প্রসঙ্গত আরোও বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ!

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে পর্ব-১

==================

===============================

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم
أما بعد...

অনেকেই মনে করেন, ‘ইসলাম কোন মুসলমানকে হত্যার অনুমতি দেয় না। যত অপরাধই করুক, তাকে হত্যা করা

যাবে না। ইসলাম যেখানে একটা পিঁপড়াকে কষ্ট দেয়ারও অনুমতি দেয় না, সেখানে কালিমার দাবিদার একজন মুসলমানকে কিভাবে হত্যা করা যাবে!!’
ফরিদ মাসউদদের মতো দালালদের বিকৃতি আর প্রোপাগাণ্ডার কারণে ইদানিং এ ধরণের ধ্যান-ধারণা অনেক ছড়িয়েছে। এ কারণে মুজাহিদরা কোন নাস্তিক, মুরতাদ বা জুলহাজ মান্নানের মতো কোন ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে হত্যা করলে কারো কারো মনে সংশয় জাগে, এ হত্যা কিভাবে জায়েয হল? জিহাদিরা হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না। এরা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে। এরা নির্দয়। এরা হিংস্র। এরা রক্তপিপাসু- ইত্যাদি।

আর যারা মোটামুটি দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের অনেকের ধারণা- ইসলাম কেবল তিন শ্রেণীর মুসলমানকে হত্যার অনুমতি দেয়:
১. যে মুসলমান ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে কোন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করেছে।
২. বিবাহিত যিনাকার পুরুষ বা মহিলা।
৩. দ্বীন ত্যাগী মুরতাদ।

তাদের ধারণা, এর বাহিরে কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়। যেমন

এক হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة.

"যে মুসলমান স্বাক্ষী দেয়- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল; তিন কারণের কোন একটা ব্যতীত তার রক্ত হালাল নয়: জানের বদলায় জান, বিবাহিত যিনাকার এবং মুসলমানদের জামাআত পরিত্যাগকারী দ্বীনত্যাগী (মুরতাদ)।" (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৬৪৮৪ , সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ৪৪৬৮)

এ হাদিসের কারণে তারা মনে করেন, উল্লিখিত তিন প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত আর কাউকে হত্যা করা ইসলামে বৈধ নয়।

আর এই তিন শ্রেণীর হত্যার ব্যাপারেও তাদের অনেকের আকীদা- তা ইমাম ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। তাই, মুজাহিদরা যখন কোন মুরতাদকে হত্যা করেন, তখন তাদের সংশয় লাগে, কিভাবে তা জায়েয হলো! এর প্রেক্ষিতে তারা বিভিন্ন অশোভন মন্তব্যও করে থাকেন।

এখানে তারা দুটো ভুল করেছেন-

এক.

হত্যাকে এই সুনির্দিষ্ট তিন শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন; অথচ বাস্তবে হত্যার গণ্ডি আরো অনেক ব্যাপক। ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

قال علماؤنا : إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة. اهـ

"আমাদের আইম্মায়ে কেরাম বলেন, দলীল-প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত যে, হত্যার সবব- দশটি।" (তাফসীরে কুরতুবী: ৭/১১৮)

অর্থাৎ এই দশ সববের কোন একটা কোন মুসলিমের মাঝে পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করা হবে।

হাদিসের জওয়াব

উপরোক্ত হাদিসে যে হত্যার সবব তিনটিতে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, এর জওয়াব- হাদিসে মৌলিক তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর শাখা-প্রশাখা দশ (এমনকি দশেরও বেশি) পর্যান্ত পৌঁছায়। অর্থাৎ উপরোক্ত তিন সবব হলো মৌলিক তিনটি সবব, যার ভেতরে আরো অনেক সবব প্রবিষ্ট হয়ে আছে। যেমন- হাদিসে হত্যার একটি সবব বলা হয়েছে

‘কোন মুসলিমকে ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে হত্যা করা।’ কিন্তু কোন মুসলমানের হত্যায় যদি অনেকে শরীক থাকে, যাদের কেউ সরাসরি হত্যায় (যেমন- যবাই করা বা গুলী করায়) অংশ নিয়েছে, আর কেউ কেউ পাহাড়ায় নিয়োজিত ছিল- তাহলে এই একজন মুসলমানের জানের বদলায় অংশগ্রহণকারী সকলকেই হত্যা করা হবে। যারা সরাসরি যবাই বা গুলী করেছে তাদেরকে যেমন হত্যা করা হবে, যারা পাহাড়ায় নিয়োজিত ছিল তাদেরকেও হত্যা করা হবে। কারণ, তাদের সকলের সম্মিলিত শক্তির বলেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। তাই সকলকেই হত্যা করা হবে। পাহাড়াদারদের হত্যার কথাটা এ হাদিসে সরাসরি উল্লেখ নেই, তবে হাদিসের ব্যাপকতার মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অন্যান্য হাদিস ও সাহাবায়ে কেরামের আছার থেকে সেটা প্রমাণিত। এ সম্পর্কে আলাচনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে।

দুই.

দ্বিতীয় যে ভুলটি তারা করেছেন, তা হলো- সকল শ্রেণীর হত্যার জন্য ইমামের শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। অথচ মুরতাদ (এবং আরো অনেকের) হত্যার জন্য ইমাম শর্ত নয়, বরং যে কোন মুসলমানই তাদেরকে হত্যা করতে পারবে। যেমন- কোন পিতা তরবারি নিয়ে তার পুত্রকে হত্যার চেষ্টা করছে। পিতাকে হত্যা করা ব্যতীত তার হাত থেকে রক্ষার কোন পথ

নেই। এমতাবস্থায় শরীয়তের মাসআলা হল- উক্ত পুত্র তার পিতাকে হত্যা করে দেবে। এ হত্যা নিজের জান রক্ষার জন্য। যেমন- হিদায়াতে বলা হয়েছে,

لو شهر الأب المسلم سيفه على ابنه ولا يمكنه دفعه إلا بقتله يقتله. اهـ

"মুসলিম পিতা যদি তার পুত্রের বিরুদ্ধে তরবারি কোষমুক্ত করে, আর হত্যা ব্যতীত তাকে প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তাহলে (উক্ত পুত্র তার পিতাকে) হত্যা করে দেবে।" (হিদায়া: ১/৩৭৯)

দেখুন- এখানে কিন্তু পিতাকে হত্যার জন্য ইমামের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়াও আরো অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে কোন মুসলমানকে হত্যার জন্য ইমাম শর্ত নয়। ইমাম বিদ্যমান থাকাও শর্ত নয়, ইমামের অনুমতিও শর্ত নয়। দারুল ইসলাম থাকাও শর্ত নয়। দারুল ইসলামের বাসিন্দা হওয়াও শর্ত নয়। কাজেই, যে কোন ধরণের হত্যার জন্য ইমাম কিংবা দারুল ইসলামের শর্ত করা নিতান্তই ভুল।

পরিস্থিতির বিবেচনায় বিষয়টা একটু আলোচনা করে দিলে অনেকেরই উপকারে আসবে মনে হল। তাই আল্লাহর নামে

শুরু করলাম। বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে নেই। যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকুতেই ক্ষান্ত রাখবো ইনশাআল্লাহ। ওমা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে: পর্ব-২

لا يحل دم امرئ مسلم ... إلا بإحدى ثلاث- হাদিস নিয়ে কিছু কথা

এ হাদিস থেকে অনেকেই সংশয়ে পড়েছেন যে, তিন শ্রেণীর মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন মুসলমানকে হত্যা বৈধ নয়। অথচ বাস্তবে এদের বাইরে আরো অনেককে শরীয়ত হত্যার বৈধতা দিয়ে রেখেছে। এ হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আইম্মায়ে কেরাম তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। বাহ্যিকভাবে এ হাদিসের সাথে ঐসব হত্যার যে বিরোধ দেখা যায়, তাও তারা নিরসন করেছেন। উপরে এ ব্যাপারে কিঞ্চিত

ইশারা করা হয়েছে। এখানে বিষয়টাকে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ইমাম নববী রহ. (মৃত্যু: ৬৭৬হি.) বলেন,

قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أوغيرهما، وكذا الخوارج، والله أعلم. واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع. اهـ

"আইম্মায়ে কেরাম বলেন, প্রত্যেক এমন মুসলিম, যে বিদআত বা (ইমামের বিরুদ্ধে) বাগাওয়াত (তথা বিদ্রোহে) লিপ্ত হয়ে কিংবা অন্য কোনভাবে মুসলিম জামাআত থেকে বের হয়ে যায়, তার উপরও এ (হত্যার) বিধান প্রযোজ্য। তদ্রূপ খাওয়ারেজরাও এ বিধানের আওতাভুক্ত- ওয়াল্লাহু আ'লাম। শোন, (জান, মাল বা ইজ্জত-আব্রুর উপর) আক্রমণকারীসহ এ জাতীয় অন্যান্য ব্যক্তি এ হাদিসের ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার আওতা বহির্ভূত। কাজেই অনিষ্ট প্রতিহত করণার্থে এদেরকে হত্যা করা যাবে।" (শরহু মুসলিম লিন-নববী: ১১/১৬৫)

এ বক্তব্যে ইমাম নববী রহ. এ হাদিসে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়াও আরো কয়েক শ্রেণীর মুসলিমের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদেরকে হত্যা করা বৈধ-

১. বিদআতী (তবে সকল বিদআতী নয়, কিছু কিছু চরমপন্থী বিদআতী)।

২. শরয়ী ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী বাগী।

৩. খাওয়ারেজ।

৪. জান, মাল বা ইজ্জত-আব্রুর উপর আক্রমণকারী।

এ ছাড়াও আরো অনেকে যাদের তিনি নাম নেননি, শুধু ইশারা করে গেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (মৃত্যু: ৮৫২হি.) ইমাম আবু হাফস কুরতুবী রহ. (মৃত্যু: ৬৫৬হি.) থেকে বর্ণনা করেন-

يلتحق به من خرج عن جماعة المسلمين وان لم يرتد كمن يمتنع من إقامة الحد عليه إذا وجب ويقاتل على ذلك كأهل البغي وقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم. اهـ

“দ্বীনত্যাগীর বিধান প্রযোজ্য হবে এমন সব মুসলিমের উপরও, যারা মুরতাদ তো হয়নি কিন্তু মুসলিমদের জামাআত থেকে বের হয়ে গেছে। যেমন- এমন মুসলিম, যার উপর শরীয়ত নির্ধারিত কোন হদ (শাস্তি) বর্তিয়েছে কিন্তু সে নিজের উপর তা কায়েম করতে দিচ্ছে না, বরং এর বিপরীতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। যেমন- (শরয়ী ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী) বাগী, ডাকাত, যুদ্ধে লিপ্ত খাওয়ারেজ এবং এ জাতীয় অন্যান্য মুসলমান।” (ফাতহুল বারি: ৭/৩৫৩)

এখানে হত্যাপোযুক্ত আরো কয়েক শ্রেণীর মুসলমান পাওয়া গেল-

৫. যার উপর শরীয়ত নির্ধারিত কোন হদ (যেমন- যিনার শাস্তি) বর্তিয়েছে কিন্তু সে নিজের উপর তা কায়েম করতে দিচ্ছে না, বরং এর বিপরীতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত তার উপর উক্ত হদ কায়েম করা সম্ভব নয়।

৬. ডাকাত ও লুটতরাজ।

এ ছাড়াও আরোও অনেকে।

ইবনে হাজার রহ. আরোও বলেন-

حكى بن التين عن الداودي أن هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض} قال: فأباح القتل بمجرد الفساد في الارض.

قال: ورد في القتل بغير الثلاث أشياء، منها:

- قوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي}

- وحديث (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه)

- وحديث (من اتى بهيمة فاقتلوه)

- وحديث (من خرج وأمر الناس جمع يريد تفريقهم فاقتلوه)

- وقول عمر (تغرة أن يقتلا)

- قول جماعة من الائمة: إن تاب أهل القدر وإلا قتلوا

- وقول جماعة من الائمة: يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت

- وقول جماعة من الائمة: يقتل تارك الصلاة.

قال: وهذا كله زائد على الثلاثة.

قلت: وزاد غيره قتل:

- من طلب أخذ مال إنسان أو حريمه بغير حق

- ومانع الزكاة المفروضة

- ومن ارتد ولم يفارق الجماعة

ومن خالف الاجماع وأظهر الشقاق والخلاف -

والزنديق إذا تاب على رأي -

والساحر. اهـ -

"ইবনুত-ত্বীন রহ. দাউদী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, এ হাদিসটি আয়াতে মুহারাবা দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। আয়াতে মুহারাবা হলো-

{من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض}

"কাউকে হত্যা করা কিংবা যমিনে ফাসাদ-অশান্তি বিস্তার করা ব্যতীতই কেউ কাউকে হত্যা করলে, (সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল)।" (মায়েদা: ৩২)

তিনি বলেন, (এ আয়াতে) শুধু যমিনে ফাসাদ বিস্তার করার কারণেই হত্যার বৈধতা দিয়েছেন।

তিনি আরোও বলেন, হাদিসে উল্লিখিত তিন কারণ ছাড়াও হত্যার বৈধতা সম্বলিত আরোও বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন আয়াত-হাদিসে এসেছে। যেমন-

- আল্লাহ তাআলার বাণী: {فقاتلوا التي تبغي} '(মুসলিমদের দুটি দল পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে) যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, (যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিক ফিরে আসে।)'

(হুজুরাত: ৯)

- হাদিস: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه) ‘কাউকে লূত আলাইহিস সালামের কাওমের মতো কাজ (অর্থাৎ সমকামিতা) করতে দেখলে তাকে হত্যা করে দাও।’

- হাদিস: (من اتى بهيمة فاقتلوه) ‘যে ব্যক্তি কোন পশুর সাথে সঙ্গম করে, তাকে হত্যা করে দাও।’

- হাদিস: (من خرج وأمر الناس جمع يريد تفريقهم فاقتلوه) ‘লোকজন কোন এক ইমামের বাইয়াতে ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি কেউ বিদ্রোহ করে তাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায়, তাহলে তাকে হত্যা করে দাও।

- উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য: (تغرة أن يقتلا) ‘(মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়াই কেউ কারো হাতে বাইয়াত হয়ে গেলে, তাকেও বাইয়াত দেয়া যাবে না, সে যাকে বাইয়াত দিয়েছে তাকেও না। কারণ,) হতে পারে তাদের উভয়কে হত্যা করে দেয়া হবে।’

- আইম্মায়ে কেরামের এক দল বলেন: কদরিয়্যা ফেরকা তওবা করলে তো ভাল, অন্যথায় তাদের হত্যা করে দেয়া হবে।

- আরেক দল আইম্মা বলেন: বিদআতিদেরকে মারতেই থাকা হবে; হয়তো তাওবা করবে, নয়তো মার খেতে খেতে মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

- আরেক দল আইম্মা বলেন: নামাযত্যাগীকে হত্যা করে দেয়া হবে।

তিনি বলেন, এ সবগুলোই হাদিসে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর বাইরে।

আমি বলি, অন্যরা আরো কয়েকটি বাড়িয়েছেন:

- যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো মাল বা ইজ্জতের উপর হামলা করবে।

- ফরয যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

- যে মুরতাদ হয়ে গেছে, কিন্তু মুসলিম জামাআত থেকে পৃথক হয়নি।

- যে ইজমায়ী তথা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরোধিতা করে, অনৈক্য ও অহেতুক মতবিরোধের প্রকাশ ঘটায়।

- এক মত অনুযায়ী: যিনদ্বীক, যখন সে তাওবা করে।

- যাদুকর।” (ফাতহুল বারি: ৭/৩৫৬)

এ বক্তব্য থেকে আরো কয়েক শ্রেণীর মুসলমান হত্যার বৈধতা পাওয়া গেল:

৭. যমিনে ফাসাদ বিস্তারকারী।

৮. কোন দল অন্যায়ভাবে অন্য দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে।

৯. সমকামী।

১০. পশুর সাথে সঙ্গমকারী।

১১. আহলে হল ওয়াল আকদের পরামর্শ ছাড়াই কাউকে বাইয়াত দিয়ে দিলে এবং আহলে হল ওয়াল আকদের অসম্মতি সত্ত্বেও উক্ত বাইয়াতে অটল থাকলে। এমতাবস্থায় যে বাইয়াত দিয়েছে এবং যাকে বাইয়াত দিয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করে দেয়া হবে।

১২. কদরিয়্যা ফেরকা।

১৩. বিদআতী।

১৪. নামায আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

১৫. ফরয যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

১৬. যে ইজমায়ী তথা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরোধিতা করে, অনৈক্য ও অহেতুক মতবিরোধের প্রকাশ ঘটায়।

১৭. যিনদ্বীক (যদিও তাওবা করে।)

১৮. যাদুকর (পুরুষ হোক, কি মহিলা।)

অতএব, উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আইম্মায়ে কেরামে বক্তব্য থেকে নিম্নোক্ত ১৮ শ্রেণীর মুসলমান পাওয়া গেল, যাদেরকে হত্যা করার বৈধতা শরীয়ত দিয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত হাদিসে এদের কারোরই উল্লেখ নেই:

১. বিদআতী (তবে সকল বিদআতী নয়, কিছু কিছু চরমপন্থী বিদআতী)।

২. শরয়ী ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী বাগী।

৩. খাওয়ারেজ।

৪. জান, মাল বা ইজ্জত-আব্রুর উপর আক্রমণকারী।

৫. যার উপর শরীয়ত নির্ধারিত কোন হদ (যেমন- যিনার শাস্তি) বর্তিয়েছে কিন্তু সে নিজের উপর তা কায়েম করতে দিচ্ছে না, বরং এর বিপরীতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত তার উপর তা কায়েম করা সম্ভব

নয়।

৬. ডাকাত ও লুটতরাজ।

৭. যমিনে ফাসাদ বিস্তারকারী।

৮. কোন দল অন্যায়ভাবে অন্য দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে।

৯. সমকামী।

১০. পশুর সাথে সঙ্গমকারী।

১১. আহলে হল ওয়াল আকদের পরামর্শ ছাড়াই কাউকে বাইয়াত দিয়ে দিলে এবং আহলে হল ওয়াল আকদের অসম্মতি সত্ত্বেও উক্ত বাইয়াতে অটল থাকলে। এমতাবস্থায় এদের উভয়কে হত্যা করে দেয়া হবে।

১২. কদরিয়্যা ফেরকা।

১৩. বিদআতী।

১৪. নামায আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

১৫. ফরয যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী।

১৬. যে ইজমায়ী তথা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরোধিতা করে, অনৈক্য ও অহেতুক মতবিরোধের প্রকাশ ঘটায়।

১৭. যিনদ্বীক (যদিও তাওবা করে।)

১৮. যাদুকর (পুরুষ হোক, কি মহিলা।)

সতর্কতা: *এদের সকলকে ঢালাওভাবে হত্যা বৈধ নয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ শর্তসাপেক্ষে বৈধ, অন্যথায় নয়। সামনে পৃথক পৃথক এদের সকলের আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ। তখন আশাকরি পরিষ্কার হবে।*

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে: পর্ব-৩

হাদিসের সমন্বয়

আমরা দেখলাম, শরীয়ত উক্ত তিন শ্রেণী ছাড়াও আরো অনেক মুসলমানকে হত্যার বৈধতা দিয়েছে; এতদসত্ত্বেও উপরোক্ত হাদিসে শুধু তিন শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হল কিভাবে?

এর নিরসন বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে করেছেন। যেমন-

১. কেউ বলেছেন, এ হাদিস মানসূখ হয়ে গেছে। যেমন- ইবনে হাজার রহ. দাউদী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতে মুহারাবা দ্বারা এ হাদিস মানসূখ হয়ে গেছে।

২. কেউ বলেন, এ হাদিসের বাইরে অন্য যত হত্যার কথা এসেছে, সেগুলোকে এ হাদিসে উল্লিখিত তিন শ্রেণীর কোন না কোন একটা মধ্যে ফেলা যায়। যেমন- সমকামিতা এবং পশুসঙ্গমকে যিনার শ্রেণীতে ফেলা যায়। খাওয়ারেজ ও বাগীদেরকে দ্বীনত্যাগী শ্রেণীতে ফেলা যায়। এভাবে সবগুলোকেই তিন শ্রেণীর কোন না কোন শ্রেণীতে ফেলা যায়। অতএব, মৌলিক কারণ তিনটিই, তবে তার শাখা-প্রশাখা অনেক।

৩. তবে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বুঝে আসছে হাফেয ইবনে হাজার রহ. যে নিরসন পেশ করেছেন- সেটি। তা হল- হাদিসে যে তিন শ্রেণীর হত্যার কথা এসেছে (অর্থাৎ অন্যায় হত্যাকারী, বিবাহিত যিনাকার পুরুষ বা মহিলা, মুরতাদ) তাদেরকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা ফরয। চাই এরা কারোও অনিষ্ট সাধন

করুক বা না করুক- সর্বাবস্থায় তাদের হত্যা করতে। এই তিন ব্যক্তি এমন যে, এদের ব্যক্তিত্বটাই হত্যার যোগ্য। তারা কি অন্য কোন অনিষ্ট করল কি করল না- তা দেখার বিষয় নয়। যিনা, হত্যা ও ইরতিদাদ এমন অপরাধ, যাতে লিপ্ত হওয়ার পর উক্ত ব্যক্তি আর বেঁচে থাকার যোগ্য থাকে না। উক্ত অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পর সে অন্য কোন অপরাধ না করলেও তাকে হত্যা করে দিতে হবে।

পক্ষান্তরে বাকি ১৮ শ্রেণী, যাদের হত্যার কথা বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে এসেছে- তাদেরকে হত্যা করতে হয় তাদের অনিষ্ট থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে। এখানে ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়, অনিষ্ট দমন উদ্দেশ্য। অনিষ্ট যদি হত্যা ছাড়াই দমন করা সম্ভব হয়, তাহলে তাদের হত্যা করা যাবে না। যেমন-

- বাগী যদি বিদ্রোহ ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না।

- কারো জান, মাল বা ইজ্জতের উপর আক্রমণকারী ব্যক্তি যদি হত্যা ছাড়াই (ধমকি, চিৎকার বা প্রহারের দ্বারা) বিরত হয়ে যায়, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না।

- যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী যদি যাকাত আদায়ে সম্মত

হয়ে যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করা হবে না।

বাকিগুলোরও একই কথা। হত্যা ছাড়াই যদি তাদের অনিষ্ট দমন করা যায়, তাহলে হত্যা করা হবে না। কিন্তু ঐ হাদিসে উল্লিখিত তিন শ্রেণী ব্যতিক্রম। এদের বিষয়টা অনিষ্ট দমনের সাথ সম্পর্কিত নয়, বরং এদের ব্যক্তিত্বটাই এমন যে, এরা আর বেঁচে থাকার অধিকার রাখে না। এদেরকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

উদাহরণ

যেমন ধরুন, নামায এমন একটা বিধান, যা প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে হওয়া উদ্দেশ্য। একজনের নামায অন্যজন আদায় করলে হবে না। এক পরিবারের একজন বাকি সকলের নামায একাই পড়ে নিলে বাকিদের নামায আদায় হবে না। তাদের নামায তাদেরকেই আদায় করতে হবে। কিন্তু জিহাদ এমন একটা বিধান, যা প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে হওয়া উদ্দেশ্য নয়। কাফেরদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ বা জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করা এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য যদি কিছু

সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা অর্জন হয়ে যায়, তাহলে বাকিরা জিহাদ না করলেও চলবে। তবে নফিরে আম হয়ে গেলে তখন কথা ভিন্ন। তখন সকলকেই শরীক হতে হবে।

এখানেও বিষয়টা এমনই। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তিত্বটাই পৃথিবীতে থাকার অনুপযুক্ত। তাই তাদেরকে হত্যা করে ফেলতে হবে। আর বাকিদের অনিষ্ট দমন উদ্দেশ্য। অনিষ্ট যদি হত্যা ছাড়াই দমন হয়ে যায়, তাহলে হত্যা করা হবে না। আর হত্যা ছাড়া দমন সম্ভব না হলে হত্যা করা হবে। কাজেই, এ হাদিসের সাথে অন্যান্য আয়াত ও হাদিসের বিরোধ নেই। এ হাদিসে বিশেষ তিন শ্রেণীর কথা এসেছে আর অন্যান্য আয়াত ও হাদিসে অন্য প্রকারগুলোর কথা এসেছে। একটার সাথে আরেকটার কোন বিরোধ নেই।

এবার ইবনে হাজার রহ. এর বক্তব্য লক্ষ্য করুন। তিনি সংক্ষেপ কথায় বিষয়টা বুঝিয়ে দিয়েছেন-

والتحقيق في جواب ذلك أن الحصر فيمن يجب قتله عينا أما من ذكرهم فان قتل الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة والمقاتلة. اهـ

“এর প্রকৃত জওয়াব হল- তিন শ্রেণীতে সীমাবদ্ধের কথাটা এসেছে এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে, যাদের স্বয়ং ব্যক্তিটাকে হত্যা করাই ফরয। পক্ষান্তরে অন্য যাদের কথা বলা হয়েছে- তাদের কাউকে তো হত্যা করা বৈধ হবে কেবল ঐ সময়, যখন তার সাথে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ বেঁধে যায়। (ফাতহুল বারি: ৭/৩৫৩)

বি.দ্র.

বিবাহিত যিনাকার (যদি গোলাম বা বান্দি না হয়; কেননা, তাদের হুকুম ভিন্ন) তাওবা করুক বা না করুক- সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। তাকে মাফ করার অধিকার কারো নেই।

মুরতাদ যদি তাওবা না করে, তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলা ফরয। তাকে মাফ করার অধিকার কারো নেই।

তবে অন্যায় হত্যাকারীকে যদি নিহত ব্যক্তির অলী (অভিভাবকরা) মাফ করে দেয়, তাহলে মাফ পেয়ে যাবে, অন্যথায় হত্যা করে দেয়া হবে।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে-৪

ইসলামে অস্ত্র প্রয়োগের গুরুত্ব

ইসলাম এমন ধর্ম, অস্ত্র যার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত এ দ্বীন যথাযথ প্রতিষ্ঠা বা সংরক্ষণ কোনটাই হতে পারে না। বিজাতীয় দুশমনকে প্রতিহত করা এবং ইসলামকে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠা করা যেমন অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত সম্ভব নয়; মুসলমানদের পারস্পরিক শান্তি-শৃংখলা; জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তাও তেমনি অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত সম্ভব নয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা কিতাব নাযিল করেছেন, সাথে যমিনে অস্ত্র তৈরির উপাদানও সৃষ্টি করেছেন, যাতে কিতাবে বর্ণিত হেদায়াত ও জীবন বিধানকে অস্ত্রের বলে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা যায়। কারণ, সম্পূর্ণ

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দ্বীন ও দ্বীনের বিধান মেনে চলা সকলের জন্য সম্ভব হয় না। আল্লাহর বিধান ছেড়ে বাঁক পথ ধরা অনেকেরই তবিয়ত। এদেরকে সোজা পথে চালাতে অস্ত্র প্রয়োগের বিকল্প নেই। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কিতাব নাযিলের পাশাপাশি যমিনে অস্ত্রের উপাদান সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}

"আমি অবশ্যই আমার রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শন(মু'জিযা)সহ লোকদের নিকট প্রেরণ করেছি। আমি তাদের সাথে কিতাব নাযিল করেছি, নাযিল করেছি (আমার তরফ থেকে) এক ন্যায়দণ্ড, যাতে মানুষ (এর মাধ্যমে) ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর আমি লোহা পয়দা করেছি, যার ভেতর রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার। তা এ জন্য যে, আল্লাহ দেখতে চান কে তাকে না দেখেও তাঁর (দ্বীনের) ও তাঁর রসূলদের সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অসীমশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী।" (হাদিদ: ২৫)

ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

{وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد} أي: وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. اهـ

“(আর আমি লোহা পয়দা করেছি, যার ভেতর রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি) অর্থাৎ লৌহকে আমি এমন সব লোকের দমনকারী বানিয়েছি, যারা সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ এসে যাওয়ার পরও হক গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৮/২৭)

অতএব, অবাধ্যদেরকে বশীভূত করার জন্য অস্ত্র প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد . كتاب يهدي به، وحديد ينصره، كما قال تعالي ... اهـ

“দ্বীন কিছুতেই কায়েম হবে না কিতাব, মীযান (ন্যায়দণ্ড) এবং লোহা(র সমন্বয়) ব্যতীত। কিতাব থেকে হিদায়াত নেয়া হবে

আর লোহা তাকে সাহায্য করবে; যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন ...।” (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৩৫/৩৬)

তিনি অন্যত্র বলেন,

قال تعالى: { وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب} فمن عدل عن الكتاب قُوِّمَ بالحديد ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان نضرب بهذا يعنى السيف من عدل عن هذا يعنى المصحف. اهـ

“আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘আর আমি লোহা পয়দা করেছি, যার ভেতর রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার। তা এ জন্য যে, আল্লাহ দেখতে চান কে তাকে না দেখেও তাঁর (দ্বীনের) ও তাঁর রসূলদের সাহায্য করে।’ অতএব, যে কেউ কিতাব ছেড়ে বাঁকা পথ ধরবে, তাকে লৌহ প্রয়োগে সোজা করা হবে। এ কারণেই দ্বীন কায়েমের মাধ্যম (দুটি): কুরআন ও তরবারি। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আদেশ

করেছেন, এই (কুরআন) ছেড়ে যে ভিন্ন পথ ধরবে, তাকে এই (তরবারি) দ্বারা আঘাত করতে।" (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/২৬৪)

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. বলেন,

فإن امتناع الناس مما لا يحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعهم خوفاً من الله تعالى وبه ورد الأثر " إن الله يزع بالسلطان فوق ما يزع بالقرآن " . اهـ

"আল্লাহ তাআলার ভয়ের চেয়ে শাস্তির ভয়ে মানুষ নাজায়েয থেকে বেঁচে থাকে বেশি । এ ব্যাপারেই এ আছারটি বর্ণিত আছে- 'আল্লাহ তাআলা কুরআন দ্বারা যতটুকু শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেন, সুলতানের দ্বারা এর চেয়ে বেশি করেন।" (শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/৯১)

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فى بعض فوائد العقوبات المشروعة فى الدنيا ضبط العوام كما قال عثمان بن عفان رضى الله عنه ان الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن فان من يكون من المنافقين والفجار فانه ينزجر بما

يشاهده من العقوبات وينضبط عن انتهاك المحرمات فهذا بعض فوائد العقوبات السلطانية المشروعة واما فوائد الأمر والنهى فأعظم من ان يحصيها خطاب أو كتاب بل هى الجامعة لكل خير يطلب ويراد وفى الخروج عنها كل شر وفساد. اهـ

“শরীয়ত নির্ধারিত কিছু কিছু দুনিয়াবি শাস্তির একটি ফায়েদা এই যে, সেগুলো দ্বারা জনসাধারণের মাঝে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা হয়। যেমনটা হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ‘যতটুকু শান্তি-শৃংখলা আল্লাহ তাআলা কুরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন না, তার চেয়ে বেশি তিনি সুলতানের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন।’ কেননা, মুনাফিক ও পাপাচারি লোকেরা শাস্তি দর্শনে বারণ হয় এবং হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে। এটি শরীয়ত নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় শাস্তির একটি উপকারী দিক। আর আমর বিল মা’রূপ ও নাহি আনিল মুনকারের উপকারের কথা তো কোন এক বয়ানে বা কিতাবে বুঝানো সম্ভব না। বরং প্রত্যাশিত সকল কল্যাণ এতেই নিহিত। আর তা পরিত্যাগ করাতেই সকল অনিষ্ট ও ফাসাদ।” (মাজমুউল ফাতাওয়া: ১১/৪১৬)

অতএব, যারা ইসলাম শান্তির ধর্ম বলে বুলি আওড়ান;

ইসলামে মারামারি নেই, কাটাকাটি নেই বলে মুখে ফেনা তুলেন; দাওয়াত ও ইসলাহের মাধ্যমেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন- তারা বোকার স্বর্গে বসবাস করেন। আল্লাহ তাআলার চিরন্তন সুন্নাহ'র বিরোধি কথা বলেন। তারা কিছুতেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। উপরন্তু উম্মাহকে এক ভয়াবহ বিকৃতি, ফাসাদ ও পরাজয়ের দিকে ঠেলে দেবে।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ৫

জনসাধারণ কি অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার অধিকার রাখে?

এ প্রশ্নের উত্তরের আগে একটা বিষয় বুঝে নেয়া চাই। তা হলো- (হুদুদ-কেসাস) ও (উপস্থিত যুলম ও অন্যায় প্রতিহত করণ)- এর মধ্যকার ব্যবধান। বিষয়টি বুঝার জন্য দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি:

এক.

ধরুন একটা বাজারে কোন একটা সন্ত্রাসী একজন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করতে তার উপর চড়াও হয়েছে। সে ছুরি বের করে তাকে যবাই করে ফেলতে চাইছে। আশেপাশে যারা উপস্থিত আছে তাদের সামর্থ্য আছে উক্ত সন্ত্রাসীকে প্রতিহত করে নিরপরাধ লোকটাকে তার হাত থেকে রক্ষা করার। হতে পারে উপস্থিত লোকদের ধমকিতে, কিংবা শারীরিক আঘাতে সে সরে যাবে। আবার এও হতে পারে- উক্ত সন্ত্রাসী সহজে দমতে চাইবে না। এমনও হতে পারে- অস্ত্র প্রয়োগ কিংবা হত্যা করা ছাড়া তাকে দমন করা যাবে না। নিরপরাধ মুসলিম লোকটাকে তার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

এমতাবস্থায় বিধান কি? যদি অস্ত্র ব্যবহার বা হত্যা ছাড়া সন্ত্রাসীটাকে দমন করা সম্ভব না হয়, তাহলে উক্ত নিরপরাধ মুসলমান নিজে বা উপস্থিত লোকজন তার বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করতে কিংবা তাকে হত্যা করতে পারবে কি?

দ্বিতীয়ত: সন্ত্রাসী যদি নিরপরাধ লোকটাকে হত্যা করেই ফেলে, তাহলে শরীয়তের বিধান মতে একজন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যার কারণে সন্ত্রাসীকে হত্যা করতে হবে। একে কেসাস বলে।

এমতাবস্থায় বিধান কি? সাধারণ জনগণ কি কেসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করতে পারবে?

দুই.

একটা লম্পট একজন নারীর সম্ভ্রবহানি করতে চাচ্ছে। সেখানে

অনেকেই উপস্থিত। অবস্থা এমন যে, উক্ত লম্পটের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ ছাড়া কিংবা তাকে হত্যা করা ছাড়া নারীটির সম্ভ্রব রক্ষা করা সম্ভব না।

এমতাবস্থায় বিধান কি? উক্ত নারী কিংবা উপস্থিত লোকজন কি উক্ত লম্পটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করতে কিংবা তাকে হত্যা করতে পারবে?

দ্বিতীয়ত: লম্পট লোকটা যদি উক্ত নারীর সম্ভ্রবহানি করেই ফেলে, তাহলে তার উপর যিনার শাস্তি বর্তাবে। একে হদ বলে। লম্পটটা অবিবাহিত হলে তাকে একশ দোররা মারতে হবে আর বিবাহিত হলে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে।

এমতাবস্থায় বিধান কি? সাধারণ জনগণ কি তার উপর যিনার হদ (বেত্রাঘাত বা প্রস্তারাঘাতে হত্যা) কায়েম করতে পারবে?

এ দু'টি উদাহরণে হত্যায় লিপ্ত সন্ত্রাসী এবং যিনায় লিপ্ত লম্পটের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ, কিংবা প্রয়োজনে হত্যা করে নিরপরাধ মুসলমান ও উক্ত নারীকে রক্ষা করা হল- (উপস্থিত যুলম ও অন্যায় প্রতিহত করণ)। এটি 'আমর বিল মা'রূপ ও নাহি আনিল মুনকারের' মধ্যে পড়ে। আর হত্যা বা যিনা সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর শরীয়তের নিয়মানুযায়ী হত্যাকারী বা যিনাকারকে হত্যা করা বা বেত্রাঘাত করা হল- (হদ ও কেসাস)।

এখন প্রশ্ন:

- সাধারণ জনগণ কি (আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার) এবং (হদ-কেসাস) উভয়টিই কায়েম করতে পারবে?

- না'কি কোনটাই পারবে না?

- না'কি একটা পারবে আরেকটা পারবে না?

উত্তর: একটা পারবে আরেকটা পারবে না। আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার সম্পাদন করতে পারবে, কিন্তু হদ বা

কেসাস কায়েম করতে পারবে না। হুদুদ-কেসাস কায়েম করার দায়িত্ব ইমাম, সুলতান বা তাদের কতৃক নির্ধারিত ব্যক্তির (যেমন- কাজি)। সাধারণ জনগণের তা কায়েম করার অধিকার নেই।

অতএব, উপরোক্ত উদাহরণ দু'টিতে নিরপরাধ মুসলমান এবং উক্ত নারীকে রক্ষার জন্য সাধারণ জনগণ প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারবে। যদি হত্যা করা ব্যতীত উক্ত মহিলা বা মুসলমানকে রক্ষা করা সম্ভব না হয়, তাহলে হত্যাও করতে পারবে। এটি আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হত্যা বা যিনা সংঘটিত হয়ে যাওয়ার তাদের উপর হদ বা কেসাস কায়েম করতে পারবে না। তাই কেসাসস্বরূপ সন্ত্রাসীকে হত্যা বা হদরূপে যিনাকারকে হত্যা বা বেত্রাঘাত করতে পারবে না।

এখন প্রশ্ন হল- একটা পারবে আরেকটা পারবে না কেন? আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতে পারবে কিন্তু হুদুদ-কেসাস কায়েম করতে পারবে না কেন?

বিষয়টা একটু গোঁড়া থেকে বুঝতে চেষ্টা করি-

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার সম্পাদনের দায়িত্ব যেমন উম্মাহর, হুদুদ-কেসাস কায়েম করার দায়িত্বও উম্মাহর। কিন্তু আমর বিল মারূ'ফ ও নাহি আনিল মুনকার উম্মাহর সকলেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পাদন করতে পারবে, কিন্তু হুদুদ-কেসাস কায়েম করবেন উম্মাহর পক্ষ থেকে উম্মাহর ইমাম, সুলতান বা তাদের কতৃক নির্ধারিত ব্যক্তিগণ। সাধারণ জনগণ নিজেরা তা কায়েম করতে পারবে না। কারণ- আমর বিল মারূ'ফ ও নাহি আনিল মুনকার এবং হুদুদ-কেসাসের মাঝে ব্যবধান আছে:

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় তার অনুমতি ব্যতীত কোন সাহাবী কোন হদ বা কেসাস কায়েম করেননি, কিন্তু আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার সকলেই সম্পাদন করতেন।

- খোলাফায়ে রাশেদিনের খেলাফতকালে হুদুদ-কেসাস খোলাফায়ে রাশেদিন নিজেরা বা তাদের কতৃক নির্ধারিত ব্যক্তিরা কায়েম করতেন। তাদের অনুমতি ব্যতীত সাধারণ জনগণ তা কায়েম করতে পারতো না, কিন্তু আমর বিল

মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার সকলেই আঞ্জাম দিতেন।
- হুদুদ-কেসাস কায়েমের জন্য এতটুকু শক্তি-সামর্থ্য থাকা আবশ্যক যে, অবাধ্য অপরাধিদের পাকড়াও করে তাদের উপর হদ-কেসাস কায়েম করতে পারে এবং এর প্রতিক্রিয়ারূপে যে ফিতনা-ফাসাদ সংঘটিত হওয়ার সম্ভবনা আছে তা প্রতিহত করতে পারে। আর স্পষ্ট যে, পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা এবং উদ্ভূত ফেতনা-ফাসাদ প্রতিহত করার ক্ষমতা সাধারণ জনগণের নেই, কিন্তু তা ইমাম বা সুলতানের আছে। সাধারণ জনগণ হদ বা কেসাস কায়েম করতে গেলে উল্টো আরো ফেতনা-ফাসাদ ছড়াবে। তাই তারা তা কায়েম করতে পারবে না। কিন্তু ইমাম বা সুলতানের অবস্থা এর ব্যতিক্রম। তারা তাদের শক্তিবলে পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং উদ্ভূত সব ধরণের ফেতনা-ফাসাদ প্রতিহত করতে পারবেন। তাই তারা হুদুদ-কেসাস কায়েম করতে পারবেন।
- সাধারণ জনগণের উপর আপত্তি আসতে পারে যে, তারা স্বজনপ্রীতি, ঘুষ বা অন্য কোন দুনিয়াবি স্বার্থে কাউকে শাস্তি দিচ্ছে বা হত্যা করছে। কিন্তু ইমাম বা সুলতানের ক্ষেত্রে সাধারণত এ অভিযোগ আসবে না।
- চলমান উপস্থিত যুলুম ও অন্যায়ের অবস্থা এক রকম আর তা সম্পাদন শেষ হয়ে গেলে তার অবস্থা আরেক রকম।

চলমান অবস্থায় অপরাধ দৃশ্যমান। চোখের সামনেই তা সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু অপরাধ শেষ হয়ে গেলে তখন এর বিপরীতে হদ বা কেসাস কায়েমের জন্য শরীয়ত কয়েকটি জিনিস আবশ্যক করেছে। যেমন:

ক. যথোপোযুক্ত স্বাক্ষী-প্রমাণসহ অপরাধ প্রমাণ করা।

খ. স্বাক্ষীদের অবস্থা যাচাই করা যে, তারা সত্যবাদি না মিথ্যাবাদি।

গ. হদ কায়েমের পর্যাপ্ত শর্তাবলী পাওয়া গিয়েছে কি’না- তা নিশ্চিত হওয়া।

ইত্যাদি আরোও বিভিন্ন বিষয়, যা হুদুদ-কেসাসে প্রয়োজন। কিন্তু অপরাধ যখন সংঘটিত হচ্ছে, একজন স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করছে, তখন এসব কিছুই দরকার নেই। তাই, জনসাধারণের সম্মুখে সুস্পষ্ট কোন অন্যায় বা যুলুম সংঘটিত হলে তারা তৎক্ষণাৎ তা প্রতিহত করতে পারবে। প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যা পর্যন্ত করতে পারবে। কিন্তু হুদুদ-কেসাসের অবস্থা তার ব্যতিক্রম।

বি.দ্র.-১

সাধারণ জনগণ আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার কেবল ঐসব বিষয়েই করতে পারবে, যেগুলো শরীয়তে সুস্পষ্ট হারাম এবং সুস্পষ্ট জুলুম ও অন্যায়। যেমন- যিনা, হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব বিষয় সুস্পষ্ট নয়, যেগুলো হারাম-হালাল উভয়টারই সম্ভবনা রাখে, সেসব বিষয়ে করতে পারবে না। উলামাগণ বিশেষ শর্তসাপেক্ষে করতে পারবেন।

বি.দ্র.-২

কেউ যদি কাউকে যিনা, হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদির মতো সুস্পষ্ট কোন অপরাধে লিপ্ত দেখে এবং তাকে হত্যা ব্যতীত উক্ত হারাম বা যুলুম থেকে বিরত রাখা সম্ভব না হয়, ফলে বাধ্য হয়ে তাকে হত্যা করে দেয়- তাহলে আল্লাহ তাআলার দরবারে তার কোন জবাবদিহি করতে হবে না, বরং সওয়াবের অধিকারি হবে। কিন্তু কাজির দরবারে সে যদি উপযুক্ত স্বাক্ষী-প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করতে না পারে যে, উক্ত অপরাধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় তাকে হত্যা করেছে, তাহলে কাজির দরবারে সে হত্যাকারী বলে বিবেচিত হবে। হত্যাকারি হিসেবেই দুনিয়াতে

তার বিচার হবে। বিচারস্বরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে হত্যার বদলে হত্যা করা হবে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য (দিয়াত) পরিশোধ করতে হবে। আর যদি প্রমাণ করতে পারে যে, সে তাকে উপরোক্ত অপরাধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় বাধ্য হয়ে হত্যা করেছে, তাহলে মুক্তি পেয়ে যাবে।

বি.দ্র.-৩

মুজাহিদগণ যে সব এলাকা দখল করেছেন, সেগুলোতে হুদুদ-কেসাস কায়েম করতে পারবেন কি?

উত্তর: যেখানে মুজাহিদদের পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান এবং তারা ইসলামী ইমারা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন, সেখানে তো অবশ্যই কায়েম করবেন। আর যেসব এলাকায় তাদের একক আদিপত্য এখনোও কায়েম হয়নি, বরং হামলার মুখে যে কোন সময় ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে, সেগুলোতে হুদুদ-কেসাস কায়েম করবেন কি'না ভেবে দেখতে হবে। যদি সেখানে হুদুদ-কেসাস কায়েম করার দ্বারা লোকজন বিগড়ে না যায়, জিহাদের কোন ক্ষতি না হয়, কাফেররা সুবিধা গ্রহণ না করার আশংকা না থাকে- তাহলে ইনশাআল্লাহ কায়েম করতে পারেন। পক্ষান্তরে যদি লোকজন বিগড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে,

জিহাদের ক্ষতির আশংকা থাকে, কাফেরদের সুবিধা লাভের সম্ভাবনা থাকে- তাহলে কায়েম করবেন না। হুদুদ-কেসাসের পরিবর্তে মুনাসিব মতো অন্য কোন শরয়ী শাস্তি নির্ধারণ করে নেবেন। দাওয়াত, ইসলাহ ও সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করার চেষ্টা করবেন। যতদিন আল্লাহ তাআলা পূর্ণ তামকীন না দেন, ততদিন জরুরত বশত এভাবে চলতে হবে। এটা আল্লাহর হুদুদ ও কেসাসের প্রতি উদাসীনতার কারণে নয়, জরুরতে কারণে।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ৬

বিশেষ আবেদন:

[ভাইদের প্রতি আবেদন- আমার এ বিষয়ের লেখাগুলো ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে না পড়ে মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। যেসব শর্ত উল্লেখ করা হয়, সেগুলো ভালভাবে খেয়াল করুন। বিষয়টা অনেক নাজুক। একটু এদিক সেদিক হয়ে গেলে মাসআলা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। হালাল হারাম হয়ে যাবে, হারাম হালাল হয়ে যাবে। তাই মনোযোগের সাথে বুঝে শুনে পড়ুন।

অধিকন্তু আমার উদ্দেশ্য- ভাইদের এখনই হামলায় নেমে যাওয়া নয়। কারো উপর হামলা করতে হলে অবশ্যই যথাযথ মাসআলা বুঝে নিতে হবে এবং তা অফ লাইনে বুঝতে হবে। শুধু অন লাইনে পড়ে মাসআলা আগা-গোড়া সব বুঝে আসে না। তাই ভাইদের আমি নিষেধ করছি- আমার লেখার উপর ভিত্তি করে কারও উপর হামলা করবেন না। এর অনুমতি আমি দিই না। আমার উদ্দেশ্য- যাতে আমার লেখাটা পড়ে এ ব্যাপারে মৌলিক একটা ধারণা হাসিল হয়। বাকি বাস্তবে কারো উপর হামলা করতে হলে অবশ্যই, এবং অবশ্যই অফ লাইনে যোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে। তাই, ভাইয়েরা আমার! কেউ ভুল বুঝবেন না। তবে হ্যাঁ, প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। আমি উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। ওয়াসসালাম।]

পর্ব-৬

আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরযে কেফায়া

উপরে আমরা আলোচনা করলাম, আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার হিসেবে উপস্থিত যুলুম ও অন্যায় প্রতিহত করার অধিকার রাষ্ট্রের যেমন আছে, সাধারণ জনগণেরও আছে। প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যা পর্যন্ত করার অধিকার জনগণের আছে। শুধু যে, অধিকার আছে তাই না, বরং অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্র ব্যবহার ও হত্যা করা ফরয হয়ে পড়ে। এর ভিত্তি আরেকটা মাসআলার উপর। তা হল- আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের বিধান কি? তা কি ফরয, না ফরয নয়? ফরয হলে কি ফরযে আইন, না ফরয়ে কেফায়া?

উত্তর: আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয। তবে তা ফরযে কেফায়া। যেমন- জিহাদ ফরয তবে স্বাভাকি অবস্থায় তা ফরযে কেফায়া; এবং যেমন- কোন মুসলিম মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন ও জানাযার নামায ফরয এবং তা ফরযে

কেফায়া। ফেরযে কেফায়ার অর্থ- উম্মাহর প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির উপরই তা ফরয, সরকারি-বেসরকারি সকলের উপরই তা ফরয, তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা তা সম্পন্ন হয়ে গেলে বাকিদের উপর থেকে এর দায়িত্ব-ভার সরে যায়। আর কেউ-ই যদি আদায় না করে, তাহলে সামর্থ্যবান সকলেই গুনাগার হবে।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার যেহেতু সকলের উপরই ফরয, তাই (সরকারি-বেসরকারি) যার সামনেই কোন সুস্পষ্ট অপরাধ সংঘটিত হবে, তারই দায়িত্ব তা প্রতিহত করা। প্রতিহত করতে গিয়ে যদি স্বাভাবিক হুমকি-ধমকি কিংবা অস্ত্রবিহিন মারপিটের দ্বারা অপরাধী অপরাধ থেকে সরে পড়ে তাহলে তো ভালই, অন্যথায় অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিলে অস্ত্রই ব্যবহার করতে হবে। যদি হত্যা ছাড়া দমানো সম্ভব না হয়, তাহলে হত্যাই করতে হবে।

ফরযে কেফায়ার বিষয়টা পরিষ্কার করতে আগের উদাহরণে আবার ফিরে যাই। উক্ত উদাহরণে সন্ত্রাসী লোকটা নিরপরাধ

মুসলমান ব্যক্তিটির উপর চড়াও হয়েছিল। এখন তাকে প্রতিহত করার দরকার। উপস্থিত সকলের উপরই তা ফরয। তবে যদি উপস্থিত দুয়েক জন মিলে তাকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়, তাহলে বাকিদের উপর থেকে এর দায়িত্ব-ভার সরে যাবে। কিন্তু কেউ-ই যদি প্রতিহত না করে, তাহলে সকলেই ফরয তরকের কারণে গুনাহগার হবে। আর ফরয যেহেতু শুধু সরকারি লোকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকলের উপরই ফরয, তাই উপস্তিত লোকেরা নিজেরাই তা প্রতিহত করতে পারবে, রাষ্ট্রীয় বাহিনিকে খবর দিতে হবে না। বরং যদি রাষ্ট্রীয় বাহিনিকে খবর দিতে গেলে আশঙ্খা হয়- সন্ত্রাসী লোকটা নিরপরাধ মুসলমান লোকটাকে হত্যা করে ফেলবে, তাহলে উপস্থিত লোকদের জন্য জায়েয হবে না- নিজেরা হাত গুটিয়ে বসে থেকে তাকে হত্যা করতে দেয়া আর সরকারি বাহিনীর অপেক্ষা করা। বরং তাদের নিজেদেরকেই তখন এগিয়ে এসে তাকে প্রতিহত করতে হবে। তবে যদি কোনভাবে সন্ত্রাসী লোকটা মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে জনসাধারণের জন্য জায়েয হবে না, নিজেরাই কেসাসরূপে সন্ত্রাসীকে হত্যা করে ফেলা। বরং তারা তাকে পাকড়াও করে কাজির হাতে তুলে দেবে বিচারের জন্য। এরপর কাজি যখন তাদেরকে স্বাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকবে, তখন তারা সত্য সত্য স্বাক্ষ্য দেবে।

এটাই তখন তাদের দায়িত্ব।

বি.দ্র-১

আলোচনা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সরকার নিয়ে। কোন কুফরী রাষ্ট্র ও কাফের সরকার নিয়ে নয়।

বি.দ্র.-২

যদি কেউ আশংকা করে যে, আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতে গেলে তার জীবন চলে যেতে পারে বা তার কোন অঙ্গ নষ্ট হতে পারে, বা দীর্ঘ জেল-জরিমান হতে পারে: তাহলে তার জন্য আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার থেকে বিরত থাকারও অবকাশ আছে। অবশ্য এ মূহুর্তেও আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করাই উত্তম। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কারা জন্য না করাটাও উত্তম হতে পারে।

বি.দ্র-৩

যারা কোন জিহাদি তানজীমের সাথে জড়িত, যাদের একজন ধরা পড়লে আরো অনেকেরই ধরা পড়ার এবং জান-মালের ক্ষতি বা বিনাশের আশংকা আছে- তাদের জন্য কোন আমর বিল মা'রূফ বা নাহি আনিল মুনকারে লিপ্ত হওয়ার আগে হিসাব করে দেখতে হবে, তাতে লিপ্ত হওয়ার দ্বারা লাভ কতটুকু হবে আর ক্ষতির আশংকা কতটুকু। বিশেষ করে বর্তমান এই দুর্বলতার যামানায় যেখানে মুজাহিদদের সংখ্যা অনেক স্বল্প, আবার তাগুত সরকার হন্যে হয়ে তাদের খুঁজছে- তাই এ ধরণের কোন পদক্ষেপ নিতে অনেক হিসাব-নিকাশ করে নিতে হবে। কেননা, তার গ্রেফতারির দ্বারা যে শুধু তার নিজের জান, মাল, ও ইজ্জত-আব্রু হুমকির মুখে পড়বে তাই নয়, আরোও অনেককেও ক্ষতিগ্রস্থ হতে হতে পারে। তাই সাবধানতার সাথে পদক্ষেপ নেয়া চাই। এ ব্যাপারে তানজীমের কোন নিষেধাজ্ঞা থাকলে, যদি তা শরীয়তের সুস্পষ্ট পরিপন্থি না হয়, তাহলে তা মেনে চলা উচিৎ। ওয়াল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা আ'লাম।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ৭

দলীল-প্রমাণ

আমাদের মূল আলোচনা ছিল ‘কি কি কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে’- তা নিয়ে। বিষয়টি বুঝার জন্য প্রাসঙ্গিক আরও বিভিন্ন বিষয় এসে গেছে। এতক্ষণ যা আলোচনা হল তার সারকথা-

[আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার, উপস্থিত যুলুম ও অন্যায় প্রতিহত করা, হুদুদ-কেসাস কায়েম করা: সবগুলোই উম্মাহর দায়িত্ব। তবে বিশেষ মাসলাহাতের কারণে হুদুদ কেসাস কায়েম করার দায়িত্ব খলিফা, সুলতান, উমারা, কাজি ও ক্ষমতাশীলদের উপর; আর আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার, উপস্থিত যুলুম ও অন্যায় প্রতিহত করা সকলেরই দায়িত্ব। প্রশাসন-সাধারণ জনগণ সকলেই তা

আঞ্জাম দিতে পারবে। এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে যদি অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে প্রশাসনের ন্যায় সাধারণ জনগণও অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে। হত্যা ছাড়া প্রতিহত করা সম্ভব না হলে হত্যাও করতে পারবেন।]

আমাদের আলোচনা যেহেতু আমরা বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার নিয়ে, তাই আমরা হুদুদ-কেসাসের আলোচনায় যাবো না। আবার আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের মধ্য থেকে শুধু মুসলিম হত্যার বিষয়টিই যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয়, তাই আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার নিয়েও বিস্তারিত কোন আলোচনা এখানে করবো না। আল্লাহ তাআলা যদি তাওফিক দেন তাহলে তা নিয়ে অন্য সময় স্বতন্ত্র রিসালায় আলোচনা করবো। এখানে শুধু মুসলিম হত্যার বিষয়টির উপরই ক্ষান্ত করবো।

মুসলিম হত্যার বিষয়টি ঠিক ঠিক মতো বুঝার জন্য (সাধারণ

জনগণ অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার অধিকার রাখে কি’না?)- তা জানার দরকার ছিল। তাই এ ব্যাপারে কিঞ্চিত আলোচনা করা হল। এখানে তার কয়েকটি দলীল এবং আইম্মায়ে কেরামের কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখ করবো। ওমা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ!

****

দলীল: সাধারণ জনগণ অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার অধিকার রাখে

কুরআনে কারীম থেকে দলীল

১. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ}

“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই- যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে। আর এরূপ লোকই সফলকাম।” (আলে

ইমরান: ১০৪)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়:

- আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয এবং তা ফরযে কেফায়া। কারণ, আল্লাহ তাআলা উম্মাহর প্রত্যেকের উপর অত্যাবশ্যকরূপে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয করেননি, বরং তাদের মধ্য থেকে এ কাজের জন্য একটি দল থাকার আদেশ দিয়েছেন। কাজেই উম্মাহর একটি অংশ এ কাজ করলেই বাকিদের উপর থেকে দায়িত্ব-ভার সরে যাবে। আর কেউ-ই তা আদায় না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।

- আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার শুধু মুসলিম প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, বরং গোটা উম্মাহর সকলেরই তা তা দায়িত্ব। কারণ, আল্লাহ তাআলা গোটা উম্মাহকে সম্বোধন করে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আদেশ দিয়েছেন। একে শুধু শাসক শ্রেণীর সাথে খাছ করেননি।

- জনসাধারণও প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যা করতে পারবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা আমর বিল মা'রূফ ও নাহি

আনিল মুনকারের আদেশ দিয়েছেন। কাজেই কোন অন্যায় দেখা গেলে তা প্রতিহত করতে হবে। যদি নরম গরম কথা, হুমকি ধমকি কিংবা অস্ত্রবিহীন মারপিটে অন্যায় প্রতিহত হয়ে যায়, তাহলে তো ভালই; অন্যথায় অস্ত্র প্রয়োগে এমনকি হত্যা করে তা প্রতিহত করতে হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা আয়াতে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কোন নির্দিষ্ট স্তরের বৈধতা দিয়ে অন্য স্তরকে হারাম করেননি, বরং নিঃশর্তভাবে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আদেশ দিয়েছেন। এতে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের সকল স্তরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের সর্বনিম্ন স্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর তথা অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যাও এতে অন্তর্ভুক্ত আছে।

কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার নিয়ে আলোচনা এসেছে। আমি আরও কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি:

২. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ...}

"তোমরাই (দুনিয়ায়) সর্বোত্তম জাতি। মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। (শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে তোমাদের কাজ হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎকাজে আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাঁধা দেবে।" (আলে ইমারান: ১১০)

এ আয়াত আগের আয়াতে অনুরূপ।

৩. আল্লাহ তাআলা লুকমান আলাইহিস সালামের উপদেশ বিবৃত করেন-

{ يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}

"ওহে আমার পুত্র! নামায কায়েম কর, লোকদের সৎকাজে আদেশ দাও ও মন্দ মন্দ কাজে বাঁধা দাও এবং (এ কারণে) তোমার যে কষ্ট দেখা দেয় তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা বড় হিম্মতের কাজ।" (লুকমান: ১৭)

৪. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}

"বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদের উপর দাঊদ ও ঈসা ইবনে মারয়ামের যবানীতে লা'নত বর্ষিত হয়েছে। কেননা, তারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং সীমালংঘন করেছে। তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো, তা থেকে একে অপরকে বারণ করতে না। তারা যা করতো, নিঃসন্দেহে তা ছিল নিকৃষ্ট।" (মায়েদা: ৭৮-৭৯)

নাহি আনিল মুনকারের মতো ফরয দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার কারণে বনী ঈসরাঈলের উপর লা'নত বর্ষিত হয়েছে।

৫. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}

"মুসলিমদের দুটি দল পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের

দিকে ফিরে আসে।” (হুজুরাত: ৯)

মুসলমানদের এক দল আরেক দলের সাথে দ্বন্দ্ব-মারামারিতে লিপ্ত হলে, তাদের মাঝে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করে দেয়ার চেষ্টা করা হবে। যদি তারা এর মাধ্যমে বারণ হয়ে যায় তো ভাল; অন্যথায় যে দল বাড়াবাড়ি করবে, মীমাংসায় রাজি না হবে- তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করা হবে, যুদ্ধ করা হবে, যতক্ষণ না তারা তাদের বাড়বাড়ি ও সীমালঙ্গন ছাড়তে বাধ্য হয়। এখানে তাদেরকে যেহেতু অস্ত্র প্রয়োগ ও যুদ্ধ ব্যতীত বারণ রাখা সম্ভব না, তাই শরীয়ত অস্ত্র প্রয়োগ করার আদেশ দিয়েছে।

এ ছাড়াও আরোও অনেক আয়াতে আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আলোচনা এসেছে। এখানে এ কয়টা আয়াতই উল্লেখ করা হল।

সুন্নাহ্ থেকে দলীল

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان))

"তোমাদের যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে যেন স্বহস্তে (শক্তিবলে) তা প্রতিহত করে। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেন তার যবান দিয়ে প্রতিহত করে। যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তাহলে যেন অন্তর দিয়ে প্রতিহত করে। আর এ (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) হল দুর্বলতম ঈমান।" (সহীহ মুসলিম: ১৮৬)

এ হাদিস প্রমাণ করে:

- আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার উম্মাহর সামর্থ্যবান প্রতিটি সদস্যের উপর ফরয। কারণ, হাদিসে ব্যাপকভাবে সকলের প্রতিই আদেশ জারি করা হয়েছে। বিশেষ কোন শ্রেণীর মাঝে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। তবে পূর্বে আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোন একদল তা আদায় করে নিলে বাকিদের দায়িত্ব-ভার সরে যাবে।

- হাদিসে শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করার আদেশ এসেছে। অতএব, যদি কথায় কাজ না হয়, তাহলে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি, বরং নিঃশর্তভাবে শক্তি প্রয়োগের আদেশ এসেছে। অতএব, যদি অস্ত্রবিহীন মারপিটে কাজ না হয়, তাহলে অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। যদি হত্যা করা ছাড়া প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তাহলে হত্যা করে হলেও অন্যায় প্রতিহত করতে হবে।

এ ছাড়াও অসংখ্য হাদিসে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের আদেশ দেয়া হয়েছে। আমি এখানে আরও কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করছি:

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل))

“আমার পূর্বে যত উম্মতের কাছে যত নবী পাঠানো হয়েছে, তাদের সকলেরই নিজ উম্মতের মধ্য থেকে কতক হাওয়ারি ও সাহাবী ছিল, যারা তার সুন্নত আঁকড়ে ধরতো এবং তার আদেশের আনুগত্য করতো। তারা অতিক্রান্ত হওয়ার পর নিকৃষ্ট উত্তরসূরিরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। তারা এমনসব কথা বলবে, যা তারা করে না এবং এমন কর্ম করবে, যার আদেশ তাদের দেয়া হয়নি। যে স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগে) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে নিজ যবান দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সেও মুমিন। সে নিজ অন্তর দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এ(অন্তর দিয়ে জিহাদ করা)র বাহিরে সরিষার দানা বরাবর ঈমানও নেই।” (সহীহ মুসলিম: ১৮৮)

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب))

“যখন লোকজন জালেমকে (জুলুম করতে) দেখেও তার হাত না আটকাবে, তখন অচিরেই আল্লাহ তাআলা ব্যাপকভাবে তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন।” (আবু দাউদ: ৪৩৪০)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب))

"যখন কোন সম্প্রদায়ে গুনাহের কাজ হয়, আর জাতির অন্য লোকসকল তা প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিহত না করে, তখন অতিশীঘ্রই আল্লাহ তাআলা ব্যাপকভাবে তাদের উপর তার আযাব নাযিল করেন।" (আবু দাউদ: ৪৩৪০)

৫. ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেন-

عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى قال « فلا تعطه مالك ». قال أرأيت إن قاتلنى قال « قاتله ». قال أرأيت إن قتلنى قال « فأنت شهيد ». قال أرأيت إن قتلته قال « هو فى النار ».

"হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরজ করল- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আমার মাল কেড়ে নিতে আসে? তিনি

জওয়াব দিলেন- তাকে তোমার মাল দেবে না। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি সে আমার সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়? তিনি জওয়াব দিলেন, তুমিও তার সাথে মারামারি কর। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি সে আমাকে হত্যা করে ফেলে? তিনি জওয়াব দিলেন, তাহলে তুমি শহীদ হবে। ঐ ব্যক্তি আরজ করল- কি বলেন, যদি আমি তাকে হত্যা করে ফেলি? তিনি জওয়াব দিলেন, তাহলে সে জাহান্নামী হবে।” (সহীহ মুসলিম: ৩৭৭)

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

(من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد)

“যে ব্যক্তি তার মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে- সে শহীদ। যে তার পরিবার, তার নিজ প্রাণ বা দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হবে- সেও শহীদ।” (আবু দাউদ: ৪৭৭২)

শেষোক্ত হাদিস দু’টিতে জান, মাল, ইজ্জত-আব্রু, দ্বীন বা

পরিবার পরিজন রক্ষার্থে অস্ত্র প্রয়োগ এমনকি হত্যা পর্যন্ত করার সুস্পষ্ট অনুমতি দেয়া হয়েছে।

এছাড়াও এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস রয়েছে। এখানে এ ক’টিতেই ক্ষান্ত করা হল।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ৮

সাধারণ জনগণ অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার অধিকার রাখে

আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য

১. ইবনে কাসীর রহ.

আল্লাহ তাআলার বাণী-

{ وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ}

“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই- যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে। আর এরূপ লোকই সফলকাম।” (আলে ইমরান: ১০৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". وفي رواية: "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل". اهـ

“এ আয়াতের উদ্দেশ্য- এ কাজে উম্মাহর একটি দল নিয়োজিত থাকতে হবে। অবশ্য তা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উম্মাহর প্রত্যেকের উপরই ফরয। যেমন, সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان))

‘তোমাদের যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে যেন স্বহস্তে (শক্তিবলে) তা প্রতিহত করে। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেন তার যবান দিয়ে প্রতিহত করে। যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তাহলে যেন অন্তর দিয়ে প্রতিহত করে। আর এ (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) হল দুর্বলতম ঈমান।’

অন্য বর্ণনায় আছে-

"وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"

‘এ(অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা)র বাহিরে সরিষার দানা বরাবর ঈমানও নেই’।” (তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৯১)

ইবনে কাসীর রহ. এর বক্তব্য থেকে বুঝা গেল- আমরা বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের উপরই ফরয। প্রত্যেকের উপর তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী।

২. ইমাম নববী রহ.

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لأَحاد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، اهـ. والله أعلم

“উলামায়ে কেরাম বলেন, আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার শুধু প্রশাসনের লোকদের সাথেই খাছ নয়, বরং মুসলিম জনসাধারণের জন্যও তা বৈধ। ইমামুল হারামাইন রহ. বলেন, ‘এর দলীল: মুসলিম উম্মাহর ইজমা। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের পরবর্তী যামানায় শাসকবর্গ ছাড়া সাধারণ জনগণও আমরা বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার করতেন। মুসলিম উম্মাহ তাদের সমর্থন করেছেন। শাসন-কর্তৃত্ব ছাড়াই আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তারা তাদের কোন তিরস্কার করেননি।’ ওয়াল্লাহু আ’লাম।” (শরহে মুসলিম লিন-নববী: ২/২৩)

লক্ষ্য করুন- **(আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার শুধু প্রশাসনের লোকদের সাথেই খাছ নয়, বরং মুসলিম**

জনসাধারণের জন্যও তা বৈধ।)

৩. ইমাম জাসসাস রহ.

বক্তব্য-১:

باب فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

مطلب: في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية

قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} ... قد حوت هذه الآية معنيين. أحدهما: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآخر: أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نفسه إذا قام به غيره. لقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة} وحقيقته تقتضي البعض دون البعض, فدل على أنه فرض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. اهـ

"বাব: আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয।

মতলব: আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরযে কেফায়া।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ}

'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা চাই- যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে। আর এরূপ লোকই সফলকাম।'

এ আয়াত দু'টি বিষয় বুঝাচ্ছে:

এক. আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয।

দুই. তা ফরযে কেফায়া। কতকে তা আদায় করে ফেললে, বাকিদের উপর ফরয থাকবে না।

কেননা, আল্লাহ তাআলা বলছেন- {وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ} '(এ কাজের জন্য) তোমাদের মাঝে একটি দল থাকা চাই।' যার দাবি- উম্মাহর একটি অংশ, (সকলে নয়)। বুঝা গেল, তা ফরযে কেফায়া। কতকে তা আদায় করে ফেললে বাকিদের থেকে তার দায়িত্ব-ভার সরে যাবে।" (আহকামুল কুরআন: ২/৩৭)

বক্তব্য-২:

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত উল্লেখ করার পর বলেন,

فهذه الآي ونظائرها مقتضية لإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهي على منازل: أولها تغييره باليد إذا أمكن, فإن لم يمكن وكان في نفيه خائفا على نفسه إذا أنكره بيده فعليه إنكاره بلسانه, فإن تعذر ذلك لما وصفنا فعليه إنكاره بقلبه. اهـ

"এ সকল আয়াত এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াতের দাবি- আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ফরয। এর বিভিন্ন দরজা রয়েছে। সর্বোচ্চ দরজা হল, সম্ভব হলে শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করে দেয়া। যদি তা সম্ভব না হয় এবং শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করতে গেলে জীবনের আশংকা হয়, তাহলে যবান দিয়ে প্রতিহত করবে। যদি পূর্বোক্ত কারণে (অর্থাৎ জীবনের আশংকায়) তাও অসম্ভব হয়, তাহলে অন্তর দিয়ে প্রতিহত করবে।" (আহকামুল কুরআন: ২/৩৮)

বক্তব্য-৩:

এরপর তিনি এ সম্পর্কে অনেকগুলো হাদিস উল্লেখ করেন। তারপর বলেন,

وفي هذه الأخبار دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما حالان: حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته, ففرض على من أمكنه إزالة ذلك بيده أن يزيله; وإزالته باليد تكون على وجوه: منها أن لا يمكنه إزالته إلا بالسيف, وأن يأتي على نفس

فاعل المنكر فعليه أن يفعل ذلك. كمن رأى رجلا قصده أو قصد غيره بقتله أو بأخذ مال أو قصد الزنا بامرأة أو نحو ذلك, وعلم أنه لا ينتهي إن أنكره بالقول أو قاتله بما دون السلاح فعليه أن يقتله; لقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكرا فليغيره بيده" , فإذا لم يمكنه تغييره بيده إلا بقتل المقيم على هذا المنكر فعليه أن يقتله فرضا عليه. وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بيده ودفعه عنه بغير سلاح انتهى عنه لم يجز له الإقدام على قتله, وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بالدفع بيده أو بالقول امتنع عليه, ولم يمكنه بعد ذلك دفعه عنه, ولم يمكنه إزالة هذا المنكر إلا بأن يقدم عليه بالقتل من غير إنذار منه له فعليه أن يقتله. اهـ

“এসব হাদিস প্রমাণ, আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের দুটি হালত রয়েছে-

যখন অন্যায় প্রতিহত ও দূরীকরণ সম্ভব। এমতাবস্থায় শক্তিবলে তা প্রতিহত করার সামর্থ্য যার আছে, তার উপর ফরয- তা প্রতিহত করা।

শক্তিবলে প্রতিহত করার বিভিন্ন সূরত হতে পারে:-

হয়তো তরবারি ব্যবহার করা এবং অন্যায়ে লিপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা ব্যতীত তা প্রতিহত করা সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় এমনটা করাই (অর্থাৎ তরবারি প্রয়োগে করে হত্যা করে দেয়াই) তার কর্তব্য।

যেমন- কেউ দেখলো, এক ব্যক্তি তাকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা বা তার মাল লুণ্টন করতে চাচ্ছে, কিংবা কোন মহিলার সাথে যিনা করতে চাচ্ছে, কিংবা এ রকম অন্য কোন অন্যায় করতে চাচ্ছে। আর সে জানে, কথা বা অস্ত্রবিহীন বাধার দ্বারা সে বিরত হবে না। এমতাবস্থায় তার কর্তব্য- তাকে হত্যা করে দেয়া। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"من رأى منكرا فليغيره بيده"

'তোমাদের যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে, সে যেন স্বহস্তে (শক্তিবলে) তা প্রতিহত করে।'

যখন উক্ত অন্যায়ে অটল ব্যক্তিকে হত্যা করা ব্যতীত তা প্রতিহত করা সম্ভব না, তখন তার উপর ফরয- তাকে হত্যা করে দেয়া।

আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, অস্ত্র ছাড়া (খালি) হাতে বাধা দেয়ার দ্বারাই সে বিরত হয়ে যাবে, তাহলে হত্যা করতে যাওয়া জায়েয হবে না।

আর যদি প্রবল ধারণা হয়, মুখে বা বা (খালি) হাতে বাধা দিতে গেলে সে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং এরপর তার পক্ষ থেকে কোন ধরণের পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যতীতই তাকে হত্যা করে দেয়া ছাড়া তাকে তা থেকে বিরত রাখা এবং

অন্যায় প্রতিহত করা সম্ভব হবে না- তাহলে তার জন্য আবশ্যক: তাকে হত্যা করে দেয়া।” (আহকামুল কুরআন: ২/৪০)

অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যার ব্যাপারে জাসসাস রহ. এর বক্তব্য সুস্পষ্ট।

৪. ইমাম কুরতুবী রহ.

فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله، وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل، فإن زال بدون القتل لم يجز القتل، وهذا تلقي من قول الله تعالى: "فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله". وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على المال عن نفسه أو عن ماله أو نفس غيره فله ذلك ولا شي عليه. ولو رأى زيد عمراو قد قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن صاحب المال قادرا عليه ولا راضيا به. اهـ

“যদি যবান দ্বারা অন্যায় প্রতিহত করতে পারে, তাহলে তাই করবে। আর যদি শাস্তি বা হত্যা ছাড়া সম্ভব না হয়, তাহলে তাই করবে। হত্যা ছাড়া প্রতিহত হয়ে গেলে হত্যা জায়েয হবে

না। এই মাসআলা গৃহীত হয়েছে আল্লাহ তাআলার এ বাণী থেকে-

" فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله "

‘(মুসলিমদের দুটি দল পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে) যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে।’

এর ভিত্তিতেই উলামায়ে কেরাম বলেন, কোন ব্যক্তির নিজের জান-মালের উপর বা অন্য কারো জান-মালের উপর কেউ আক্রমণ করলে, সে উক্ত আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে পারবে এবং এর বিপরীতে তার উপর কোন জরিমানা বর্তাবে না। যায়েদ যদি আমরকে দেখে যে, সে বকরের মাল লুণ্টন করতে চাচ্ছে, তাহলে দেখতে হবে- মালের মালিক যদি আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে সক্ষম না হয় এবং সে মাল প্রদানে সম্মতও নয়, তাহলে যায়েদের উপর ফরয বকরকে রক্ষা করা এবং আমরকে প্রতিহত করা।” (তাফসীরে কুরতুবী: ৪/৪৯)

আশাকরি এ বক্তব্যগুলো থেকেই পরিষ্কার হয়েছে যে, সাধারণ জনগণ প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ ও হত্যা করে অন্যায় প্রতিহত করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে-৯

((অনেক দিন হল লেখাটা শুরু করেছিলাম। সময়-সুযোগের অভাবে শেষ করা গেল না। এখন আলহামদু লিল্লাহ কিছুটা সুযোগ হয়েছে। তাই আবার লিখতে শুরু করলাম।))

হত্যার শ্রেণীবিভাগ

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছি যে, কি কি কারণে একজন মুসলমানকে হত্যা করা যায়। এখানে বিষয়টাকে আরেকটু পরিষ্কার করে তোলার চেষ্টা করব।

যেসব কারণে একজন মুসলমানকে হত্যা করা যায়, তার সবগুলো একই শ্রেণীভুক্ত নয়। একেক জনের হত্যা একেক শ্রেণীভুক্ত। মৌলিকভাবে আমরা মুসলিম হত্যাকে নিম্নোক্ত চার শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি:

১. হদরূপে হত্যা।

২. কেসাসরূপে হত্যা।

৩. دفع الصائلতথা জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষার্থে হত্যা।

৪. সিয়াসত ও তা'যিররূপে হত্যা।

এক. হদ

হদ বলা হয় শরীয়ত কতৃক সুনির্ধারিত শাস্তি, যাতে কোন ধরণের কম-বেশ বা পরিবর্তনের সুযোগ নেই এবং যা প্রমাণিত হওয়ার পর মাফ করার কোন সুযোগ নেই। যেমন- চোরের হাত কাটা। এটা হদ। এতে কোন পরিবর্তন করা যাবে না। হাত কাটার বদলে জেল-জরিমানা নির্ধারণ করা যাবে না। তদ্রূপ কাযির দরবারে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে চুরি প্রমাণিত হওয়ার পর চোরকে মাফ করে দেয়া এবং হাত না কেটে ছেড়ে দেয়ারও কোন সুযোগ নেই।

হানাফি মাযহাব মতে ছয়টি অপরাধের শাস্তি হদ বলে গণ্য:

১. যিনা।

২. মদপান।

৩. মদ ব্যতীত অন্য কোন নেশাজাত দ্রব্য সেবনে মাতাল হয়ে পড়লে। অবশ্য এর শাস্তি মদপানের শাস্তির সমান তথা আশি দোররা।

৪. কজফ তথা পূত-পবিত্র কোন স্বাধীন মুসলমানকে যিনার অপবাদ দেয়া ।

৫. চুরি।

৬. রাহাজানি।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. (১২৫২হি.) ইবনে কামাল পাশা রহ. (৯৪০হি.) থেকে বর্ণনা করেন,

وهي ستة أنواع: حد الزنا، وحد شرب الخمر خاصة، وحد السكر من غيرها والكمية متحدة فيهما، وحد القذف، وحد السرقة، وحد قطع الطريق. اهـ

“হদ ছয় প্রকার: ১. যিনার হদ। ২. মদপানের হদ। ৩. মদ ব্যতীত অন্য কোন মাদক সেবনে মাতাল হওয়ার হদ। তবে শাস্তির পরিমাণ উভয়টাতে একই। ৪. কজফ তথা যিনার অপবাদ লাগানোর হদ। ৫. চুরির হদ। ৬. রাহাজানির হদ।” (রদ্দুল মুহতার: ৪/৩)

হদরূপে যাদের হত্যা করা হবে

১. বিবাহিত যিনাকারী পুরুষ বা মহিলা

এদেরকে রজম করে তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। আর অবিবাহিত হলে একশো বেত্রাঘাত লাগানো হবে। বেত্রাঘাত কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা, আর রজম হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}

“যিনাকারী পুরুষ ও যিনাকারী নারী: প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে। তোমরা যদি আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখ, তাহলে তাদের প্রতি করুণাবোধ যেন আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। আর মু’মিনদের একটা দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।” (নূর: ২)

হাদিসে এসেছে,

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين

التارك للجماعة.

“যে মুসলমান স্বাক্ষী দেয়- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল; তিন কারণের কোন একটা ব্যতীত তার রক্ত হালাল নয়: জানের বদলায় জান, বিবাহিত যিনাকার এবং মুসলমানদের জামাআত পরিত্যাগকারী দ্বীনত্যাগী (মুরতাদ)।” (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৬৪৮৪ , সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ৪৪৬৮)

ইসলামে রজমের বিধান শুরু হয় ইয়াহুদিদের দিয়ে। দুই ইয়াহুদি নারী-পুরুষ যিনা করে। ইয়াহুদিরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচার নিয়ে আসে। তিনি তাদের উভয়কে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করেন এবং বলেন,

اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه

“হে আল্লাহ! তারা যখন তোমাদের আদেশ মিটিয়ে দিয়েছে, তখন সর্ব প্রথম আমি তা যিন্দা করলাম।” (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাবু রজমিল ইয়াহুদ; সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, বাবুররজমি ফিল বালাত্ব।)

মায়িয আলআসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনা করে ফেলেন। তিনি তাওবা করে লজ্জিত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে নিজ অপরাধ স্বীকার করে হদ কায়েম করতে বলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু তিনি বার বার হদ কায়েমের জন্য আবেদন করতে থাকেন। এভাবে চার বার করার পর তিনি রজমের আদেশ দেন। ফলে তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা হয়। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, বাব: আর-রজমু বিল মুসাল্লা; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: মানি'তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা।)

জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা যিনা করে ফেলেন। তিনি তাওবা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে হদ কায়েমের আবেদন জানান। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে মায়িয আলআসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো তাকেও রজম করে হত্যা করেন। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: মানি'তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা।)

এক লোক এক বাড়িতে কর্মচারি ছিল। সে বাড়ির মালিকের স্ত্রীর সাথে যিনা করে ফেলে। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর হদ কায়েম করেন। কর্মচারি লোকটি অবিবাহিত ছিল তাই তাকে একশো

বেত্রাঘাত করেন এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেন। আর মালিকের স্ত্রী বিবাহিত হওয়ায় তাকে রজম করে হত্যা করেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুশ শুরূত, বাবুশ শুরূতিল্লাতি লা তাহিল্লু ফিলহুদুদ; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদুদ, বাব: মানি'তারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা।)

উল্লেখ্য যে, হানাফি মাযহাব মতে উক্ত নির্বাসন হদ হিসেবে নয়, সিয়াসত হিসেবে। ইমামুল মুসলিমিন যদি কাউকে নির্বাসন দেয়া উচিৎ মনে করেন তাহলে দিতে পারেন। অন্যথায় নির্বাসন দেয়া জরুরী নয়। আর যদি নির্বাসন দিতে গেলে উক্ত লোক মুরতাদ হয়ে যাওয়ার বা গোমরাহ হয়ে যাওয়ার বা অন্যদের ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকে কিংবা অন্য কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে তাহলে নির্বাসন দেয়া উচিৎ হবে না। (দেখুন : শরহু মুখতাসারিত ত্বহাবি, ৬/১৬২-১৬৩; বাদায়িউস সানায়ি': ৫/৪৯৬)

২. ডাকাত ও রাহজান

প্রধানত ডাকাত ও রাহজান বলতে সেসব লোককে বুঝায়, যারা চলন্ত রাস্তার আশেপাশে লুকিয়ে থাকে। রাস্তা দিয়ে

চলাচলরত পথিকদের উপর হামলা করে তাদের মাল লুণ্টন করে। মালের স্বার্থে প্রয়োজনে তাদের জখম বা হত্যা করে। ফিকহের পরিভাষায় ডাকাত বলতে সাধরণ এদেরকেই বুঝানো হয়। তবে আইম্মায়ে কেরাম ঐসব লোককেও ডাকাত ও রাহজানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যারা কোন প্রকার তাবীল ব্যতীত শুধুই অর্থ-সম্পদ ও ক্ষমতার লোভে ইমামুল মুসলিমীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফাসেক, জালেম বা মুরতাদ শাসক অপসারণ করে যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেয়া তাদের উদ্দেশ্য নয়, অর্থ-সম্পদ আর নেতৃত্ব-ক্ষমতাই তাদের উদ্দেশ্য।

তবে সব ধরণের ডাকাতকে হত্যা করা হবে না। ডাকাতি ও রাহজানির শাস্তি অপরাধের মাত্রা হিসেবে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

- যদি রাহাজানি করতে গিয়ে কাউকে হত্যা করে, তাহলে হদস্বরূপ তাকেও হত্যা করা হবে।

- যদি হত্যার পাশাপাশি মালও লুণ্টন করে, তাহলে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হবে কিংবা হত্যা করে তিন দিন পর্যন্ত শূলে লটকিয়ে রাখা হবে।

- যদি হত্যা না করে, শুধু মাল লুণ্টন করে: তাহলে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেয়া হবে (অর্থাৎ ডান হাত ও বাম

পা)।

- আর যদি হত্যাও না করে, মালও লুণ্টন না করে বরং এর আগেই ধরা পড়ে যায়, তাহলে পাকড়াও করে প্রথমত প্রহার করা হবে অতঃপর জেলে বন্দী করে রাখা হবে। যখন তাওবা করে ভাল হয়ে যাবে এবং চেহারা ও চাল-চলনে তাওবার সুস্পষ্ট আলামত প্রকাশ পাবে, তখন ছাড়া হবে। অন্যথায় মৃত্যু পর্যন্তই জেলে বন্দী করে রাখা হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

"যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যমিনে ফাসাদ-বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে- তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে ওদের নির্বাসিত করা হবে। এটা দুনিয়াতে ওদের লাঞ্চনা, আর আখেরাতে ওদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।" (মায়েদা: ৩৩)

বি.দ্র.

একাধিক ব্যক্তি বা এক দল মিলে রাহাজানি করলে সবার উপরই সমান শাস্তি বর্তাবে। যেমন, কেউ লুণ্ঠন ও হত্যা করেছে আর কেউ পাহারা দিয়েছে- তাহলে হদরূপে সকলকেই হত্যা করা হবে। হত্যাকারীদেরকেও হত্যা করা হবে, পাহারাদারদেরকেও হত্যা করেছে। কারণ, হত্যাকারীরা মূলত পাহারাদারদের পাহারার কারণেই হত্যা করতে সমর্থ্য হয়েছে। কাজেই, হত্যায় সকলেই অংশীদার। সকলের উপরই হত্যার বিধান আরোপ হবে।

ডাকাত ও রাহজানদের এ শাস্তিগুলো হদের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কেউ তা মাফ করতে পারবে না। কেননা, হদ আল্লাহর হক। কেউ তা মাফ করার অধিকার রাখে না। তবে এরা যদি পাকড়াও হওয়ার পূর্বেই তাওবা করে নেয় এবং স্বেচ্ছায় ইমামুল মুসলিমীনের কাছে এসে ধরা দেয়, তাহলে আল্লাহর হক তথা হদ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

“তবে তোমরা তাদের পাকড়াও করার পূর্বেই যারা তাওবা করে নেবে, তাদের বিষয়টা ব্যতিক্রম। এরূপ ক্ষেত্রে জেনে রেখ, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (মায়েদা: ৩৪)

আল্লাহর হক মাফ হয়ে গেলেও বান্দার হক তাদের উপর বর্তাবে। তখন বান্দার হক হিসেবে লুণ্ঠিত মাল ফেরত দিতে হবে। কাউকে জখম বা কোন অঙ্গ নষ্ট করে থাকলে তার বদলা নেয়া হবে। কাউকে হত্যা করে থাকলে কেসাস নেয়া হবে।

এ দু’টি অপরাধ হদ হওয়ার ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের দ্বিমত নেই। আরোও কয়েকটি অপরাধ রয়েছে, যেগুলো হদ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে:

৩. সমকামীতা।

৪. নামায তরক করা।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করা।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে- ১০

তিন. সমকামিতা

মানব ইতিহাসে এটি অতীব জঘন্য অপরাধ। সর্বপ্রথম লূত আলাইহিস সালামের কওম এই জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয়। এদের পূর্বে এই কর্মের চিন্তা কারো মাথায় আসেনি। আল্লাহ তাআলা এদেরকে এমন ভয়াবহভাবে ধ্বংস করেছেন, যা অন্য কোন কওমকে করেননি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84)

“আমি লূতকেও পাঠালাম। যখন তিনি নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি এমন অশ্লীল কর্ম করছ, যা তোমাদের আগে সারা বিশ্বে কেউ করেনি? তোমরা কামেচ্ছা পূরণের জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে যাও! (আর এটা তো কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় বরং তোমরা এমন লোক যে,

(সভ্যতার) সীমা চরমভাবে লংঘন করেছো। তার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল কেবল এই যে, ‘এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা বড় পবিত্র থাকতে চায়।’ অতঃপর (যখন আমার আযাব এলো,) তখন আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে (জনপদ থেকে বের করে) রক্ষা করলাম। তবে তার স্ত্রী ছাড়া। সে অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে শামিল থাকলো (যাদের উপর আযাব আপতিত হল)। আমি তাদের উপর (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং চেয়ে দেখ, অপরাধীদের পরিণাম কেমন ভয়াবহ হয়েছিল!” (আ’রাফ: ৮০-৮৪)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58)

“আমি তাদের উপর বর্ষণ করলাম এক মারাত্মক (পাথর) বৃষ্টি। আগে থেকেই যেসব লোককে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের উপর বর্ষিত সে বৃষ্টি কতই না মন্দ ছিল!” (নামল: ৫৮)

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83)

“অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে গেল, তখন আমি সে জনপদের উপর দিককে নিচের দিকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর থাকে থাকে পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করলাম, যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে চিহ্নিত ছিল। সে জনপদ এই জালিমদের থেকে দূরে নয়।” (হুদ: ৮২-৮৩)

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75)

“সুতরাং সূর্যোদয় হওয়া মাত্রই মহানাদ তাদের আঘাত করল। অনন্তর আমি সে ভূখণ্ডকে উল্টিয়ে উপর-নিচ করে দিলাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথর-ধারা বর্ষণ করলাম। নিশ্চয়ই অনুসন্ধানীদের জন্য এসব ঘটনার মাঝে বহু নিদর্শন রয়েছে।” (হিজর: ৭৩-৭৫)

হাদিস শরীফে সমকামিদের হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)

“কাউকে লূত আলাইহিস সালামের কাওমের মতো কাজ

(অর্থাৎ সমকামিতা) করতে দেখলে যে করেছে এবং যার সাথে করেছে, তাদের উভয়কে হত্যা করে দাও।” (আবু দাউদ: ৪৪৬৪ , তিরিমিযি: ১৪৫৬)

তবে সমকামিদের শাস্তির ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের দ্বিমত আছে:

কেউ কেউ বলেন, তাদেরকে সর্বাবস্থায় হত্যা করে দিতে হবে।

কেউ কেউ বলেন, তাদের শাস্তি যিনার শাস্তির অনুরূপ। অর্থাৎ অবিবাহিত হলে একশো বেত্রাঘাত আর বিবাহিত হলে রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা। তাদের মতে সমকামিতা যিনার মতোই হদের অন্তর্ভুক্ত।

আবার কারো কারো মতে তাদের শাস্তি হদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের শাস্তি যিনার শাস্তির অনুরূপ নয়। আবার সর্বাবস্থায় তাদের হত্যা করাও আবশ্যক নয়। বরং তাদের শাস্তি তা’যিররূপে গণ্য। তা’যির বলা হয় অনির্ধারিত শাস্তিকে। অর্থাৎ

ইমামুল মুসলিমীন যে ধরণের শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন দিতে পারবেন। যদি প্রহার ও বন্দীর দ্বারাই তারা বিরত হবে মনে হয়, তাহলে এতেই ক্ষান্ত রাখবেন। কিন্তু যারা এ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে, তাদেরকে হত্যা করে দেবেন। বিবাহিত হলেও, অবিবাহিত হলেও।

ইমামুল মুসলিমীন এদেরকে অত্যন্ত ভয়াবহ পন্থায় হত্যা করবেন। যেমন:

১. আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবেন।
২. কিংবা দেয়াল ধ্বসিয়ে দিয়ে চাপা দিয়ে হত্যা করবেন।
৩. কিংবা উঁচু পাহাড় বা বিল্ডিংয়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করবেন। পড়ন্ত অবস্থায় উপর থেকে পাথর বর্ষণ করবেন, যেমনটা লূত আলাইহিস সালামের কওমের সাথে করা হয়েছে।
৪. কিংবা অতীব দূর্গন্ধময় স্থানে আটকে রাখবেন, যতক্ষণ না দূর্গন্ধের প্রকটতায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
(দেখুন: হেদায়া: ২/৫১৬, ফাতহুল কাদির: ৫/২৪৯-২৫২, রদ্দুল মুহতার: ৪/২৭)

বি.দ্র.

*জুলহাজ মান্নান ও তার সমকামি বন্ধু সামির মাহবুব তনয় যদি মুরতাদ নাও হয়ে থাকতো, তাহলেও শুধু এ সমকামিতার অপরাধে এবং তার প্রচার-প্রসারের অপরাধেই তাদের হত্যা করে দেয়া আবশ্যক হতো। *এমন নাপাক কীটদের যমিনে বেঁচে থাকার অধিকার নেই।*

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে- ১১

চার. নামায তরককারী

নামায তরককারীর ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মতভেদ রয়েছে।

হানাফি মাযহাব মতে নামায তরককারীকে বন্দী করে শাস্তি দিতে থাকা হবে। যতদিন নামায পড়তে শুরু না করবে, ততদিন জেলে আটকে রেখে শাস্তি দিতেই থাকা হবে। হয়তো নামায পড়তে সম্মত হবে, নয়তো এভাবে বন্দী অবস্থায়ই মারা যাবে।

আর আইম্মায়ে সালাসা (মালেক, শাফিয়ি ও আহমাদ) রাহিমাহুমুল্লাহর অভিমত অনুযায়ী- বন্দী করার পর যদি নামায পড়তে সম্মত না হয়, তাহলে হত্যা করে দেয়া হবে।

তবে কি হিসাবে হত্যা করা হবে সেটাতে মতভেদ আছে। আহমদ রহ. এর মতে সে মুরতাদ হয়ে গেছে। মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। আর মালেক রহ. ও শাফিয়ি রহ. এর মতে হদরূপে হত্যা করা হবে, যেমন বিবাহিত যিনাকারকে হদরূপে হত্যা করা হয়। অর্থাৎ তাদের মতে সে মুরতাদ হয়নি, তবে যিনার শাস্তির মতো নামায তরকের শাস্তি হল- হত্যা।

অর্থাৎ আহমাদ রহ. এর মতে নামায তরককারী মুরতাদ। মুরতাদ হিসেবে তাকে হত্যা করা হবে। আর বাকি তিন ইমামের মতে মুরতাদ নয়। তবে মালেক রহ. ও শাফিয়ি রহ. এর মতে হদরূপে হত্যা করা হবে। আর আবু হানিফা রহ. এর মতে জেলে বন্দী রেখে শাস্তি দেয়া হবে।
[দেখুন: কিতাবুস সালাত ওয়া হুকমু তারিকিহা- ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.); পৃষ্ঠা: ১২-১৩]

পাঁচ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তিকারী

আইম্মায়ে কেরাম সকলে একমত যে, সাধারণ মুরতাদের শাস্তি হল- হত্যা করে দেয়া। তবে যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে। তখন আর হত্যা করা হবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যে কটুক্তি করবে, সে সর্বসম্মতিতে মুরতাদ। তবে সাধারণ মুরতাদ যেমন তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে তার তাওবা কবুল করে হত্যা না করে ছেড়ে দেয়া হয়, এর ব্যাপারেও এমনটি করা হবে কি'না সেটা মতভেদপূর্ণ।

মালেকি ও হাম্বলি মাযহাব মতে দুনিয়াতে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়। তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করতে হবে। কেননা, তাদের মতে কটুক্তিকারী মুরতাদের শাস্তি হদের অন্তর্ভুক্ত। আর হদ তাওবা করার দ্বারা মাফ হয় না। যেমন- কারো

ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে যিনা প্রমাণিত হওয়ার পর যদি সে তাওবা করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে আখেরাতে মাফ করবেন ঠিকই, কিন্তু দুনিয়াতে অবশ্যই তার উপর যিনার শাস্তি কায়েম করতে হবে। তদ্রূপ কটুক্তিকারী (মুসলিম হোক অমুসলিম হোক) তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে আখেরাতে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ পেয়ে যাবে, কিন্তু দুনিয়াতে অবশ্যই তাকে হদরূপে হত্যা করে দিতে হবে।

শাফিয়ি মাযহাব মতে কটুক্তিকারীর শাস্তি কোন কোন সূরতে হদের অন্তর্ভুক্ত (তখন তাকে মুসলমান হয়ে গেলেও হত্যা করে দিতে হবে) আর কোন কোন সূরতে হদের অন্তর্ভুক্ত নয় (তখন তাওবা করে মুসলমান হলে মাফ করে দেয়া হবে)।

হানাফি মাযহাব মতে কটুক্তিকারী মুরতাদের শাস্তি অন্যান্য মুরতাদদের মতোই। হদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে হত্যা করা হবে না। তবে কোন যিম্মি যদি কটুক্তির পর তাওবা করে মুসলামন হয়, তাহলে তার ব্যাপারে একটু ভিন্নতা আছে। তাহলো- যদি পাকড়াও করার আগেই মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে হত্যা করা হবে না। আর পাকড়াও করার পর মুসলমান হয়ে গেলেও হত্যা করে দিতে

হবে।

[দেখুন: ফাতাওয়া শামী, ৪/২৩৩, বাবুল মুরতাদ; ৪/২১৫, বাবুল উশরি ওয়াল খারাজি ওয়াল জিযইয়া]

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ১২

দুই. কেসাস (القصاص)

কেউ কাউকে হত্যা করলে হত্যার বদলায় তাকেও হত্যা করা, কিংবা কেউ কারো কোন অঙ্গ নষ্ট করলে অঙ্গের বদলায় তারও উক্ত অঙ্গ নষ্ট করাকে কেসাস বলে। তবে আমাদের এ আলোচনায় কেসাস দ্বারা হত্যার বদলে হত্যা উদ্দেশ্য।

কোন মুসলমান অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে কেসাসের বিধান রয়েছে। তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে। যে কাউকে হত্যা করলেই তার বিপরীতে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে- এমনটা নয়।

কেসাসের বিধান আরোপ হওয়ার জন্য মৌলিকভাবে দু'টি শর্ত বলা যায়-

প্রথম শর্ত

যাকে হত্যা করা হয়েছে সে ব্যক্তি محقون الدم على التابيد হতে হবে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি হতে হবে, শরীয়ত যার জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছে এবং শরীয়ত সম্মত কোন কারণ না পাওয়া গেলে চিরদিনের জন্য তাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

উপরোক্ত মূলনীতির নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের হত্যার দ্বারা কেসাস আসবে না-

১. হরবি তথা এমন কাফের যাদের সাথে মুসলমানদের কোন চুক্তি নেই।

২. মুআহাদ তথা এমন কাফের যাদের সাথে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়েছে।

৩. মুসতা'মিন তথা এমন কাফের যে মুসলমানদের অনুমোদন

নিয়ে সাময়িক সময়ের জন্য দারুল ইসলামে এসেছে। এদের কাউকে হত্যার দ্বারা কেসাসের বিধান আসবে না। অর্থাৎ কোন মুসলমান এ তিন শ্রেণীর কোন কাফেরকে হত্যা করলে তার বিপরীতে উক্ত মুসলামনকে হত্যা করা হবে না। কারণ, এসব কাফেরের জান-মাল মূলত মুসলমানদের জন্য হালাল। মূলত এদেরকে হত্যা করাও বৈধ, তাদের মাল-সম্পদ লুট করাও বৈধ।

সরাসরি হরবি তথা যেসব কাফেরের সাথে কোন চুক্তি নেই- তাদের বিষয়টা তো স্পষ্টই। আর বাকি দুই প্রকার কাফের তথা মুআহাদ ও মুসতা'মিনকে যদিও চুক্তি ও নিরাপত্তা দানের কারণে আপাতত হত্যা করা বৈধ নয়, কিন্তু মূলত তাদের জান-মাল মুসলমানদের জন্য হালাল। চুক্তি বা নিরাপত্তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেই অন্যান্য হরবি কাফেরের মতো তাদের হত্যা করা ও মাল লুণ্টন করা হালাল হয়ে যাবে। অতএব, তাদের জান-মাল চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত নয়। তাই তাদের হত্যা দ্বারা কোন মুসলমানের উপর কেসাসের বিধান আরোপিত হবে না। অবশ্য চুক্তি ও নিরাপত্তা বহাল থাকাবস্থায় হত্যা করার কারণে মুসলমান গুনাহগার হবে।

কাফেরের চতুর্থ প্রকার- যিম্মি। তথা মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া প্রদান করত দারুল ইসলামের বসবাসকারী কাফের। এদের হত্যার দ্বারা মুসলমান থেকে কেসাস নেয়া হবে কি'না সেটা আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মত বিরোধপূর্ণ।

৪. মুরতাদ। কেননা, তার জীবনের নিরাপত্তা শেষ। তাকে হত্যা করা ফরয।

• এমনসব মুসলমানকে হত্যার দ্বারা কেসাস আসবে না, যারা হত্যাযোগ্য কোন অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি কিংবা শরয়ী সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে উপরোক্ত অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে এবং দারুল ইসলামের শরয়ী কাযি তাদের হত্যার ফায়সালা দিয়েছেন। যেমন-

৫. বিবাহিত যিনাকারী পুরুষ বা মহিলা।

৬. ডাকাত ও রাহজান (পুরুষ হোক বা মহিলা)।

অতএব, যদি কাযি সাহেব কোন মুসলমানকে যিনা বা রাহজানির কারণে হত্যার ফায়সালা দেন, অতঃপর সরকারী জল্লাদ বা হত্যায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন সাধারণ মুসলমান তাকে হত্যা করে ফেলে- তাহলে উক্ত মুসলমানের উপর কেসাস আসবে না। অর্থাৎ হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হবে না। কেননা, মুসলমানের জান-মাল সুরক্ষিত হলেও সে যে মুসলামনকে হত্যা করেছে, সে মুসলমান সুরক্ষিত নয়। বরং শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সে হত্যাযোগ্য। তাই তাকে হত্যার কারণে কেসাস আসবে না। অবশ্য কাযি সাহেবের আদেশ ছাড়াই নিজে নিজে হত্যা করার কারণে তাকে তা'যির করা হবে। কিন্তু কাযি সাহেবের ফায়সালা দেয়ার আগেই যদি হত্যা করে দেয়, তাহলে মাসআলা ভিন্ন।

দ্বিতীয় শর্ত

قتل العمد হতে হবে। তথা জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃত হত্যা করতে হবে। অতএব, কোন মুসলমান যদি অন্য কোন মুসলমানকে অজান্তে বা ভুলবশত হত্যা করে ফেলে তাহলে এ হত্যার

বিপরীতে কেসাস আসবে না। অবশ্য রক্তমূল তথা দিয়াত দিতে হবে এবং ইস্তিগফার করতে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে গুনাহ মাফ চাইতে হবে।

উল্লেখ্য যে, যাকে হত্যা করা হয়েছে, তার অভিভাবকরা ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে হত্যাও করতে পারে, ইচ্ছে করলে মাফও করে দিতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে হত্যার বদলে দিয়াতও আদায় করতে পারে। অবশ্য দিয়াত আদায় করতে হলে হত্যাকারী তাতে সম্মত হতে হবে কি'না সেটা আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ।

সারকথা এই দাঁড়াল-

মুরতাদকে কিংবা যিম্মি ছাড়া অন্য কোন কাফেরকে হত্যার দ্বারা কেসাস আসবে না। যিম্মিকে হত্যার দ্বারা কেসাস আসবে কি'না সেটা মতবিরোধপূর্ণ। আর যেসব মুসলমানের ব্যাপারে যিনা বা রাহজানিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে শরয়ী কাযি কর্তৃক হত্যার ফায়সালা এসেছে, তাদের হত্যার দ্বারাও কেসাস আসবে না। যাদের হত্যার দ্বারা কেসাসের বিধান আরোপিত

হয়, নিহতের অভিভাবকরা ইচ্ছে করলে সেখানেও কেসাস না নিয়ে মাফ করে দেয়ার কিংবা দিয়াত আদায় করার সুযোগ রয়েছে।

তবে হদ এর ব্যতিক্রম। হদ মাফ করার কিংবা তার বদলে দিয়াত বা কোন অর্থ আদায় করার অবকাশ নেই।

[দেখুন: ফাতাওয়া শামী: ৬/৫৩২-৫৩৪, ফি মা ইউজিবুল ক্বাওয়াদ ওয়া মা লা ইউজিবুহ্; হেদায়া: ২/২০২, বাবুশ শাহাদাতি আলায যিনা ওয়ার রুজুয়ি আনহা; ফাতহুল ক্বাদির: ৫/৪১৬, বাবু কত্বয়িত তরীক; আহকামুল ক্বুরআন- জাসসাস: ১/১৭৪, সূরা বাক্বারা, আয়াতুল কেসাস।]

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ১৪

চার. সিয়াসত (السياسة) ও তা'যির (التعزير) হিসেবে হত্যা

সিয়াসত ও তা'যির সমার্থক। শরীয়তে যেসব অপরাধের শাস্তি সুনির্ধারিত নয় যেসব অপরাধের শাস্তি ইমামুল মুসলিমিন, সুলতান ও কাযির বিবেচনার উপর ন্যস্ত। যেখানে যে পরিমাণ

শাস্তি দেয়া মুনাসিব মনে হয় সে পরিমাণ দেবেন। যে পরিমাণের দ্বারা অপরাধীকে বিরত রাখা ও সমাজ থেকে সব ধরণের অন্যায়-অনাচার ও বিশৃংখলা দূর করে ভারসাম্য ও শান্তিপূর্ণ দ্বীনি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ও বহাল রাখা যায়, সে পরিমাণ শাস্তিই দেবেন। তবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দেয়া জায়েয নয়। এ শাস্তির নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ও সীমারেখা আছে। আল্লাহ চাহেন তো হদ-তা'যির নিয়ে আলাদাভাবে লিখার ইচ্ছা আছে। সেখানে এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

হত্যার মাধ্যমেও তা'যির হতে পারে। সাধারণত একে القتل سياسةً তথা সিয়াসতরূপে হত্যা বলা হয়। যেসব অপরাধের শাস্তি সুনির্ধারিত নয়, কিন্তু অপরাধগুলো এমন যে, সেগুলোর প্রভাব অন্যের উপর পড়ে, জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়ে, সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হয়- সেগুলোতে হত্যার বিধান রয়েছে। এসব অপরাধ যখন কোন ব্যক্তি বার বার করতে থাকে, তখন তাকে হত্যা করে দিতে হয়। তদ্রূপ, যেসকল ব্যক্তি দ্বীনি পরিবেশ নষ্ট করে, যাদের দ্বারা দ্বীন বিকৃতির আশঙ্কা হয়- তাদেরকেও হত্যার বিধান রয়েছে।

এক কথায় বলতে গেলে- যারা সমাজে দ্বীনি বা দুনিয়াবি ফাসাদ ও বিপর্যয় ঘটায়, তাদেরকে হত্যা করে দেয়া হবে- যদিও তারা মুসলমান হয়, নামায-রোযাসহ অন্য সকল যাবতীয় ইবাদত বন্দেগীর পাবন্দ হয়।

কুরআন সুন্নাহয় ফাসাদকারীদেরকে হত্যার নির্দেশনা এসেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}

"কাউকে হত্যা বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ব্যতীতই কেউ কাউকে হত্যা করলে, সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করল।" (মায়েদা: ৩২)

এ আয়ত থেকে বুঝা যায়, কেউ কাউকে হত্যা করলে হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা যাবে। তদ্রূপ কেউ পৃথিবীতে ফাসাদ ও বিশৃংখলা করে বেড়ালে তাকেও হত্যা করা যাবে।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন,

فكان في مضمون الآية إباحة قتل المفسد في الأرض. اهـ

"আয়াত বুঝাচ্ছে- যমিনে বিশৃংখলাকারীকে হত্যা করা বৈধ।" (আহকামুল কুরআন: ২/৫০৫)

দ্বীনি-দুনিয়াবি উভয় ধরণের ফাসাদ এ আয়াতে অন্তর্ভুক্ত।

দুনিয়াবি ফাসাদ, যেমন: চুরি, ডাকাতি, রাহজানি, সন্ত্রাসী, খুন, ধর্ষণ, যাদু-টোনা ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের শান্তি-শৃংখলা নষ্ট করা, জনজীবন অতিষ্ট করে তোলা।
দ্বীনি ফাসাদ, যেমন: ইলহাদ, যান্দাকাহ্, নাস্তিকতা, বিদআত ইত্যাদি ছড়ানো।

এ উভয় ধরণের ফাসাদকারীকেই হত্যা করা যাবে- যদি হত্যা ব্যতীত তার অনিষ্ট দমন সম্ভব না হয়। এ ধরণের হত্যাকে সিয়াসত বলে।

সিয়াসত কাকে বলে?

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সিয়াসত সম্পর্কে আশাকরি কিঞ্চিত ধারণা হয়েছে। তবে সিয়াসতের পরিধি অনেক ব্যাপক। শুধু হত্যার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। তদ্রূপ কোন এক প্রকার অপরাধের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। সিয়াসত সকল বিষয়ের সাথেই জড়িত। সমাজের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য যেসব কর্মপন্থা গ্রহণ করা দরকার তার সবগুলোকেই সিয়াসত বলে। তবে তা শরীয়ত বহির্ভূত না হতে হবে। শরীয়ত বহির্ভূত হলে তা আর ইসলামী সিয়াসত থাকবে না, জুলুমে পরিণত হবে, যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন।

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.) ইবনে আকীল রহ. (৫১৩হি.) থেকে সিয়াসতের সংজ্ঞা বর্ণনা করেন,

السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه و سلم ولا نزل به وحي. اهـ

“সিয়াসত হচ্ছে এমন কর্মপন্থা, যারা মাধ্যমে লোকজন কল্যাণ ও শৃংখলার অধিকতার নিকটবর্তী হবে এবং ফাসাদ ও বিপর্যয় থেকে অধিকতর দূরে থাকবে; যদিও তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রণয়ন করেননি এবং সে ব্যাপারে কোন ওহীও নাযিল হয়নি।” (আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ্: ১৭)

উদ্দেশ্য- যদিও সে ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই এবং সুস্পষ্ট কোন ওহীও সে ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি; কিন্তু শরীয়তের মূলনীতির দাবি এমনই। অর্থাৎ যেসব বিষয়ে শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন বিধান নেই, সেগুলোতে শরীয়তের সার্বিক মূলনীতির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল সিয়াসত। পক্ষান্তরে যদি তা শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানের বিপরীত হয় কিংবা শরীয়তের মূলনীতির পরিপন্থী হয়, তাহলে তা ইসলামী সিয়াসত থাকবে না, জালেম সিয়াসতে পরিণত হবে।

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.) বলেন,

فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الشريعة. اهـ

“সিয়াসত দুই প্রকার: ১. জালেম সিয়াসত; শরীয়ত একে হারাম ঘোষণা করে। ২. আদেল তথা ইনসাফপূর্ণ সিয়াসত, যা জালেম ও পাপিষ্ঠের নিকট থেকে প্রাপ্য উদ্ধার করে। এটি শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত।” (আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ্: ১০)

তিনি আরোও বলেন,

فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل هي موافقة لما جاء به بل هي جزء من أجزائه ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحهم وإنما هي عدل الله ورسوله. اهـ

“কাজেই এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, ইনসাফপূর্ণ সিয়াসত শরীয়তের ভাষ্যের পরিপন্থি। বরং তা শরীয়ত যা নিয়ে এসেছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বরং তা শরীয়তেরই একটি অংশ, যদিও তোমাদের পরিভাষার অনুকরণে আমরা তাকে সিয়াসত নাম দিচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ ও তার রাসূল প্রদত্ত ইনসাফপূর্ণ বিধান।” (আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ্: ১৮)

অতএব, নিজের মনগড়া বিধান ও ফায়সালা দিয়ে দেয়ার নাম ইসলামী সিয়াসত নয়, বরং শরয়ী উসূল ও মূলনীতির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো ইসলামী সিয়াসত। শরয়ী

উসূলের পরিপন্থি হলে তা আর ইসলামী সিয়াসত থাকবে না, জুলুম ও হারামে পরিণত হবে।

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

أشار كلام الفتح إلى أن السياسة لا تختص بالزنا وهو ما عزاه الشارح إلى النهر. وفي القهستاني: السياسة لا تختص بالزنا بل تجوز في كل جناية، والرأي فيها إلى الإمام على ما في الكافي ... فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة. اهـ

“ফাতহুল কাদিরের বক্তব্য এদিকে ঈঙ্গিত করে যে, সিয়াসত শুধু যিনার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। ... কুহুসতানিতে রয়েছে, ‘সিয়াসত শুধু যিনার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা প্রত্যেক অপরাধের ক্ষেত্রেই বৈধ। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ভার ইমামুল মুসলিমীনের উপর ন্যস্ত। ... অতএব, সিয়াসত হচ্ছে- দুনিয়া ও আখেরাত উভয় বিষয়ে যে পথে মুক্তি মিলবে, সে পথের নির্দেশনা দানের মাধ্যমে সৃষ্টি জগতকে যথোপোযুক্ত পরিচালনা করা।” (রদ্দুল মুহতার: ৪/১৫)

ইমামুল মুসলিমিন বলতে শুধু তিনিই উদ্দেশ্য নন, বরং তার নিয়োগকৃত সুলতান, কাযি ও আমীর-উমারা সকলেই উদ্দেশ্য। সকলেই নিজ নিজ গণ্ডির ভেতর থেকে সিয়াসত প্রয়োগ করতে পারবেন। (দেখুন- রদ্দুল মুহতার: ৪/১৫)

সিয়াসতের পরিধি অনেক বড়। ক্ষেত্র বিশেষে শরীয়তের ভিতরে থেকে কোন কোন বিষয়ে এবং কারো কারো ব্যাপারে একটু শিথিলতা অবলম্বন করতে হয়। এটাও সিয়াসত। যেমন- মুসলিম বাহিনি দারুল হরবে থাকাবস্থায় হদ কায়েম করতে হাদিসে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, দারুল হরবে যুদ্ধাবস্থায় একজন সৈনিকের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনেক। তার হাত কেটে দিলে বা পা কেটে দিলে মুসলমানদের দুর্বলতা আসবে। কাফেরদের শক্তি ও সাহস বাড়বে। অধিকন্তু যার উপর হদ কায়েম করা হয়েছে সে ক্ষোভের শিকার হয়ে কাফেরদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়ে যেতে পারে। তখন হদ কায়েমটা কল্যাণের কারণ না হয়ে বরং অকল্যাণের কারণ হয়ে যাবে।

এখানে দারুল ইসলামে ফিরা পর্যন্ত হদ কায়েমে বিলম্ব করা হচ্ছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও এটা কুরআনে কারিমের নির্দেশের পরিপন্থি- কেননা, কুরআনে কারিমে হদ কায়েমে বিলম্বের কথা নেই; কিন্তু শরীয়তের মূলনীতির আলোকে এটাই সিয়াসতের দাবি। কেননা, বিলম্ব করার দ্বারা হদও কায়েম করা যাচ্ছে এবং যে অকল্যাণ সাধিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাও প্রতিহত করা সম্ভব হচ্ছে। তাই এখানে হদ কায়েম বিলম্ব করাটাই শরীয়তের দাবি।

যাহোক, বুঝানো উদ্দেশ্য- শরীয়তের ভিতরে থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে একটু শিথিলতা অবলম্বন করাও সিয়াসতের অন্তর্ভুক্ত। আবার অনেক ক্ষেত্রে কঠোর বিধান আরোপ করাও সিয়াসতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- চোরের শাস্তি হল: প্রথমবার চুরি করলে ডান হাত কেটে দেয়া, দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কেটে দেয়া। এ দু’টি শাস্তি হদ হিসেবে নির্ধারিত। তাই এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। তৃতীয় বার ও চতুর্থ বার চুরি করলে কি শাস্তি (হানাফি মাযহাব মতে) তা শরীয়তে নির্ধারিত নেই। মুনাসিব মনে হলে জেলে ভরে রাখতে পারেন, আবার যথাক্রমে বাম হাত ও ডান পা কেটে দিতে পারেন। আবার মুনাসিব মনে

হলে হত্যাও করে দিতে পারেন। চুরির শাস্তি যদিও হত্যা নয়, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ বার চুরি করলে হত্যা করা সিয়াসতের দাবি। কারণ, এ অবস্থায় সে আর স্বাভাবিক চোর থাকেনি, বরং মুফসিদ ফিল আরদ তথা যমিনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীতে পরিণত হয়েছে। তার কারণে জনগণের মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এটা একটা ফাসাদ। আর ফাসাদকারীকে হত্যা করে দেয়ার কথা কুরআনে কারীমে এসেছে, যেমনটা একটু আগে আয়াত উল্লেখ করেছি। তাই তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চোরকে হত্যা করে দেয়া শরীয়তের পরিপন্থি নয়, বরং এটাই শরীয়তের উসূল ও মূলনীতির দাবি। এ চোরের ক্ষেত্রে এটাই ইসলামী সিয়াসত।

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

عرفها بعضهم بأنها: "تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد"، وقوله: " لها حكم شرعي" معناه أنها داخلة تحت قواعد الشرع وإن لم ينص عليها بخصوصها؛ فإن مدار الشريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم، ولذا قال في البحر: وظاهر كلامهم أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي اهـ.

وفي حاشية مسكين عن الحموي: السياسة شرع مغلظ، وهي نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها. وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم، وتدفع كثيرا من المظالم، وتردع أهل الفساد، وتوصل إلى المقاصد الشرعية فالشريعة توجب المصير إليها والاعتماد في إظهار الحق عليها، وهي باب واسع ...الخ اهـ.

"কেউ কেউ সিয়াসতের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, তা হচ্ছে- 'ফাসাদের বীজ নির্মূলের উদ্দেশ্যে যেসব অপরাধে শরয়ী বিধান রয়েছে, সেগুলোতে কঠোরতর শাস্তি প্রদান করা।' তার বক্তব্যে 'শরয়ী বিধান রয়েছে' দ্বারা উদ্দেশ্য- তা শরীয়তের উসূল ও মূলনীতির আওতায় পড়ে, যদিও সরাসরি সে বিষয়ে শরীয়তের কোন সুস্পষ্ট ভাষ্য নেই। কেননা, ঈমানের উসূল ও মূলনীতিসমূহের পর শরীয়তের ভিত্তি হল ফাসাদের বীজ নির্মূলের উপর, যেন জগত টিকে থাকতে পারে। এ জন্য আলবাহরুর রায়েকে বলা হয়েছে, 'আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহের ভাষ্য এই যে, সিয়াসত হল- বিচারকের এমন পদক্ষেপ যা তিনি মাসলাহাতের বিবেচনায় গ্রহণ করেছেন, যদিও উক্ত পদক্ষেপের ব্যাপারে (শরীয়তে) প্রত্যক্ষ কোন দলীল নেই।'

মিসকিন রহ. এর হাশিয়াতে হামাবি রহ. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, 'সিয়াসত হলো কঠোরতর বিধান। তা দুই প্রকার: ১.

জালেম সিয়াসত। শরীয়ত একে হারাম ঘোষণা করে। ২. আদেল তথা ইনসাফপূর্ণ সিয়াসত, যা জালেম থেকে প্রাপ্য অধিকার আদায় করে, অনেক রকমের জুলুম প্রতিহত করে, ফাসাদকারীদের দমন করে এবং শরীয়তের মাকাসিদ ও উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তবায়নের দিকে ধাবিত করে। শরীয়ত একে অবলম্বন করা এবং হক ও প্রাপ্য প্রমাণ করার জন্য এর উপর নির্ভর করা আবশ্যক করে। এটি এক ব্যাপক বিস্তৃত অধ্যায় ...।” (রদ্দুল মুহতার: ৪/১৫)

মোটকথা- যেসব বিষয়ে শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান নেই, সেগুলোতে শরীয়তের সার্বিক উসূল ও মূলনীতির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল- ইসলামী সিয়াসত। শরীয়তের সীমারেখার অভ্যন্তরে থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা করাও সিয়াসত, ফাসাদ ও ফাসাদকারীদের দমনের উদ্দেশ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোরতর বিধান (এমন কি মৃত্যুদণ্ড) আরোপ করাও সিয়াসত। সিয়াসত একটি ব্যাপক-বিস্তৃত অধ্যায়। শরীয়তের প্রত্যেকটি বিষয়েই এর আওতাধীন।

সিয়াসতরূপে হত্যা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশাকরি আপনাদের নিকট অস্পষ্ট নয় যে, অনেক ক্ষেত্রে শরীয়ত সিয়াসত বা তা'যিররূপে হত্যার বৈধতা দিয়েছে।

'আদদুররুল মুখতার' গ্রন্থকার (১০৮৮হি.) বলেন,

و يكون التعزير بالقتل. اهـ

"তা'যির হত্যার দ্বারাও হতে পারে।" [আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের সাথে ছাপা): ৪/৬২]

আমরা শুরুতে বলে এসেছি যে, সিয়াসতরূপে ঐসব ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে, যারা সমাজে ফাসাদ করে বেড়াচ্ছে, যাদের ফলে জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়েছে, যাদের ফলে লোকজনের জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে কিংবা দ্বীন বিকৃত হচ্ছে। এমন ধরণের ব্যক্তিদেরকে সিয়াসতরূপে হত্যা করা হবে। অন্যথায় যাদের অপরাধের দ্বারা কেবল অপরাধী নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের অপরাধের ফলে অন্যের কোন ক্ষতি হচ্ছে না- তাদের হত্যা করা হবে না। যেমন- কোন ব্যক্তি রোযা রাখে না। কিন্তু সে অন্য কাউকে রোযা না

রাখার দাওয়াত দেয় না। তাকে রোযা না রাখলে বন্দী করা হবে, শাস্তি দেয়া হবে; কিন্তু হত্যা করা হবে না। কেননা, রোযা না রাখার ক্ষতি তা তার নিজের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এর দ্বারা অন্যের কোন ক্ষতি হচ্ছে না। পক্ষান্তরে কট্টর বিদআতি, যে নিজ বিদআতের দিকে অন্যদের আহ্বান করে থাকে- তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। কেননা, তারা দ্বারা লোকজনের দ্বীন বরবাদ হওয়ার আশঙ্কা আছে। তদ্রূপ, চোর, ডাকাত, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ, লুটেরা, খুনি, ধর্ষক, সমকামি- এসব লোকের দ্বারা সমাজ বিনষ্ট হচ্ছে, জনশান্তিতে বিঘ্ন ঘটছে। তাই এরা যখন এসব অপরাধ বার বার করতে থাকবে, তখন তাদের হত্যা করে দেয়া হবে।

'আদদুররুল মুখতার' গ্রন্থকারের উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় আল্লামা শামী রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

رأيت في [الصارم المسلول] للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة، وكان حاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت

اهـ ... ومن ذلك ما سيذكره .بالتكرار وشرع القتل في جنسها المصنف من أن للإمام قتل السارق سياسة أي إن تكرر منه.

وسيأتي أيضا قبيل كتاب الجهاد أن من تكرر الخنق منه في المصر قتل به سياسة لسعيه بالفساد، وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل، وسيأتي أيضا في باب الردة أن الساحر أو الزنديق الداعي إذا أخذ قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، ولو أخذ بعدها قبلت، وأن الخناق لا توبة له وتقدم كيفية تعزير اللوطي بالقتل. اهـ كلام ابن عابدين رحمه الله

"হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. এর 'আসসারিমুল মাসলূল' গ্রন্থে দেখেছি: [হানাফিদের একটি মূলনীতি হলো- তাদের মতে যেসব অপরাধের শাস্তি হত্যা নয়; যেমন: ভারি বস্তু দ্বারা হত্যা করা, যোনিদ্বার ব্যতীত অন্য পথে সঙ্গম করা; যদি ব্যক্তি থেকে তা একাধিকবার প্রকাশ পায়, তাহলে ইমামুল মুসলিমীন তাকে হত্যা করতে পারবেন। তদ্রূপ মাসলাহাত মনে করলে তিনি নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত শাস্তিও দিতে পারবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবায়ে কেরাম থেকে এ সকল অপরাধের বেলায় বর্ণিত হত্যাকে তারা এর উপর প্রয়োগ করেন যে, এতে তিনি মাসলাহাত রয়েছে মনে করেছেন। একে তারা 'সিয়াসতরূপে হত্যা' নাম দিয়ে থাকেন। এর সারকথা: যেসব অপরাধের অনুরূপ অপরাধে হত্যার বিধান রয়েছে, সেগুলো যখন বারংবার সংঘটিত হওয়ার দ্বারা

গুরুতর অবস্থা ধারণ করবে, তখন সেগুলোতে তিনি তা’যিররূপে হত্যা করতে পারবেন।] হাফেয ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য শেষ হল। ...

(শামী রহ. বলেন,) গ্রন্থকার সামনে যা উল্লেখ করবেন, সেটাও এই শ্রেণীভুক্তই। তা হল- ইমামুল মুসলিমীন সিয়াসতরূপে চোরকে হত্যা করতে পারবেন। অর্থাৎ যখন তার থেকে বারংবার চুরি প্রকাশ পাবে। কিতাবুল জিহাদের একটু আগে আলোচনা আসবে যে, যে ব্যক্তি থেকে শহরের অভ্যন্তরে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার ঘটনা বারংবার ঘটবে, তাকে সিয়াসতরূপে হত্যা করে দেয়া হবে। কেননা, সে যমিনে ফাসাদ করে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তি, যার অবস্থা এমন হবে- তাকে হত্যা করে দিয়ে তার অনিষ্ট দমন করা হবে। বাবুর রিদ্দাহয় আলোচনা আসবে- যাদুকর কিংবা এমন যিন্দিক, যে নিজ কুফরি অভিমতের দিকে লোকজনকে দাওয়াত দেয়: যদি তাওবা করার আগেই ধৃত হয় এরপর তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা কবুল হবে না বরং হত্যা করে দেয়া হবে। আর তাওবা করার পর ধৃত হলে তাওবা কবুল হবে। সামনে এও আসবে যে, শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যাকারীর কোন তাওবার সুযোগ নেই। আর সমকামিকে তা’যিররূপে কিভাবে হত্যা করা হবে তার আলোচনা আগে গেছে।” (রদ্দুল মুহতার: ৪/৬২-৬৩)

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ১৫

বি.দ্র.-১: এক অপরাধ কতবার করলে ফাসাদ ফিল আরদ গণ্য হবে?

এটি অপরাধের ভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন- চুরির ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয়বার চুরি করাটা ফাসাদ ফিল আরদ গণ্য হয় না। এ দুই বারের শাস্তি হদের অন্তর্ভুক্ত যা সুনির্ধারিত। তৃতীয় বা চতুর্থ বার চুরি করা ফাসাদ ফিল আরদ বলে গণ্য। তখন মুনাসিব মনে হলে ইমামুল মুসলিমীন চোরকে হত্যা করতে পারেন।

অপর দিকে কাউকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা দ্বিতীয় বারেই ফাসাদ ফিল আরদ বলে গণ্য। কাজেই কারো থেকে একাধিক বার শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার অপরাধ পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে।

এক কথায় বলা যায়- যেখানে হদ নির্ধারিত আছে, সেখানে হদ কায়েম করা হবে। হদের সীমা পেরিয়ে গেলে তখন (যেমন তৃতীয় বার চুরি করা) ফাসাদ ফিল আরদ গণ্য হবে। আর

যেখানে হদ নেই সেখানে একাধিক বার পাওয়া গেলে (যেমন একাধিক বার শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা) ফাসাদ ফিল আরদ গণ্য হবে।

বি.দ্র.-২: ফাসাদকারীদেরকে অপরাধে লিপ্ত থাকা না থাকা উভয় অবস্থায় হত্যা করা হবে

আমরা আগে আলোচনা করেছি যে, দফউস সায়েলরূপে যাদের হত্যা করা হবে, তাদেরকে কেবল তখনই হত্যা করা হবে, যখন তারা অপরাধে লিপ্ত থাকে এবং হত্যা ব্যতীত তাদের থেকে জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষা সম্ভব না হয়। অপরাধ থেকে নিবৃত হয়ে গেলে আর হত্যা করা যাবে না। তখন শরয়ী দলীল-প্রমাণের আলোকে যে অপরাধ প্রমাণিত হবে সে হিসেবে হদ-কেসাস বা অন্য শাস্তি কায়েম করা হবে।

এ আলোচনা থেকে কারো সন্দেহ হতে পারে যে, অপরাধে লিপ্ত থাকাবস্থা ছাড়া সাধারণ অবস্থায় কাউকে হত্যা করা যাবে

না। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টা এমন নয়। যারা ফাসাদকারীরূপে চিহ্নিত হয়ে যাবে, তাদেরকে যেকোনো অবস্থায় হত্যা করা যাবে- চাই অপরাধে লিপ্ত থাকুক বা না থাকুক। যেমন ধরুন, এক লোক প্রসিদ্ধ সন্ত্রাস। সে ফাসাদকারীরূপে চিহ্নিত। সে হত্যার উপযুক্ত। এমতাবস্থায় তাকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা যাবে। বাড়িতে কি বাড়ির বাইরে, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার যেখানে যে অবস্থায়ই পাওয়া যাবে হত্যা করা যাবে।

যেমন ধরুন- সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর ইত্যাদি অনিষ্টকর প্রাণী। এদেরকে যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে। এ অপেক্ষায় থাকা হবে না যে, সাপ-বিচ্ছু কামড় দিতে শুরু করলে বা ইঁদুর কাটতে শুরু করলে তখন হত্যা করা হবে, এর আগে হত্যা করা হবে না। কারণ, এদেরকে হত্যা করা হচ্ছে ফাসাদ দূরীকরণের জন্য। এরা যদি বর্তমানে ফাসাদে লিপ্ত নাও থাকে, তবুও তাদের ব্যাপারে জানা কথা যে, তারা অচিরেই ফাসাদ করে বেড়াবে। ভবিষ্যতে তাদের থেকে যে ফাসাদের আশঙ্কা, সেটাকে প্রতিহত করতেই তাদের হত্যা করা হচ্ছে। এ আশঙ্কা তাদের থেকে সর্বাবস্থায়ই বিদ্যমান। বাড়িতে

থাকলেও, গাড়িতে থাকলেও। হাটে থাকলেও, ঘাটে থাকলেও। ঘুমে থাকলেও, জাগ্রত থাকলেও। এ জন্য এদের ব্যাপারে কোন পরোয়া নেই। যখন যেখানেই সুযোগ মিলবে হত্যা করে দেয়া হবে।

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.) বলেন,

فإن قيل: فما تقولون في السنور إذا أكلت الطيور، وأكفأت القدور؟
قيل: على مقتنيها ضمان ما تتلفه من ذلك ... لأنها في معنى الكلب العقور ... وإن لم يكن ذلك من عادتها بل فعلته نادرا: فلا ضمان.
فإن قيل: فهل تسوغون قتلها لذلك؟ قلنا: نعم، إذا كان ذلك عادة لها.
وقال ابن عقيل، وبعض الشافعية: إنما تقتل حال مباشرتها للجناية، فأما في حال سكونها وعدم صولها: فلا.
والصحيح: خلاف ذلك، وأنها تقتل، وإن كانت ساكنة، كما يقتل ... من طبعه الفساد والأذى في حال سكونه، ولا تنتظر مباشرته
وفي " الصحيحين " عنه - صلى الله عليه وسلم -: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والفأرة، والحية، والغراب العقرب " بدل " الحية " " الأبقع، والكلب العقور» وفي لفظ
ولم يشترط في قتلهن أن يكون حال المباشرة. اهـ

“যদি প্রশ্ন করা হয়- বিড়াল যদি পাখি খেয়ে ফেলে এবং ডেগ-পাতিল উল্টে ফেলে তাহলে এর (জরিমানার ব্যাপারে) আপনারা কি বলেন? উত্তর হবে- (যদি অনিষ্টসাধন করা ঐ বিড়ালের অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে) বিড়াল পালককে নষ্টকৃত জিনিসের জরিমানা দিতে হবে। ... কেননা, এ বিড়াল ঐ কুকুরের মতো, দংশন করা যার স্বভাব। ... আর যদি এমনটা এর অভ্যাস না হয়ে থাকে, বরং ঘটনাক্রমে করে ফেলেছে, তাহলে জরিমানা দিতে হবে না।

যদি প্রশ্ন করা হয়- এ অপরাধের কারণে কি আপনারা একে মেরে ফেলার অনুমতি দেন? উত্তরে বলব, হ্যাঁ (মেরে ফেলা যাবে)- যদি এমনটা করা এর অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে। তবে ইবনে আকীল রহ. এবং শাফিয়ি মাযহাবের কেউ কেউ বলেন, অনিষ্টে লিপ্ত থাকাবস্থায় হত্যা করা যাবে। নিবৃত থাকাবস্থায় এবং আক্রমণ না করাবস্থায় হত্যা করা যাবে না।

তবে সঠিক কথা হল এর বিপরীতটা। নিবৃত থাকাবস্থায়ও একে হত্যা করা যাবে; যেমন- *ফাসাদ করে বেড়ানো এবং কষ্ট দেয়া যে লোকের অভ্যাস, তাকে নিবৃত থাকাবস্থায়ও হত্যা*

করা যাবে। অপরাধে লিপ্ত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা হবে না। ...

সহীহাইনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে- 'পাঁচটি ফাসেক প্রাণী আছে, যেগুলোকে হরম শরীফ কি হরমের বাইরে সবখানে হত্যা করা হবে। সেগুলো হল: চিল, ইঁদুর, সাপ, পেটে বা পিটে সাদা দাগবিশিষ্ট কাক এবং ঐ কুকুর, দংশন করা যার স্বভাব।' অন্য বর্ণনায় সাপের বদলে বিচ্চুর কথা আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের হত্যার জন্য হত্যা অনিষ্টে লিপ্ত থাকাবস্থায় হওয়ার শর্ত করেননি।" **(আততুরুকুল হুকমিয়্যাহ্: ২৪১-২৪২)**

হাদিসে যে পাঁচটি প্রাণীর কথা বলা হয়েছে, শুধু সেগুলোই নয়; যে প্রাণীই কষ্টদায়ক হবে- তাকেই হত্যা করে দেয়া হবে। যেখানে যে অবস্থায়ই পাওয়া যাবে, হত্যা করে দেয়া যাবে। হাদিসে এ পাঁচটি উল্লেখ করে এ দিকেই ঈঙ্গিত করা হয়েছে। যাহোক, বুঝানো উদ্দেশ্য- ফাসাদকারী যেই হবে, তাকেই হত্যা করা। যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে- হত্যা করে দেয়া হবে। ফাসাদকারী মানুষ হোক কি অন্য কোন প্রাণী হোক। ফাসাদকারী যদি মানুষ হয়, তাহলে তাকে হত্যা করে দেয়ার

বিষয়টি সুবিদিত। এ কারণেই ইবনুল কায়্যিম রহ. বিড়াল হত্যা বুঝাতে গিয়ে মানুষ হত্যার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং এর উপর বিড়ালকে কিয়াস করেছেন।

কতক ব্যক্তির অভ্যাস এমন যে, তারা জালেম শাসকদের দরবারে গিয়ে লোকজনের ব্যাপারে বানিয়ে চিনিয়ে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। এদের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে শাসকরা নিরপরাধ লোকজনকে হত্যা করে। এসব লোকও ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এরাও হত্যাযোগ্য। এদের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে আবেদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

سئل شيخ الإسلام عن قتل الأعونة والظلمة والسعاة في أيام الفترة: قال يباح قتلهم؛ لأنهم ساعون في الأرض بالفساد، فقيل إنهم يمتنعون عن ذلك في أيام الفترة ويختفون. قال: ذلك امتناع ضرورة - {ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه} [الأنعام: 28]- كما نشاهد. قال وسألنا الشيخ أبا شجاع عنه، فقال: يباح قتله ويثاب قاتله. اهـ

“শাইখুল ইসলাম রহ.কে শাসকদের কাছে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনকারী এবং জালেমদেরকে বিরতিকালীন সময়ে (হত্যার) ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন, ‘তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। কেননা, তারা যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়।’ এর উপর প্রশ্ন করা হল- বিরতিকালীন সময়ে তো তারা তা থেকে বিরত থাকে এবং আত্মগোপনে থাকে? তিনি উত্তর দেন: ‘এ বিরত থাকা তো জরুরতের কারণে। ***যদি তাদের ফিরিয়ে দেয়া হত, তাহলে যা হতে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে তারা পুনর্বার তাতেই লিপ্ত হতো।*** [আনআম: ২৮] যেমনটা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তিনি বলেন, শায়খ আবু সুজা রহ.কে আমরা এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তর দেন: একে হত্যা করা বৈধ এবং তার হত্যাকরী সওয়াবের অধিকারী হবে।”
(রদ্দুল মুহতার: ৪/৬৪)

মোটকথা: যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে যারা বেড়ায়, তাদেরকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা যাবে- চাই তারা সে সময়ে ফাসাদে লিপ্ত থাকুক বা না থাকুক।

বি.দ্র.-৩: ফাসাদকারী যদি তাওবা করে

ফাসাদকারীদের উক্ত বিধান হল যখন তারা তাওবা করে ভাল না হবে। কিন্তু যদি তাওবা করে ফেলে এবং ফাসাদ পরিত্যাগ করে সংশোধন হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিধান কি হবে?

উত্তর: তাওবা হয়তো পাকড়াও করার আগে হবে, নয়তো পরে হবে। কোন কোন ফাসাদকারী এমন আছে যে, পাকড়াও করার আগে তাওবা করলে মাফ পেয়ে যাবে কিন্তু পাকড়াও করার পর তাওবা করলেও মাফ নেই। আবার কোন কোন ফাসাদকারী এমন আছে, তাদেরকে কোন অবস্থায়ই মাফ করে হবে না। আগে তাওবা করলেও তাদের বিধান- হত্যা। অবশ্য এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মতভেদ আছে। সামনে ইনশাআল্লাহ এর আলোচনা আসবে।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ১৬

সিয়াসতরূপে যাদের হত্যা করা হবে

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সিয়াসতরূপে অনেকেই হত্যার পর্যায়ে পড়ে। যথা:

১. যাদুকর।

২. বিদআতিদের সর্দার।

৩. যিন্দিক।

৪. সমকামী।

৫. পশুর সাথে সঙ্গমকারী।

৬. যে ব্যক্তি তার মাহরাম মহিলাকে বিবাহ করে।

৭. চোর।

৮. রাহজান ও ডাকাত।

৯. শ্বাসরূদ্ধ করে হত্যাকারী।

১০. ভারী বস্তু (যেমন পাথর ইত্যাদি) দিয়ে হত্যাকারী।

১১. মদখোর।

১২. যে ব্যক্তি শাসকদের কাছে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ করে লোকজনকে হত্যা করায়।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ১৭

এক. যাদুকর

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকিদা হল, যাদুর হাকিকত-বাস্তবতা রয়েছে। এর দ্বারা লোকজনের ক্ষতি করা সম্ভব। যাদু এমন জিনিস যা শিখা ও শিখানো যায়। তবে তা শিখা বা শিখানো হারাম। তবে বিশেষ জরুরতের দুয়েক ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম। যাদু বিদ্যার ব্যাপক প্রচলন কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত।

সকল যাদুকরই কি কাফের?

যাদুকর মাত্রই কাফের কি'না এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামে দ্বিমত রয়েছে:

- কারো কারো মতে যাদু বিদ্যা কুফর এবং প্রত্যেক যাদুকরই কাফের।

- কারো মতে (যেমন ইমাম শাফিয়ি রহ.) যদি যাদুতে কোন কুফরি বিশ্বাস, কথা বা কাজ থাকে তাহলে কাফের, অন্যথায় কাফের নয়।

যাদুকরের শাস্তি: হত্যা

যাদুকর তার যাদুর দ্বারা লোকজনকে কষ্ট দিয়ে থাকে। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটায়। তাই সে মুফসিদ ফিল আরদ তথা সমাজে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এদের শাস্তি হল- পাকড়াও হওয়ার আগেই যদি যাদু পরিত্যাগ করে তাওবা করে ভাল হয়ে যায়, তাহলে মাফ পাবে। আর যদি তাওবা করে ভাল হয়ে যাওয়ার আগেই পাকড়াও করা হয়, তাহলে হত্যা করে দেয়া হবে। পাকড়াও হওয়ার পর তাওবা করলেও মাফ করা হবে না। অবশ্য খালেস দিলে তাওবা করলে আখেরাতে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ পাবে।

‘আদদুররুল মুখতার’ গ্রন্থকার (১০৮৮হি.) বলেন,

الساحر ... (قبل توبته) ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل، ولو (إذا أخذ) أخذ بعدها قبلت. اهـ

“যাদুকর ধৃত হওয়ার পর তাওবা করলে তার তাওবা কবুল হবে না বরং হত্যা করে দেয়া হবে। আর যদি তাওবার পর ধৃত হয়, তাহলে তাওবা কবুল হবে (হত্যা করা হবে না)।”

(‘আদদুররুল মুখতার’- রদ্দুল মুহতারের সাথে ছাপা: ৪/২৪২)

উল্লেখ্য, যাদুকর মুসলিম হোক কি অমুসলিম, মুসলিম হলে যাদুর দ্বারা কাফের হোক বা না হোক, পুরুষ হোক কি নারী- সর্বাবস্থায় তার শাস্তি: হত্যা। মুসলিম, কাফের, মুরতাদ; মহিলা, পুরুষ- সকলের বিধান এক তথা হত্যা।

মুরতাদ যাদুকর সাধারণ মুরতাদের মতো নয়

সাধারণ মুরতাদের বিধান হল, তিন দিন পর্যন্ত তাওবার সুযোগ দেয়া। এর মধ্যে মুসলমান হয়ে গেলে মাফ পেয়ে যাবে, অন্যথায় হত্যা করে দেয়া হবে। কিন্তু মুরতাদ যাদুকরের বিধান ব্যতিক্রম। তার কাছে তাওবা তলব করা হবে না। পাকড়াও করার পর অবশ্যই হত্যা করে দিতে হবে।

মুরতাদ যদি মহিলা হয় তাহলে হানাফি মাযহাব মতে তাকে হত্যা করা হয় না, বন্দী করে রেখে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু মহিলা যদি যাদুকর হয় এবং যাদুর দ্বারা মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তাকে হত্যা করে দিতে হবে। তার বিধান সাধারণ

মুরতাদ মহিলার মতো নয়। কারণ, তাকে মূলত হত্যা করা হচ্ছে ইরতিদাদের কারণে নয়, বরং তার যাদুর কারণে।

মোটকথা- মুরতাদ যদি যাদুকর হয়, তাহলে পাকড়াও করার পর তাকে আর মাফ করা হবে না। কারণ, সে সাধারণ মুরতাদ নয় বরং ফাসাদকারী মুরতাদ। সাধারণ মুরতাদরা তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে মাফ করার সুযোগ আছে, কিন্তু ফাসাদকারী মুরতাদরা তাওবা করে ভাল হয়ে গেলেও মাফ পায় না। পাকড়াওয়ের পর মুফসিদ মুরতাদের শাস্তি হদের মতো। হদ যেমন মাফ হয় না, এদের শাস্তিও তেমন মাফ হয় না।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন,

وحكى محمد بن شجاع عن أبي علي الرازي قال: سألت أبا يوسف عن قول أبي حنيفة في الساحر "يقتل ولا يستتاب" لم لم يكن ذلك بمنزلة المرتد؟ فقال: الساحر قد جمع مع كفره السعي في الأرض بالفساد. اهـ

“মুহাম্মাদ ইবনে সুজা রহ. আবু আলী রাযি রহ. থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, যাদুকরের ব্যাপারে আবু হানিফা রহ. এর অভিমত ‘তাওবা তলব করা ব্যতীতই তাকে হত্যা করে দেয়া হবে’- এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম যে, তার বিধান সাধারণ মুরতাদের বিধানের মতো হল না কেন? তিনি উত্তর দেন- কারণ, যাদুকর কাফের হওয়ার পাশাপাশি যমিনে ফাসাদ সৃষ্টিরও সমন্বয় ঘটিয়েছে।” **(আহকামুল কুরআন: ১/৬১)**

তিনি আরও বলেন,

ويستدل بظاهر قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا} [المائدة: 33] إلى آخر الآية، على وجوب قتل الساحر حدا; لأنه من أهل السعي في الأرض بالفساد لعمله السحر واستدعائه الناس إليه وإفساده إياهم مع ما صار إليه من الكفر. اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী, ‘যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যমিনে ফাসাদ-বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়ায় ... (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)’- এর ভাষ্য থেকে এ ব্যাপারে দলীল দেয়া যায় যে, যাদুকরকে হদরূপে হত্যা করা ফরয। কেননা, সে যমিনে ফাসাদ সৃষ্টিকারী। সে যাদু করে। লোকদেরকে এর দিকে আহ্বান করে। তাদের মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করে।

পাশাপাশি যে কুফরিতে সে নিপতিত হয়েছে তা তো আছেই।”
(আহকামুল কুরআন: ১/৬৫)

যেসব যাদুকর মুরতাদ হয়ে যায়নি, তাদেরও শাস্তি-পাকড়াওয়ের পর হত্যা। কারণ, সে মুরতাদ না হলেও মুফসিদ ফিল আরদ, যার শাস্তি হত্যা।

ইবনে আবেদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

لا يلزم من عدم كفره مطلقا عدم قتله؛ لأن قتله بسبب سعيه بالفساد كما مر. فإذا ثبت إضراره بسحره ولو بغير مكفر: يقتل دفعا لشره كالخناق وقطاع الطريق. اهـ

“অনেক সময় যাদুকর কাফের হয় না- এর অর্থ এই নয় যে, তাকে হত্যা করা হবে না। কেননা, তাকে হত্যা করা হচ্ছে যমিনে ফাসাদ করে বেড়ানোর কারণে- যেমনটা আগেও অতিবাহিত হয়েছে। অতএব, যখন প্রমাণিত হবে যে, সে যাদুর দ্বারা লোকজনের ক্ষতি করে- যদিও তা কুফরির দ্বারা না হয়: তখন তার অনিষ্ট দমনার্থে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। যেমন শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যাকারী ও রাহজানদের হত্যা করা হয়।”
(রদ্দুল মুহতার: ১/৪৫)

যাদুকরদের সাথে সাহাবা তাবিয়িগণের আচরণ

সাহাবা ও তাবেয়িগণ যাদুকরদের হত্যা করে দিতেন। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে এসেছে,

عن عمرو ؛ سمع بجالة ، يقول : كنت كاتبا لجزء بن معاوية ، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، قال :. فقتلنا ثلاث سواحر

"বাজালা রহ. বলেন, আমি জায ইবনে মুআবিয়ার কেরানী ছিলাম। তখন আমাদের নিকট হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পত্র আসল এই মর্মে যে, 'প্রতিটি যাদুকর পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করে দাও।' তিনি বলেন, তখন আমরা তিনটি যাদুকরকে (পেয়ে) হত্যা করে দিলাম।" (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ২৯৫৮৫)

عن ابن عمر ؛ أن جارية لحفصة سحرتها ، ووجدوا سحرها ، واعترفت ، فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها

"ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার এক বাঁদি তাকে - হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে- যাদু করেছিল। তারা উক্ত বাঁদির যাদুর প্রমাণ

পেল। বাঁদিও যাদুর কথা স্বীকার করল। তখন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদকে আদেশ দেন বাঁদিটিকে হত্যা করে ফেলতে। ফলে তিনি একে হত্যা করে দেন।” (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ২৯৫৮৩)

عن همام بن يحيى ؛ أن عامل عمان كتب إلى عمر بن عبد العزيز في ساحرة أخذها ، فكتب إليه عمر : إن اعترفت ، أو قامت عليها البينة ، فاقتلها.

“হাম্মাম ইবনে ইয়াহইয়া রহ. বলেন, উম্মানের গভর্নর এক যাদুকর মহিলাকে গ্রেফতার করে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. এর কাছে এর বিধান জানতে চেয়ে পত্র লেখেন। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. লিখে পাঠান, ‘যদি মহিলা যাদুর কথা স্বীকার করে বা সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে তার যাদু প্রমাণিত হয়, তাহলে একে হত্যা করে দাও।” (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ২৯৫৮২)

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

وقال أصحابنا: للسحر حقيقة وتأثير في إيلام الأجسام خلافا لمن منع ذلك وقال إنما هو تخييل. وتعليم السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد إباحته كفر. وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر

الساحر بتعلمه وفعله، سواء اعتقد تحريمه أو لا ويقتل. وقد روي عن عمر وعثمان وابن عمر وكذلك عن جندب بن عبد الله وحبيب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز فإنهم قتلوه بدون الاستتابة. اهـ

“আমাদের আইম্মায়ে কেরামের অভিমত হল, যাদুর হাকিকত-বাস্তবতা রয়েছে (তা কেবল চোখের ধাঁ-ধাঁ নয়) এবং শারীরিক কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে এর প্রভাব রয়েছে। তবে কেউ কেউ তা মানতে চান না বরং বলেন, তা কেবল চোখের ধাঁ-ধাঁ। আহলে ইলমদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, যাদু শিক্ষা দেয়া হারাম। একে বৈধ জ্ঞান করা কুফর। আমাদের আইম্মায়ে কেরাম, মালেক ও আহমাদ রহ. থেকে বর্ণিত যে, যাদুকর যাদু শিখা এবং তা প্রয়োগের দ্বারাই কাফের হয়ে যাবে এবং তাকে হত্যা করে দেয়া হবে- চাই তা হারাম জ্ঞান করুক বা না করুক। উমর, উসমান ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এমনই বর্ণিত আছে। তদ্রূপ, জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ, হাবিব ইবনে কা’ব, কাইস ইবনে সা’দ এবং উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকেও এমনই বর্ণিত আছে। কেননা, তারা একে -যাদুকরকে- তাওবা তলব করা ব্যতীতই হত্যা করে দিয়েছেন।” **(ফাতহুল কাদির: ৬/৯৯)**

সামনে গিয়ে বলেন,

وعند الشافعي لا يقتل ولا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته ... ويجب أن لا يعدل عن مذهب الشافعي في كفر الساحر والعراف وعدمه.

وأما قتله فيجب ولا يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في الأرض لا بمجرد عمله إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره. اهـ

"তবে শাফিয়ি রহ. এর অভিমত হল, একে বৈধ জ্ঞান না করলে হত্যা করা হবে না এবং সে কাফেরও হবে না। ... যাদুকর ও গণকের কাফের হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ি রহ. এর অভিমত ছেড়ে অন্য কোন অভিমতের দিকে না যাওয়া আবশ্যক। তবে (তার হত্যার বিষয়ে শাফিয়ি রহ. এর অভিমত গ্রহণ করা হবে না, বরং) যাদু চর্চার বিষয়টা প্রমাণিত হলে তাকে হত্যা করে দেয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে তার থেকে তাওবা তলব করা হবে না। যদি তার মাঝে কোন কুফরি আকিদা না থাকে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে শুধু যাদুর কারণে নয়, বরং যমিনে ফাসাদ করে বেড়ানোর কারণে।" **(ফাতহুল কাদির: ৬/৯৯)**

সারকথা-

যাদুতে কোন কুফরি কথা, কাজ বা বিশ্বাস থাকলে তা সর্বসম্মতিতে কুফর এবং যাদুকর (আগে মুসলিম থেকে থাকলে এখন) কাফের। আর কুফরি কিছু না থাকলে অনেকের মতে কাফের আর কারো কারো মতে কাফের নয়। তবে কুফরি থাকুক বা না থাকুক, কাফের হোক বা না হোক- তাওবার আগে পাকড়াও হলে সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করে দিতে হবে। যাদুকর মুসলিম হোক বা কাফের হোক, মুসলিম হয়ে থাকলে যাদুর দ্বারা মুরতাদ হোক বা না হোক, পুরুষ হোক কি মহিলা- সর্বাবস্থায় তার বিধান: তাওবার আগে পাকড়াও হলে হত্যা। কারণ, সে মুফসিদ ফিল আরদ তথা

যমিনে ফাসাদ বিস্তারকারী। আর মুফসিদের ক্ষেত্রে কাফের-মুসলিম, পুরুষ-মহিলা, স্বাধীন-গোলাম সবার হুকুম সমান।

যেসব কারণে একজন মুসলমান হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ১৯

যিন্দিকের শাস্তি:

মুসলিম বেশধারী যিন্দিক যদি ধৃত হওয়ার আগেই তাওবা করে ভাল হয়ে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে আখেরাতের পাশাপাশি দুনিয়াতেও তার তাওবা কবুল হবে। ফলে তার উপর থেকে মুরতাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে মুসলমান গণ্য হবে। যেমন সাধারণ মুরতাদরা তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে তাদের তাওবা কবুল হয় এবং তাদের উপর থেকে মুরতাদের শাস্তি রহিত হয়ে যায়।

মুসলিম পরিচয়ধারী কোন ব্যক্তি গোপনে গোপনে কাফের কি'না তা জানার পথ নেই। তাই কোন যিন্দিক ধৃত হওয়ার আগে তাওবার সূরত এ হবে যে, সে স্বেচ্ছায় কাযি বা ইমামুল মুসলিমিনকে জানাল, এতদিন সে কাফের ছিল। এখন তাওবা

করে বাস্তবেই মুসলমান হয়ে গেছে। তাহলে সে মাফ পেয়ে যাবে। কারণ, স্বেচ্ছায় নিজের অবস্থা প্রকাশ করে তাওবা করা থেকে বুঝা যায়, সে বাস্তবেই তাওবা করেছে।

পক্ষান্তরে যদি শরয়ী দলীল প্রমাণ দিয়ে তার কুফর প্রমাণ হয় এবং তারপর ধৃত হয়ে কাযির দরবারে উপস্থিত হয়, তাহলে তখন তার তাওবা (ইখলাসের সাথে হলে আখেরাতে আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও, দুনিয়ার বিচারে) গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তার ব্যাপারে প্রবল ধারণা এটাই যে, সে বাস্তবে তাওবা করেনি, হত্যা থেকে বাঁচার জন্য তাওবা জাহির করছে; যেমন এতদিন নিজেকে বাঁচানোর জন্য মুসলমান দাবি করে এসেছে।

সংশয়:

এখানে সংশয় হতে পারে যে, দারুল হরবে কাফেরদের উপর হামলা করলে যদি তারা তরবারির মুখে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের ইসলাম গ্রহণযোগ্য হয়; তাহলে এখানে যিন্দিক ব্যক্তি তরবারির ভয়ে তাওবা করলে মাফ পাবে না কেন?

নিরসন:

হরবিরা এতদিন ইসলামের সাথে সুস্পষ্ট দুশমনি প্রকাশ করে আসছিল। এখন যখন ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন স্বাভাবিক এটাই যে, তারা তাদের আগের বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলামী বিশ্বাস ধারণ করেছে। কিন্তু যিন্দিক এর ব্যতিক্রম। কেননা, এতদিন সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য –কাফের হওয়া সত্ত্বে- মুসলমান দাবি করে আসছিল। এখন ধরা পড়ার পর যখন নিজেকে মুসলমান দাবি করছে, তখন সে অতিরিক্ত কিছু করেনি, আগে যেমন মুসলমান দাবি করছিল, এখনও তেমনই দাবি করছে। আর তার কুফরি আকীদা থেকে ফিরে আসার দাবি যা সে করছে, তার ব্যাপারে প্রবল ধারণা এটাই যে, সে তরবারির ভয়ে শুধু জাহির করছে, বাস্তবে কুফর পরিত্যাগ করছে না। কেননা, এতদিন- কাফের হওয়া সত্ত্বে- নিজেকে বাঁচানোর জন্য শুধু মুসলমান দাবি করতো। এখন ধরা পড়ার পর তার আগের কুফর ছেড়ে দেয়া নিশ্চিত নয়। বরং প্রবল ধারণা এটাই যে, নিজেকে বাঁচানোর জন্যই এত দিনের মতো এখনও তাওবা জাহির করছে। পক্ষান্তরে হারবি কাফেররা নিজেদেরকে স্পষ্ট কাফের দাবি করে আসছিল। নিজেদের বাঁচানোর জন্য বা দুনিয়াবি কোন স্বার্থে নিজেদের মুসলমান

দাবি করার কোন প্রমাণ তাদের থেকে নেই। তাই তাদের বেলায় এ সম্ভাবনা প্রবল যে, তারা বাস্তবেই মুসলমান হয়ে গেছে।

অন্য কথায় বলা যায়, যার জাহির তার বাতিনের বিপরীত প্রমাণিত হবে, দুনিয়ার বিচারে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়- যদিও ইখলাসের সাথে হলে আখেরাতে আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে যাদের বাতিন তাদের জাহিরের অনুরূপ, তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য।

এছাড়াও বিভিন্ন কারণ আছে। সামনে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

***

দলীল-প্রমাণ ও আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্য:

আল্লামা কাশ্মিরি রহ. (১৩৫২হি.) তার যুগান্তকারী গ্রন্থ 'ইকফারুল মুলহিদিন' এ বলেন,

قال: التفتازاني في "مقاصد الطالبين في أصول الدين": الكافر إن أظهر الإيمان خص باسم "المنافق"، وإن كفر بعد الإسلام "فبالمرتد"... وإن أبطن عقائد هي كفر بالإتفاق "فبالزنذيق"".

وقال في شرحه: قد ظهر أن: "الكافر" اسم لمن لا إيمان له: فإن أظهر الإيمان خص باسم المنافق، وإن طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد، لرجوعه عن الإسلام ... وإن كان مع اعترافه وإظهاره شعائر الإسلام - بنبوة النبي - صلى الله عليه وسلم يبطن عقائد هي كفر بالإتفاق، خص باسم الزنيدق. اهـ

"'মাকাসিদুত ত্বালিবিন ফি উসূলিদ দ্বীন' গ্রন্থে তাফতাযানি রহ. (৭৯২হি.) বলেন, কাফের যদি নিজেকে মু'মিন জাহির করে, তাহলে তাকে 'মুনাফিক' বলা হবে। যদি মুসলমান থাকার পর কাফের হয়, তাহলে বলা হবে 'মুরতাদ'। ... আর যদি গোপনে গোপনে এমন সব আকীদা পোষণ করে, যেগুলো সর্বসম্মতিতে কুফর, তাহলে 'যিন্দিক'।

তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন: এতক্ষণে স্পষ্ট হল যে, ‘কাফের’ হচ্ছে এমন ব্যক্তির নাম, যার ঈমান নেই। যদি সে নিজেকে মু’মিন জাহির করে তাহলে ‘মুনাফিক’ বলা হবে। যদি মুসলমান থাকার পর তার উপর কুফর আপতিত হয়, তাহলে বলা হবে ‘মুরতাদ’ তথা দ্বীনত্যাগী । কেননা, সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছে। ... যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত স্বীকার করা এবং শাআয়েরে ইসলাম প্রকাশ্যে জাহির করা সত্ত্বেও গোপনে গোপনে এমন সব আকীদা পোষণ করে, যেগুলো সর্বসম্মতিতে কুফর, তাহলে ‘যিন্দিক’।”

(ইকফারুল মুলহিদিনি: ১২-১৩)

অন্যত্র বলেন,

المخالف للدين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له، لا ظاهراً ولا باطناً فهو كافر، وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وإن اعترف به ظاهراً لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق، كما إذا اعترف بأن القرآن حق، وما فيه من ذكر الجنة والنار حق، لكن المراد بالجنة: الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة، والمراد بالنار: هي الندامة التي تحصل بسبب

الملكات المذمومة، وليس في الخارج جنة ولا نار فهو زنديق. اهـ

“দ্বীনে হকের বিরোধী ব্যক্তি যদি জাহিরি বাতিনি কোনভাবেই তা স্বীকার না করে এবং তার প্রতি আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে সে ‘(প্রকাশ্য) কাফের’। যদি যবান দিয়ে তো স্বীকার করে কিন্তু তার অন্তর কুফরে অটল, তাহলে ‘মুনাফিক’। আর যদি বাহ্যত স্বীকার করে কিন্তু জরুরিয়্যাতে দ্বীনের কিছু বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা করে, যা সাহাবা-তাবেয়ীন যে ব্যাখ্যা করেছেন এবং উম্মাহ যে ব্যাখ্যার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছে সে ব্যাখ্যার বিপরীত; তাহলে সেই হচ্ছে ‘যিন্দিক’। যেমন: স্বীকার করলো যে, কুরআন সত্য এবং তাতে বিধৃত জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য; কিন্তু জান্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য- প্রশংসনীয় স্বভাবের কারণে অর্জিত প্রশান্তি, আর জাহান্নাম দ্বারা উদ্দেশ্য- নিন্দনীয় স্বভাবের কারণে উদ্ভূত অনুতপ্ততা; বাস্তবে কোন জান্নাত বা কোন জাহান্নাম নেই: তাহলে সে ‘যিন্দিক’।” **(ইকফারুল মুলহিদিনি: ৪৪)**

কাশ্মিরি রহ. এর বক্তব্যের সারকথা- মুসলমান দাবিদার যে

ব্যক্তি অন্তরে কুফর পোষণ করে (কিন্তু তার কুফর জনসম্মুখে প্রকাশ পায় না) সে মুনাফিক। আর যে মুসলমান দাবি করার পরও গোপনে গোপনে কোন কুফরী আকীদা পোষণ করে কিংবা জরুরিয়্যাতে দ্বীনের কোন বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা করে যা সাহাবা, তাবেয়ীন ও উম্মাহর ইজমার পরিপন্থী: সে যিন্দিক।

উল্লেখ্য, কাশ্মিরি রহ. এখানে যিন্দিকের ব্যাপক ও সামাজিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেননা, যদি মুসলমান নামধারী কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের বিপরীত ব্যাখ্যা করতে থাকে, তাহলে ফিকহের পরিভাষায় সে সুস্পষ্ট মুরতাদ গণ্য হবে। সামাজিকভাবে তাকে যিন্দিক বলা হলেও তার উপর মুরতাদের বিধানই প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ যদি সে তার এসব কুফরি আকীদা পরিত্যাগ করে সত্য ইসলামে ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে যেমন তার তাওবা কবুল হবে, দুনিয়াতেও সে হত্যা থেকে বেঁচে যাবে। যেমন- ঐসব কাদিয়ানি ও শীয়া, যারা নিজেদের কুফরি আকীদা সুস্পষ্টই প্রকাশ করে থাকে। কাদিয়ানিরা শেষ নবীর অর্থের অপব্যাখ্যা করে থাকে। শীয়ারা কুরআন মানে কিন্তু ভিন্ন কুরআন। এরা

সামাজিকভাবে যিন্দিক হলেও ফিকহের ভাষায় মুরতাদ। এরা তাওবা করলে মাফ পাবে।

পক্ষান্তরে যদি তারা বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে, প্রকাশ্যে তাদের থেকে কোন কুফর প্রকাশ না পায, কিন্তু গোপনে গোপনে এসব অপব্যাখ্যা ও কুফরী আকীদা পোষণ করে; ঘটনাক্রমে বা নির্ভরযোগ্য মনে করে কারো নিকট প্রকাশ করার দ্বারা তা প্রকাশ পায়: তাহলে ফিকহের পরিভাষায় তারা যিন্দিক। এদের বিধান সাধারণ মুরতাদের থেকে ভিন্ন।

অন্য কথায় বলা যায়, যিন্দিক মূলত মুনাফিক। কিন্তু ঘটনাক্রমে যার কুফর প্রকাশ হয়ে যাবে- কিন্তু সে অস্বীকার করতে থাকবে যে, সে কাফের না বা কোন কুফরি আকীদা পোষণ করে না- সে যিন্দিক। পক্ষান্তরে যে প্রকাশ্যে কুফর করে বেড়ায়, সে যিন্দিক নয়, মুরতাদ। সামাজিকভাবে ব্যাপক অর্থে ক্ষেত্রবিশেষে তাকে যিন্দিক বলা হলেও ফিকহের ভাষায় সে মুরতাদ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

الزنديق فى عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبى صلى الله عليه و سلم وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره. اهـ

"এসকল ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় যিন্দিক হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার মুনাফিক। আর তা হচ্ছে, বাহ্যত মুসলমান জাহির করা কিন্তু অন্তরে ভিন্ন কিছু পোষণ করা।" **(মাজমুউল ফাতাওয়া: ৭/৪৭২)**

অর্থাৎ এই মুনাফিকের কুফর যখন তার অসতর্কতাবশত ঘটনাক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন সে যিন্দিক।

যিন্দিক বাহ্যত যেটাকে নিজের দ্বীন বলে প্রকাশ করছে, বাস্তবে সেটা তার দ্বীন নয়। বরং সে এর বিপরীত আকীদা রাখে। এ কারণে তাকে 'বে-দ্বীন'ও বলা হয়। এ হিসেবে ইবনুল ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

وهو من لا يتدين بدين. اهـ

“যিন্দিক হচ্ছে যার কোন দ্বীন নেই (তথা বেদ্বীন)।” **(ফাতহুল কাদির: ৬/৯৮)**

যিন্দিকের কুফর প্রকাশ কিভাবে হবে, এ সম্পর্কে বলেন,

فطريق العلم بحاله إما بأن يعثر بعض الناس عليه أو يسره إلى من أمن إليه. اهـ

“তার অবস্থা সম্পর্কে অবগতির পন্থা হল- হয়তো কোন মুসলমান ঘটনাক্রমে তা জেনে ফেলবে, নতুবা নির্ভরযোগ্য মনে করে কারো কাছে গোপনে তা প্রকাশ করবে।” **(ফাতহুল কাদির: ৬/৯৮)**

বুঝা গেল, যে যিন্দিকের শাস্তি সাধারণ মুরতাদের চেয়ে ভিন্ন, যার তাওবা দুনিয়ার বিচারে কবুল হবে না, সে হল ঐ যিন্দিক, যে গোপনে গোপনে কুফরি পোষণ করে। পক্ষান্তরে যারা প্রকাশ্যে কুফর করে বেড়ায়, তারা মুরতাদ। তারা তাওবা করলে তাওবা কবুল হবে। ফলে তাদের উপর মুরতাদের শাস্তি বর্তাবে না। যেমন হরবি কাফেররা তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে তাদের তাওবা কবুল হয়।

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

والحق أن الذي يقتل ولا تقبل توبته هو المنافق، فالزنديق إن كان حكمه كذلك فيجب أن يكون مبطنا كفره ... ويظهر تدينه بالإسلام ... وإلا فلو فرضناه مظهرا لذلك حتى تاب يجب أن لا يقتل وتقبل توبته كسائر الكفار المظهرين لكفرهم إذا أظهروا التوبة. اهـ

“বাস্তব কথা হচ্ছে, যাকে (অবশ্যই) হত্যা করে দেয়া হবে এবং তার তাওবা কবুল করা হবে না, সে হচ্ছে মুনাফিক। যিন্দিকের বিধান যদি এমনই হয়, তাহলে তার বেলায় আবশ্যক যে, সে তার কুফর গোপন করে ... এবং বাহ্যত নিজেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী দাবি করে। ... অন্যথায় যদি ধরে নিই যে, সে তার কুফর প্রকাশ করে বেড়ায়, তাহলে তাওবা করলে তাকে হত্যা না করা এবং তার তাওবা কবুল করা আবশ্যক। যেমন, অন্য সকল কাফের, যারা নিজেদের কুফর প্রকাশ করে বেড়ায়- যখন তারা তাওবা করে (তখন তাদের তাওবা গ্রহণ করা হয়)।” **(ফাতহুল কাদির: ৬/৯৯)**

সারকথা দাঁড়াল:

- যারা হরবি কাফের, তারা যখন তাওবা করে মুসলমান হয়ে

যাবে, তাদের তাওবা আখেরাতে যেমন কবুল হবে, দুনিয়াতেও হবে। ফলে তাদের হত্যা করা হবে না।

- যারা সুস্পষ্ট মুরতাদ, তারা যদি তাওবা করে, তাহলে তাদের তাওবাও আখেরাতের সাথে সাথে দুনিয়াতেও কবুল হবে। ফলে তাদের হত্যা করা হবে না।

- যাদের বাতিন তাদের জাহিরের বিপরীত- অর্থাৎ যিন্দিক- যারা বাস্তবে কাফের কিন্তু নিজেদের বাঁচানোর জন্য বা দুনিয়াবি সুবিধা লাভের জন্য বা ছদ্মবেশে ইসলামের ক্ষতি করার জন্য বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে, দুনিয়ার বিচারে তাদের তাওবা কবুল হবে না। ফলে অবশ্যই তাদের হত্যা করা হবে। তবে ইখলাসের সাথে হলে আখেরাতে মাফ পেয়ে যাবে।

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২০

অনেক দিন যাবৎ কাজটা বন্ধ ছিল। আল্লাহ তাআলার তাওফিকে আবার শুরু হল।

যিন্দিকের আলোচনা চলছিল। কিছু আলোচনা হয়েছিল। বাকি অংশ আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। যিন্দিক ধৃত হওয়ার পর তাওবা করলেও তার তাওবা গ্রহণ করা হবে না, বরং হত্যা করা হবে। হ্যাঁ, খালেস নিয়তে তাওবা করলে আখেরাতে

আল্লাহ তাকে মাফ করবেন- সেটা ভিন্ন কথা। এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত দলীল আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ধৃত হওয়ার পর দুনিয়াতে যিন্দিকের তাওবা কবূল না হওয়ার দলীল:

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১ হি.) বলেন,

ومما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه قوله تعالى: {قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا} [التوبة: 52] قال السلف بالقتل إن أظهرتم ما في [في هذه الآية: {أو بأيدينا} [التوبة: 52 قلوبكم، وهو كما قالوا؛ لأن العذاب على ما يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل؛ فلو قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم لم يمكن المؤمنين أن يتربصوا بالزنادقة أن يصيبهم الله بأيديهم؛ لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يصابوا بأيديهم قط، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. اهـ [إعلام الموقعين: 3\107]

"ধৃত হওয়ার পর যিন্দিকের তাওবা তার রক্তের সুরক্ষা না হওয়ার একটি দলীল আল্লাহ তাআলার এ বাণী,

{ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا}

“আপনি (মুনাফিকদের) বলে দিন, তোমরা কি আমাদের ব্যাপারে (বিজয় ও শাহাদাত এ) দু’ কল্যাণের কোনো একটির অপেক্ষায় আছ? আমরা কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে প্রতিক্ষায় আছি যে, আল্লাহ তাআলা নিজে থেকে তোমাদের শাস্তি পৌঁছাবেন কিংবা আমাদের হাত দিয়ে।”- তাওবা ৫২

সালাফগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে, তা যদি তোমরা প্রকাশ কর, তাহলে (আমাদের হাতে) হত্যা করানোর মাধ্যমে তিনি আমাদের হাত দিয়ে তোমাদের শাস্তি পৌঁছাবেন’।

এটিই যথাযথ ব্যাখ্যা। কারণ, তারা যে কুফর তাদের অন্তরে গোপন রাখে, মুমিনদের হাতে তার শাস্তি হত্যার দ্বারাই কেবল হতে পারে। যান্দাকা প্রকাশ হওয়ার পরও যদি এদের তাওবা কবূল হয়, তাহলে মুমিনদের জন্য এটি সম্ভব হবে না যে, তাদের হাতে আল্লাহ তাআলা এদের শাস্তি দেয়ার প্রতিক্ষায়

থাকবে। কেননা, মুমিনরা যখনই এদেরকে শাস্তি দিতে যাবে, তখনই তারা বাহ্যত মুসলমান হয়ে যাবে। ফলে মুমিনদের হাতে এদের শাস্তি হবে না কখনই। এ ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ অনেক।”- **ই’লামুল মুআককিয়িন: ৩/১০৭**

ইবনে তাইমিয়া রহ. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা এখন আর সে আলোচনায় যাচ্ছি না।

বি.দ্র.

যিন্দিক পীর-সূফিদের হত্যা করা জরুরী:

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২ হি.) বলেন,

وفي رسالة ابن كمال عن الإمام الغزالي في كتاب [التفرقة بين الإسلام والزندقة] ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه بلغ حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب المسكر والمعاصي وأكل مال السلطان، فهذا مما لا أشك في وجوب قتله إذ ضرره في الدين أعظم؛ وينفتح به باب من الإباحة لا ينسد؛ وضرر هذا فوق ضرر من يقول بالإباحة مطلقا؛ فإنه يمتنع عن الإصغاء إليه لظهور كفره. أما هذا فيزعم

أنه لم يرتكب إلا تخصيص عموم التكليف بمن ليس له مثل درجته في الدين ويتداعى هذا إلى أن يدعي كل فاسق مثل حاله اهـ. رد المحتار 4\243

“ইবনে কামাল পাশা রহ. ইমাম গাযালি রহ.-র ‘আততাফরিকা বাইনাল ইসলামি ওয়াযযান্দাকা’ কিতাব থেকে তার নিজের বক্তব্য বর্ণনা করেন: এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কতক সূফি, যারা দাবি করে যে, তারা আল্লাহ তাআলার সাথে এমন এক সম্পর্কের দরজায় উপনীত হয়েছে, যার ফলে তাদের উপর থেকে নামাযের দায়িত্ব রহিত হয়ে গেছে এবং নেশাজাত দ্রব্য পান করা, গুনাহে লিপ্ত হওয়া এবং সুলতানের মাল ভক্ষণ করা তাদের জন্য হালাল হয়ে গেছে। আমার কোনই সন্দেহ নেই যে, এ ধরণের লোককে হত্যা করা অত্যাবশ্যক। কেননা, এদের দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি হয় অনেক বেশি। এদের দ্বারা (হারামসমূহকে) হালালরূপে গ্রহণ করার এমন এক দরজা খোলবে, যা বন্ধ হবার মতো নয়। যেসব লোক নিঃশর্তভাবে সব কিছুকে হালাল বলে, তাদের চেয়েও এসব লোকের অনিষ্ট বেশি। কেননা, সুস্পষ্ট কুফর হওয়ার কারণে লোকজন নিঃশর্ত হালাল দাবিদারদের কথার দিকে কর্ণপাত করবে না। পক্ষান্তরে এ লোকের দাবি হল, সে শুধু এতটুকু করেছে যে,

শরীয়তের পক্ষ থেকে আরোপিত দায়-দায়িত্বগুলোকে সে ঐসব লোকের জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, যারা (তার দাবি অনুযায়ী) তার স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। এর অনিবার্য পরিণতি এই দাঁড়াবে যে, প্রত্যেক ফাসেকই দাবি করবে, সে ঐ স্তরে পৌঁছে গেছে।"- **রদ্দুল মুহতার ৪/২৪৩**

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২১

হাল্লাজ ও ইবনে আরাবি প্রসঙ্গ:

বিশ্ব ইতিহাসে প্রসিদ্ধ দু'জন যিন্দিক: হাল্লাজ ও ইবনে আরাবি। এদের দ্বারা ইসলামের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সংক্ষেপে এ দু'জনের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য দু'জন ইমামের বক্তব্য তুলে ধরছি।

ইবনে আরাবি:

ইবনে আবিল ঈজ্ হানাফি রহ. (৭৯২ হি.) ইবনে আরাবির কিছু কুফরি কথা উল্লেখ করার পর বলেন,

وكيف يخفى كفر من هذا كلامه ؟ وله من الكلام أمثال هذا،

وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين : { لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله } ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار. والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه و سلم ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد ولكن في قبول توبته خلاف والصحيح عدم قبولها وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه والله المستعان. اهـ شرح العقيدة الطحاوية لابن ابى العز الحنفي 492

“যে ব্যক্তি এ ধরণের কথা বলে, সে কাফের হওয়ার ব্যাপারে কিভাবে অস্পষ্টতা থাকতে পারে?! এ ধরণের কুফরি কথা তার আরোও আছে। সেগুলোর কিছু এমন যে, তার কুফরিটা অস্পষ্ট। আর কিছু আছে সুস্পষ্ট কুফর (যা সকলেই বুঝবে)। এ কারণে সেগুলোর বাতুলতা প্রকাশ হওয়ার জন্য বিচক্ষণতার সাথে যাচাইয়ের প্রয়োজন পড়ে। কেননা, কিছু বাতিল আছে যা সকল যাচাইকারীর সামনেই ধরা পড়ে। আর কিছু আছে যা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিদগ্ধ পর্যালোচক ছাড়া

অন্য কারো চোখে ধরা পড়ে না।

ইবনে আরাবি ও তার সমশ্রেণীর লোকদের কুফর (মক্কার) ঐসব (কাফের) লোকদের চেয়েও বেশি, যারা বলেছিল, ‘আমরা কিছুতেই ঈমান আনবো না, যতক্ষণ না আমাদেরও ঐ জিনিস (অর্থাৎ নবুওয়্যাত) দেয়া হয়, যা আল্লাহর রাসূলদের দেয়া হয়েছিল।’

কিন্তু ইবনে আরাবি ধরণের লোকেরা হচ্ছে ইত্তেহাদি যিন্দিক ও মুনাফিক, যাদের ঠিকানা জাহান্নামের সর্বনিকৃষ্ট স্তরে। মুনাফিকরা যেহেতু বাহ্যত নিজেদের মুসলমান বলে প্রকাশ করে, তাই তাদের সাথে মুসলমানদের মতোই মুআমালা করতে হয়। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মুনাফিকরা অন্তরে কুফর গোপন রেখে বাহ্যত নিজেদের মুসলমান দাবি করতো। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে তাদের সাথে মুসলমানদের মতোই মুআমালা করতেন। যদি তাদের কারো থেকে তার লুকানো কুফর প্রকাশ হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই তার উপর মুরতাদের বিধান প্রয়োগ করতেন। তবে তার তাওবা কবূল হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত

আছে। সহীহ অভিমত হচ্ছে, কবূল হবে না। মুআল্লা রহ. আবু হানিফা রহ. থেকে এমনটিই বর্ণনা করেছেন।”- শরহুল আকিদাতিত তহাবিয়্যা লি ইবনি আবিল ঈজ: ৪৯২

হাল্লাজ:

ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.)-র কাছে হাল্লাজের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তিনি উত্তর দেন,

من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين؛ فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد كقوله: أنا الله. وقوله: إله في السماء وإله في الأرض ... والحلاج: كانت له مخاريق وأنواع من السحر وله كتب منسوبة إليه في السحر. وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر واتحاده به وأن البشر يكون إلها وهذا من الآلهة: فهو كافر مباح الدم وعلى هذا قتل الحلاج... وما يحكى عن الحلاج من ظهور كرامات له عند قتله مثل كتابة دمه على الأرض: الله الله وإظهار الفرح بالقتل أو نحو ذلك: فكله كذب. فقد جمع المسلمون أخبار الحلاج في مواضع كثيرة ... وما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخير لا

من العلماء ولا من المشايخ؛ ولكن بعض الناس يقف فيه؛ لأنه لم يعرف أمره وأبلغ من يحسن به الظن يقول: إنه وجب قتله في الظاهر فالقاتل مجاهد والمقتول شهيد وهذا أيضا خطأ. وقول القائل: إنه قتل ظلما قول باطل فإن وجوب قتله على ما أظهره من الإلحاد أمر واجب باتفاق المسلمين؛ لكن لما كان يظهر الإسلام ويبطن الإلحاد إلى أصحابه: صار زنديقا فلما أخذ وحبس أظهر التوبة والفقهاء متنازعون في قبول توبة الزنديق فأكثرهم لا يقبلها. اهـ مجموع الفتاوى 2\480-483

"হাল্লাজ যেসকল (কুফরি) কথা-বার্তায় বিশ্বাসী ছিল, যেগুলোর কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি সেগুলো বিশ্বাস করবে, মুসলমানদের সকলের ঐক্যমতে সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে। হুলুল, ইত্তিহাদ এবং যিন্দিক ও মুলহিদদের এ জাতীয় বিভিন্ন কথা-বার্তার কারণে মুসলমানরা তাকে হত্যা করেছে। যেমন, সে বলতো: 'আমিই আল্লাহ', 'আকাশে ইলাহ একজন আর যমিনে ইলাহ আরেকজন (যার দ্বারা সে নিজেকেই উদ্দেশ্য নিতো) ইত্যাদি। ...

হাল্লাজ অনেক অলৌকিক কাণ্ড ঘটাত এবং বিভিন্ন প্রকার যাদু-টোনা জানত। যাদু সম্পর্কে তার নামে কিছু কিতাবও

আছে। মোটকথা, যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে এ আকীদা রাখবে যে, তিনি কোন মানুষের ভিতরে অবতরণ করেন এবং তার সাথে মিশে একাকার হয়ে যান এবং মানুষটি ইলাহ হয়ে যায় এবং সেও (তখন) অনেক ইলাহের মধ্যে একজন ইলাহ: সে ব্যক্তি কাফের এবং তার রক্ত হালাল। হাল্লাজকে এর ভিত্তিতেই হত্যা করা হয়েছে। ...

আর হাল্লাজের ব্যাপারে যা বলা হয় যে, তাকে হত্যা করার সময় তার বেশ কিছু কারামত জাহের হয়েছে; যেমন: তার রক্তের দ্বারা যমিনে আল্লাহ আল্লাহ লেখা উঠেছে, হত্যার কারণে সে খুশির বহিঃপ্রকাশ করেছে, এছাড়াও এ জাতীয় যত কিছু বলা হয়- তার সবগুলোই মিথ্যা। মুসলিম মনীষীগণ অনেক কিতাবে হাল্লাজের কাহিনি বর্ণনা করেছেন; ... কিন্তু উলামা-মাশায়েখদের কোন একজন ইমামের ব্যাপারেও আমাদের এ কথা জানা নেই যে, তিনি হাল্লাজের ব্যাপারে ভাল কিছু বলেছেন।

তবে হ্যাঁ! কেউ কেউ এ ব্যাপারে (পক্ষ-বিপক্ষ কিছু না বলে) চুপ থেকেছেন। তার কারণ, হাল্লাজের বিষয়টা তাদের জানা ছিল না। তার ব্যাপারে যারা ভাল ধারণা রাখেন, বেশির চেয়ে বেশি তারা এ কথা বলেন যে, জাহিরিভাবে তাকে হত্যা করা

ফরয ছিল; অতএব, যিনি হত্যা করেছেন, তিনি (তাকে হত্যা করার দ্বারা) মুজাহিদ গণ্য হবেন; আর নিহত ব্যক্তিও শহীদ হবে। তবে বাস্তবে এ কথাটিও ভুল।

আর এ কথা বলা যে, তাকে হত্যা করা জুলুম হয়েছে- এটি একটি বাতিল কথা। কেননা, সে যে ইলহাদ (ও কুফর) জাহের করেছে, সে অনুযায়ী আইম্মায়ে কেরামের সকলের ঐক্যমতে তাকে হত্যা করা ফরয ছিল। কিন্তু যেহেতু সে বাহ্যত নিজেকে মুসলমান প্রকাশ করত আর তার ভক্তবৃন্দের নিকট গোপনে ইলহাদ জাহের করতো, তাই সে ছিল যিন্দিক। এরপর যখন তাকে গ্রেফতার করে বন্দী করা হয়েছে, তখন বাহ্যত তাওবা করেছে। আর যিন্দিকের তাওবা কবূল করা হবে কি'না এ নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ আছে। অধিকাংশের মত হল, কবূল হবে না।”- মাজমুউল ফতাওয়া ২/৪৮০-৪৮৩

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২২

তিন. বিদআতিদের গুরু

আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, যারা যমিনে দ্বীনি বা

দুনিয়াবি কোন ধরণের ফাসাদ ছড়ায়, প্রয়োজনে ফাসাদ দূর করণার্থে তাদের হত্যা করা বা শাস্তি দেয়া বৈধ। আর স্পষ্ট যে, বিদআতিরা দ্বীনের ব্যাপারে ফাসাদ ছড়াচ্ছে। তাদের প্রতিহত করা এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সহীহ আকীদার সংরক্ষণ করা ফরয। এজন্য প্রয়োজনে বিদআতিদের শাস্তি দেয়ার দরকার পড়লে, গ্রেফতার-বন্দীর দরকার পড়লে তা-ই করতে হবে। যদি কিতাল ছাড়া দমন সম্ভব না হয়, তাহলে কিতাল করা হবে। মুনাসিব মনে হলে তাদের নেতৃত্বস্থানীয়দের হত্যাও করা যাবে। আর যদি বিদআত এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তা কুফর ও ইরতিদাদে পৌঁছে গেছে, তাহলে তাদের উপর মুরতাদের বিধান আরোপ হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب، وإن لم يكن في نفس الأمر كفرا. فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه. اهـ مجموع الفتاوى 23\349-350

“কুফর পর্যন্ত না গড়ালেও বিদআতের প্রতি আহ্বানকারী দাঈকে কখনও হত্যা করা হয় জনসাধারণের উপর থেকে তার

অনিষ্ট প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে; যেমন হত্যা করা হয়ে থাকে মুহারিব(তথা ডাকাত)কে। এমন নয় যে, যাকেই হত্যার আদেশ দেয়া হয়েছে, তা কেবল তার রিদ্দাহর কারণেই। এ হিসেবে (কদরিয়া ফিরকার গুরু) গাইলান আলকদরি ও অন্যানদের হত্যা এর ভিত্তিতে হতে পারে।"- মাজমুউল ফাতাওয়া ২৩/৩৪৯-৩৫০

আরো বলেন,

وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وكذلك كثير من أصحاب مالك. وقالوا: إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض؛ لا لأجل الردة؛ ... وهذا لأن المفسد كالصائل. فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل. اهـ مجموع الفتاوى 28\346-347

"শাফিয়ি, আহমাদ ও অন্যান্য আরো অনেক ইমামের অনুসারিদের এক জামাত কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী বিদআতের দিকে আহ্বানকারী দাঈকে হত্যার অনুমোদন দিয়েছেন। ইমাম মালেকের অনেক অনুসারিও এর অনুমোদন দিয়েছেন। তারা

বলেন, ইমাম মালেক রহ. সহ আরো অনেকে কদরিয়াদের হত্যার অনুমোদন দিয়েছেন ফাসাদ ফিল আরদের কারণে; রিদ্দাহর কারণে নয়। ... এর কারণ, ফাসাদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর উপর আগ্রাসীর অনুরূপ। আর আগ্রাসী ব্যক্তি যদি হত্যা ছাড়া বিরত না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করে দিতে হয়।”- মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৩৪৬-৩৪৭

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২ হি.) বলেন,

وفي نور العين عن التمهيد: أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم بحيث توجب الكفر فإنه يباح قتلهم جميعا إذا لم يرجعوا ولم يتوبوا، وإذا تابوا وأسلموا تقبل توبتهم جميعا ... فأما في بدعة لا توجب الكفر فإنه يجب التعزير بأي وجه يمكن أن يمنع من ذلك، فإن لم يمكن بلا حبس وضرب يجوز حبسه وضربه، وكذا لو لم يمكن المنع بلا سيف إن كان رئيسهم ومقتداهم جاز قتله سياسة وامتناعا.

والمبتدع لو له دلالة ودعوة للناس إلى بدعته ويتوهم منه أن ينشر البدعة وإن لم يحكم بكفره جاز للسلطان قتله سياسة وزجرا لأن فساده أعلى وأعم حيث يؤثر في الدين. والبدعة لو كانت كفرا يباح قتل أصحابها عاما، ولو لم تكن كفرا يقتل معلمهم ورئيسهم زجرا وامتناعا. اهـ

“‘নূরুল আইন’ কিতাবে ‘আততামহিদ’ কিতাব থেকে বিবৃত হয়েছে: বিদআতিদের বিদআত যদি কুফর পর্যন্ত গড়িয়ে যায় এবং তারা তাওবা করে ফিরে আসতে সম্মত না হয়, তাহলে তাদের সকলকে হত্যা করে দেয়া বৈধ। যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে সকলের তাওবা কবুল করা হবে। ... আর যেসব বিদআত কুফরে গড়ায়নি, সেসবের ক্ষেত্রে তা থেকে বিরত রাখা যায় মতো তা’যির করা আবশ্যক। যদি বন্দী ও প্রহার ব্যতীত সম্ভব না হয়, তাহলে বন্দী ও প্রহার বৈধ। তদ্রূপ, যদি অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত বিরত রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে নেতা ও অনুসরণীয় পর্যায়ের বিদআতি হলে সিয়াসতরূপে ও দমনের উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করা বৈধ। বিদআতি যদি লোকজনকে তার বিদআতের প্রতি দাঈ ও আহ্বানকারী হয় এবং তার কারণে বিদআত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে তার ব্যাপারে কুফরের ফায়সালা না হলেও সিয়াসতরূপে ও দমনের উদ্দেশ্যে সুলতানের জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ। কেননা, তার কারণে বড় ধরণের ও ব্যাপক ফাসাদ দেখা দিচ্ছে। কেননা, তার ফাসাদ দ্বীনকে আক্রান্ত করছে। বিদআত যদি কুফরে গড়ায়, তাহলে তাদের সকলকে ঢালাওভাবে হত্যা করা হবে। আর কুফর না হলে

দমনের উদ্দেশ্যে তাদের উস্তাদ ও সর্দারকে হত্যা করা হবে।”- রদ্দুল মুহতার ৪/২৪৩

মোটকথা: ইরতিদাদ হলে মুরতাদ হিসেবে সকলকে হত্যা করা হবে। আর ইরতিদাদ না হলে শাস্তি দিয়ে হলেও বিদআত দমন করতে হবে। প্রয়োজনে নেতৃত্বস্থানীয় ও গুরু পর্যায়ের বিদআতিদের হত্যা করাও জায়েয হবে- যদিও তারা কাফের হয়ে যায়নি। বিদআত দমনের জন্য হত্যা করা হবে; মুরতাদ হিসেবে নয়।

বি.দ্র- ১

এখানে বিদআত বলতে সাধারণ বিদআত উদ্দেশ্য নয়; কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট পরিপন্থী বিদআতে গলিজা উদ্দেশ্য। নতুবা অনেক উলামা ফুকাহাকে হত্যা করা আবশ্যক হবে। কারণ, টুকটাক ও সাধারণ কিছু বিদআত অনেক আলেম-ফকিহের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। এ ধরণের বিদআত এখানে উদ্দেশ্য নয়। এখানে খাওয়ারেজ, *মু’তাজিলা ও কদরিয়াদের মতো

বিদআত উদ্দেশ্য। বর্তমান সময়কার মাজার ও কবর পূজারিদের নেতৃত্বস্থানীয় ভণ্ড বাবাগুলো এ শ্রেণীতে পড়বে। আর দেউয়ান বাগীদের মতো খবীসগুলো তো সুস্পষ্ট মুরতাদ। এদেরকে ফাসাদ ফিল আরদের পাশাপাশি ইরতিদাদের কারণেও হত্যা করা আবশ্যক।

বি.দ্র-২

যেকোন হত্যার ক্ষেত্রেই তার লাভ-ক্ষতির হিসেব করা আবশ্যক। যদি হত্যার দ্বারা লাভের তুলনায় ক্ষতি হয় বেশি, তাহলে হত্যা করা হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ারেজদের প্রথম ব্যক্তি যুলখুয়াইসিরাকে এজন্যই হত্যা করেননি। মুনাফিকদেরও ছেড়ে দিয়েছেন। এজন্য বিদআতি কোন গুরু বা বাবাকে হত্যা করতে হলে বিজ্ঞ মুজাহিদ উলামায়ে কেরাম ও উমারাদের নির্দেশনা নিয়ে করা উচিৎ। নয়তো লাভের তুলনায় ক্ষতি হতে পারে বেশি।

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৩

চার. পশুর সাথে সঙ্গমকারী

এক হাদিসে পশুর সাথে সঙ্গমকারীকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে:

(من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه)

"কাউকে কোন পশুর সাথে সঙ্গম করতে দেখলে হত্যা করে দেবে।" - আবু দাউদ: ৪৪৬৬ , তিরিমিযি: ১৪৫৫

এ হাদিসের বর্ণনাকারী হলেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। কিন্তু তার থেকে এর বিপরীত বর্ণনা আছে। তিনি বলেন,

ليس على الذى يأتى البهيمة حد

"পশুর সাথে সঙ্গমকারী ব্যক্তির উপর হদ বর্তাবে না।"- আবু দাউদ: ৪৪৬৭ , তিরিমিযি: ১৪৫৫

এ থেকে বুঝা যায়, হাদিসে যে হত্যার কথা বলা হয়েছে, তা হদ হিসেবে নয় যে, অবশ্যই হত্যা করতে হবে। বরং তা'যির উদ্দেশ্য। যদি কোন ব্যক্তি এ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ইমামুল মুসলিমীন তাকে হত্যা করা মুনাসিব মনে করেন, তাহলে তা'যিররূপে হত্যা করতে পারেন। আর যদি হত্যা করার দরকার মনে না করেন, তাহলে অন্য শাস্তি দেবেন।

আল্লামা আইনী রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন,

وقيل: إنما قال ذلك في فاعل اعتاد وبذلك قتل سياسة عندنا. اهـ
البناية 6\312

"বলা হয়, হত্যার নির্দেশ এমন ব্যক্তির ব্যাপারে দিয়েছেন, যে এ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী তাকে সিয়াসতরূপে হত্যা করা হবে।"- আলবিনায়া ৬/৩১২

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৫

আলোচনাটা শুরু হয়েছিল অনেক দিন হল। মাঝখানে বেশ অনেক দিন বন্ধ ছিল। আল্লাহ তাআলার তাওফিক হলে

আলোচনাটা পূর্ণ করার চেষ্টা করবো। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

আলোচনা চলছিল সিয়াসত ও তা'যিররূপে কাদের হত্যা করা হবে। বেশ অনেকেই এর আওতায় পড়ে। যেমন,

১. যাদুকর।

২. বিদআতিদের গুরু।

৩. যিন্দিক।

৪. সমকামী।

৫. পশুর সাথে সঙ্গমকারী।

৬. যে ব্যক্তি তার মাহরাম মহিলার সাথে সঙ্গম করে।

৭. চোর।

৮. রাহজান ও ডাকাত।

৯. শ্বাসরূদ্ধ করে হত্যাকারী।

১০. ভারী বস্তু (যেমন পাথর ইত্যাদি) দিয়ে হত্যাকারী।

১১. মদখোর।

১২. যে ব্যক্তি শাসকদের কাছে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ করে লোকজনকে হত্যা করায়।

***

প্রথম পাঁচ জনের আলোচনা ইতিমধ্যে হয়েছে। আজ ষষ্ঠ জনকে নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ছয়. আপন মাহরাম মহিলার সাথে সঙ্গমকারী

হাদিসে মাহরাম মহিলার সাথে সঙ্গমকারীকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে। যেমন এক হাদিসে এসেছে,

(ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)

"যে ব্যক্তি তার মাহরামের সাথে সঙ্গম করে, তাকে হত্যা করে দাও।" - তিরিমিযি: ১৪৬২

যিনার শাস্তি হল অবিবাহিত হলে বেত্রাঘাত আর বিবাহিত হলে রজম করে হত্যা। কিন্তু এ ব্যক্তির বেলায় বিবাহিত অবিবাহিতের কোন পার্থক্য না করে হত্যা করে দিতে বলা

হয়েছে। বুঝা গেল, এর শাস্তি যিনার শাস্তি নয়। তাহলে হত্যা কি হিসেবে? ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

قالوا: جاز فيه أحد الأمرين أنه للاستحلال، أو أمر بذلك سياسة وتعزيرا. اهـ

"উলামাগণ বলেন, এখানে দু'টির কোন একটি হতে পারে: হয়তো হালাল মনে করার কারণে, নয়তো সিয়াসত ও তা'যিররূপে এ আদেশ দিয়েছেন।" –ফাতহুল কাদির ৫/২৬১

অর্থাৎ যদি হালাল মনে করে করে থাকে তাহলে তো মুরতাদ। মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। আর যদি হালাল মনে না করে থাকে, হারাম জেনেও করে থাকে তাহলে হত্যা করতে বলা হয়েছে সিয়াসতরূপে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবাদিতে দেখা যেতে পারে। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

সাত. চোর

চোরের স্বাভাবিক শাস্তি হল প্রথমবারে চুরি করলে ডান হাত কেটে দেয়া, দ্বিতীয়বারে বাম পা কেটে দেয়া। হাত কাটা কুরআনে কারীম দ্বারা আর পা কাটা সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। (দেখুন: ফাতহুল কাদির ৫/৩৯৭-৩৯৮)

তৃতীয় ও চতুর্থবারে চুরি করলে কি করা হবে তা মতভেদপূর্ণ। কোনো কোনো জয়িফ হাদিসে তৃতীয়বারে বাম হাত এবং চতুর্থবারে ডান পা কেটে দেয়ার কথা এসেছে এবং পঞ্চমবারে হত্যা করে দেয়ার কথা এসেছে। তবে হাদিস নিতান্তই দুর্বল। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এর বিপরীত আমল প্রমাণিত আছে।

যেমন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত যে, দুইবারের বেশি চুরি করলে হাত-পা না কেটে বা হত্যা না করে জেলে ভরে রেখেছেন। এ কারণে হানাফিদের মত হলো, দুইবারের বেশি চুরি করলে জেলে ভরে রাখা হবে এবং শাস্তি দেয়া

হবে। তাওবা করে ভাল হলে তো ভালোই অন্যথায় মরণ পর্যন্ত জেলেই থাকতে হবে। তবে ইমামুল মুসলিমিন বা কাযি সাহেব যদি মুনাসিব মনে করেন তাহলে ফাসাদ ফিল আরদের কারণে তৃতীয়-চতুর্থবারে হাত পা কাটতে পারবেন বা হত্যা করতে পারবেন। তবে প্রথম বা দ্বিতীয়বারে হত্যা করতে পারবেন না। কারণ, দুইবারের শাস্তি শরীয়তে সুনির্ধারিত।

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১হি.) বলেন,

فامتناع علي بعد ذلك إما لضعف الروايات المذكورة في الإتيان على أربعته وإما لعلمه أن ذلك ليس حدا مستمرا بل من رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من السعي بالفساد في الأرض وبعد الطباع عن الرجوع فله قتله سياسة فيفعل ذلك القتل المعنوي. اهـ

“হাদিস বর্ণিত হওয়ার পরও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর আমল করেননি। হয়তো এ কারণে যে, চারো হাত-পা কেটে দেয়ার উপরোক্ত বর্ণনাগুলো দুর্বল; নয়তো এ কারণে যে, তিনি জানেন, তা শরীয়ত নির্ধারিত হদ হিসেবে নয়, বরং ইমামের রায় হিসেবে। দেখলেন যে, এ লোক ফাসাদ ফিল আরদ করে বেড়াচ্ছে এবং তা থেকে ফিরে আসার মতো

মানসিকতা তার নেই। এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করা জায়েয। তাই হতা-পা কেটে দিতে পারেন, যা হত্যারই নামান্তর।” –ফাতহুল কাদির ৫/৩৯৭

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

وفي حاشية السيد أبي السعود: رأيت بخط الحموي عن السراجية ما نصه: إذا سرق ثالثا ورابعا للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد. اهـ قال الحموي: فما يقع من حكام زماننا من قتله أول مرة زاعمين أن ذلك سياسة جور وظلم وجهل. اهـ

“সায়্যিদ আবুস সাউদ রহ. তার প্রণীত হাশিয়াতে বলেন, হামাবি রহ. এর নিজ হাতের লেখা দেখেছি যে, (ফাতাওয়া) সিরাজিয়া থেকে নিম্নোক্ত কথাটি বর্ণনা করেছেন: ‘তৃতীয় ও চতুর্থবারে চুরি করলে যমিনে ফাসাদ করে বেড়ানোর অপরাধে সিয়াসতরূপে ইমামুল মুসলিমিন তাকে হত্যা করতে পারবেন’। হামাবি রহ. বলেন, সিয়াসতের দাবি তুলে আমাদের বর্তমান যামানায় প্রথমবারেই যে হত্যা করে দেয়া হচ্ছে তা অন্যায়-অবিচার, জুলুম ও অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়।” –

রদ্দুল মুহতার ৪/১০৩

অতএব, প্রথম বা দ্বিতীয়বারে হত্যা করা যাবে না। তৃতীয়-চতুর্থবারে জেলে ভরে রাখবে। তবে একান্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক হলে এবং তাকে হত্যা করে দেয়াই সমাজের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হলে হত্যা করতে পারবেন।

***

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৭

আট. কিসাস নেই এমন হত্যাকাণ্ড একাধিকবার ঘটালে

কেউ কাউকে হত্যা করলে তা দুই রকম হতে পারে:

এক. হত্যাকারী স্বীকার করেছে যে, হত্যার নিয়তেই আঘাত করেছিল।

এ ধরনের হত্যাকারীকে কিসাসরূপে হত্যা করা হবে, চাই

ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করুক বা লাঠি বা অন্য কোনো সাধারণ বস্তু দ্বারা হত্যা করুক।

দুই. হত্যাকারী হত্যার নিয়তে আঘাত করেছে বলে স্বীকার করছে না। বলছে, আঘাত দ্বারা হত্যা উদ্দেশ্য ছিল না, ঘটনাক্রমে মরে গেছে।

এ ধরনের হত্যাকারীর বিধান মতভেদপূর্ণ। আবু হানিফা রহ. এর মতে এ ধরনের হত্যাকারীর বিধান নির্ভর করে হত্যার সরঞ্জামের উপর। যদি অস্ত্র বা অস্ত্রজাতীয় জিনিস দ্বারা হত্যা করে থাকে, তাহলে কিসাসরূপে তাকেও হত্যা করা হবে। যেমন, তরবারি বা ছুরি দিয়ে হত্যা।

আর যদি বাঁশ-কাঠের লাঠি বা সাধারণ ছোটখাট জিনিস দিয়ে হত্যা করে থাকে, যেগুলো সাধারণত হত্যার জন্য ব্যবহার করা হয় না তাহলে কিসাস আসবে না, দিয়াত দিতে হবে। আর গুনাহ তো আছেই।

এই দ্বিতীয় প্রকারের হত্যা, যেখানে কিসাস আসে না, দিয়াত

আসে- যদি একাধিকবার ঘটায় তাহলে সে মুফসিদ ফিল আরদ। ধৃত হওয়ার পর এ ধরনের লোককেও হত্যা করে দেয়া হবে। প্রথমবার তাকে মাফ করা হয়েছিল এ ভেবে যে, হয়তো সে হত্যার ইচ্ছা করেনি। কেননা, সে যে ধরনের বস্তু দিয়ে আঘাত করেছিল, তা সাধারণত হত্যার জন্য ব্যবহার হয় না। কিন্তু বারবার হত্যাকাণ্ড ঘটানোর দ্বারা তার আসল চেহারা প্রকাশ পেয়েছে। এখন আর তাকে মাফ করা হবে না।

রাফিয়ি রহ. (১৩১২হি.) বলেন,

إذا أقر بقصد قتله بما ذكر يقتص منه عنده. اهـ

“ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে স্বীকার করলে আবু হানিফা রহ. এর মতেও তার থেকে কিসাস নেয়া হবে।” –তাকরিরাতুর রাফিয়ি (রদ্দুল মুহতারের সাথে মূদ্রিত, মাকতাবায়ে রশিদিয়া, কোয়েটা) ১০/১৬০, কিতাবুল জিনায়াত

হাসকাফি রহ. (১০৮৮হি.) বলেন,

لا القود لشبهه ... وموجبه الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة بالخطأ نظرا لآلته إلا أن يتكرر منه فللإمام قتله سياسة اختيار. اهـ

“এ ধরনের হত্যার ফলে (প্রথমত) গুনাহ হবে। (দ্বিতীয়ত) কাফফারা দিতে হবে। (তৃতীয়ত) আকিলাদের উপর দিয়াত বর্তাবে। তবে কিসাস আসবে না। কেননা, হত্যায় ব্যবহৃত বস্তুটির কারণে (হত্যার ইচ্ছা ছিল কি’না তা নিয়ে) কিছুটা সংশয় থেকে যায়। তবে যদি একাধিকবার ঘটায় তাহলে ইমামুল মুসলিমিন সিয়াসতরূপে তাকে হত্যা করে দিতে পারবেন। ‘আলইখতিয়ার’ কিতাবে এমনই বলা হয়েছে।” - আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের সাথে মুদ্রিত) ৬/৫৩০, কিতাবুল জিনায়াত

সামনে গিয়ে বলেন,

ولا تقبل توبته لو بعد مسكه كالساحر. اهـ

“ধরার পরে তাওবা করলেও মাফ করা হবে না, যেমন যাদুকরকে ধরার পরে মাফ করা হয় না।” –আদদুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারের সাথে মুদ্রিত) ৬/৫৪৪, কিতাবুল জিনায়াত

উল্লেখ্য: ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা যারা অহরহ খুন-খারাবি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা করে দেশব্যাপী ফাসাদ করে যাচ্ছে: এরা সকলেই মুফসিদ ফিল আরদ। এরা হত্যার

উপযুক্ত। যারা সরাসরি হত্যা করে তারাও, যারা সহযোগী তারাও। অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে না লাঠি দিয়ে তা দেখার বিষয় নয়। মুফসিদ ফিল আরদের বেলায় অস্ত্র-লাঠির ব্যবধান নেই।

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৮

দশ.

যে ব্যক্তি শাসকদের কাছে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ করে লোকজনকে হত্যা করায়

কতক ব্যক্তির অভ্যাস এমন যে, তারা জালেম শাসকদের দরবারে গিয়ে লোকজনের ব্যাপারে বানিয়ে চিনিয়ে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। এদের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে জালেম শাসকরা নিরপরাধ লোকজনকে হত্যা করে। এসব লোকও ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এরাও হত্যাযোগ্য। এদের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে আবেদিন রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

سئل شيخ الإسلام عن قتل الأعونة والظلمة والسعاة في أيام الفترة: قال يباح قتلهم؛ لأنهم ساعون في الأرض بالفساد، فقيل إنهم يمتنعون عن ذلك في أيام الفترة ويختفون. قال: ذلك امتناع

{ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه} [الأنعام: 28]- كما - ضرورة نشاهد. قال وسألنا الشيخ أبا شجاع عنه، فقال: يباح قتله ويثاب قاتله. اهـ.

“শাইখুল ইসলাম রহ.কে শাসকদের কাছে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপনকারীদেরকে এবং জালেমদেরকে বিরতিকালীন সময়ে (হত্যার) ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন, ‘তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। কেননা, তারা যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়।’ এর উপর প্রশ্ন করা হল- বিরতিকালীন সময়ে তো তারা তা থেকে বিরত থাকে এবং আত্মগোপনে থাকে? তিনি উত্তর দেন: ‘এ বিরত থাকা তো জরুরতের কারণে। যদি তাদের ফিরিয়ে দেয়া হত, তাহলে যা হতে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে তারা পুনর্বার তাতেই লিপ্ত হতো। [আনআম: ২৮] যেমনটা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তিনি বলেন, শায়খ আবু সুজা রহ.কে আমরা এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তর দেন: একে হত্যা করা বৈধ এবং তার হত্যাকরী সওয়াবের অধিকারী হবে।” -রদ্দুল মুহতার: ৪/৬৪

অন্যত্র বলেন,

وفي البزازية: أفتوا بأن قتل الأعونة والسعاة جائز في أيام الفتنة

ط ملخصا. اهـ

“তাহতাবি রহ. ফাতাওয়া বাযযাযিয়া থেকে বর্ণনা করেন, ফিতনার সময় জালেমদের সহযোগীদেরকে এবং যারা শাসকদের কাছে মিথ্যা অভিযোগ করে লোকজনকে হত্যা করায় মাশায়েখগণ তাদেরকে হত্যা করা জায়েয ফতোয়া দিয়েছেন।” –রদ্দুল মুহতার ৬/৫৬২

উল্লেখ্য, বিরতিকালীন সময় দ্বারা উদ্দেশ্য- ওয়াল্লাহু আ'লাম- যখন এসব লোক সুবিধা করতে না পেরে আত্মগোপনে থাকে। পরে যখন সুযোগ আসবে আবার ফাসাদ শুরু করবে।

আর ফিতনার সময় দ্বারা উদ্দেশ্য, যখন মুসলমানদের একক কোনো খলিফা না থাকে। ক্ষমতা নিয়ে নিজেরা মারামারি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয় তখন।

মোটকথা, এসব লোককে যখনই পাওয়া যাবে হত্যা করা যাবে। এরা মুফসিদ ফিল আরদ। এদের দ্বারা সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হচ্ছে। জনজীবন অতিষ্ট হয়ে পড়েছে।

যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে- ২৯

এগার. বাগি

একজন খলিফা থাকাবস্থায় বা আহলে হল ওয়াল আকদ একজনের হাতে বাইয়াত দিয়ে দেয়ার পর অন্য কেউ খলিফা দাবি করলে হাদিসে তাকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে। যেমন এক হাদিসে এসেছে,

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

“তোমরা এক ব্যক্তির (অর্থাৎ এক খলিফার) হাতে ঐক্যবদ্ধ থাকাবস্থায় যদি অন্য কোন ব্যক্তি তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে আসে বা জামাতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে আসে, তাহলে তাকে হত্যা করে দাও।” -মুসলিম: ৪৯০৪

অন্য হাদিসে এসেছে,

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما
“যদি দুই খলিফার বাইয়াত হয়, তাহলে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করে দাও।” -মুসলিম: ৪৯০৫

এ হত্যা তা’যির ও সিয়াসতরূপে। এ ধরনের ব্যক্তিকে হত্যা না করলে দলাদলি দেখা দেবে। ফিতনা, মারামারি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হবে। সমাজের সার্বজনীন শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে একজনকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

ومن لم يندفع فساده فى الأرض الا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين. اهـ

“হত্যা করা ব্যতীত যার ফাসাদ ও অনিষ্ট দমন হচ্ছে না তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। যেমন, ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজে যে (নিজেকে খলিফা দাবি করে) বিভেদ ঘটাতে চায়।” –মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/১০৮-১০৯

এরপর তিনি এর পক্ষে কুরআন সুন্নাহর দলীল তুলে ধরেন।

বাগিদের ব্যাপারে এখানে কথা বাড়াবো না। আল্লাহ তাআলার তাওফিক হলে এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র লেখার ইচ্ছা আছে।

শাতিমের ব্যাপারে হানাফি মাযহাবের সিদ্ধান্ত

‘শাতেমে রাসূল (ﷺ) এর হত্যা নিয়ে একটি সংশয় নিরসন’ - নামে এক ভাই ফোরামে একটা সুন্দর পোস্ট দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ভাইকে জাযায়ে খায়র দান করুন। তবে হানাফি মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে একটু অসঙ্গতি হয়ে গেছে। সেটা তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য।

হানাফি মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে ভাই লিখেছেন,

ইমাম আবু হানিফা (রহিঃ) এর মাযহাব:

আল্লামা খাইরুদ্দীন রামালী (রহিঃ) ফতোয়ায়ে বাযযাযিয়ায় লিখেছেন:

“রাসূলের কটূক্তিকারীদের সর্বাবস্থায় হত্যা করা জরুরী। তার

তওবা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। চাই সে গ্রেফতারের পরে তওবা করুক বা নিজ থেকেই তওবা করুক। কারণ এমন ব্যক্তির তওবার কোনো পরোয়াই করা যায় না এবং এই মাস’আলায় কোনো মুসলমানের মতভেদ কল্পনাও করা যায় না। এটিই ইমামে আযম আবু হানিফা (রহিঃ), আহলে কুফী ও ইমাম মালেক (রহিঃ) এর মাযহাব।” (তাম্বিহুল উলাতি ওয়াল হুক্কাম, পৃষ্ঠা ৩২৮)

আল্লামা শামী (রহিঃ) তাঁর ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ করেন:
“সকল উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, রাসূলের কটূক্তিকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব। ইমাম মালেক (রহিঃ), ইমাম আবুল লাইস (রহিঃ), ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহিঃ), ইমাম ইসহাক (রহিঃ), ইমাম শাফেঈ (রহিঃ), এমনকি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রহিঃ) সহ সকলের মতেই রাসূলের কটূক্তিকারীর তওবা কবুল করা হবে না।”

ফিকহে হানাফির অন্যতম বড় ফকীহ ইমাম ইবনে হুমাম (রহিঃ) বলেন:
“রাসূল (ﷺ) এর প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়। সুতরাং যে কটূক্তিকারী, সে তো আরো আগেই মুরতাদ হয়ে যাবে। আমাদের মতে, এমন ব্যক্তিকে হদ হিসেবে হত্যা করা জরুরী। তওবা গ্রহণ করে তার হত্যা মাফ করা যাবে না।” (ফাতহুল কাদীর, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭)

***

শাতিমের ব্যাপারে সাধারণত সবাই এটাই জানে যে, তার তাওবা কবুল হবে না। বিশেষত ইবনে তাইমিয়া রহ. **‘আসসারিমুল মাসলুল’** কিতাবে এ মতকেই তারজিহ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ ও দালিলিক আলোচনা করেছেন। মুজাহিদ ভাইরাও সাধারণত এটাই জানেন। হানাফি মাযহাবের কোনো কোনো ইমাম এটাই বলেছেন।

উপরোক্ত আর্টিক্যালে হানাফি মাযহাব হিসেবে ফতোয়ায়ে বাযযাযিয়া ও ইবনুল হুমাম রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু’জন এটাই মত দিয়েছেন। তবে বাস্তব কথা হলো, ভাই হানাফি মাযহাব বুঝতে এবং বর্ণনা করতে উভয়টাতেই ভুল করেছেন।

বুঝার ভুল

আসলে হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাবের রায় হলো, মুসলিম শাতিমের তাওবা কবুল হবে। মালিকি ও হাম্বলী মাযহাব হলো, কবুল হবে না। এ ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ সামনে কথা বলছি।

বর্ণনায় ভুল

ভাই এখানে হানাফি মাযহাব বর্ণনা করতে ফতোয়া বাযযাযিয়া, ইবনুল হুমাম রহ. ও আল্লামা শামি রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। এখানে ভাইয়ের কয়েকটা ভুল হয়েছে-

ক. মাযহাবের কয়েকজনের বক্তব্য মানেই এটা নয় যে, তাদের মতটাই মাযহাবের মুফতা বিহি কওল। আসলে বাযযাযি রহ. ও ইবনুল হুমাম রহ. যদিও মত দিয়েছেন, শাতিমের তাওবা কবুল হবে না, তবে এটা হানাফি মাযহাব নয়। হানাফি মাযহাব হলো, তাওবা কবুল হবে।

খ. ভাই বলেছেন, 'আল্লামা খাইরুদ্দীন রামালী (রহিঃ) ফতোয়ায়ে বাযযাযিয়ায় লিখেছেন'। আসলে ফাতাওয়া বাযযাযিয়ার প্রণেতা ইমাম 'মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন শিহাব আলকারদারি আলবাযযাযি (৮২৭ হি.); খাইরুদ্দীন রামালী নয়।

গ. আল্লামা শামির বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা সম্পূর্ণ বেমানান। কারণ, শামি নিজে রদ্দুল মুহতার এবং তার রিসালা 'তাম্বিহুল উলাত'-এ বাযযাযি ও ইবনুল হুমামের বক্তব্য খণ্ডন করে দেখিয়েছেন, এটা হানাফি মাযহাবের খেলাফ। হানাফি মাযহাবের রায় হলো, তাওবা কবুল হবে।
যখন শামি নিজে দুই কিতাবে এ মতটা খণ্ডন করেছেন, তখন

এ মতের পক্ষে শামির বক্তব্য উল্লেখ করা বেমানান।

আসলে যতটুকু বুঝতে পারছি, ভাই এখানে ‘তাওবা কবুল হবে না’ এ মতের পক্ষে যাদের বক্তব্য পেয়েছেন উল্লেখ করে দিয়েছেন। এটা সমস্যার কিছু ছিল না। কিন্তু মাযহাবের কয়েকজনের মতকে মাযহাব বলাটা ঠিক হয়নি। তাদের নিজেদের রায় হিসেবে উল্লেখ করাই সমীচিন।

তাওবা কবুল হওয়া না হওয়া দ্বারা কি অর্থ?

শাতিম যদি তাওবা করে মুসলমান হয় তাহলে আখেরাতে সে অবশ্যই মাফ পাবে। তবে দুনিয়াতে মাফ পাবে কি’না সেটাই হলো কথা। হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাবে মাফ পেয়ে যাবে। হত্যা করা হবে না। তাওবা কবুল হওয়া দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। আর মালিকি ও হাম্বলী মাযহাব মতে আখেরাতে মাফ পেলেও দুনিয়াতে মাফ পাবে না। হত্যা করে দেয়া হবে। তাওবা কবুল হবে না দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। যেমন, কেউ যিনা করে তাওবা করলে আখেরাতে মাফ পাবে, কিন্তু দুনিয়াতে শাস্তি মাফ হবে না। দোররা মারা হবে বা বিবাহিত হলে রজম করে হত্যা করা হবে। তাওবা কবুল না হওয়া দ্বারা দুনিয়াবি শাস্তি মাফ না হওয়া উদ্দেশ্য। নতুবা আখেরাতে যে মাফ পাবে সে ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই।

তাওবার পরও কোনো কোনো শাতিমকে সিয়াসতরূপে হত্যা করা যাবে

উল্লেখ্য শাতিম তাওবা করলে যে হত্যা করে হবে না বলা হয়েছে এর অর্থ- তার হত্যা তখন হদ থাকবে না। তবে হত্যার উপযোগী মনে হলে সিয়াসতরূপে হত্যা করা যাবে।

কোনো মুসলিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করলে সে মুরতাদ। যদি সে তাওবা না করে তাহলে তাকে কতল করা ফরয। এটা হদ। এটা মাফ হওয়ার কোনো সূরত নেই।

তাওবা করলে হানাফি মাযহাব মতে আর হদ থাকবে না। তবে যদি সে ভয়ানক প্রকৃতির খবিস শাতিম হয়, বার বার কটুক্তি করে আর তাওবা করে, তাহলে তাওবা করার পরও হানাফি মাযহাব মতে তাকে হত্যা করা যাবে। তবে তা হদ হিসেবে নয়, তা'যির ও সিয়াসত হিসেবে। অর্থাৎ তাকে হত্যা করতে হবেই- এমন নয়। তবে ভয়ানক খবিস হলে এবং হত্যা করা মুনাসিব মনে হলে মুসলমান হলেও হত্যা করা যাবে।

অতএব, তাওবা করলে কোনো অবস্থায়ই হত্যা করা যাবে না, তা নয়। যদি সে মুফসিদ ফিল আরদ-এর পর্যায়ে চলে যায় তাহলে অন্য দশটা মুফসিদের মতো তাকেও হত্যা করা যাবে।

হ্যাঁ, যদি আসলেই তাওবা করে নেয় এবং ভাল মানুষ হয়ে যায় তাহলে তাওবার পর হত্যা করা যাবে না। মালিকি ও হাম্বলী মাযহাব মতে তখনও হত্যা করতে হবে। তাদের মতে তাওবার পরও হত্যাটা হদ হিসেবে থেকে যায়; যেমনটা যিনার শাস্তির বেলায় বিধান।

হদ দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

উল্লেখ্য, হদ দ্বারা এখানে এটাই উদ্দেশ্য যে, তাওবা করলেও কতল মাফ হবে না, যেমন যিনার শাস্তি মাফ হয় না। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, ইমাম ছাড়া কেউ হত্যা করতে পারবে না, যেমনটা কতক লোক ফিতনা ছাড়ায়। নতুবা যেখানে শাতিমের শাস্তি আলোচিত হয়েছে, সেখানে আশেপাশেই কথাটা আছে যে, জনগণও তাকে হত্যা করতে পারবে। কিন্তু যাদের চোখ অন্ধ তারা ভিন্নরূপ দেখে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

সারকথা

মালিকি ও হাম্বলী মাযহাব মতে শাতিমের হত্যা তাওবা করার আগে ও পরে সর্বাবস্থায় হদ। বিধায় শাতিম তাওবা করলেও মাফ পাবে না, সর্বাবস্থায় হত্যা করতে হবে।

আর হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাব মতে তাওবার আগ পর্যন্ত

হদ। তাওবার পর হদ নয়। অর্থাৎ তাওবা করলে মাফ পেয়ে যাবে। হত্যা করা আবশ্যক নয়। তবে কোনো শাতিম ভয়ানক খবিস হলে এবং তাওবা করাটাকে একটা পলিসিরূপে গ্রহণ করেছে বুঝা গেলে, তাওবা করার পরও হানাফি মাযহাব মতে হত্যা করা যাবে। এ হত্যা হদ হিসেবে নয়, মুফসিদ ফিল আরদ হিসেবে। তা'যির ও সিয়াসতরূপে।

বি.দ্র.

উপরোক্ত বিধান মুসলিম শাতিমের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ যে লোক মুসলিম ছিল, পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করে মুরতাদ হয়ে গেছে। যদি কোনো যিম্মি বা হারবি কাফের রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করে, তাহলে তার বিধান কিছুটা অন্য রকম। সেদিকে যাচ্ছি না। তবে এতটুকু কথা সর্বসম্মত যে, তাওবা করে মুসলমান না হলে হত্যা করে দেয়া যাবে।

***

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 135-136)

وأفاد بإطلاقه أنه لا فرق بين ردة وردة من أنه إذا أسلم ويستثنى

منه مسائل؛ الأولى: الردة بسبه - صلى الله عليه وسلم - قال في فتح القدير كل من أبغض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقلبه كان مرتدا فالساب بطريق أولى ثم يقتل حدا عندنا فلا تقبل توبته في إسقاطه القتل قالوا هذا مذهب أهل الكوفة ومالك ونقل عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ولا فرق بين أن يجيء تائبا من

... نفسه أو شهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات

وعلله البزازي بأنه حق تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين وكحد القذف لا يزول بالتوبة وصرح بأن سب واحد من الأنبياء كذلك وقوله في فتح القدير في إسقاط القتل يفيد أن توبته مقبولة عند الله تعالى وهو مصرح به. اهـ

تعقبه ابن عابدين، فقال تحته في منحة الخالق (5\135-136):

(قوله قال في فتح القدير كل من أبغض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلخ) قال تلميذ المؤلف في منح الغفار بعد نقله ذلك وجعله إياه متنا ما نصه: وبمثله صرح الإمام البزازي وبهذا جزم شيخنا في فوائده لكن سمعت من مولانا شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحب الفتح تبع البزازي في ذلك وأن البزازي تبع صاحب الصارم المسلول فإنه عزا في البزازية ما نقله من ذلك إليه ولم يعزه إلى أحد من علماء الحنفية اهـ.

وقد نقل ابن أفلاطون زاده في كتابه المسمى بمعين الحكام أنها ردة حيث قال معزيا إلى شرح الطحاوي ما صورته من سب النبي - عليه الصلاة والسلام - أو بغضه كان ذلك منه ردة وحكمه حكم المرتدين اهـ.

وفي النتف من سب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد اهـ.

فقوله ويفعل به ما يفعل بالمرتد ظاهر في قبول توبته كما لا

يخفى. وممن نقل أنها ردة عن أبي حنيفة القاضي عياض في كتابه
قال أبو بكر بن المنذر - رحمه :المسمى بالشفاء ونص عبارته
الله تعالى - أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي - صلى
الله تعالى عليه وسلم - يقتل وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث
.- وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي - رحمه الله
قال القاضي أبو الفضل وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق -
ولا تقبل توبته عند هؤلاء وبمثله قال أبو - رضي الله تعالى عنه
حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم،
لكنهم قالوا هي ردة وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك - رحمه
- الله - وحكى الطبري مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن ينقصه
صلى الله تعالى عليه وسلم - أو برئ منه أو كذبه اهـ. إلى هنا
.كلام صاحب المنح
لكن قال بعدما يأتي عن الجوهرة في ساب الشيخين أقول: يقوى
القول بعدم قبول توبة من سب صاحب الشرع الشريف - صلى
الله تعالى عليه وسلم - وهو الذي ينبغي أن يعول عليه في الإفتاء
والقضاء رعاية لحضرة صاحب الرسالة المخصوص بكمال
.الفضل والبسالة اهـ
وفيه كلام تعرفه وقد حررت المسألة في تنقيح الحامدية فراجعها.
ثم جمعت في ذلك كتابا سميته (تنبيه الولاة والحكام على أحكام
شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة
لكنهم قالوا هي ردة إلخ :والسلام)، وبينت فيه أن قول الشفاء
يقتل ولا " :صريح في قبول توبته لأنه استدراك على قوله قبله
تقبل توبته عند هؤلاء" فعلم أن قوله: "وبمثله قال أبو حنيفة" أي
قال أنه يقتل لكن قالوا أنه ردة، فحاصله أنه يقتل إن لم يتب كما

.هو حكم الردة وإلا لم يكن للاستدراك المذكور فائدة
وممن صرح بقبول توبته عندنا الإمام السبكي في (السيف المسلول) وقال إنه لم يجد للحنفية إلا قبول التوبة. وسبقه إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن أمية الحنبلي في كتابه (الصارم المسلول) فصرح فيه في عدة مواضع بقبول التوبة عند الحنفية وأنه لا يقتل. اهـ

شرح السير الكبير (ص: 1938)

قال - رحمه الله تعالى -: المرتد يقتل إن لم يسلم حرا .- 3881 كان أو عبدا، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» .
وهو يعم الأحرار والعبيد، ولمولى العبد أن يقتله بنفسه إن شاء، فعل ذلك ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - بعبد له تنصر، ولأنه بالردة صار كالحربي في حكم القتل، ولكل مسلم قتل الحربي الذي لا أمان له، إلا أن الأفضل له أن يرفعه إلى الإمام ليكون هو الذي يقتله؛ لأن فيه معنى الحد. واستيفاء الحدود إلى الإمام. اهـ

من رسالة (تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام) لابن عابدين رحمه الله تعالى في ضمن (رسائل ابن عابدين، ج1)

:قال فى الشاتم المسلم
نعم لو قيل إذ تكرر السب من هذا الشقي الخبيث بحيث أنه كلما أخذ تاب يقتل، وكذا لو ظهر أن ذلك معتاده وتجاهر به كان ذلك

قولا وجيها كما ذكروا مثله في الذمي ويكون حينئذ بمنزلة الزنديق. وأما بدون ذلك فلا يجوز الإفتاء بقتله بعد إسلامه حدا أو تعزيرا. اهـ ص335

الزنديق الذي يقتل ولا تقبل توبته هو المعروف بالزندقة الداعي إليها، وهذا ليس كذلك وإنما كان معروفا بالاسلام ولا يدعو احدا إلى أن يفعل كفعله الشنيع بل الغالب أنه إنما تصدر منه كلمة السب عند شدة غيظة ونكايته ممن خاصمه في أمر ونحو ذلك. نعم لو كان معروفا بهذا الفعل الفظيع داعيا إلى اعتقاده الشنيع فلا شك حينئذ ولا ارتياب في زندقته وقتله وإن تاب. اهـ ص341

أما إذا علم منه حسن التوبة والإيمان وأن ما صدر منه إنما كان من هفوات اللسان فالأولى تعزيره بما دون القتل جريا على مذهبنا الثابت بالنقل. بل ادعى الإمام السبكي أن عدم قتله حينئذ محل وفاق حيث قال: وأرى أن مالكا وغيره من أئمة الدين لا يقولون بذلك أي عدم قبول التوبة إلا في محل التهمة فهو محمل قول مالك ومن وافقه اهـ. ص348

قال فى الشاتم الكافر:

الساب إذا كان كافرا لا يقتل عندنا إلا إذا رآه الإمام سياسة. اهـ ص320

-قال-بعد ما ذكر قصة قتل عصماء اليهودية

لا يقال كيف قتلت مع أن النساء لا يقتلن للكفر عندنا لأنا نقول إنما قتلت لسعيها في الأرض بالفساد لأنها كانت تهجو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتؤذيه وتحرض الكفار عليه وقد صرحوا بان الساحر يقتل ولو امرأة. ولا شك أن ضرر هذه اشد من الساحر والزنديق وقاطع الطريق. فمن اعلن بشتمه صلى الله تعالى عليه وسلم مثل هذه يقتل. اهـ ص355

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين المسلم حيث جزمت بأن مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن الساب المسلم إذا تاب وأسلم لا يقتل؟ قلت: المسلم ظاهر حاله أن السب إنما صدر منه عن غيظ وحمق وسبق لسان لا عن إعتقاد جازم، فإذا تاب وأناب وأسلم قبلنا إسلامه. بخلاف الكافر فإن ظاهر حاله يدل على إعتقاد ما يقول وأنه أراد الطعن في الدين، ولذلك قلنا فيما مر أن المسلم أيضا إذا تكرر منه ذلك وصار معروفا بهذا الإعتقاد داعيا إليه يقتل ولا تقبل توبته وإسلامه كالزنديق فلا فرق حينئذ بين المسلم والذمي. اهـ 355

-قال –بعد ما ذكر نقولا في قتل الزنديق

والمقصود من نقله بيان عدم قبول توبة من وقفنا على خبث باطنه وخشية ضرره وإضلاله فلا نقبل اسلامه وتوبته وإن كان يظهر الاسلام، فكيف بمن كان كافرا خبيث الاعتقاد وتجاهر بالشتم والالحاد. ثم لما رأى الحسام بادر إلى الاسلام فلا ينبغي لمسلم التوقف في قتله وإن تاب. لكن بشرط تكرر ذلك منه وتجاهره به كما علمته مما نقلنا عن الحافظ ابن تيمية عن أكثر الحنفية ومما .ننقلناه عن المفتي أبي السعود

فإن قلت: قال ابن المؤيد في فتاواه: كل من سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو أبغضه كان مرتدا وأما ذوو العهود من الكفار إذا فعلوا ذلك لم يخرجوا من عهودهم وأمروا أن لايعودوا، فإن عادوا عزروا ولم يقتلوا كذا في شرح الطحاوي اهـ. فهذا مخالف لما مر من القتل سياسة. قلت: قد يجاب بحمل هذا على ما إذا عثر عليهم وهم يكتمونه ولم يتجاهروا به أو يراد بقوله ولم يقتلوا أي حدا لزوما بل سياسة مفوضة إلى رأي الإمام يفعلها حيث رأى بها المصلحة. اهـ ص356

শাতিমের ব্যাপারে হানাফি মাযহাবের সিদ্ধান্ত ০২

গত পর্বে এ ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা করেছিলাম। আজ আরও একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ।

মুসলিম কখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিতে পারে না

একজন মুসলিম তখনই মুসলিম হতে পারে, যখন আল্লাহ ও রাসূলের মুহাব্বাত ও তা'জিম তার অন্তরে এ পরিমাণ হবে যে, আল্লাহ ও রাসূলকে নিয়ে সমালোচনা করার মতো দুঃসাহস তার হবে না। এতটুকু মুহাব্বাত ও তা'জিম না থাকলে কেউ মুসলিম হতে পারে না।

ইবনে আবিদিন রহ. (১২৫২ হি.) বলেন,

وقد حقق في المسايرة أنه لا بد في حقيقة الإيمان من عدم ما يدل على الاستخفاف من قول أو فعل. –رد المحتار: 6\355

(মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহ. তাঁর) ‘আল-মুসায়ারাহ্’ কিতাবে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য

অবমাননা বুঝায় মতো কোনো কথা বা কাজ না পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যক। -ফাতাওয়া শামী: ৬/৩৫৫

আরও বলেন,

ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر ... : قال في المسايرة الحنفية بألفاظ كثيرة ، وأفعال تصدر من المنتهكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين. -رد المحتار: 6\356

‘আল-মুসায়ারাহ্’ কিতাবে (ইবনুল হুমাম রহ.) বলেন, ... তা’জীম; যেটি অবমাননার বিপরীত, ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য এটি শর্ত করার কারণে হানাফিরা তা’জীম বিনষ্টকারীদের থেকে প্রকাশিত অনেক কথা ও কাজের দ্বারা তাকফির করে থাকেন। কেননা, সেগুলো দ্বীনের অবমাননা বুঝায়। -ফাতাওয়া শামী: ৬/৩৫৬

যখন ঈমান সহীহ হওয়ার জন্য এ পরিমাণ তা’জিম শর্ত, তখন কোনো ব্যক্তি মুসলিম হয়ে থাকলে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করতে পারে না।

মুসলিম থেকে কখন অবমাননাকর কিছু প্রকাশ পেতে পারে?

হাঁ,

ক. কারো কারো ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় ঝগড়া বিবাদের

হালতে ভারসাম্য ঠিক থাকে না। অনেকটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখ দিয়ে অনাকাঙ্খিত কথা বেরিয়ে আসে। এ ধরনের ক্ষেত্রে কোনো মুসলিম থেকে অবমাননাকর কিছু প্রকাশ পেয়ে যাওয়া সম্ভব। অবশ্য এটাও তার ঈমানের দুর্বলতারই পরিচায়ক।

খ. তদ্রূপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৌতুক করতে করতে কথাচ্ছলে এমন কিছু চলে আসে।

রাগেই হোক আর কথাচ্ছলেই হোক, এ ধরনের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননাকর কোনো কথা এসে যাওয়ার পর মুসলিম আসমান থেকে পড়ে। মনে হয় যেন কেয়ামত ঘটে গেছে। এ সে কি করলো!? কাঁদতে থাকে। পেরেশান হয়ে উলামাদের কাছে দৌঁড়তে থাকে, হুজুর এখন আমার কি হবে?

এ ধরনের শাতিমের তাওবা কবুল করার কথা বলা হয়েছে

হানাফি মাযহাবে এ ধরনের শাতিমের তাওবা কবুল হবে বলা হয়েছে। যেহেতু অবমাননা আর ঈমান এক সাথে হতে পারে না, তাই তার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। সে মুরতাদ হয়ে গেছে। নতুন করে ঈমান আনতে হবে। ঈমান নিয়ে আসলে আর

হত্যা করা হবে না।

পক্ষান্তরে অবমাননা যদি মিশন হয়

পক্ষান্তরে শাতিম যদি এমন যে, রাসূলের প্রতি তার মোটেই বিশ্বাস নেই। উপরে উপরে নিজেকে মুসলিম দাবি করতো আর ভিতরে ভিতরে রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করতো। রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করে সে মজা পেত। অন্যকেও এ কুফরির প্রতি দাওয়াত দিতো। অনেক সময় গোপনে অনেক সময় প্রকাশ্যে। পরে মুসলিমদের সামনে তার আসল চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তার তাওবা কি কবুল হবে বলা হয়েছে?

এটি বুঝতে হলে আপনাকে সামনের মাসআলাটি বুঝতে হবে-

শাতিম যদি যিম্মি হয়

কোনো যিম্মি যদি রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করে, তাহলে কি বিধান?

স্পষ্ট যে, যিম্মি রাসূলের উপর ঈমান রাখে না। সে আল্লাহ ও রাসূলের দুশমন। সে যদি কটুক্তি করে, তাহলে তার কটুক্তি ঐ মুসলিমের মতো নয়, যে কথাচ্ছলে বা ঝগড়া বিবাদে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কোনো কিছু বলে ফেলেছিল। বরং স্পষ্ট এটাই যে, সে রাসূলের প্রতি দুশমনিবশত কটুক্তি করেছে। বিশেষত দারুল

ইসলামে মুসলিমদের তরবারি যখন সর্বদা তার মাথার উপর ঝুলন্ত, এতদসত্বেও সে কটুক্তি করেছে। বুঝা গেল, সে রাসূলের এমনই কট্টর দুশমন যে, তরবারি ঝুলন্ত বুঝেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি।

অতএব, তার হুকুম যিন্দিকের হুকুমে। ধরার পর তাওবা করলেও মাফ হবে না। তাওবা করে মুসলিম হয়ে গেলেও হত্যা করা হবে। কারণ, তার হালত সাক্ষ দেয় যে, সে আসলে মন থেকে ঈমান আনেনি। শুধু হত্যা থেকে বাঁচতে ঈমান আনার দাবি করছে।

হাঁ, যদি আসলেই মন থেকে ঈমান এনে থাকে, তাহলে আখেরাতে মাফ পেয়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়াতে মুহাম্মাদি তরবারি তার গর্দান উড়াবেই।

কাযি শায়খি যাদাহ রহ. (১০৭৮ হি.) বলেন,

أما إذا أعلن بشتمه أو اعتاد فالحق أنه يقتل لأن المرأة التي كانت تعلن بشتمه – عليه الصلاة والسلام – قتلت وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبه يفتى اليوم. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 677)

যিম্মি যদি প্রকাশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (এক বার) গালি দেয়, কিংবা (জানা যায় যে, গোপনে গোপনে সে) রাসূলকে অনেক সময়ই গালি দিয়ে থাকে, তাহলে হত্যা

করে দেয়া হবে। কারণ, প্রকাশ্যে যে মহিলাটি রাসূলকে গালি দিয়েছিল তাকে হত্যা করে দেয়া হয়েছিল। বাকি তিন ইমামের মাযহাবও এটিই। বর্তমানে এর উপরই ফতোয়া। -মাজমাউল আনহুর: ১/৬৭৭

ইবনে আবিদিন রহ. বলেন,

ورأيت في كتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي ما نصه: ... أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا يقتل سياسة، وهذا متوجه على أصولهم. اهـ فقد أفاد أنه يجوز عندنا قتله إذا تكرر منه ذلك وأظهره وقوله وإن أسلم بعد أخذه لم أر من صرح به عندنا لكنه نقله عن مذهبنا وهو ثبت فيقبل. –رد المحتار: 4\214-215

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কিতাব 'আসসারিমুল মাসলুল' –এ দেখেছি তিনি বলেছেন, '(আমাদের যামানার) অধিকাংশ হানাফি ইমাম ফতোয়া দিয়েছেন, কোনো যিম্মি (গোপনে গোপনে) বার বার রাসূলকে গালি দেয় জানা গেলে, ধরার পর তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলেও তাকে হত্যা করে দেয়া হবে। হানাফি ইমামগণ বলেন, এ হত্যা হলো সিয়াসতরূপে (হদরূপে নয়)। হানাফিদের উসূল অনুযায়ী মাসআলাটি এমন হওয়া যথার্থ'।

(ইবনে আবিদিন রহ. বলেন,) ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, যিম্মি যদি একাধিকবার (গোপনে গোপনে)

গালি দেয়, কিংবা প্রকাশ্যে (একবার) গালি দেয়, আমাদের হানাফি মাযহাব মতে তাকে হত্যা করা জায়েয।

অবশ্য তিনি যে বলেছেন, ‘ধরার পর মুসলমান হয়ে গেলেও হত্যা করা হবে’ –আমাদের কোনো ইমাম পরিষ্কার এমন বলেছেন দেখিনি। তবে তিনি আমাদের মাযহাব থেকেই কথাটি বর্ণনা করেছেন। আর তিনি নির্ভরযোগ্য মানুষ। তার কথা গ্রহণযোগ্য। -রদ্দুল মুহতার: ৪/২১৪-২১৫

বুঝা গেল, যিম্মি যদি প্রকাশ্যে একবারও রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করে, তাহলে ধরার পর হত্যা করে দেয়া হবে। এমনকি তাওবা করে মুসলিম হয়ে গেলেও হত্যা করা হবে। কারণ, সে মুফসিদ ফিল আরদ। সে রাসূলের উপর আঘাত করে গোটা দ্বীনকেই বরবাদ করে দিতে চাইছে। যে উম্মাহর নবীকে নিয়ে সমালোচনা হয়, সে উম্মাহর ইজ্জত সম্মান আর কি বাকি আছে, যা দেখে মানুষ এ দ্বীনকে সঠিক ভাবতে পারে?!

তবে বেশকম এতটুকু, অন্যরা বলেছেন এ হত্যা হদরূপে, আর হানাফিরা বলেছেন, এ হত্যা তা’যির ও সিয়াসতরূপে। এর ফলাফল দাঁড়াবে, কোনো যিম্মি যদি আসলেই খালেস দিলে তাওবা করে পূর্ণ ইয়াকিনের সাথে সত্য বুঝে দ্বীন কবুল

করেছে বুঝা যায়, তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়ারও অবকাশ আছে। কিন্তু যারা বলেন হদ, তাদের মতে ছেড়ে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

এবার আমাদের আগের মাসআলায় ফিরে যাই,

অবমাননা যদি মিশন হয়: অভিজিত-ওয়াশিকদের মতো ব্লগারদের বিধান

আমরা দেখেছি, মুসলিম ব্যক্তি; যে রাসূলের মুহাব্বাত ও তা'জিম রাখে, তবে ঘটনাবশত হঠাৎ তার মুখ থেকে অবমাননাকর কিছু বেরিয়ে গেছে, সে তাওবা করলে হত্যা করা হবে না।

পক্ষান্তরে যিম্মি যদি একবারও প্রকাশ্যে কটুক্তি করে, তাহলে হত্যা করে দেয়া হবে।

এ দুয়ের ব্যবধান এখানে যে, একজন রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখে, কোনো দুশমনি রাখে না। অপরজন রাসূলের প্রকাশ্য দুশমন। দুশমনি থেকেই সে কটুক্তি করেছে। সে মুফসিদ ফিল আরদ। তাওবা করে মুসলিম হলেও তাকে হত্যা করা হবে।

এ থেকে অভিজিত-ওয়াশিকদের মতো ব্লগারদের হুকুম বের হবে। এরা আসলে গোড়া থেকেই রাসূলের উপর ঈমান রাখে

না। মুসলিম ঘরে ওয়াশিকদের জন্ম হলেও আসলে তারা বে-ঈমান।

শুধু তাই নয়, মুহাম্মাদে আরাবির কট্টর দুশমন। তারা নিজেরা দুশমনি-অবমাননা করেই ক্ষান্ত থাকেনি, ব্লগ খুলে গোটা দেশবাসীকে এজঘন্য কুফরের দাওয়াত দিয়েছে। এরা সে যিম্মি শাতিম থেকেও হাজারো গুণ কট্টর দুশমন। এদের দ্বারা দ্বীনে ইসলাম ও উম্মাতে মুহাম্মাদির ক্ষতি সে যিম্মির চেয়েও লাখো কোটি গুণ বেশি। যখন যিম্মি প্রকাশ্যে কটুক্তি করলে সে মুসলিম হয়ে গেলেও ছাড় নেই, তখন কি আপনি মনে করেছেন ওয়াশিকদের ছেড়ে দেয়া হবে?

তারা তো আগে থেকেই ইসলামের দাবিদার। কিন্তু তাদের দাবি কাদিয়ানিদের দাবির মতো। আর রাসূল অবমাননা করে কুফরের মাত্রা হাজারো গুণ বৃদ্ধি করেছে। এদের কিছুতেই ছাড় দেয়া হবে না।

ইবনে আবিদিন রহ. বলেন,

نعم لو قيل إذ تكرر السب من هذا الشقي الخبيث بحيث أنه كلما أخذ تاب يقتل، وكذا لو ظهر أن ذلك معتاده وتجاهر به كان ذلك قولا وجيها كما ذكروا مثله في الذمي ويكون حينئذ بمنزلة الزنديق. اهـ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام ، ج1، ص335

(মুসলিম নামধারী) এ হতাভাগা খবিস যদি বার বার রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করে, যখনই ধরা হয় তাওবা করে ফেলে; তদ্রূপ যদি জানা যায় যে, সে (গোপনে গোপনে) প্রায়ই অবমাননা করে থাকে এবং (এখন) প্রকাশ্যেও করেছে, তাহলে যদি বলা হয় যে, তাওবার পরও তাকে হত্যা করা হবে- তাহলে একে যথার্থ বলা যায়। যেমনটা আইম্মায়ে কেরাম যিম্মির ক্ষেত্রে বলেছেন। এমন ক্ষেত্রে তার বিধান যিন্দিকের মতো হবে। -রাসায়িলে ইবনে আবিদিন: ১/৩৩৫, রিসালা: তাম্বিহুল উলাত

আরও বলেন,

فإن قلت: ما الفرق بينه وبين المسلم حيث جزمت بأن مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن الساب المسلم إذا تاب وأسلم لا يقتل؟ قلت: المسلم ظاهر حاله أن السب إنما صدر منه عن غيظ وحمق وسبق لسان لا عن إعتقاد جازم، فإذا تاب وأناب وأسلم قبلنا إسلامه.
بخلاف الكافر فإن ظاهر حاله يدل على إعتقاد ما يقول وأنه أراد الطعن في الدين، ولذلك قلنا فيما مر أن المسلم أيضا إذا تكرر منه ذلك وصار معروفا بهذا الإعتقاد داعيا إليه يقتل ولا تقبل توبته وإسلامه كالزنديق فلا فرق حينئذ بين المسلم والذمي. اهـ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام ، ج1، ص355

যদি আপত্তি করা হয় যে, যিম্মি ও মুসলিমের মধ্যে কি ব্যবধান আছে যে কারণে আপনি দৃঢ়তার সাথে বলছেন, আবু হানিফা ও তার অনুসারিদের মাযহাব হলো, মুসলিম শাতিম তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে করা হবে না (পক্ষান্তরে যিম্মি মুসলমান হলেও মাফ পাবে না)?

উত্তরে বলবো, মুসলিমের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এটাই যে, তার থেকে কটুক্তি প্রকাশ পেয়েছে রাগের হালতে এবং মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। এটা তার আকিদা ও বিশ্বাস নয়। যখন সে তাওবা করবে, নত হয়ে রুজু করবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে, তার ইসলাম আমরা কবুল করবো।

পক্ষান্তরে কাফেরের বিষয়টা ব্যতিক্রম। তার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক এটাই যে, সে বদ আকিদার কারণেই এ কটুক্তি করেছে এবং এর দ্বারা দ্বীনে ইসলামের গোড়ায় আঘাত করা তার উদ্দেশ্য (কাজেই সে তরবারির মুখে ঈমান এনেছে দাবি করলে আমরা তাকে বিশ্বাস করতে পারি না)।

এ কারণে আমরা আগে বলে এসেছে, মুসলিমও যদি বার বার এ কাজ করে, এ কাজে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এর দাওয়াত দেয়, তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে। তার তাওবা ও ইসলাম কবুল করা হবে না, যেমনটা যিন্দিকের বেলায়।

অতএব, এ হিসেবে মুসলিম ও যিম্মি শাতিমের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকছে না। -রাসায়িলে ইবনে আবিদিন: ১/৩৫৫, রিসালা: তাম্বিহুল উলাত

অর্থাৎ মুফসিদ ফিল আরদ পর্যায়ে চলে গেলে উভয়কেই হত্যা করা হবে।

হাঁ, কোনো শাতিম যদি ভুল বুঝতে পেরে নিজে থেকেই স্বেচ্ছায় তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং মুহাম্মাদে আরাবির সানা সিফাত ও প্রশংসা এ পরিমাণ গাইতে থাকে, যা থেকে অনুমান হয় যে, সে আসলে ভুল বুঝেছে, তাহলে তাকে হত্যা করে হবে না। কিন্তু যতক্ষণ নিজে থেকে তাওবা করছে না, ততক্ষণ তার কোনো ছাড় নেই।

ধরার পরের মাসআলা দারুল ইসলামে

উল্লেখ্য, বার বার যে বলা হচ্ছে: ধরা পড়ার পরে, ধরা পড়ার পরে- এ মাসআলা মূলত দারুল ইসলামে। ধরার পর কাযির দরবারে উপস্থিত করে বিচার করা সম্ভব।

কিন্তু আমাদের হালত এমন নয়। ধরে বিচার করার শক্তি আমাদের নেই। এখনকার যত শাতিমকে হত্যা করা হচ্ছে, এগুলো মূলত ধরার পড়ার আগের মাসআলা। সে অবমাননার পর দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুসলিম সিংহরা সুযোগ পেয়ে হত্যা করে দিচ্ছে। এখানে ধরা পড়ার কোনো মাসআলা নেই।

এখানে মাসআলা সে প্রথমটাই যে, সে শাতিম। তাওবাও

করেনি। এসব শাতিম তো মুফসিদ ফিল আরদ হওয়ার কারণে দারুল ইসলাম থাকলে ধরা পড়ার পর তাওবা করে মুসলিম হয়ে গেছে দাবি করলেও মাফ পেতো না।

এ হিসেবে এখনকার মুসলিম নামধারী এসব অ্যাকটিভ শাতিম দুই দিক থেকে হত্যার উপযুক্ত-

ক. তারা মুরতাদ হয়ে গেছে কিন্তু তাওবা করছে না।

খ. তারা মুফসিদ ফিল আরদ।

***

সারমর্ম

পূর্বপ্রস্তুতি না থাকায় কথাগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। একটু সারমর্ম টানার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ।

শাতিম যদি যিম্মি হয়

শাতিম যদি যিম্মি হয়, ঘটনাবশত রাগের হালতে কোনো একবার গোপনে কোনো কটু কথা বলে ফেলে, দেখে ফেলার পর সে থতমত খেয়ে যায় এবং লজ্জিত হয়ে স্বীকার করে যে, আর কখনও এমন কাজ করবে না- তাহলে হানাফি মাযহাব

মতে তাকে হত্যা করা হবে না। অন্য শাস্তি দেয়া হবে।

পক্ষান্তরে যদি প্রকাশ্যে কোনো একবারও কটুক্তি করে, কিংবা জানা যায় যে, সে গোপনে গোপনে প্রায়ই এ কাজ করে, তাহলে ধরার পর সিয়াসতরূপে হত্যা করা হবে। এমনকি ধরার পর তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলেও যদি ইমামুল মুসলিমিন মনে করেন যে, সে আসলে তাওবা করেনি, তরবারির মুখে জীবন বাঁচানোর জন্য শুধু ঈমানের দাবি করছে, ছেড়ে দিলে আগের মতোই এ কাজ সে আবার করবে এবং ফিতনা সৃষ্টি করবে, তাহলে তাকে হত্যা করে দেবে। মুসলমান হলেও মাফ পাবে না।

শাতিম যদি মুসলিম হয়

শাতিম যদি মুসলিম হয়, রাগের হালতে বা কথায় কথায় মুখ ফসকে কোনো অবমাননাকর কথা বেড়িয়ে যায়, তাহলে তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে ছেড়ে দেয়া হবে, হত্যা করা হবে না। তাওবা না করলে হত্যা করে দিতে হবে।

পক্ষান্তরে যদি অবমাননা তার মিশন হয়, যখনই সুযোগ পায় গোপনে প্রকাশ্যে সে এ কাজ করে, এ কাজে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে তাওবা না করলে তো হত্যা করা হবেই, এমনকি তাওবা করে মুসলমান হলেও হত্যা করা হবে। তার ইসলাম

দুনিয়াতে কোনো কাজে আসবে না। ওয়াশিকের মতো ব্লগাররা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। হ্যাঁ, প্রকৃত অর্থেই মুখলিস হয়ে থাকলে আখেরাতে মাফ পাবে।

শাতিম যদি হারবি হয়

হারবিকে তো এমনিতেই হত্যা করা জায়েয। শাতিম হলে তো এর আগেই জায়েয। অতএব, কোনো হারবি কাফের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করার পর যদি তাওবা করে মুসলিম না হয়, তাহলে তার জান মাল হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন রইল যদি তাওবা করে মুসলিম হয়ে যায় তাহলে কি বিধান?

যদি সাধারণ কাফের হয় আর অবমাননাকে মিশন না বানায়, মুফসিদ ফিল আরদের পর্যায়ে না পৌঁছে, তাহলে মুসলমান হলে মাফ পেয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বিশেষত যখন হাদিসে এসেছে, মুসলমান হলে পূর্বেকার সকল অপরাধ মাফ হয়ে যায়।

আর যদি মুফসিদ ফির আরদ হয়, অবমাননা তার মিশন হয় (যেমন ব্লগ খোলে), তাহলে তাওবা করলে মাফ পাবে কি'না? এ বিষয়টা আমি পরিষ্কার দেখিনি।

মুসলিম ও যিম্মির ক্ষেত্রে দেখেছি, মুফসিদ ফিল আরদ হলে তাওবা করে মুসলমান হলেও মাফ পাবে না। এ হিসেবে কি একথা বলা যায়, হারবি কাফেরও মুফসিদ ফিল আরদে পৌঁছার পর তাওবা করে মুসলমান হলেও মাফ পাবে না?

কিন্তু যিম্মি ও মুসলিমের সাথে হারবির একটা ব্যবধান আছে। সেটা হলো, মুসলিম তো ঈমানের দাবিদার। সে রাসূলের সমালোচনার বিশ্বাস রাখে না দাবি করে। এতদসত্ত্বেও যখন তার থেকে বার বার অবমাননা প্রকাশ পাচ্ছে, তখন আমরা তাকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না।

এমননিভাবে যিম্মি দারুল ইসলামে মুসলিমদের তরবারির নিচে থাকে। তাকে তো যিম্মি এ জন্যই বানানো হয়েছে, যাতে সে মুসলিমদের বা মুসলিমদের দ্বীনের কোনো সমালোচনা না করে। সে এটা মেনেই তো যিম্মি হয়েছে। এরপরও যখন সে এমন কাজ করেছে, তখন আমরা তাকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

পক্ষান্তরে হারবি কাফের মুসলিমদের আওতামুক্ত। সে মুসলিমদের প্রকাশ্য দুশমন। সে তো সমালোচনা করা স্বাভাবিক। সবাই জানে যে, এটাই তার আকিদা বিশ্বাস। সে তার আকিদা বিশ্বাস মতেই কাজ করছে।

অধিকন্তু সে মুসলিমদের থেকে দূরে থাকে। ইসলাম সম্পর্কে জানাশুনা নেই। মুসলিমদের নবী সম্পর্কেও জানাশুনা নেই। তার থেকে এ কাজ প্রকাশ পাওয়া যিম্মি ও মুসলিমের তুলনায় স্বাভাবিক। এ হিসেবে তাকে যিম্মি ও মুসলিম শাতিমের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

যাহোক, হারবি শাতিমের এ সূরতটা আমার কাছে অস্পষ্ট। কোনো ভাইয়ের তাহকিকে ধরা পড়লে আমাকে জানানোর অনুরোধ।

বিশেষ আবেদন

হানাফি মাযহাবের ব্যাপারে উপরোক্ত তাহকিক আমার ব্যক্তিগত। যদি কোনো ভাইয়ের কাছে আমার তাহকিকের কোনো অংশ ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে আমাকে শুধরে দেয়ার অনুরোধ। বিশেষ করে হারবি মুফসিদ শাতিম মুসলমান হয়ে গেলে হত্যা করা হবে কি'না বিষয়টাতে আমি সন্দিহান। কোনো ভাইয়ের তাহকিকে ধরা পড়লে অবশ্যই আমাকে অবগত করবেন। পাশাপাশি দোয়া করবেন, যেন আল্লাহ তাআলা ভুলক্রটিমুক্ত সহীহ তাহকিকের তাওফিক দান করেন।

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.

শাতিমকে হত্যা করবে কে?

শাতিমকে হত্যা করবে কে- এটা অনেকের প্রশ্ন। এর সহজ উত্তর ছিল-

রাসূলের যামানায় শাতিমকে হত্যা করতো কে?

সবাই জানেন, সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত মজলিসেই শাতিমকে হত্যা করে দিতেন। রাসূলের কাছ থেকে অনুমতি নেয়ারও প্রয়োজন বোধ করতেন না। বুঝা গেল, শাতিমকে যে কেউ হত্যা করতে পারবে।

শাতিম হত্যায় কি সরকারের অনুমতি লাগবে?

কিন্তু সরকারপন্থী কিছু আলেম ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে যে, শাতিম হত্যা হদের অন্তর্ভুক্ত। হদ কায়েমের দায়িত্ব ইমামের। তাই ইমামের অনুমতি ছাড়া সাধারণ জনগণ শাতিমকে হত্যা করতে পারবে না। এ বিষয়টি পুঁজি করে তারা সংশয় ছড়ায়, সরকারের অনুমতি ছাড়া জনগণ শাতিম হত্যা করতে পারবে না।

সরকার যদি হত্যা না করে?

যদি আমরা তর্কের খাতিরে মেনেও নেই যে, শাতিম হত্যা সরকারের দায়িত্ব, তখন প্রশ্ন আসবে, সরকার না করলে কে করবে?

অধিকন্তু সরকার যদি নিজেই শাতিমদের পাহাড়া দেয় এবং নতুন নতুন শাতিম জন্ম দেয়ার পথ করে দেয়, তাহলে কি বিধান?

এ ধরনের প্রশ্নগুলো তারা এড়িয়ে চলে।

যেমন নামায না পড়লে মুরতাদ। কিন্তু মন্ত্রী এমপিরা যে নামায পড়ে না, তারা মুরতাদ কি’না- এ প্রশ্নটা তারা এড়িয়ে চলে।

শাতিম হত্যা কি হদের অন্তর্ভুক্ত?

স্বাভাবিক বলা হয় মালিকি ও হাম্বলি মাযহাব মতে শাতিম হত্যা হদের অন্তর্ভুক্ত। এ কথাটি পুঁজি করেই সরকারি আলেমরা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে যে, জনগণ শাতিম হত্যা করতে পারবে না।

আসলে এরা হাকিকতটা উল্টে ধরেছে। ফুকাহায়ে কেরাম যে মাকসাদে হদ বলেছেন, তারা সে মাকসাদের ঠিক বিপরীত বানিয়ে ফেলেছে। শব্দের মারপ্যাঁচে জাতিকে ধোঁকা দিয়েছে।

শাতিম হত্যা সব মাযহাব মতেই হদ

স্বাভাবিক বলা হয় মালিকি ও হাম্বলি মাযহাব মতে শাতিম হত্যা হদ। হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাব মতে হদ নয়। তবে বাস্তব হলো, সব মাযহাব মতেই শাতিম হত্যা হদ। তবে একটু বেশকম আছে। সামনে এর আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

হানাফি মাযহাবে মুরতাদ ও শাতিমের বিধান একই

উল্লেখ্য, হানাফি মাযহাবে মুরতাদ ও শাতিমের বিধান একই। এ হিসেবে সামনে মুরতাদের যে আলোচনা আসছে তা-ই

শাতিমের বেলায় প্রযোজ্য।

রিদ্দাহর শাস্তি এবং হানাফি মাযহাবে দ্বৈত বক্তব্যের সমন্বয়

হানাফি মাযহাবে হদ ছয় প্রকার বলা হয়েছে।

ইবনে আবেদীন শামী রহ. (১২৫২হি.) ইবনে কামাল পাশা রহ. (৯৪০হি.) -এর সূত্রে বলেন,

وهي ستة أنواع: حد الزنا، وحد شرب الخمر خاصة، وحد السكر من غيرها والكمية متحدة فيهما، وحد القذف، وحد السرقة، وحد قطع الطريق ابن كمال. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 3)

হদ ছয় প্রকার: ১. যিনার হদ। ২. মদপানের হদ। ৩. মদ ব্যতীত অন্য কোন মাদক সেবনে মাতাল হওয়ার হদ। তবে শাস্তির পরিমাণ উভয়টাতে একই। ৪. কজফ তথা যিনার অপবাদ লাগানোর হদ। ৫. চুরির হদ। ৬. রাহাজানির হদ। -রদ্দুল মুহতার: ৪/৩

এর মধ্যে মুরতাদ বা শাতিমে রাসূলের শাস্তির উল্লেখ নেই।

অপরদিকে ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.) বলেন,

قتل المرتد على ردته حد. المبسوط للسرخسي (10/ 118)
রিদ্দাহয় বহাল থাকাবস্থায় মুরতাদকে হত্যা করা হদ। -মাবসুত: ১০/১১৮

একই কথা বলেছেন শরহুস সিয়ারেও (পৃষ্ঠা: ১৭০৪)।

قتل المرتد مستحق حدا. شرح السير الكبير (ص: 1704)

এ দ্বৈততার সমন্বয় হচ্ছে, তাওবা করলে যেহেতু মাফ হয়ে যায়, এ দিকটি বিবেচনা করে হদ বলা হয়নি। আবার তাওবার আগ পর্যন্ত যেহেতু মাফের সুযোগ নেই, এ দিকটি বিবেচনা করে হদ বলা হয়েছে। উভয়টিই ঠিক আছে।

রিদ্দাহর শাস্তি হদ কি হদ নয় এ ব্যাপারে কিছু আলোচনার পর ইবনে আবিদিন রহ. বলেন,

وبهذا يظهر لك أن قتل المرتد حد ... إنما يسمى حدا ما دام باقيا على ردته. –تنبيه الولاة والحكام: 31، 33

এ আলোচনা থেকে আপনি বুঝতে পারছেন, মুরতাদ হত্যা হদ। ... তবে হদ বলা হবে যতক্ষণ সে রিদ্দাহয় বহাল থাকবে। -তাম্বিহুল উলাতি ওয়াল হুক্কাম: ৩১, ৩৩

অর্থাৎ তাওবা করে মুসলিম হয়ে গেলে আর হদ নয়। তখন রিদ্দাহর কারণে হত্যা করা যাবে না। হ্যাঁ, মুফসিদ ফিল আরদ

হলে সিয়াসত ও তা'যিরূপে হত্যা করা যাবে, যেমনটা আগে আলোচনা গেছে।

মুরতাদ ও শাতিম হত্যা হদ- এর কি উদ্দেশ্য?

দেখলাম, হানাফি মাযহাবেও মুরতাদ ও শাতিমের হত্যা হদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?
এটি বুঝতে হলে আপনাকে বুঝতে হবে, হদ কাকে বলে?

হদ হচ্ছে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি, যা কেউ মাফ করতে পারে না। যেমন চোরের শাস্তি হাত কাটা। কাযির কাছে চুরি প্রমাণ হওয়ার পর, যার মাল চুরি হয়েছে সে হাত কাটা মাফ করতে পারবে না। মাফ করলেও মাফ হবে না। কাটতেই হবে।

পক্ষান্তরে কেউ যদি কারো পিতাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে হত্যার বদলে হত্যার বিধান। নিহতের সন্তানেরা ইচ্ছা করলে কিসাস মাফ করে দিয়াত নিতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে সম্পূর্ণই মাফ করে দিতে পারে। কারণ, কিসাস হদ নয়। এটা নিহতের অলির হক। ইচ্ছে করলে মাফ করতে পারে। কিন্তু হদ স্বয়ং আল্লাহ তাআলার হক। এটা কেউ মাফ করতে পারবে না।

শাতিম হত্যা হদের অন্তর্ভুক্ত এ হিসেবেই। অর্থাৎ কেউ মাফ

করতে পারবে না।

তবে বেশকম হলো, মালিকি ও হাম্বলি মাযহাব মতে তাওবার আগেও হদ, পরেও হদ। কাজেই শাতিম তাওবা করলেও হত্যা মাফ হবে না।

আর হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাব মতে তাওবার আগে হদ, পরে হদ নয়। অর্থাৎ তাওবার আগে কেউ মাফ করতে পারবে না। তাওবা না করলে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। তাওবা করে ফেললে আর হদ থাকবে না। তখন যদি মুফসিদ ফিল আরদ হিসেবে হত্যার উপযোগী হয়, হত্যা করা হবে। অন্যথায় অন্য শাস্তি দেয়া হবে। হত্যা করা হবে না।

সংশয়: হদ কায়েম করতে দারুল ইসলাম লাগে, ইমাম লাগে

এখন তাহলে প্রশ্ন হবে, মুরতাদ ও শাতিমের শাস্তি যদি হদ হয়, তাহলে হদ কায়েমের দায়িত্ব তো ইমামের। আমাদের তো ইমাম নেই। তাহলে মুরতাদ ও শাতিমকে হত্যা করা হবে কি হিসেবে?

আরও একটা প্রশ্ন আসবে যে, হদ কায়েম করতে তো হানাফি মাযহাব মতে দারুল ইসলাম লাগে। আমরা তো দারুল হারবে আছি।

এ প্রশ্নের উত্তর সামনের পয়েন্টে-

মুরতাদ ও শাতিম হারবি কাফের, বিধায় যে কেউ হত্যা করতে পারবে

হ্যাঁ, হদ কায়েম করতে দারুল ইসলাম লাগে, ইমাম লাগে- সব ঠিক। তবে শাতিম ও মুরতাদের বিষয়টা ব্যতিক্রম। শাতিমই হোক বা অন্য যেকোনো মুরতাদই হোক, সে কাফের।

এখন প্রশ্ন, সে চুক্তিবদ্ধ কাফের না'কি হারবি কাফের?

স্পষ্ট যে, হারবি কাফের। কারণ, চুক্তিবদ্ধ কাফের তিন প্রকার:

এক. যিম্মি: যে জিযিয়ার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দারুল ইসলামের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছে।
দুই. মুআহিদ: কাফের রাষ্ট্রের কাফের বাসিন্দা, যাদের সাথে মুসলিমদের সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে।
তিন. মুস্তামিন: কাফের রাষ্ট্রের কাফের বাসিন্দা, যে সাময়িক আমান নিয়ে দারুল ইসলামে ব্যবসা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এসেছে।

মুরতাদ এ তিন শ্রেণীর কোনো শ্রেণীরই নয়। তার সাথে মুসলিমদের কোনো চুক্তি নেই। কাজেই সে হারবি কাফের।

বরং আরও নিকৃষ্ট কাফের। আর হারবি কাফেরকে যে কেউ হত্যা করতে পারে। দারুল ইসলাম, দারুল হারব যেখানেই পাওয়া যাবে সে হালালুদদাম। এ হিসেবেই শাতিম ও মুরতাদকে যে কেউ হত্যা করতে পারবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]

মুশরিকদের তোমরা যেখানেই পাবে হত্যা করবে। - তাওবা: ৫

ইমাম সারাখসী রহ. বলেন,

لأنه بالردة صار كالحربي في حكم القتل، ولكل مسلم قتل الحربي الذي لا أمان له. شرح السير الكبير (ص: 1938)

(মুনীব তার মুরতাদ গোলামকে হত্যা করতে পারবে) কারণ, মুরতাদ হওয়ার দ্বারা হত্যার বিধানের ক্ষেত্রে সে হারবি কাফেরের মতো হয়ে গেছে। আর মুসলিমদের সাথে যে হারবি কাফেরের আমানের চুক্তি নেই, তাকে প্রত্যেক মুসলিমই হত্যা করতে পারবে। -শরহুস সিয়ারিল কাবির: ১৯৩৮

মুরতাদ ও মুসলিম শাতিমকে আমান দেয়ার পরও হত্যা করা হবে

আমরা দেখেছি, মুরতাদ ও মুসলিম শাতিমের হত্যা হদের

অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মুসলমান না হলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। কেউ মাফ করতে পারবে না। এ হিসেবে কোনো মুরতাদ যদি নাগালের বাইরে চলে যায় এবং মুসলমানরা তার সাথে কোনো নিরাপত্তা চুক্তি করে, তারপর সে নিরাপত্তা নিয়ে মুসলিমদের কাছে আসে, তাহলে তখন আর তাকে ছাড়া হবে না। কারণ, তাকে হত্যা করা আবশ্যক। আর যাকে হত্যা করা আবশ্যক, আমানের মাধ্যমে তার জীবনরক্ষা হবে না।

ইমাম সারাখসী রহ. বলেন,

لو طلب قوم من المرتدين أن يؤمنوهم على أن يكونوا ذمة يؤدون الخراج فلا ينبغي أن يؤمنوهم على ذلك لأن قتل المرتد مستحق حدا، ولا يجوز ترك إقامة الحد ولا تأخيره بمال ... فإن أعطوهم ذلك حتى خرجوا إلينا عرض عليهم الإسلام فإن أبوا قتلوا، ولا يجوز ردهم إلى مأمنهم بحال؛ لأن القتل مستحق عينا على المرتد إن لم يسلم، قال – صلى الله عليه وآله وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» . شرح السير الكبير (ص: 2016-2017)

মুরতাদদের কোনো দল যদি জিযিয়া আদায়ের শর্তে আমানের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে মুসলিমদের উচিৎ নয় এ শর্তে তাদের আমান দেয়া। কারণ, মুরতাদ হত্যা হদ। মালের বিনিময়ে হদ ছেড়ে দেয়া বা কায়েমে দেরি করা জায়েয নয়। ... তবে যদি আমান দিয়ে দেয় এবং এর ভিত্তিতে তারা আমাদের কাছে চলে আসে, তাহলে তাদেরকে মুসলমান হয়ে যেতে আহ্বান জানানো হবে। যদি না হয়, হত্যা করে দেয়া হবে। কোনো অবস্থায়ই তাদেরকে তাদের নিরাপদস্থলে ফিরে

যেতে দেয়া জায়েয হবে না। কারণ, মুসলমান না হলে মুরতাদকে হত্যা করা সুনির্ধারিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি তার আপন দ্বীন (ইসলাম) পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করে দেবে'। -শরহুস সিয়ার: ২০১৬-২০১৭

আরও বলেন,

والمقصود أن المرتد راجع عن الإسلام بعد ما أقر به فكان قتله مستحقا حدا. (ألا ترى) أنه لو دخل إلينا بأمان أو رسولا، أو غير رسول لم ندعه يرجع إلى دار الحرب، ولكن نعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل. شرح السير الكبير (ص: 1707)

মুরতাদ ইসলামকে স্বীকার করে নেয়ার পর তা থেকে ফিরে গেছে। কাজেই তার হত্যাটা হদ। তুমি কি দেখনা, (যেহেতু তা হদ, তাই) মুরতাদ যদি আমান নিয়েও আমাদের কাছে আসে, দূত হিসেবেই আসে বা এমনিতেই আসে, আমরা তাকে দারুল হারবে ফিরে যেতে দেবো না। বরং মুসলমান হতে বলবো। হলে তো ভালো। নইলে হত্যা করে দেয়া হবে। -শরহুস সিয়ার: ১৭০৭

শাতিমের বিধান মুরতাদের চেয়েও কঠোর

এ তো গেল সাধারণ মুরতাদের বিধান। আর শাতিমের বিধান

তো আরও কঠোর। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম একে উপস্থিত মজলিসেই হত্যা করে দিতেন। রাসূলের অনুমতির অপেক্ষায়ও থাকতেন না।

শাতিম মহিলা হলেও ছাড় নেই

হারবি মহিলাদের হত্যা করা শরীয়তে নিষেধ। কিন্তু যদি রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করে তাহলে হত্যা করে দেয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম এমনটিই করেছেন।

ইমাম সারাখসী রহ. বলেন,

وكذلك إن كانت تعلن شتم رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم -، فلا بأس بقتلها. شرح السير الكبير (ص: 1417)

এমনিভাবে হারবি মহিলা যদি প্রকাশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি করে, তাহলে হত্যা করে দিতে সমস্যা নেই। -শরহুস সিয়ারিল কাবির: **১৪১৭**

এরপর তিনি এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ উল্লেখ করেন।

ইবনে আবিদিন রহ. বলেন,

فهو مخصوص من عموم النهي عن قتل النساء من أهل الحرب.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 216)

অতএব, হারবি শাতিম মহিলাকে হত্যা করে দেয়ার বিষয়টা হারবি মহিলাদের হত্যার সাধারণ নিষেধাজ্ঞার বাইরে। -রদ্দুল মুহতার: ৪/২১৬

শাতিম বাপ হলেও ছাড় নেই

বাপ মুশরিক হলেও ছেলের জন্য বাপকে হত্যা করা নিষেধ। কিন্তু শাতিম এ হুকুমের আওতাধীন নয়।

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন,

وينبغي أنه لو سمع أباه المشرك يذكر الله أو رسوله بسوء يكون له قتله لما روي «أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب النبي - صلى الله عليه وسلم - وشرف وكرم، فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك» . فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 454)

যদি মুসলিম তার আপন মুশরিক পিতাকে শুনতে পায় যে, সে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের শানে কটুক্তি করছে, তাহলে তাকে হত্যা করে দেয়া জায়েয হওয়াই সমীচিন। বর্ণিত আছে, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদি. তাঁর পিতাকে যখন শুনলেন যে, রাসূলকে নিয়ে কটুক্তি করছে, তিনি তাকে হত্যা করে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে কোনো আপত্তি করেননি। -ফাতহুল কাদির: ৫/৪৫৪

শাতিম হত্যা হদ বলা হলো কোন হিসেবে?

আমরা দেখলাম, শাতিম হত্যার জন্য ইমাম দরকার নেই। দারুল ইসলাম দরকার নেই। শাতিম হারবি কাফের। তাকে যে কেউ হত্যা করতে পারে। এমনকি আমান দিয়ে দিলেও, বাগে পাওয়ার পর ছাড়া হবে না।

তাহলে প্রশ্ন, শাতিম হত্যা হদ বলা হলো কোন হিসেবে?

উত্তর সেটাই, যা আগে বলা হয়েছে: যেহেতু শাতিম হত্যা মাফ হওয়ার সূরত নেই (মালিকি ও হাম্বলি মাযহাব মতে তাওবার আগে পড়ে সর্বাবস্থায়, আর হানাফি ও শাফিয়ি মাযহাব মতে তাওবার আগে) এ হিসেবে হদ বলা হয়েছে।

ইমাম থাকতে হবে, দারুল ইসলাম লাগবে- এ হিসেবে বলা হয়নি। অন্যথায় যিনার শাস্তি যেমন দারুল ইসলাম ছাড়া এবং ইমাম ছাড়া কায়েম করা যায় না, মুরতাদের ও শাতিমের হত্যাও এমনই হতো। বুঝা গেল, এ হিসেবে হদ বলা হয়নি। কিন্তু সরকারি আলেমরা এ বিষয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করতে চায়। আল্লাহ তাআলা তাদের গোমড় ফাঁস করে দিন। আমীন।

তারা যেহেতু সরকারকে উলুল আমর দাবি করে, তাই উচিৎ

ছিল সরকারকে চাপ দেয়া যে, শাতিম হত্যা হদ। কিছুতেই তা মাফ করা যাবে না। আপনারা শাতিমদের ধরে হত্যা করুন।

কিন্তু তা না করে উল্টো শাতিমদের বাঁচিয়ে দেয়ার ফন্দি করেছে। এভাবে আল্লাহর নির্ধারিত একটি হদের বিপক্ষে তাদের অবস্থান। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

***

আল্লাহ তাআলার তাওফিক হলে সামনের পর্বে ইমামের অনুমতি নিয়ে আরও কিছু কথা এবং দাওয়াতের মাসআলা আলোচনা হবে।

শাতিম হত্যা
এবং
ইমামের অনুমতি

শাতিমকে হত্যা করবো হারবি হিসেবে, হদ হিসেবে নয়

শাতিম যদি আসলি কাফের হয়- যেমন ধরুন হিন্দু, খৃস্টান- তাহলে, তার জান মাল আগে থেকেই মুসলিমদের জন্য হালাল। সে হারবি। হারবিকে যেকোনো মুসলিম হত্যা করতে পারে।

আর যদি আগে মুসলিম থেকে থাকে তাহলে এখন সে মুরতাদ হয়ে গেছে এবং হালালুদদাম হয়ে গেছে। হারবি হয়ে গেছে। হারবি কাফের হিসেবে যে কেউ তাকে হত্যা করতে পারে।

অতএব, আমরা যে শাতিমকে হত্যার কথা বলছি, তা এ হিসেবেই যে, শাতিম হারবি কাফের এবং হালালুদদাম। আমরা তাকে হারবি হিসেবে হত্যা করছি, হদ হিসেবে নয়। অতএব,

আপত্তির সুযোগ নেই যে, হদ কায়েমের দায়িত্ব ইমামের।

হদ কায়েম ইমামের দায়িত্ব তা আপন জায়গায় বহাল আছে। এ কারণে আমরা যিনাকারকে রজম করছি না, চোরের হাত কাটছি না, মদ্যপানকারীকে দোররা লাগাচ্ছি না। কারণ, এগুলো খালেস হদ। এগুলো কায়েম করতে দারুল ইসলাম ও ইমাম বা সুলতানের প্রয়োজন আছে।

পক্ষান্তরে শাতিম হারবি কাফের। হারবিকে যেকোনো মুসলিম হত্যা করতে পারে। সে হিসেবেই আমরা এ খবিসকে হত্যা করছি। বিষয়টি একটু ভাল করে বুঝা উচিৎ।

সাহাবায়ে কেরাম অনুমতি ছাড়াই হত্যা করেছেন

আমরা যদি সিরাতের দিকে তাকাই, দেখতে পাবো, শাতিম মহিলা হোক পুরুষ হোক- সাহাবায়ে হত্যা করে দিয়েছেন। অনুমতি নেয়ার প্রয়োজনও বোধ করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়েছেন। হত্যাকারী সাহাবিদের প্রশংসা করেছেন। বুঝা গেল, শাতিম এমনই এক জঘন্য কীট, যাকে সরানোর জন্য ইমামের অনুমতি নিষ্প্রয়োজন।

অনুমতির অপেক্ষায় বসে থাকা গাইরত পরিপন্থী

গাইরত ও রাসূলের মুহাব্বাতের দাবিও এটাই যে, রাসূল অবমাননাকারীদের যেখানে যখন পাওয়া যায় হত্যা করে দেয়া। অনুমতির অপেক্ষায় বসে থাকা গাইরত ও মুহাব্বাতের পরিপন্থী। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম তৎক্ষণাৎ হত্যা করে দিয়েছেন।

রাসূলের তো মাফ করে দেয়ার অধিকারও ছিল, এতদসত্ত্বেও ...

অথচ আপনারা জানেন, রাসূলের জীবদ্দশায় যেকোনো শাতিমকে মাফ করে দেয়ার অধিকার রাসূলের ছিল। কোনো কোনো শাতিমকে তিনি তাওবার পর মাফ করেও দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করেননি যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি একে মাফ করে দেবেন, না'কি হত্যা করে দেবো?

আর বর্তমানে তো উম্মতের এ অধিকার নেই যে, কোনো শাতিমকে নিজে থেকে মাফ করে দেবে। তখন কি করে দাবি করা যায় যে, সাধারণের জন্য শাতিম হত্যা নাজায়েয?!! রাসূল নিজে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যদি সাহাবায়ে কেরামের জন্য জায়েয বরং প্রশংসনীয় হয়, সেখানে আমাদের উপর হারাম

করে ফেলবে এমন বুকের পাটা কার আছে?! হ্যাঁ, গায়ের জোরে তো অনেক কিছুই বলা যায়।

সরকারি আলেমদের প্রতি আহ্বান

সরকারি আলেমদের কাছে আবদার থাকবে, আপনারা এমন দু'চারটি দলীল বা দু'চারজন ইমামের বক্তব্য পেশ করুন, যারা বলেছেন, সরকারের অনুমতি ছাড়া শাতিম হত্যা নাজায়েয। এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সত্য গোপনের পায়তারা করবেন না।

অনুমতির কথা থাকলে মুরতাদের ক্ষেত্রে; শাতিমের ক্ষেত্রে নয়

হ্যাঁ, ফিকহের কিতাবে স্বাভাবিক মুরতাদ, যে কোনো সন্দেহে পতিত হয়ে মুরতাদ হয়ে গেছে, তার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ইমামের উপর আগে বেড়ে নিজে থেকে কেউ হত্যা করবে না।

কারণ, ইমাম নিযুক্তই করা হয়েছে এসব হদ কায়েমের জন্য। ইমাম তার বাহিনিসমেত সর্বদা ইসলামের পাহারায় নিয়োজিত। কোনো লোক মুরতাদ হওয়ার পর ইমামের হাত থেকে ছাড় পেয়ে যাবে এর কল্পনাও করা যায় না দারুল ইসলামে।

এ ধরনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ইমামের হাতে ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। এটাও স্বাভাবিক মুরতাদের ক্ষেত্রে, শাতিমের ক্ষেত্রে না। শাতিমের বেলায় তো আমরা দেখেছি, সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত মজলিসে হত্যা করে দিয়েছেন। অনুমতির অপেক্ষায় বসে থাকেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজে খুশী হয়েছেন। সাহাবিদের প্রশংসা করেছেন।

দারুল ইসলামে অনুমতি ছাড়া মুরতাদ হত্যা ইমামের অপমান

ধরুন, দেশের নামীদামী কোনো মাদ্রাসার প্রধান মুফতি সাহেবকে আপনাদের এলাকার জামে মসজিদের খতীব নিয়োগ দিলেন। তিনি জুমা পড়ান। নিয়মিত পড়ান। আজও তিনি উপস্থিত। বয়ানও করেছেন। খুতবাও দিয়েছেন। এখন নামায পড়াবেন। এ মূহুর্তে সাধারণ কেউ যদি হাজারো মুসল্লির সামনে কোনো প্রকার অনুমতি ছাড়াই খতীব সাহেবকে পেছনে রেখে নিজেই নামায পড়াতে শুরু করে দেয়, তাহলে কেমন দেখাবে বিষয়টা?

এখানেও বিষয়টা এমনই। ইমামুল মুসলিমিন মুরতাদ হত্যার জন্য প্রস্তুত। এবং তিনি তা খুব ভালভাবে আঞ্জামও দিয়ে থাকেন। এখনও দেবেন। এমন মূহুর্তে যদি কেউ ইমামের অনুমতি ছাড়া নিজেই কোনো মুরতাদকে পেয়ে হত্যা করে দেয়, তাহলে এটা ইমামের অপমান। এজন্যই ইমামের হাতে

ন্যস্ত করতে বলা হয়েছে।

আরেকটা বিষয় হলো, এতদিন যে ব্যক্তি মুসলিম ছিল, নামাযী ছিল, আজ হঠাৎ যদি সে মুরতাদ হয়ে যায়, বুঝা যাবে যে, সে কোনো সংশয়ে পতিত। এমন ব্যক্তিকে প্রথমে হত্যা না করে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিৎ। আর ইমামুল মুসলিমিন এ কাজটি করতে পারবেন ভাল মতো। তাই মুরতাদ হত্যার দায়িত্ব ইমামের হাতে ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। কেউ স্বেচ্ছারিতা দেখালে প্রয়োজনমাফিক শাস্তিও দিতে বলা হয়েছে।

ইবনে আবিদিন রহ. বলেন,

قوله وإلا قتل «فإن أسلم وإلا قتل لحديث «من بدل دينه فاقتلوه قال في المنح: وأطلق فشمل الإمام وغيره، لكن إن قتله غيره أو قطع عضوا منه بلا إذن الإمام أدبه الإمام. اهـ. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 226)

গ্রন্থকার বলেন, ‘মুসলমান হলে ভাল, অন্যথায় হত্যা করে দেয়া হবে’।

হত্যা কে করবে- এ বিষয়টা তিনি ব্যাপক রেখেছেন। অতএব, ইমাম এবং সাধারণ সকলেই এতে অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধারণ কেউ ইমামের অনুমতি ছাড়া হত্যা করে ফেললে বা অঙ্গ কেটে ফেললে, (ইমামের হক নষ্ট এবং স্বেচ্ছাচারিতা দেখানোর কারণে) ইমামুল মুসলিমিন তাকে (মুনাসিবমতো) শাসন করবেন। -রদ্দুল মুহতার: ৪/২২৬

ইমামের উপর আগে বেড়ে কাজ করা প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেন,

إذا أدخل الحربي بغير إذنه يصح أمانه ويعزر لافتياته. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 204)

কোনো মুসলিম যদি (ইমামের অনুমতি ছাড়া) কোনো হারবিকে আমান দিয়ে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তাহলে আমান সহীহ হবে। তবে ইমামের উপর আগে বেড়ে যাওয়ার কারণে (মুনাসিব মনে করলে) তাকে শাস্তি দেবেন। -রদ্দুল মুহতার: ৪/২০৪

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه أو قطع عضوا منه كره ذلك، ولا شيء على القاتل والقاطع لأن الكفر مبيح وكل جناية على المرتد هدر ومعنى الكراهة هنا ترك المستحب فهي كراهة تنزيه. فتح القدير للكمال ابن الهمام (6/ 71)

মুসলমান হওয়ার দাওয়াত পেশ করার আগেই যদি কেউ মুরতাদকে হত্যা করে ফেলে বা অঙ্গ কেটে ফেলে তাহলে তা মাকরূহ হবে। তবে হত্যাকারী বা কর্তনকারীর উপর কোনো জরিমানা বর্তাবে না। কেননা, কুফর এমন অপরাধ যা তার রক্ত হালাল করে দিয়েছে। মুরতাদের উপর (হত্যা-কর্তন) যা যাবে, কোনোটার কোনো জরিমানা নেই।

উল্লেখ্য, এখানে মাকরূহ দ্বারা উদ্দেশ্য তা মুস্তাহাবের পরিপন্থী।

অতএব, তা মাকরুহে তানযিহি। -ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম: ৬/৭১

মুরতাদের রক্ত মূলত হালাল। তবে দাওয়াত পেশ করার আগেই এবং ইমামের আগে বেড়ে নিজে থেকে হত্যা করে দুইটি মন্দ করলো,

এক. দাওয়াত দেয়া হলো না। হতে পারে তার কোনো সংশয় ছিল, যা দলীল প্রমাণ পেশ করলে হয়তো দূর হয়ে যেতো এবং সে মুসলমান হয়ে যেতো। অবশ্য এটা বড় কোনো মন্দ নয়। মুস্তাহাবের পরিপন্থী। (সামনের পর্বে ইনশাআল্লাহ কথা বলবো যে, কোন ধরনের মুরতাদকে দাওয়াত দেয়া হবে আর কাকে দেয়া হবে না।)

দুই. ইমামের হক নষ্ট করলো। ইমামের আগে বেড়ে স্বেচ্ছাচারিতা দেখাল।

আর দাওয়াতের পর মুসলমান না হলে যদি হত্যা করে, তাহলে শুধু ইমামের হক নষ্ট হলো। এ কারণে ইমাম তাকে শাসন করবেন।

অতএব, মূলত মুরতাদ হত্যা কোনো অন্যায় না। অন্যায় হলো ইমামের আগে বেড়ে যাওয়া। আর এটাও অনেক বড় কোনো অন্যায় নয়। অনেক সময় ব্যক্তি গাইরতের কারণেও হত্যা করে ফেলতে পারে। অবশ্য ইমামের আগে বেড়ে যাওয়া হল। এজন্য ইমাম ব্যক্তিভেদে যতটুকু শাসনের দরকার করবেন। যেন কেউ ইমামের হাতে ন্যস্ত বিষয়াশয়ে ইমামের আগে বেড়ে না যায়।

উল্লেখ্য, আগেও বলা হয়েছে, ইমামের হক নষ্টের এ মাসআলা মুরতাদের ক্ষেত্রে। শাতিমের ক্ষেত্রে না। শাতিমের ক্ষেত্রে তো সাহাবায়ে কেরাম অনুমতি ছাড়াই হত্যা করেছেন।

ইমাম নেই, ইমামের হকও নেই

ইমামের হকের এ বিধান ঐ সময় যখন ইমাম থাকবে এবং ইমাম বিচার করবে নিশ্চিত। যেমন আফগানিস্তান ইসলামি ইমারা এই কয়েক দিন হলো ফরমান জারি করেছে, আদালতের ফায়সালা ছাড়া যেন কেউ কোনো অপরাধীকে শাস্তি না দেয় এবং শাস্তির ভিডিও না করে। কারণ, সারা দেশে তাদের বাহিনি আছে। কাযি আছে। আদালত আছে। সাধারণ মানুষ নিজেরা শাস্তি দেয়ার দরকার নেই।

অধিকন্তু সাধারণ মানুষ অনেক সময় সীমালংঘনও করে। যতটুকু শাস্তি প্রাপ্য এর চেয়ে বেশি মারপিট করে। তাই এ ফরমান। সেখানে বলা যাবে, মুরতাদকে নিজেরা হত্যা না করে কাযির দরবারে সোপর্দ করবে।

কিন্তু আমাদের দেশগুলোর মতো যেখানে ইমাম নেই, সেখানে এ বিধানও নেই। ইমাম নেই, ইমামের হকও নেই। বরং সরকার নিজেই মুরতাদ। দেশের মুসলমান তো সরকারকে হত্যা করার জন্যই ওঁৎপেতে আছে।

আমাদের অবস্থা হলো, কোনো লোক মুরতাদ হয়ে আমেরিকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। আমেরিকা তার নিরাপত্তা দিচ্ছে। যেকোনো মুসলমান সুযোগ পেলে ঐ মুরতাদকে তো হত্যা করবেই, আমেরিকার যে কাফেরকে বাগে পাবে তাকেও হত্যা করবে।

আমাদের সরকারগুলো তো আরও নিকৃষ্ট কাফের। এদের হত্যার অপেক্ষায়ই তো আমরা আছি। এদের অনুমতি নেবো আমরা?! পাগলামি ছাড়া আর কি!

মুরতাদ হত্যায় দাওয়াতের বিধান

শাতিম যদি আসলি কাফের হয়, তাহলে দাওয়াতের কোনো মাসআলা নেই। তার রক্ত তো আগে থেকেই হালাল।
শাতিম যদি মুসলিম হয় তাহলে কি বিধান?

আমরা প্রথমে মুরতাদের দাওয়াতের বিধান সংক্ষেপে আলোচনা করবো। তাতে ইনশাআল্লাহ শাতিমের মাসআলাও পরিষ্কার হবে।

মুরতাদকে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়

দাওয়াতকে অন্য শব্দে ইসতিতাবাহ্ বলা হয়। যার অর্থ, তাওবা তলব করা। সে যে কুফরে লিপ্ত হয়ে দ্বীন থেকে বেরিয়ে গেছে, তা তরক করে আবার ইসলামে ফিরে আসার আহ্বান জানানো। কোনো সংশয়ে পড়ে থাকলে তা দূর করে দেয়া।
এ ইসতিতাবাহ্ বা দাওয়াত কি ফরয? না'কি এ ধরনের কোনো দাওয়াত দেয়া ও তাওবা তলব করা ছাড়াই হত্যা করা যাবে?

এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে কিছুটা দ্বিমত আছে। আমাদের হানাফি মাযহাব মতে মুস্তাহাব; ফরয নয়।

ইমাম কাসানি রহ. (৫৮৭ হি.) হানাফি মাযহাব তুলে ধরেছেন এভাবে,

يستحب أن يستتاب ويعرض عليه الإسلام لاحتمال أن يسلم، لكن لا يجب؛ لأن الدعوة قد بلغته فإن أسلم فمرحبا وأهلا بالإسلام، وإن أبى نظر الإمام في ذلك فإن طمع في توبته، أو سأل هو التأجيل، أجله ثلاثة أيام وإن لم يطمع في توبته ولم يسأل هو التأجيل، قتله من ساعته. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 134)

মুরতাদের কাছে তাওবা তলব করা ও ইসলাম পেশ করা মুস্তাহাব। সম্ভাবনা আছে সে মুসলমান হয়ে যাবে। তবে ওয়াজিব নয়। কারণ, দাওয়াত তো ইতিমধ্যে তার কাছে পৌঁছেছেই। (সে তো মুসলমানই ছিল। ইসলাম সম্পর্কে জানাশুনা আছে। নতুন করে জানানোর প্রয়োজন নেই।) (তাওবা তলব করার পর) মুসলমান হয়ে গেলে তো ভাল; অন্যথায় ইমামুল মুসলিমিন দেখবেন,

- যদি মনে করেন যে, তাওবা করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আশা আছে, কিংবা যদি সে চিন্তা ফিকির করে দেখার জন্য কিছু সময় চায়, তাহলে (মুস্তাহাবরূপে) তিন দিন সময় দেবেন।
- যদি তাওবা করবে বলে আশা না থাকে এবং সে সময়ও না চায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে দেবেন। -বাদায়িউস সানায়ি: ৭/১৩৪

অতএব, মুরতাদকে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়; মুস্তাহাব।

এমনিভাবে তিন দিন সময় দেয়াও ওয়াজিব নয়। সময় দিলে যদি ফায়েদা হবে মনে হয় দিবেন, অন্যথায় তখনই হত্যা করে দেবেন।

অতএব, মুরতাদকে দাওয়াত দেয়া ছাড়াই হত্যা করে দেয়া মুস্তাহাব পরিপন্থী, মাকরুহে তানযিহি, কিন্তু নাজায়েয নয়।

মারগিনানি রহ. (৫৯৩ হি.) বলেন,

فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شيء على القاتل. ومعنى الكراهية ههنا ترك المستحب وانتفاء الضمان لأن الكفر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب. الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 406)

ইসলাম পেশ করার আগেই মুরতাদকে হত্যা করে ফেললে কাজটা মাকরুহ হবে, কিন্তু হত্যাকারীর উপর কোনো জরিমানা আসবে না। মাকরুহ দ্বারা (মাকরুহে তাহরিমি উদ্দেশ্য না) উদ্দেশ্য, তা মুস্তাহাব পরিপন্থী (অর্থাৎ মাকরুহে তানযিহি); তবে জরিমানা নেই। কারণ, কুফর এমন অপরাধ যা রক্ত হালাল করে দেয়। আর দাওয়াত পৌঁছে যাওয়ার পর নতুন করে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়। -হিদায়া: ২/৪০৬

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন,

(ومعنى الكراهة هنا ترك المستحب) فهي كراهة تنزيه. فتح القدير للكمال ابن الهمام (6/ 71)

মুস্তাহাব পরিপন্থী। অর্থাৎ মাকরুহে তানযিহি। -ফাতহুল কাদির: ৬/৭১

মুরতাদকে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয় কেন?

মুরতাদের শরয়ী তাকয়িফটা বুঝতে হবে।

মুরতাদ তো কাফের। আবার কাফেরও এমন কাফের, যার সাথে চুক্তি নেই। তাহলে সে হারবি কাফের।

আবার সে এতদিন মুসলমান ছিল। কাজেই ইসলাম সম্পর্কে তার জানাশুনা আছে।

এ হিসেবে শরীয়তের দৃষ্টিতে মুরতাদের অবস্থা হলো, সে এক হারবি কাফের, যার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে। আর যে হারবির কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে, তাকে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব। তবে শর্ত সাপেক্ষে মুস্তাহাব।

হারবিকে দাওয়াত দেয়া কখন মুস্তাহাব?

যে হারবির কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে, তাকে নতুন করে দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব। তবে দুই শর্তে-

১. দাওয়াত কবুল করবে বলে আশা থাকতে হবে।

২. দাওয়াত দিতে গেলে ক্ষতির আশঙ্কা না থাকতে হবে।

এ দুইটার কোনোটার ব্যতয় ঘটলে দাওয়াত মুস্তাহাব নয়।

ইমাম বুরহানুদ্দীন মাহমুদ বুখারি রহ. (৬১৬ হি.) বলেন,

ثم إنما تستحب الدعوة مرة أخرى للتأكيد بشرطين
أحدهما: أن لا يكون في تقديم الدعوة ضرر على المسلمين، وأما إذا كان في تقديم الدعوة ضرر على المسلمين، بأن علموا أنهم لو قدموا الدعوة يستعدون للقتال، أو يحتالون بحيلة، أو يتحصنون، لا يستحب تقديم الدعوة؛ وهذا لأن تقديم الدعوة مستحب، ودفع الضرر عن المسلمين واجب، ولا يجوز الاشتغال بالمستحب إذا تضمن ترك الواجب.

الشرط الثاني: أن يطمع فيهم ما يدعون إليه، أما إذا كان لا يطمع فيهم ما يدعون إليه، لايشتغلون بالدعوة؛ لأنه يكون اشتغالا بما لا يفيد ـ -المحيط البرهاني، ج:7، ص:95؛ ط. إدارة القرآن

গুরুত্বারোপের জন্য (একবার দাওয়াত পৌঁছার পর) দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেওয়া মোস্তাহাব দু’টি শর্তে:

এক. দাওয়াত প্রদানের মধ্যে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতি না থাকতে হবে। দাওয়াত প্রদানে যদি মুসলমানদের ক্ষতি থাকে; যেমন: মুসলমানদের জানা আছে তারা যদি দাওয়াত দিতে যায় তাহলে কাফেররা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে কিংবা কোনো কূটকৌশল অবলম্বন করবে অথবা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে নেবে- এমন হলে পুনর্বার দাওয়াত দেওয়া মোস্তাহাব নয়। কারণ দাওয়াত দেওয়া মোস্তাহাব, আর মুসলমানদের উপর আগত যে কোনো ক্ষতি প্রতিরোধ করা ফরয। মোস্তাহাব কাজ যদি ফরয পরিত্যাগের কারণ হয় তাহলে সে মোস্তাহাব আমল করা জায়েয নয়।

দুই. যে বিষয়ের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, তারা তাতে সাড়া দেবে বলে আশা থাকতে হবে। সাড়া দেওয়ার আশা না থাকলে দাওয়াত দিতে যাবে না। কারণ, এটি তখন অনর্থক কাজে ব্যস্ত হওয়ার নামান্তর। -আলমুহিতুল বুরহানি ৭/৯৫

মুমতানি'কে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়

মুরতাদ দুই প্রকার:

ক. মাকদুর আলাইহি: দারুল ইসলামের যে বাসিন্দা দারুল ইসলামে মুরতাদ হয়েছে এবং ইমামুল মুসলিমিন তাকে ধরে তাওবা তলব করতে পারবেন, সন্দেহ দূর করতে পারবেন এবং মুসলমান না হলে স্বাভাবিকভাবে হত্যা করে দিতে পারবেন।

খ. মুমতানি': অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক শক্তির অধিকারী, যে কারণে তাদের স্বাভাবিকভাবে পাকড়াও করে তাওবা তলব করা এবং হদ কায়েম করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় প্রকার মুরতাদকে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব নয়।

ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) বলেন,

الممتنع لا يستتاب وإنما يستتاب المقدور عليه. الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 326)

মুমতানি' এর কাছে তাওবা তলব করা হবে না। তাওবা তলব করা হবে মাকদুর আলাইহি থেকে। -আসসারিমুল মাসলুল: ৩২৬

অতএব, মুরতাদরা যদি সংঘবদ্ধ দলে পরিণত হয় এবং স্বাভাবিকভাবে ধরে হদ কায়েম করার সুযোগ না থাকে, তাহলে তাদের হত্যা করতে দাওয়াত দিতে হবে না। যেখানে সুযোগ পাওয়া যায় হত্যা করে দেয়া হবে। কারণ, সে অন্য দশটা হারবির মতোই একটা হারবি।

আমাদের দেশের মুরতাদরা মাকদুর আলাইহি, না মুমতানি'?

আমাদের দেশের মুরতাদরা মাকদুর আলাইহি নয়; মুমতানি'। কারণ, কেউ মুরতাদ হলে এ দেশের আইনে তাকে হত্যার বিধান নেই। বরং বাক স্বাধীনতার নাম করে উল্টো এদের হত্যাকারী নবীপ্রেমিকদের ফাঁসি দেয়া হয়। এদেশের রাষ্ট্রীয় আইন এবং গোটা স্বশস্ত্র বাহিনি মুরতাদদের পাহারায় নিয়োজিত। তাদের ধরে হদ কায়েম করার সামর্থ্য মুসলিমদের নেই। তাই তারা মুমতানি'।

তাহলে এদেশের মুরতাদদের দাওয়াত দেয়ার

আবশ্যকীয়তা নেই

প্রথমত আমরা দেখেছি, মুরতাদকে দাওয়াত দেয়া মূলে ফরযই নয়, মুস্তাহাব।

দ্বিতীয়ত মুরতাদরা রাষ্ট্রীয় আইন ও বাহিনির দ্বারা মুমতানি'। রাষ্ট্র তাদের পাহারায় নিয়োজিত। তাই তারা অন্য দশটা হারবির মতোই। এদের হত্যা করতে দাওয়াত দিতে হবে না। যেখানে পাওয়া যায়, সুযোগ বুঝে হত্যা করে দেয়া হবে।

তৃতীয়ত দাওয়াত দেয়া তো মুস্তাহাব তাদের, যারা দাওয়াত কবুল করবে আশা আছে। পক্ষান্তরে যারা দীর্ঘদিন যাবৎ মুরতাদ, ইসলাম বিদ্বেষের উপরই যে বড় হয়েছে, ইসলামের দুশমনিই যাদের মিশন, যারা রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক কুফফারগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতার ছত্রছায়ায় তাদের মিশন চালিয়ে যায় -এমন ধরনের মুরতাদের দাওয়াত দিয়ে লাভ কি? তাদের ব্যাপারে তো স্পষ্টই যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে না।

সর্বোপরি তাদের ধরে ধরে দাওয়াত দেয়ার সামর্থ্য তো আমাদের নেই, যেমন নেই ফ্রান্সের শাতিমদের দাওয়াত দেয়ার সামর্থ্য। তারা রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তির বলয়ে বেষ্টিত, যা ভেদ করে দাওয়াত নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না।

এরপরও এদেশের জনগণ মিটিং-মিছিল করে, রাজপথে যতটুকু সম্ভব আন্দোলন করে মুরতাদদের হুঁশিয়ারি সতর্কবাণী শুনাচ্ছেন। কিন্তু মুরতাদরা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই আছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে-বিদেশে আরামে দিন যাপন করছে আর ইসলাম বিদ্বেষ চালিয়ে

যাচ্ছে। কাজেই ফ্রান্সের হারবি শাতিমদের হত্যা করতে যেমন দাওয়াত লাগবে না, দেশীয় শাতিমরাও এমনই।

বরং বাস্তব হলো, যতটুকু জনগণ করেছে, এতটুকুও দরকার ছিল না। মুরতাদ হওয়ার পর পরই যদি কেউ হত্যা করে দেয়, তাহলেও ঠিক আছে। গুনাহের কাজ হতো না। আমরা দেখেছি, দারুল ইসলামের মাকদুর আলাইহি মুরতাদ, যে কোনো সংশয়ে পড়ে মুরতাদ হয়েছে, যাকে দাওয়াত দিলে ফিরে আসতে পারে, তাকেও দাওয়াত দেয়া জরুরী না; মুস্তাহাব। তাহলে দারুল হারবের মুমতানি' ও ইসলাম বিদ্বেষী মুরতাদ, যে এমন নয় যে, কোনো সংশয়ে পড়ে গিয়েছে আর তা দূর করে দিলেই ইসলাম কবুল করে ফেলবে- তাহলে এমন মুরতাদকে কেন দাওয়াত দেয়া ফরয হবে?

হাঁ, দাওয়াত এদেরকে দেয়া যেতে পারে

দেশের সীমান্ত এলাকাগুলোতে খৃস্টান মিশনারী ও এনজিওগুলোর খপ্পরে পড়ে সরলমনা দুর্বল ঈমানের যেসব মুসলিম মুরতাদ হয়ে গেছে, তাদের দাওয়াত দেয়া যেতে পারে। তারা আসলে সংশয়ে পড়েই মুরতাদ হয়েছে। খৃস্টান মিশনারীরা তাদের কাছে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যরূপে দেখিয়েছে। পাশাপাশি দারিদ্রের কষাঘাতে পিষ্ট বিধায় অর্থলোভও কাজ করেছে।

এদেরকে দাওয়াত দিলে, হকটা বুঝিয়ে দিলে তারা আবার দ্বীনে ইসলামে ফিরে আসবে। কিছু দায়ী ভাইয়ের মেহনতে তারা অনেকে ফিরে আসছেও। যদি তাগুত সরকার দায়ী ভাইদের এদের মাঝে কাজ করার সুযোগ দিতো, তাহলে এদের সকলেই আবার মুসলমান হয়ে

যেতো। কিন্তু! তাগুতরাই তো মিশনারী আর এনজিওগুলোকে ইরতাদের সুযোগ করে দিয়েছে এবং নিরাপত্তা দিচ্ছে। পক্ষান্তরে দায়ী ভাইরা যারা কাজ করেন, অনেক রিস্ক নিয়ে কাজ করেন। এতদসত্বেও হাজারা হাজার মুরতাদ হওয়া মুসলমান আবার ফিরে আসছে। এ ধরনের মুরতাদের বেলায় দাওয়াত দেয়ার দরকার আছে।

কিন্তু ওয়াশিক বাবু আর শাহরিয়ার কবিরদের আপনি দাওয়াত দেবেন? তাহলে চৌদ্দ শিকের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

সারকথা

দাওয়াত তাদের দিতে হয় যারা সংশয়ে পড়ে মুরতাদ হয়েছে, দাওয়াত দিলে ফিরে আসবে আশা আছে। অধিকন্তু যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব। দাওয়াত কবুল না করলে হদ কায়েম করার সুযোগ আছে।

পক্ষান্তরে যারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার চাদরে বেষ্টিত, যারা ইসলাম বিদ্বেষ থেকে মুরতাদ, যাদের মাঝে দাওয়াত কোনো কাজ করবে না, বরং দাওয়াত দিতে গেলে আপনার জীবন হুমকির মুখে পড়বে -এদের দাওয়াতের মাসআলা নেই। যেখানে পাবেন হত্যা করে দেবেন। এটাই এদের সঠিক প্রাপ্য।

অধিকন্তু দেশের লাখো কোটি তাওহিদি মুসলিমের বছরের পর বছর মিছিল, আন্দোলন, সভা, মাহফিল ইত্যাদির মাধ্যমে যে পরিমাণ দাওয়াত হয়েছে, তা মুস্তাহাব দাওয়াতের হাজার দরজা অতিক্রম করেছে। কিন্তু ফলাফল শুন্য। এখন ওষুধ একমাত্র ধারালো তরবারি।

দ্বিতীয় কোনো ওষুধ নেই।

শাতিম কিন্তু আরও জঘন্য

আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম, তা সাধারণ মুরতাদের ব্যাপারে। শাতিমের বিধান আরও কঠোর। মুরতাদ তো তাওবা করলে মাফ পেয়ে যায়, কিন্তু শাতিমের ব্যাপারে তো অনেক ইমামের সিদ্ধান্ত- মুসলমান হলেও হত্যা মাফ নেই। যখন মুরতাদের বেলায়ই আমাদের উপরোক্ত আলোচনা, তখন শাতিমের কি হতে পারে নিজেই অনুধাবন করুন।

শাতিমের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহ ছিল- সরাসরি হত্যা। মুরতাদ আর শাতিমের বিধানে অনেক ব্যবধান। শুধু বুঝানোর জন্য মুরতাদের আলোচনাটা আনা হল। যাতে শাতিমের বিধানটা আন্দাজ করা যায়। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.